চিত্রকর ভ্রাতা।

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ রায়, নেত্রকোণা—ময়মনসিংহ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

ভাগ্যলক্ষ্মী

শিল্পী—শ্রী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে

Lakshmibilas Press.
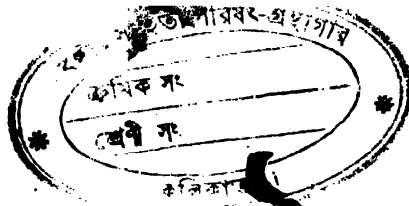
দ্বাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩৩০। | প্রথম সংখ্যা।

রাষ্ট্র ও সমাজ।

রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ই অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। সমাজ যেমন কতকগুলি লোকের সমষ্টি বা সম্মিলন রাষ্ট্রও তেমনি একটা সম্মিলন মাত্র। সমাজের ও রাষ্ট্রে একতা একই প্রকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিতর একতা জন্মিয়া থাকে, ঠিক সেই কারণেই রাষ্ট্রের মধ্যে একতা জন্মে। কতকগুলি লোকের ভিতর একটা সাধারণ জিনিষ থাকে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের মধ্যে একতার সৃষ্টি হয়। সেই প্রকার, বিবিধ সমাজের মধ্যেও একটা সাধারণ জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা তাঁহাদের একতার হেতু। হিগলের মতেও রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কারণ তিনি উভয়কেই সম্মিলন বা সমষ্টি মনে করেন। যাহা হউক, সর্ব্ব প্রকার সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতর বেশ প্রভেদ রহিয়াছে। এই প্রভেদ কি? পরে আলোচনা করিব।

সমাজস্থ সঙ্ঘবদ্ধ লোক সমষ্টির উদ্দেশ্য হইতেছে—সৎজীবন যাপন করা। পরস্পরের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যে কতকগুলি সাধারণ বিষয় সম্পাদন করাই সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য। যে সমাজে এই সাহচর্য্য পূর্ণ ও নিখুত, সেই সমাজই সুগঠিত ও সুদৃঢ়। সাহচর্য্য দুই প্রকার—নিষ্ক্রিয় (Negative) ও সক্রিয় (Positive)। সাহচর্য্য সমাজের একটা দিক। এতদ্ব্যতীত ইহার আরো একটা দিক আছে। সমাজ বিবিধ লোকের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব সহ্য করে; প্রত্যেকের নিজস্বটুকু বজায় রাখিয়া স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগকে আত্মবিকাশের সুবিধা করিয়া দেয়। কিন্তু সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন এক নহে। রাষ্ট্রের একটা নির্দ্দিষ্ট আকার আছে; ইহার আদেশই আইন ও উহা সর্ব্বত্র সমভাবে প্রয়োজ্য। সকল লোকের বিষয়ই ইহাকে পর্য্যালোচনা করিতে হয় এবং সাধারণতঃ সর্ব্বজন সম্পর্কীয় সমুদয় প্রশ্নের এবং সমস্যারই রাষ্ট্র মীমাংসা করিয়া থাকে।

যদিও রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বেশ একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি বাস্তব জগতের দিকে তাকাইলে প্রতীয়মান হয় যে বহুকাল রাষ্ট্র ও সমাজ বাদবিসম্বাদে লিপ্ত ছিল। রাষ্ট্র সাধারণতঃ বিভিন্ন দল, ও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একতা সূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজ সর্ব্বদাই লোক সমষ্টিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া দিতেছে। এই সমুদয় বিভাগ—জন্ম, সম্পত্তি, ব্যবসায়, জ্ঞান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু আদিম প্রথার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় সমাজের ভিত্তি (১) জ্ঞাতিত্ব (২) প্রভুত্ব (৩) দেশবাসীর সত্ত্ব ও (৪) ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই প্রথমতঃ সমাজের একটা সম্প্রসারিণী প্রবৃত্তি ছিল না। সভ্যতার প্রথম যুগে সামাজিক পার্থক্য বিশেষ ছিল না, কারণ তখন সমাজ সাধারণতঃ জ্ঞাতিত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে সময় কতিপয় ব্যক্তির ক্ষমতা দুর্দ্দমনীয় ছিল। এই কারণে তখন বিভিন্ন স্বাধীন সামাজিক দল একত্র থাকিতে পারিত না। কিন্তু তখনও রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। কাজেই দেখা যায় এদিক দিয়া রাষ্ট্র সমাজের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত। সে সময়ে রাষ্ট্রের খুব প্রয়োজনও ছিল; রাষ্ট্রীয় শক্তি বিদ্যমান থাকায় বিভিন্ন

সামাজিক দলের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদের ভিতর একটা একতা সংস্থাপন করিতে পারিত। উক্ত জাতীয় শক্তি Tradition বা সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আমরা আগাগোড়াই দেখিয়া আসিতেছি, রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতর নানা প্রকার সমস্ত থাকা সত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে। সামাজিক শক্তি সর্ব্বদাই রাষ্ট্রীয় শক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে। কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে না যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছানুযায়ী সমাজগঠন করিতে পারিয়াছে, কিংবা রাষ্ট্রের উপর সমাজের কোন প্রভাব নাই। রাষ্ট্র সমাজের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারিয়াছে, ইহার একমাত্র কারণই এই যে রাষ্ট্র সর্ব্বদাই—সমাজ বাস্তবিক পক্ষে কি চায় তাহা স্থির করিয়া লইয়া তদনুসারে নিজকে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে। প্রত্যক্ষ ভাবে না লইলেও পরোক্ষ ভাবে সমাজ রাষ্ট্রের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সামাজিক অবস্থা অনুসারে রাষ্ট্রীয় শক্তি পুনর্গঠন করিতে হইয়াছে। ঠিক ঠিক ভাবে অনুসন্ধান করিলে উল্লিখিত পুনর্গঠিত রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমাজের ভিতরকার বিশেষত্ব বা সাধারণ জিনিষটা অক্ষতরূপে প্রতীয়মান হয়। যখন রাষ্ট্র বিবাদমান সমাজ সমূহের বন্ধনরজ্জু বা মিলন সূত্র নিজের হস্তগত করিয়া নিরপেক্ষভাবে সমাজের বিবাদ মীমাংসা করিয়া উহাদিগের ভিতর একটা শৃঙ্খলা বিধান করিতে আরম্ভ করিল, এবং যখন সমাজ সমূহের সংস্কার ও মঙ্গল সাধনই রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল, তখন রাষ্ট্র ও সমাজের বিবাদ প্রশমিত হইল।

পূর্ব্বে রাষ্ট্র ও সমাজের বিবাদের উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের ধ্বংস সাধন। কিন্তু এখন আর সে উদ্দেশ্য নাই। এমন কি রাষ্ট্রীয় শক্তিও কোন শ্রেণী বিশেষের উপর ন্যস্ত নহে প্রত্যেকেই রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে সমাজ সংস্কারে তৎপর। সমাজে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলেই রাষ্ট্রীয় শক্তির আহ্বান প্রয়োজন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সমাজের উপর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব সর্বতোভাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

আমরা উপরে দেখিয়াছি রাষ্ট্রও সম্মিলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ। রাষ্ট্রের মধ্যে সকল সমাজের একটা সমন্বয় দৃষ্টিগোচর হয়, কাজেই রাষ্ট্রীয় গঠন অনেকটা স্বাভাবিক সামাজিক বিভাগের অনুরূপ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমারা বিশদরূপে দেখাইয়াছি, সমাজের হিত সাধনের নিমিত্ত সমাজ সংরক্ষণ, সংগঠন ও প্রতিপালনের নিমিত্তই রাষ্ট্র। যেমন রাষ্ট্র সমাজের জন্য, তেমনি আবার সমাজও রাষ্ট্রের জন্য। রাষ্ট্র জাতীয় ইচ্ছাশক্তির সমষ্টি মাত্র। এই প্রকার রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যেই সমাজ জীবিত আছে।

রাষ্ট্র বিভিন্ন সামাজিক দলের বাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া উহাদিগের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। সমাজ কেবল বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ম্মপদ্ধতি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যদ্ব্যাপী। এতদ্ভিন্ন রাষ্ট্রের আরও করণীয় আছে। রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মই হইতেছে যে সকল সাধারণ উদ্দেশ্য (Common Purpose) সংশ্লিষ্ট বা সম্মিলিত কার্য্যের প্রয়োজন উহাদের সমাধান করা। তারপর যে সকল উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের অভিমত প্রকাশ করে এবং যাহা বল-প্রয়োগ ব্যতীত লাভ করা যায় না সে সমুদয় সম্পন্ন করাও রাষ্ট্রের কার্য্য।

এখন সমাজ ও রাষ্ট্রের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সমাজ নিজ নিজ মঙ্গলের জন্যই ব্যস্ত। একমতের লোক সমূহের সংযোগ ও বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগের বিয়োগই সমাজের কাজ। আর রাষ্ট্র একটা পরাক্রান্ত শক্তি। সর্ব্বসাধারণের হিতানুসারে সমাজের বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব পরিবর্ত্তন, সংশোধন ও সংস্কার করাই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। কাজেই দেখা যাইতেছে, সমাজ ও রাষ্ট্র এক নহে। রাষ্ট্রের এই প্রভুত্বটুকু বর্ত্তমান সময়ে যেমন, প্রাচীন কালেও তেমনি প্রয়োজন ছিল। কোন কোন সামাজিক দল কিংবা কোন কোন বিশিষ্ট স্বার্থ (Special Interest) মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের বিশেষত্ব ও প্রভুত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আবার ওদিকে রাষ্ট্রও সময় সময় নিজকে সর্ব্বে সর্ব্বা মনে করিয়া সমাজের পূর্ণ বিকাশের পথে বাঁধা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছে। উভয়ই অনিষ্টকর ও অবাঞ্ছনীয়। কাজেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে—রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে

কোনটিই যেন নিজ অধিকার অতিক্রম করিয়া অপরকে আক্রমণ না করে।

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতর আরও প্রভেদ আছে। রাষ্ট্র কেবল যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া যায়। ইহার শক্তি—দৈহিক বল এবং কর্ম্মধারা অপরিবর্ত্তনশীল ও কঠোর। কিন্তু সমাজের শক্তি সদিচ্ছা (Good will)। ইহার কর্ম্ম ধারায় কোন বাধাবাধি নিয়ম নাই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাকৃত সাহচর্য্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু রাষ্ট্র সাধারণতঃ সর্ব্বত্র সমভাবে বলপ্রয়োগ করে। সমাজ স্বেচ্ছাকৃত সম্মিলন; কিন্তু রাষ্ট্র বাধ্যতা মূলক সম্মিলন বা সমষ্টি। রাষ্ট্রীয় আইনের পিছনে একটা শক্তি, একটা বল প্রয়োগ রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের ভিতর থাকিবে কি না, রাষ্ট্র তাহাকে সে বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার স্বাধীনতা দেয় নাই। কিন্তু সমাজে সে স্বাধীনতা আছে। তবে একথা স্বীকার্য্য, রাষ্ট্র সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই বল প্রয়োগ করে না। কিন্তু সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় মীমাংসার উপর হস্তক্ষেপ করিলে বলপ্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রের একটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যও আছে। উল্লিখিত কর্ত্তব্য সাধনার্থ তাহাকে জনসাধারণের মতের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়; এবং তাহাদের অনুমোদিত বিষয়ই আইনে পরিণত করা হয়।

এখন দেখা যাউক, রাষ্ট্রীয় শক্তি কিসের উপর নির্ভর করে। সমাজ হইতেই রাষ্ট্র তাহার ন্যায্য অধিকার লাভ করিয়া থাকে। আমরা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতেপাই, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় রাষ্ট্রের অধিকার ও ক্ষমতা বিভিন্ন ও পৃথক। কি প্রকারে বল প্রয়োগ করিতে হইবে, বল প্রয়োগ করিলে কতটুকু সফলতা লাভ করা যাইবে, সমাজের উপর বল প্রয়োগ করিলে তাহার ফলই বা কি হইবে—ইত্যাদি বিষয়, সামাজের অবস্থা এবং শাসনকর্ত্তা ও শসিতের সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাষ্ট্রের অধিকার, ক্ষমতা ও শক্তি সামাজিক সাহচর্য্যের কতটুকু পূর্ণতা ও বিকাশ সাধন করে অথবা এসব অভীষ্ট বিষয়ে কতটা প্রতিবন্ধক, তদ্বারা রাষ্ট্রের কর্ম্মক্ষেত্র নির্ণয় করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই, যে সব দেশের জনসাধারণ যত শিক্ষিত, উন্নত, শৃঙ্খলাবদ্ধ সেই সব দেশেই গণতন্ত্র অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছে। আমরা আরও দেখিতে পাই, যখন দেশ যুদ্ধবিগ্রহে আলোড়িত থাকে কিংবা সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা প্রতীয়মান হয় তখন রাষ্ট্র বহু অতিরিক্ত (Emergences) ক্ষমতা পরিচালন করে। গত যুদ্ধের সময় ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ জনসাধারণের আহার বিহার ও গমনাগমনের বিধি পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শান্তির সময় জনসাধারণের এসব বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে, রাষ্ট্র তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

আমরা দেখিয়াছি সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষকে সংযত রাখাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। আপাত দৃষ্টিতে বোধহয় স্বাধীনতা ও বাধা অর্থাৎ ব্যক্তিগত অধিকার ও রাষ্ট্রীয় মঙ্গল পরস্পর বিরোধী—একথা কতটা সত্য তাহাই বিচার্য্য। স্বাধীনতা অর্থ সামাজিক স্বাধীনতা মনে করিলেও সেখানে একটা বাধা বা সীমা রহিয়াছে। সামাজিক স্বাধীনতা অর্থ—যে স্বাধীনতা সমাজের প্রত্যেকের উপভোগ্য। এখানে একটা সীমা নির্দ্ধারিত না থাকিলে একজনের স্বাধীনতা অপরের পক্ষে উপদ্রব। রাষ্ট্রেও সমাজের ন্যায় স্বাধীনতার একটা সীমা আছে। লোককে শাসন কর্ত্তৃত্বের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব। অধীন জাতি যখন স্বাধীনতা চায়, তখন সেও কেবল বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের হাত হইতেই স্বাধীনতা চায়—সর্ব্বপ্রকার গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব অস্বীকার করে না। সেই দেশ কখনও সমুদয় আইন কানুন পায়ে ঠেলিয়া দিতে চায় না। কেবল মাত্র সেই সকল আইন কানুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যে সকল আইন কানুন দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক। সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের মতকেই আইনে পরিণত করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। রাষ্ট্র অধিকাংশের নৈতিক ইচ্ছাই (moral will) প্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই রাষ্ট্র গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক আইন প্রণয়নে জনসাধারণের মতের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে জনসাধারণও সেই সকল আইন কানুন রক্ষার্থ একটা দায়ীত্ব অনুভব করে। তখন রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের কোন বিবাদ থাকে না, সমাজ রাষ্ট্রের স্থিতি কামনা করে ও উহার সাহায্যে নিজ নিজ বিশেষত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করে।

শ্রীমাখনলাল লাহিড়ী।

বেদন-বোধন।

হায় কি বাতনায়,
বক্ষ ফেটে যায়!
সে কথা কব কারে, কাঁদি যে নিরালায়!
কেবলি কাঁদিবার,
বিজনে ভাবিবার,
রয়েছে অবসর কিছুই নাহি আর!
হিয়ার আলোড়ন,
সদাই উৎপীড়ন,
জীবন একটানা, আঁখির বরিষণ!

তাহাই হয় যদি,
সবাই নিরবধি,
বহাই কেঁদে কেঁদে, অশ্রু মহানদী!
ডাকুক্ মহা বান,
ডুবুক্ অপমান,
কালিমা ধুয়ে দেশ, হউক শোভমান!
তেমন কাঁদিবারে,
তেমন কাঁদাবারে,
আমরা পারি কই, হায় কি অভাগা রে!
নাহি যে ক্রন্দন,
অশ্রু- চন্দন,
নাহি সে স্ববে-স্তুতি, প্রাণের বন্দন!
রুষ্ট শিব তাই,
ধ্বংস করে, ভাই!
"ববম্ বম্ বম্"—ধ্বনি কি শোনো নাই!
রাত্রি রিম্-ঝিম্,
ডমরু ডিম্-ডিম্,
বাদল মহা ঝড়, আসুক শীত হিম!
চলুক্ দিন্‌রাত,
সাধন এক সাথ,
সাধন্-নির্বাক, মুক্তি নির্ঘাৎ!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

স্নেহের দান।

(২২)

শেষ রাত্রিতে ম্যানেজার বাবুর নিকট সংবাদ পঁহুছিল; মণিবাবুর বড় যুড়ী গাড়ী দরজা বন্ধ অবস্থায় রূপগঞ্জের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

সংবাদ পাইয়াই ম্যানেজার বাবু আসিয়া রাজেন্দ্র বাবুকে সে সংবাদ জানাইলেন। পুনরায় নীরব পরামর্শ চলিল। এবারকার পরামর্শে আর স্ত্রীলোক রহিলেন না।

রাজেন্দ্রবাবুর "খুনা খুনী' পরামর্শে ম্যানেজার সম্মতি দিতেছেন না দেখিয়া রাগ করিয়া রাজেন্দ্রবাবু কহিলেন—"মেয়েলি ছাঁচ ম্যানেজারী চলে না মহাশয়, কাব্য চলে। আপনি না হয়, এক কর্ম্ম করুন, এখন চুপ করিয়া থাকুন—যেন আমরা কিছুই জানিনা। মাখন বাবু আসিলেই তাঁহাকে ও বড় কর্ত্রীকে লইয়া গিয়া ভণ্ডের দলকে তাড়াইয়া দিয়া বাড়ী পরিষ্কার করিবেন। এ দিকে আমি আসিবার পথেই স্বামীজীর স্বামীত্ব প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করিব। এখন আমাকে খুব বিশ্বাসী দুটা লোক দেন! টাকা খরচ করিতে হইবে অন্ততঃ দশ হাজার—মনে রাখিবেন। দারোগাকে হস্তগত করিতে হইবে সকলের আগে। দুটা বাইক, আর দুটা এক্‌সপার্ট লোক চাই।"

ম্যানেজার বলিলেন—"আমি অপর হিস্যার কর্ম্মচারী, আপনার আদেশ তামিল করিতেছি—কিন্তু টাকার সম্বন্ধে আমি নিরুপায়—সেবিষয়ে মালীকের সম্মতি প্রয়োজন।"

রাজেন্দ্রবাবু—"এত মতামতের ধার ধারিলে কাজ করিবেন কিরূপে? ঘোমটা দিয়া বসিয়া থাকুন.... এখন লোক দিন, আর আমার পাল্কীর বন্দোবস্ত করুন! কাজ আপনাদের, আমার পিতৃশ্রাদ্ধ সেজন্য আটক থাকিবে না, আমি যাই; পরামর্শ করিতে হইলে তাহা করুন, করিয়া শেষ রক্ষা করুন।"

অতি প্রত্যুষেই রাজেন্দ্র বাবুও রূপগঞ্জ চলিয়া গেলেন।

সবরেজেষ্ট্রারের বাসার সম্মুখেই ডহরের যুড়ী গাড়ী রহিয়াছে দেখিয়া রাজেনবাবু মণিবাবুদের আগমন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। সবরেজেষ্ট্রারের চাপরাসিকে ডাকিয়া জানিলেন—তাঁহার অনুমান ঠিক; ইহাও জানিলেন যে

সাবরেজেষ্ট্রার লাহিড়ী সাহেবও স্বামীজীর একজন পরম ভক্ত শিষ্য।

ঠিক সংবাদ এইরূপ সহজে প্রাপ্ত হইতে পারিয়া রাজেন্দ্র বাবু নিজ কর্ম্ম তালিকা নির্দ্ধারিত করিবার বেশ সুযোগ পাইলেন।

রাজেন্দ্রবাবু বুঝিলেন-এরূপ অবস্থায় সাবরেজেষ্ট্রার নিকট কোন কথা তুলিয়া কার্য্য পণ্ড করার বা স্থগিত রাখার চেষ্টা বৃথা হইবে। এ স্থলে অন্য পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়।

তিনি তাঁহার বিশ্বাসী চরগুলিকে যথাযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া নিজেরও প্রয়োজনীয় কাজ ১১টার মধ্যেই গোছাইয়া লইলেন। তারপর ঠিক ১২ টায় আসিয়া সবরেজেষ্ট্রারের আফিসে উপস্থিত হইলেন।

রাজেনবাবু মনে করিলেন—তাঁহার মত একজন প্রতিবেশী জমিদার সম্মুখে থাকিলে নিশ্চয় মণিমোহন দলিল রেজেষ্টরী করিয়া দিবার জন্য উপস্থিত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিবে। এইরূপে যদি আজকার দিনটা পণ্ড হয়; তবেই হইল ...।

সবরেজেষ্ট্রার লাহিড়ী মহাশয় রাজেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পার্শ্বের চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তারপর পেস্কারের স্থাপিত দস্তখতের কাগজের উপর কলম চালাইতে চালাইতে বলিলেন -"কমিশনার কিন্তু বড়ই জব্দ হইয়াছেন, রাজেন্ বাবু—আপনার জেপায়।" কথাটা বলিয়া রাজেন্ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রেজেষ্ট্রার সাহেব হাসিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর, কি মনে করিয়া রাজেনবাবু একেবারে যে সশরীরে! বিষয় কি?"

রাজেনবাবু বলিলেন—"বিনা মতলবেকি আর আসিয়াছি?"

সব রে—"সেটা কি শোনাই যাক্।"

রাজেনবাবু—"আমার বিদ্রোহী মহলটার সকল প্রজাই আপোষ স্বীকার করিয়া দলিল দিয়াছে। দলিলগুলি আজ রেজেষ্টারি করাইয়া দিবে কথা। না দিলে প্রত্যয় নাই। পাছে কুচক্রীর অন্ত নাই। আমার আমমোক্তার দলিল ও জন লইয়া আসিবেন কথা; আমার সম্মুখে থাকা প্রয়োজন। একদিনের একটু খাটুনিতে যদি চিরদিনের শান্তি পাওয়া যায়—কিন্তু আমার আশা প্রভুকে তো দেখিতেছি না?"

সব রে—"কেন আপনি কি বাড়ী হইতে আইসেন নাই?"

রাজেন—"না, আমি আজ ডহর হইতে আসিয়াছি। সেখানে স্বামীজীর পদধূলি লইতে গিয়াছিলাম।"

সবরেজেষ্ট্রার বাবু রাজেন্দ্ররাবুর দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"সাক্ষাৎ হয় নাই—অবশ্যই—"

রাজেন্—"আপনি কি সব জান্তা? বলুন দেখি কেমন করিয়া বলিলেন?"

সব রেজেষ্ট্রার—"আপনি আগে বলুন, ঠিক কি না?"

রাজেনবাবু—"না, সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি নাকি আজ কোথায় গিয়াছেন। আবার ফিরিবার সময় যাইব, মনে করিয়াছি।"

সব রে—"বিশেষ সু সংবাদ দিতে পারিলে কি খাওয়াইবেন, বলুন দেখি?"

"এ মন্দ নয়; কোথায় অভুক্ত ব্রাহ্মণের ফলাহারের যোগাড়—তাহা না করিয়া সেই অভুক্ত ব্রাহ্মণের উপরই পীড়ন চেষ্টা! ভদ্রতায় পক্ষে কোথায় আহার হইল—অথবা আহার হইল কি না—সেটাই জিজ্ঞাসা......"

সব রেজেষ্টার বাবু গড়গড়ির জমিদার বাড়ীর চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় আহারের সহিত খুবই ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং রাজেন বাবুর কথায় লজ্জিত হইয়া তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"সুদীর্ঘ টিকির একজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে যে আজ একাদশীর দিনে বৈপ্রহরিক অন্নাহারের অন্যায় আমন্ত্রন করিয়া বৃথা প্রলুব্ধ করিব—তেমন পাপাচারী আমি নই।"

কথাটা বলিয়া সবরেজেষ্ট্রার উচ্চ হাস্য করিলেন।

"আজ একাদশী বলিতেছেন? সে তো এখন বাঙ্গালা দেশের নিত্যব্রত।" বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু কথাটাকে অন্যদিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন।

রাজেন্দ্রবাবুর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সবরেজেষ্ট্রার বাবু বলিলেন—"একাদশীর বৈকালিক পিত্তরক্ষাটা তাহা হইলে রাজেনবাবু এ দীনের কুটীরেই হইবে—কি বলেন?"

রাজেনবাবু যোড় হাত করিয়া বলিলেন—"ক্ষমা করিবেন, আর টিকির জাত মারিতে চেষ্টা করিবেন না—বাড়ীতে গিয়াই সেটা করিতে হইবে।"

"আপনি না স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করতে উহর যাইবেন ?"

"বাড়ীর পথে উঠিয়া যাইব মাত্র। রাত্রি বাস অন্যত্র হইবে না—সে বিষয়ে কঠিন সর্ত্ত আছে।"

সবরেজেষ্ট্রার বাবু বলিলেন—"স্বামীজী ও মণীবাবু এখানেই আছেন, তাঁহাদের সঙ্গেই যাইতে পারিবেন।"

রাজেন্দ্রবাবু একটু আশ্চর্য্যের ভান করিয়া বলিলেন—"তাহারা এখানে—কেন ?"

সব রেজেষ্ট্রার সঙ্কুচ শূন্যভাবে বলিলেন—"তাঁহারা আমার বাসায় আছেন। একটা দলিল রেজেষ্টরীর জন্য আসিয়াছিলেন।"

রাজেন্দ্রবাবু—"রেজেষ্টরী এই বেলাতেই হইবে ?"

সব রে—"দলিল প্রাতেই রেজেষ্টরী হইয়াছে। তাঁহাদেরও এবেলা উপবাসে গিয়াছে; বিকালে একটু ফল মূল গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইবেন। রাত্রি ৭টা, ৮টায় রওয়ানা দিবেন আপনিও তাঁদের এক সঙ্গেই যাইতে পারিবেন। একাদশীর পিত্ত রক্ষা—নাম মাত্র; অনুরোধ অবহেলা করিবেন না। ব্রাহ্মণের অনুরোধ।"

সবরেজেষ্ট্রার দানানন্দ স্বামীর ভক্তশিষ্য। সুতরাং তাহার নিকট স্বামীজী—বর্ত্তমান কার্য্যটা যে খুব গোপনীয় এবং তিনি যে লোকজনের অগোচরে শেষ রাত্রিতে লুকাইয়া আসিয়াছেন এবং রাত্রিতেই যাইবেন স্থির করিয়াছেন—এ সকল গোপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। সবরেজেষ্ট্রারও তাহা ভাবেন নাই; তাই তিনি নিঃসঙ্কুচে তাহা রাজেন্দ্রবাবুর নিকট বলিয়া ফেলিয়াছেন এবং রাজেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করিতে ইতস্তত করেন নাই।

রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আমার লোকটাই যে এখনও আসিয়া পঁহুছিল না। আমি বলিব কি বলুন ? তবে আপনার অনুরোধ রক্ষার দিকে যে আমার উদর ও রসনা এখন হইতেই আমাকে বিষম প্রবুদ্ধ এবং প্রলুব্ধ করিতেছে, এটা আপনি নিশ্চিত রকমে জানিবেন। সময়ের অবকাশ করিতে পারিতো নিজ হইতেই যাইব। আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন না।"

রাজেন্দ্রবাবু ঘড়ীর দিকে চাহিলেন।

রাজেন্দ্র বাবুর গরে পেস্কারের মেজাজ গরম হইতেছিল: সবরেজেষ্ট্রারেরও কার্য্যে ব্যাঘাত হইতেছিল। তিনি বলিলেন—"তবে আপনি আপনার অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য গোছাইয়া একেবারে দীনের কুটীরে যাইয়া পদধূলি দান করিবেন!"

দলিল রেজেষ্টরী হইয়া গিয়াছে, এবং রাত্রি ৭টা ৮টায় স্বামীজী উহর যাইবেন, এই নিশ্চিত খবর জানিয়া রাজেন্দ্র বাবু আর তথায় বসিয়া থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না।

"আচ্ছা দেখি—লোক গুলার কি......"

বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

(২৩)

উদ্দিষ্ট কার্য্যের যথা সঙ্গত বিধি ব্যবস্থা ঠিক করিয়া, রিলিফ কার্য্যের দরবার করিয়া, উকীল লাইব্রেরীতে বক্তৃতা দিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজেন্দ্রবাবু আসিয়া সবরেজেষ্ট্রারের বাসায় পঁহুছিলেন।

সবরেজেষ্ট্রার বাবুর বাড়ীর ভিতরে স্বামীজী ও মণি মোহনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সবরেজেষ্ট্রার রাজেন্দ্রবাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া স্বামীজীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিলেন—"ইনি গড়গড়ীর দেশ হিতৈষী জমিদার, উদ্দেশ্য মহৎ পত্রিকার সম্পাদক, সুবক্তা বাবু রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী।"

রাজেনবাবু স্বামীজীকে অভিবাদন করিলেন।

মণিবাবুরদিকে সবরেজেষ্ট্রার বাবু মুখ ফিরাইতেই মণিবাবু রাজেনবাবুকে সঙ্কোচে নত হইয়া নমস্কার করিলেন।

স্বামীজী রাজেনবাবুর অভিবাদনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাজেন্দ্র বাবু সস্নেহে মণির ঘাড়ে হাত রাখিয়া সবরেজেষ্টার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মণি বাবুর কাজ বেশ হইতেছে; দুর্ভিক্ষে অন্নদান—ইহার তুল্য আর পুণ্য নাই।"

শুনিয়া স্বামীজী চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

রাজেনবাবু সবরেজেষ্ট্রার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"শুনিয়াছেন মহাশয়, সব ডিভিসনেল অফিচারটার কথা—সে বেটা ঠাট্টা করিয়া আমাকে বলে কি—এ দেশে অন্নের দুর্ভিক্ষ নাই, আয়ুরই দুর্ভিক্ষ—লোকের জীবনী শক্তির দুর্ভিক্ষ। আমাকে বলে কি—চেঁচাইয়া নজের ভিতরে

শক্তির বাজে খরচ করিবেন না—শক্তির দুর্ভিক্ষ ঘটাইবেন না। লোকটার হৃদয় কি পাষাণ!"

এ কথায় সে কথায় অনেক কথা এবং শেষ অনেক বাজে কথাও হইল। স্বামীজী বা মণি একেবারেই কোন কথা বলিল না। মণি রাজেনবাবুর কথায় সায় দিয়া মাঝে মাঝে হাসিল মাত্র। স্বামীজী একেবারে নির্ব্বাক থাকিয়া ধ্যানের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিলেন।

নানাকথার পর রাজেনবাবু মণিকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া একদিকে সারিয়া আসিলেন।

রাজেনবাবু মণিকে বলিলেন—"তুমি একবার টাকা চাহিয়া লোক পাঠাইয়া ছিলে—তখন হাতে টাকা ছিল না; সম্প্রতি কতগুলি টাকা জমা আছে, কম সুদেই দেওয়া যাইতে পারে। তোমার এখন টাকার প্রয়োজন আছে কি?"

মণি বলিল—"প্রজার খাজনাতো একেবারেই বন্ধ; বেশী হারে অনেকগুলি টাকা কুঠি হইতে আনা হইয়াছে, কম সুদে একত্র পাইলে নিতে পারি বৈ কি?"

রাজেন্দ্র—"আমি তো এখনি চলিয়া যাইব। রাত্রিতেই বাড়ীতে পঁহুছাইতে হইবে। আলাপটা কখন হওয়া সুবিধা?'

মণি বলিল—"আপনি যদি একটু অপেক্ষা করিয়া যান, তবে এখানেই হইতে পারে।"

রাজেন্দ্র—"তেমন অপেক্ষার আমার ফরসুৎ নাই। আমার বিদ্রোহী প্রজারা টাউনে আসিয়াছে,—সন্ধ্যার পর রোজ বৈঠক হয়। কাল যে কতগুলি দলিল সম্পাদিত হইয়াছিল—তার একজনও আজ রেজেষ্টরী করিয়া দিতে আইসে নাই—আমার মরিবার অবসর নাই—ইহার উপর রিলিফ ওয়ার্ক। কেবল সবরেজেষ্ট্রার বাবুর অনুরোধ রক্ষার্থ আসিয়াছি, তাহাও বিলম্ব দেখিলে পলাইতে হইবে।'

"তবে কেমন করিয়া কথা বার্ত্তা হইতে পারে?"

"তুমি একটু শীঘ্র করিয়া যদি রওয়ানা কর তবে আমার এক গাড়ীতেই যাইতে পারি—পথে পথেই আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়। বরং তোমাকে তোমার বাড়ী পঁহুছাইয়াই যাইব—দেড় ঘণ্টা সময় আমার বেশী ঘুরিতে হইবে; কি করা! টাকাগুলি না হইলে অন্যত্র দিতে হয়। বসাইয়া রাখা তো আর যায় না।'

রাজেনবাবু মণির মুখের দিকে উত্তর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

মনি একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"সেটা মন্দ নয়; আমি স্বামীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে নিশ্চয় খবর দিতেছি।"

মণি স্বামীজীর নিকট গেল। রাজেন্দ্রবাবু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ দেখিয়া সব রেজেষ্ট্রার বাবুকে তাড়া দিয়া পুকুরে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে গেলেন।

রাজেন্দ্রবাবু পুকুরের যাইতেছেন দেখিয়া সবরেজেষ্ট্রার বাবু তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য একখানা চৌকী ও কুশাসন সেখানে পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা করিয়া আসিলে রাজেন্দ্র বাবুকে মণি জানাইল—"আপনার সঙ্গে আমি অগ্রেই যাইব; স্বামীজী—পশ্চাতে আসিবেন।"

রাজেনবাবু বলিলেন—"তবে তুমি সবরেজেষ্ট্রার বাবুকে তাড়া করিয়া উদ্যোগ কর; আমি মুন্সেফবাবুর নিকট বিদায় হইয়া রিলিফের বাণ্ডিলটা লইয়া আসি। মনে করিয়াছিলাম —যাইবার সময় তাহা করিব, তাহা আর হইল না।"

রাজেনবাবু দুই এক পা অগ্রসর হইয়াই মণিকে পুনরায় ডাকিয়া তাড়াতাড়ি করিতে উপদেশ দিলেন। তারপর ত্রস্ত চলিয়া গেলেন।

সংরক্ষণ নীতি বনাম অবাধ বাণিজ্য নীতি।

এই যে সেদিন ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় আর একটা নির্ব্বাচন হইয়া গেল, উহার মূল কারণ খুজিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, ইংলণ্ডের বাণিজ্য নীতি পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ তথা জন সাধারণ দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত। এক দল সংরক্ষণ নীতির পক্ষপাতী হইয়া বলিয়াছেন যে বৈদেশিক পণ্যাদির আমদানীর উপর শুল্ক স্থাপন দ্বারা স্বদেশীয় শিল্প গুলিকে অধিকতর লাভজনক কারয়া দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য ও অন্যদল সংরক্ষণ নীতির বিরোধী হইয়া

বলিতেছেন যে বৈদেশিক পণ্যগুলিকে কর ভারে পীড়িত করিলে লোকের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট হইবে, তাহাতে বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, বরং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া দেশের দারিদ্র্য প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত সংরক্ষণ নীতির বিরোধী দলই প্রবলতর ভাবে পার্লিয়ামেণ্ট নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। এ ত গেল ইংলণ্ডের কথা, পক্ষান্তরে আমেরিকা, জার্ম্মানি এমন কি ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য অন্তর্ভূত কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে কিন্তু বাণিজ্য নীতি পরিচালনায় সংরক্ষণ নীতি বাদিগণই প্রবলতর। আমাদের ভারতবর্ষের ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যাঁহারা জনমত সংগঠন কার্য্যে ব্যাপৃত. তাঁহারা ও এই ব্যাপারে সংরক্ষণ নীতির পক্ষপাতী। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি পরিচালনায় তাঁহাদের ক্ষমতা না থাকায় অবাধ বাণিজ্য নীতিদ্বারাই ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইতেছে।

দেশভেদে বাণিজ্য নীতির উপর্য্যুক্ত যে প্রভেদ আমরা দেখিতে পাই, তাহার কারণ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে আমারা বুঝিতে পারি যে, যে দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও শিল্প কার্য্যের প্রয়োজনীয় কাচা মালের জন্য অপর দেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, তাহাদিগকেই বাধ্য হইয়া অবাধ বাণিজ্য নীতির ভক্ত হইতে হয়; কারণ প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রীও কাচামাল রপ্তানী কারক দেশও তাহার শিল্পদ্রব্যের উপর যে কর ধরা হয়, তাহা দ্বারা যদি সে ক্ষতি গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহারাও তাহার মুখাপেক্ষী অথচ এক ভাবে তাহার ক্ষতিকারক দেশের খাদ্য কিংবা কাচামালের উপর একটা কর বসাইবার ইচ্ছা প্রবল হওয়া স্বাভাবিক। অতএব অবাধ বাণিজ্য না থাকিলে এই প্রকার পরমুখাপেক্ষী দেশের সমূহ ক্ষতি। ইংলণ্ডের অবস্থাও এই প্রকার। শিল্পই ইংলণ্ডের উপজীবিকা, এই শিল্প বিনিময়েই অন্যদেশ হইতে তাহার খাদ্য ক্রয় করিতে হয়; কারণ তাহার নিজের দেশে কৃষিকার্য্যের একান্ত অভাব। এবং সেই কারণেও কাচামাল ও অন্যান্য দেশ হইতে তাহার আমদানী করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া কিংবা ভারতবর্ষের অবস্থা অন্য প্রকার। সেই জন্যই সংরক্ষণ নীতির পক্ষপাতী হইলে এই সকল দেশের কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

যে জাতির জীবন ধারণোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইলেও চলে, যে তাহার নিজের অভাব পূরণক্ষম নানা বিধ শিল্পকার্য্য সংরক্ষণ মূলক বিধি দ্বারা রক্ষা করিয়া চলিলে তাহার বিদেশীর প্রতিশোধ মূলক শুল্কের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না।

বাস্তবিক, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য কোন ও রাজকর কিংবা রাষ্ট্রীয় বিধির অনুকূলতা কিংবা প্রতিকূলতা ব্যতিরেকে যদি অপ্রতিহত ভাবে চলিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেই জগতের সমৃদ্ধির সম্যক্ বিকাশ সাধিত হয় এবং প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ সুযোগ ও ক্ষমতানুসারে যে সকল বিষয়ে তাহার শক্তিব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভব সেই সমস্ত বিষয়েই তাহার উৎপাদনী শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু যত দিন আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বেষ সম্পূর্ণ রূপে জগৎ হইতে বিলুপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব দেশে যাবতীয় ব্যবহার্য্য পণ্যাদির উৎপাদনে সচেষ্ট হইয়া অর্থনৈতিক হিসাবে বৈদেশিক জাতির নিরপেক্ষ থাকিতে সচেষ্ট থাকিবে; এবং ইহা স্বাভাবিকও এই জন্যই অনেক সময়, যে দেশে যে শিল্প গড়িয়া উঠাইবার উপযুক্ত সামর্থ্য তদ্দেশবাসিগণের হয়না, কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তদনুকূল নহে, তথাপি দেশের আত্ম প্রাচুর্য্যের (Self sufficiency) দিক্ দিয়া, সেই সেই দেশের গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টিত হয়েন, যদিও অর্থনৈতিক হিসাবে জগতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ইহা একটি অন্তরায়, কারণ যদি ঐ দেশের শক্তি প্রতিকূলাবস্থায়স্থিত শিল্পের দিকে না গিয়া অনুকূল অবস্থাপন্ন কোনও শিল্পের দিকে যাইত তাহা হইলে সেই দেশের উৎপাদনীশক্তির সম্যক্ সদ্ব্যবহার হইত। তবে জগতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত রাজনৈতিক কারণই অর্থনৈতিক সুবিবেচনা অপেক্ষা প্রবলতর থাকা প্রয়োজন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের

পর এই কারণের উপযোগিতা আরও বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছে। সেই অনুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া মিঃ বলডুইন ইংলণ্ডে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহার মত গ্রাহ্য হয় নাই!

এতদ্ব্যতীত শিল্প বিশেষে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিবার প্রধান কারণ উদীয়মান শিশু শিল্পকে বিদেশীয় প্রবল প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে রক্ষা করা। এই স্থলে সাময়িক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা অর্থনীতির হিসাবেও শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যদি এই প্রকার সংরক্ষিত শিশুশিল্প উত্তরোত্তর বলবৃদ্ধি করিয়া কোনও দিন পূর্ণ বয়স্কত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে না দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে অর্থনীতি বিদ্‌গণ শিশুশিল্পকে সংরক্ষণের সাহায্য দেওয়ার পক্ষপাতী নহেন; কারণ এই শিশুশিল্পের অযোগ্যতা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সেই শিশুশিল্প সেই দেশের উপযোগী নহে, বরং অন্য কোনও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দেশের উৎপাদনী শক্তিকে ফলপ্রসূ করিবার চেষ্টা করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

এই সংরক্ষণ নীতি কখনও একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারে না। সেইজন্য যতদিন পর্য্যন্ত শিল্পবিশেষকে সংরক্ষণের আড়ালে রাখা প্রয়োজন, ততদিন ইহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক পণ্যের উপর কর থাকা উচিত। তারপর এই করের কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কিন্তু সংরক্ষিত শিল্পগুলির পরিচালকগণ সাধারণতঃ কর তুলিয়া দিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতাকে অব্যাহত করিতে নারাজ থাকেন। তাঁহারা কিছুতেই তাঁহাদের সংরক্ষিত স্বার্থের এককণাও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহারা এই সুবিধাটুকু চিরস্থায়ী করিয়া লইবার জন্যই ব্যস্ত থাকেন। তাহাতে জন সাধারণের চিরদিনের তরেই উক্ত সংরক্ষিত পণ্যের ব্যবহার উপলক্ষে অধিকতর মূল্য প্রদান করিতে হয়। ইহাতে একপক্ষে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ভয়ে অক্ষুণ্ণ উৎপাদক যেমন লাভবান্ হয়, তেমনই অন্য পক্ষে জন সাধারণের জীবন সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠে। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য অস্থায়ীভাবে জন সাধারণ অধিক মূল্যে পণ্যাদি ক্রয় করিয়া কষ্ট স্বীকার করিতে পারে; কিন্তু যদি এই মূল্যাধিক্য স্থায়ী হয় এবং এই স্থায়িত্বের দরুণ ধনী উৎপাদক সম্প্রদায়ই কেবল লাভবান হইয়া যদি সমাজে ধন বিস্তৃতির অসামঞ্জস্যের মাত্রা বাড়াইয়া তুলেন, তাহাতে সমাজের কিংবা জন সাধারণের কোনও লাভ নাই। শিল্প এইভাবে সংরক্ষণের আশ্রয় পাইয়া যদি সংরক্ষণ নীতির স্থায়িত্ব কামনা করে, তাহা হইলে সেই শিল্পেরও ক্ষতি যথেষ্ট। শিল্প চিরদিনই যদি সংরক্ষণের স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে কোনও দিনই প্রতিযোগিতার অভাবে উহা শৈশবত্ব হইতে মুক্ত হইয়া প্রৌঢ়ত্বে আসিতে পারে না।

বস্তুতঃ এই সমস্ত কারণে শিল্পপ্রধান দেশ সমূহে সংরক্ষণ নীতি স্থায়ী হইয়া ব্যবহার্য্য পণ্যাদির মূল্য বাড়িয়া গিয়া ধনী উৎপাদক সম্প্রদায়কে অধিকতর ধনী করিবার সুবিধা করিয়া দেয়, আর জন সাধারণ কেবল শোষিত হইতেই থাকে। এই জন্য অনেক অর্থনীতিবিদ্ বৈদেশিক পণ্যের উপর কর না বসাইয়া কতিপয় নির্দ্ধারিত বৎসরের জন্য শিশুশিল্পকে রক্ষা করিতে একটা আর্থিক সাহায্য (Bounty) দিবার পক্ষপাতী। যদি আর্থিক সাহায্যে সেই শিশুশিল্প টিকিয়া উঠিতে পারে তবে ভালই; কিন্তু তাহাতে যদি সেই শিল্প টিকিয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে উহার আশা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ইহার ফলে করদাতা জন সাধারণ অধিকতর করভারে পীড়িত হইয়া আর্থিক হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু এই ক্ষতি পূর্ব্বোক্ত মূল্যাধিক্যের ক্ষতি অপেক্ষা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে, করমূলক সংরক্ষণ নীতিতে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কিছু অর্থ পাইয়া দেশের প্রয়োজনীয় কার্য্যে সেই অর্থ নিয়োগ করিতে পারেন, তাহার উত্তরে বলিবার এই যে, সংরক্ষণ নীতি মূলক কর গবর্ণমেণ্টের কখনও কাম্য নহে। বিদেশীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সেই কর স্থাপিত হয়, তাই সেই কর এমন হইবে যাহাতে কর ভার গ্রস্ত পণ্য দেশে আমদানী না হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের উক্ত করেরও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অবসর না হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সংরক্ষণ নীতিই প্রকৃত পক্ষে কার্য্য ক্ষেত্রে

সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, কারণ শেষোক্ত প্রকার যদিও পরিণামে লাভ জনক, তথাপি প্রথমতঃ কোনও গবর্ণমেণ্ট নিজ হাত হইতে টাকা দিতে প্রস্তুত হয় না।

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, পরিণামে প্রতিযোগিতাকে—তাহা স্বদেশীয়ই হউক কিংবা বিদেশীয়ই হউক—সঙ্কুচিত করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। কিন্তু এই অবাধ প্রতিযোগিতার দোহাই দিয়া অবশ্য কোনও গবর্ণমেণ্টের দেশীয় উদিয়মান শিশুশিল্পকে সংরক্ষণ নীতির আশ্রয় দান হইতে বিরত থাকাও কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইবেনা। আবার বিদেশীয় ধনবান উৎপাদক গণের অন্যায় সংগঠন যে স্থলে অবাধ প্রতি যোগিতাকে প্রতিহত করে সে স্থলেও স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের একটা কর্ত্তব্য আছে। যেমন আমরা জাপনী দেশলাইর ব্যবসাতে দেখিতে পাই—জাপনী উৎপাদকগণ নিজদের দেশে কিংবা অন্য কাহারও প্রতিযোগিতা যে স্থলে অসম্ভব সেই সব দেশে বেশীহারে মূল্য আদায় করিয়া বিদেশে অন্যান্য প্রতিযোগিতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সস্তায় মাল চালাইয়া দেয়। এই ভাবে জাপানী দেশলাইর ব্যবসা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। কিন্তু যখন বুঝা যাইবে এতদ্দেশে প্রতিযোগিতার কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন ইহার মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইবে। এইস্থলে আমাদের গবর্ণমেণ্টেরও একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। এই প্রকারের আর একটা দৃষ্টান্ত আছে—জার্ম্মানীর বিটচিনির ব্যবসা। জার্ম্মান সরকার চিনির কারবার একচেটিয়া করিবার জন্য চিনি উৎপাদকগণকে এমন সাহায্য (Bounty) দান আরম্ভ করিলেন যে তাহারা অন্যান্য দেশে ঘাটতি দিয়া অতি অল্প মূল্যে জিনিষ বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ডে তখন এই চিনির উপর কর বসাইবার জন্য এক রব উঠিয়াছিল। কিন্তু নিজের কোনও চিনির ব্যবসায় না থাকায় এবং সাধারণ লোকের অল্প মূল্যে একটা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করিবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় ইংলণ্ডকে তাহার অবাধ বাণিজ্য নীতি তখন সঙ্কুচিত করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই।

ইদানিং ভারতের বাণিজ্য নীতি কি প্রকার হওয়া উচিত, উহার আলোচনা সংক্ষেপে করিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। অনেক শিল্পের কাচা মালই এদেশে উৎপন্ন হয়। অধিকন্তু, খাদ্য শস্যও আমাদের দেশে যথেষ্ট হয়। সুতরাং অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য ভারতের পরমুখাপেক্ষী থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বিদেশীরাও ভারতের মাল তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই নেয়; কারণ কাচামাল না নিলে তাহাদের শিল্পের উন্নতি সুদূর পরাহত এবং খাদ্যশস্য না হইলে তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইবে। কাজেই যদি আমরা শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে সম্প্রতি বিদেশী প্রতিশোধ মূলক কোনও বিধির (Retaliatory measure) ভয় করিবার কারণ নাই। এই অবস্থায় বৈদেশিকগণ তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনানুসারে আমাদের পণ্য নিতে বাধ্য থাকিবে। আর আমরা যে সমস্ত বিদেশীয় পণ্য ব্যবহার করি, তাহা না হইলেও আমাদের জীবন যাত্রা অসম্ভব হয় না। বিদেশীয় পণ্য প্রায়ই আমাদের অবান্তর বিলাসিতার সামগ্রী যোগায়। যাহা হউক, সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে আমাদের ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য সংরক্ষণ নীতি দ্বারা আমাদের স্বদেশীয় শিল্পের বিশেষ কোনও উন্নতি না হইয়া যদি কেবল মাত্র দরিদ্রের জীবন সমস্যার বিড়ম্বনা টুকু বাড়াইয়া তুলে তাহা হইলে এই নীতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে শিল্পোন্নতি করিতে হইলে বিশেষ ভাবে শিল্প শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় দেশে প্রচার করা প্রয়োজন। সংরক্ষণ নীতি অপেক্ষা শিল্প কার্য্য শিক্ষা ও দেশে ব্যবসায় বুদ্ধি জাগ্রত করা বেশী প্রয়োজন। তবে এতদ্দেশীয় বিদেশী পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব বিষয়েই পরাঙ্মুখ। গবর্ণমেণ্ট ইংরেজ শিল্পীদের ভয়ে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিতে নারাজ, কারণ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ইংরেজ উৎপাদক দিগের স্বার্থ রক্ষাকারী সভ্যগণ প্রবল, সুতরাং তাহাদের সমবেত চাপ পরাধীন

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনুপেক্ষণীয়। আর দেশীয় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা বৈদেশিক পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের নিজের স্বার্থানুকূলও নহে। তাই এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের নিজদের অবহিত হইতে হইবে। শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় নিজদের শিখিতে হইবে ও জানিতে হইবে। দেশীয় বদান্য ব্যক্তিগণ শিল্পশিক্ষার জন্য আশাকরি মহানুভব সার রাসবিহারী ঘোষ ও ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় তারকনাথ পালিতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন; এবং যে পর্য্যন্ত ভারতীয় গবর্ণমেণ্টে দেশীয় লোকের ন্যায্য ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত না হইবে, সে পর্য্যন্ত নিজদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। "We must baffle governments' indifference by our own preference for Country made goods," আমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইব নিজেদের দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করিতে।

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাগর পারের চিঠি।*

লণ্ডন, ১৯ জানুয়ারী।

তোমার চিঠি আমার সামনে খোলা রয়েছে। কবি মানুষ তুমি, তোমার কবির ভাষায় পুরোণো কথা মনে করিয়ে দিয়ে দুঃখ ও আনন্দ দুই জাগিয়ে দিচ্ছ।

* * * * *

এখানকার সবি সুন্দর! সবি মনোহর! ... বড় লোকের অর্থাৎ ভদ্র লোকের মেয়েরা পাউডার Lip salve ও Ronge দিয়ে মুখের উপর একটা কৃত্রিম আবরণ সর্ব্বদা তৈরী করে রাখে। সকাল বেলা যদি কখনও দেখা যায়, তবে বোঝা যায়, কি কিম্ভুত কিমাকার চেহারা। বোধ হয় ছোট বেলা থেকেই এই সব জিনিষ মাখতে মাখতে মুখের চেহারা খারাপ করে ফেলে। কারণ যাঁরা ফুটবল, হকি খেলে, সে সব মেয়েদের পাউডার মাখার দরকারও হয় না, দেখতে ও ভাল। গরীবের মেয়েদের নাকটা বক ফুলের মত। সত্যি বলছি, প্রায় সবারই। সারা দিন সাজবার সময় ও পয়সা—দুইয়েরই অভাব, কাজেই কেবল সন্ধ্যে বেলা "অ্যাম ষ্টেড্ হিদ" (Hampstead Heath) বেড়াতে যাবার সময় মুখে খানিকটা ধাব্ড়া ধাব্ড়া পাউডার মেখে বেরোয়। বুঝলেত পল্লীর দৌড়! তবে মনে করোনা সবাই এমনি ধারা। আমি বেশীর ভাগের কথা বলচি।

এখানে দেখবার জিনিষ অবশ্য অনেক আছে। এখন ও বেশী জিনিষ দেখা হয়নি। দু'চারটে মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখেছি, তাও সব নয়। অনেকদিন থাকতে হবে এদেশে, তাই তাড়তাড়ি করছিনা। এদেশে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল। এদেশের ছেলে মেয়েরা নিজের থেকে এসে বড় আলাপ করেনা; কিন্তু একবার আলাপ হলে খুবই ভাল ব্যবহার করে, মনে যাই থাক্। অনেকেরই আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব, তা বেশ চেপে রাখে কিন্তু। এ গেল যারা লেখা পড়া জানে, তাদের কথা। Mass আমাদের উপর খুব চটা, কারণ তারা শুনেছে, যে, আমরা নাকি ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাই। এ দেশের লোক নাকি রাষ্ট্র নীতির চর্চ্চা করে খুব। দেখ্‌ছি নিজেদের দেশের খবরই কিছু জানেনা। অন্য দেশের কথা জান্‌বে কি? এ দেশের লোক সবাই খবরের কাগজ পড়ে— অর্থাৎ সকাল বেলা Daily News ও Daily Sketch এক পেনী দিয়ে কিনে তার চার পাতা ছবি দেখে ফেলে দেয়। আমি পড়তে দেখেছি, খুব কম লোককেই। সন্ধ্যে বেলা বাড়ী ফেরবার সময় একখানা "Star" কিনে নিয়ে আসে। কাগজ খানা চার ভাঁজ করলে উপরের ভাঁজে থাকে আজকের ঘোড় দৌড়ে কোন কোন ঘোড়া জিতেছে। Starting price (bet) কার উপর কত ছিল এবং কাল কোন্ কোন ঘোড়া দৌড়বে। News boyদের ডাকই হচ্ছে "all the winners'। এই হল খবরের কাগজ পড়া। নিতান্ত যাদের দরকার তারা ছাড়া কেউ Times, Daily Telegraph কি Moring Post পড়েনা। এদের বিক্রী কত হয় জানিনা কিন্তু Daily Mirror ইত্যাদির "Net sale one million"

* সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নিকট লিখিত তাঁহার জনৈক ইয়ুরোপ প্রবাসী বন্ধুর চিঠির অংশ; যতীন্দ্রবাবুর সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।

ধর্ম্ম জিনিষটা এরা একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে Church-bell ছাড়া আর ধর্ম্মের কোন চিহ্ন দেখতে পাইনা। শুনেছি, কোন কোন Crank নাকি churchএও যায়। এই লণ্ডন সহরে কেউ কেউ Bible ও পড়ে, তবে সাধারণতঃ এ সব জিনিষের চর্চ্চা নাই। * * *

আজকাল বেশ শীত পড়েছে। একদিন বরফ পড়েছিল, কিন্তু বৃষ্টি পড়ে গলে গেল। তানা হলে একটা ফটো রাখতাম।......

বিধাতার দান।

একটা কুঁড়ে ঘরের মাঝে থাক্‌ত নিধি একা;
তাহার মত গরীব বড় যেত না আর দেখা।
সেথায় নিধি একাই নিতি তুল্‌ত নামের ঢেউ;
আপন বলে এমন তাহার ছিল না যে কেউ।
সারা দুপুর ভিক্ষা করে' আপন ঘরে ফিরে;
খায় সে, যবে সন্ধ্যা আসে চতুর্দ্দিকে ঘিরে।
এম্‌নি ভাবে দিন গুলি তার সুখে-দুখে যায়;
গাঁয়ের গরীব নিধর পানে কেউ না ফিরে চায়।
খেয়াল হল দুধ খাবে সে হঠাৎ কেন জানি;
দুপুর রোদে পাত্র ভরে' আন্‌ল শেরেক খানি।
গরম কোরবে বলে' সে-দুধ হরষ-ভরা চিতে।
উনুন-ভরা আগুন দিয়ে লাগ্‌ল সে জ্বাল দিতে।
সে-দুধ যবে অগ্নিতাপে উঠ্‌তে'ছল ফুলে;
নিধি তখন উর্দ্ধে দুহাত বিধির পানে তুলে—
"ওগো প্রভু, আর দিওনা, পার্‌ব না যে খেতে;
একলা আমি কতই খাব ?" বলে আনন্দেতে।
যতই নিধি বল্‌চে, "প্রভু, আর দিয়োনা মোরে";
ততই যে দুধ উথলে উঠে যাচ্ছে ভূমে পড়ে।
কিছু কালের পরে যখন দেখচে নিধি চেয়ে;
একটু খানি দুগ্ধে শুধু ভাণ্ড আছে ছেয়ে;—
উর্দ্ধে তখন দুহাত তুলে বল্‌চে কেঁদে নিধি;
"খাবার মত রখলে না যে, একি কর্‌লে বিধি?
* * *
আজকে প্রভু তোমার কাছে শিক্ষা পেলেম এই
তোমার কৃপা-দানের কভু ঠিক ঠিকানা নেই।
"যখন যারেই কৃপা তুমি কোরবে বিতরণ;
তখন কেবল দিতেই থাক, না মানো বারণ।
পুনঃ যবে সরিয়ে নাও তোমার দানের হাত;
এক বেলাও উদর ভরা জোটেনা তার ভাত।"

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

লোমশ মনুষ্য প্রদর্শনী।

লোমশ মানুষ জগতে অভাব নাই। কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্বের তুলনায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত লোমশ স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা খুব বেশী নহে।

হিন্দুর প্রাচীন পুরাণ ইতিহাসে লোমশ মুনির কথা আছে। খৃষ্টানদিগের বাইবেলেও এষৌর কথা আছে। এষৌর সর্ব্বাঙ্গে মেষের লোমের ন্যায় লোম ছিল। সৌরভের এই লোমশ প্রদর্শনিতে প্রদর্শিত লোমশ স্ত্রী-পুরুষ গুলির চেহারা দেখিলে পুরাণ-বাইবেলের কথা আর আজগুবি বলিয়া মনে হইবে না।

লোমশ বালিকা ক্রেও।
বয়স ৬ বৎসর।

বর্ত্তমান সময় জাপানের উত্তর দ্বীপ পুঞ্জের এইনু জাতি এইরূপ লোমশ জাতি। এইনুর শরীরে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে শীত প্রধান দেশের বিড়ালের ন্যায় লোম। এখন এইনুরা সভ্য হইয়াছে। শ্বেত মনুষ্যের সহবাস করে, সুতরাং তেমন লোম আর তাহাদের শরীরে এখন দেখা যায় না। তথাপি

লোমশ মানুষ বলিতে জীবতত্ত্ববিদগণ এইনু জাতিকেই বুঝাইয়া থাকেন। এখনও যে এইনুর শরীরে লোম সম্পদ আছে, সে তাহার এই লোম সম্পদের জন্য বিশেষ গর্ব্বিত। এইনুর আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির কথা আর একদিন বলিব, আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দুই চারিটী লোমশ মনুষ্যের চিত্রই প্রদর্শন করিব।

উত্তর ব্রহ্মে এক সময় কয়েকটী লোমশ পরিবার ছিল। ডাঃ গারসনের ক্রোড়ে যে বালিকাটীর চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে, ঐ লোমশ এবং পশু প্রকৃতি সম্পন্ন বালিকাটীকে লেয়সের অরণ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। বালিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক বানরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় এবং শরীর লোমা-

লোমশ বালিকা ক্রেও।
১১ বৎসর।

বৃত দেখিয়া প্রথমে অনেকে মনে করিয়াছিলেন বালিকাটী বানর জাতি এবং মনুষ্য জাতির মধ্যবর্ত্তী স্তরের একটা মস্ত কল্পিত সিদ্ধান্তের বাস্তবতা প্রতিপাদন করিবে। ১৮৮৩ সালের লণ্ডন নগরীর বিরাট প্রদর্শনিতে (Royal Aquaream of London) এই আরণ্য বালিকাকে উপস্থিত করা হইলে প্রতীচ্য জগতের নৃতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে একটা জীবন্ত আলোচনার ধুম পড়িয়া যায়। ফলে ডারুইনের কল্পিত সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপে বালিকাকে স্থাপিত করা হয়। তখন তাহাকে দেখিবার জন্য জগতের পণ্ডিত মণ্ডলী আসিয়া লণ্ডন নগরে সমবেত হন।

ডাঃ গারসণের কিন্তু এইমত নহে। তিনি (Dr. J. G. Garson) ১৮৮৩ সালের ৬ই জানুয়ারীর British Medical Journalএ এই জন মতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে এই বালিকার পিতা মাতা বর্ত্তমান। তাহাদেরকাহারও শরীরে এইরূপ লোম নাই। লোমশ শরীরই বালিকার বিশেষত্ব...ইত্যাদি।

১৮৮৭ সালের লণ্ডন প্রদর্শনিতে পুনরায় সেই বালিকার প্রদর্শনী হয়। তখনও পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে মতের সামঞ্জস্য হয় নাই।

বিবর্ত্তন বাদী সম্প্রদায় যে এই বালিকাকে পাইয়া একটা ভয়ানক জটিল এবং কল্পিত সিদ্ধান্তের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বালিকার নাম ক্রেও। বাঙ্গালী পাঠক আরণ্য বালিকা ক্রেওর শৈশব এবং বাল্যের শরীর-তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব মানসিক সিদ্ধান্ত স্থির করুন।

আগামীবারে সুবিধা হইলে দীর্ঘ শশ্রু সমন্বিতা যুবতী জুলিনা পেট্রনার কথা বলিব।

হোমারীয় যুগে গ্রীক সমাজ।

গ্রীস ও ভারত উভয়ই মানব সভ্যতার সুপ্রাচীন লীলাভূমি। কিন্তু উভয় দেশেরই ইতিহাস কুহেলিকাচ্ছন্ন। ভারতের বাল্মীকি ব্যাসের ন্যায় গ্রীসের হোমার, হেসিয়দের ধারাবাহিক ইতিহাস অথবা জীবন চরিত নাই। হোমারের আবির্ভাবের ৪০০ বৎসর পরে হিরোডোটাস গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। (১) হিরেডোটাস বলেন—খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৮৫০ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে হোমার তাঁহার

(১) *Grote's History of Greece. Vol II. P. 247*

মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। প্লোটার্চের মতানুসারে হোমার লাইকারগাসের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (২) তাঁহার মতে লাইকারগাস খ্রীষ্ট পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর লোক। কিন্তু ষ্টেবো বলেন—লাইকারগাসের আবির্ভাব কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ৯০০ অব্দ। লাইকারগাসের জীবন চরিতে আমরা দেখিতে পাই, লাইকারগাস এসিয়া হইতে হোমারীয় কাব্যের বীর রসাত্মক কাহিনী স্বদেশে আনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। (৩) ইহাতে মনে হয়, হোমার লাইকার গাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন হোমারও লাইকার-গাস সমসাময়িক। (৪) কাহারও মতে হোমার ট্রয় যুদ্ধের ১০০—৫০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (৫) গ্রোট খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮৫০ হইতে ৭৭৬ অব্দের মধ্যেই হোমারের আবির্ভাব কাল সমীচীন বলিয়া মনে করেন। এত মত ভেদের ভিতর হইতে হোমারের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে ঠিক সময় নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া বড়ই কঠিন।

হোমার যে যুগেই আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি তাঁহার অমরকাব্যাবলীতে তাঁহার সমসাময়িক অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগের একটা স্পষ্ট সামাজিক চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। আমরা এই স্থলে তাঁহার মহাকাব্যে বর্ণিত সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

বিবাহ মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার। বিবাহের ভিতর দিয়াই মানুষের সমাজ জীবনের ধারা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে। কাজেই হোমারীয় যুগের বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

প্রাচীন গ্রীক সমাজে ভারতীয় মনু বর্ণিত অষ্ট প্রকার বিবাহের বিধান ছিলনা কিন্তু কন্যাদান প্রথা প্রচলিত ছিল। (৬) প্রায় সকল পুরুষই কন্যার পিতামাতাকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করিতেন। যদি কোন কন্যার অভিভাবক বরের নিকট হইতে কোন প্রকার শুল্ক গ্রহণ না করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতেন, তবে বরের পক্ষে ইহা বড়ই গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু এরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কন্যাদানে শুল্ক গ্রহণের বিধি যে কেবল গ্রীক সমাজেই প্রচলিত ছিল, এমন নহে। প্রাচীন জার্ম্মেণ সমাজে বর স্বয়ং কন্যাকে বহুমূল্য যৌতুক প্রদান করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিতেন। (৭) পুরাকালে ইহুদী সমাজেও এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। সেকেম (Shechem) ও দিনার (Dinah) (৮) বিবাহ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইংলণ্ড, ডেন্‌মার্ক, সুইডেন, প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কালে কন্যাপণের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। (৯)। এমনও দেখা যায় বরপক্ষ অর্থ প্রদানে অসমর্থ হইলে অর্থের বিনিময়ে গো মহিষ প্রভৃতি প্রদান করিয়া কন্যা পক্ষকে তুষ্ট করিতেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও কিছুদিন পূর্ব্বে কন্যা শুল্কগ্রহণের বিধি এত কঠোর ছিল ছিল যে ইহার ফলে অনেক দরিদ্র পুরুষ বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই।

গ্রীসের প্রাচীন ব্যাবস্থাকার সোলেন কন্যা শুল্ক গ্রহণ সমর্থন করেন নাই। তাহার বিধি ছিল, বিবাহিতা কন্যা কয়েকখানা পরিধেয় বসন ও মৃন্ময় পাত্রসহ সামান্য কিছু খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে নিয়া স্বামীগৃহে আসিবে। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান অলঙ্কার অথবা যৌতুক পিত্রালয় হইতে স্বামীগৃহে আনয়নের বিধি তিনি দেন নাই। (১০) স্ত্রী মরিয়া গেলে স্বামী ঐ সমস্ত স্বল্প মূল্যের যৌতুক গুলিও স্ত্রীর পিতাকে প্রত্যর্পণ করিতেন। হিন্দু স্বামী কিন্তু কখনই কোন বিবাহ যৌতুক শ্বশুরকে ফিরাইয়া দেন না।

ইন্দুমতী, সংযুক্তা প্রভৃতি ভারতীয় রাজকুমারীদিগের ন্যায় হোমারীয় যুগে রাজ পরিবারের নারীগণ স্বয়ম্বরা হইতেন। হোমারের নায়িকা রাজকুমারী হেলেনা রূপেগুণে তখন রমণী কুলের সেরা ছিলেন। তাহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া গ্রীসের বহু রাজকুমার তাহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে হেলেনা স্পার্টার রাজকুমার মেনিলায়ের গলে বরমাল্য অর্পন করিলে তাঁহার

(২) *Plutarch's Life of Lycurgus.*

(৩) *Ibid and Xenophon*

(৪) *Ibid*

(৫) *Grote's History of Greece. Vol. II. P. 246*

(৬) *Il. XI. 244.*

(৭) *Tacit Germ. C. 18*

(৮) *Genesis XXXIV 12*

(৯) *Grotes History of Greece vol II 201 footnote.*

(১০) *Plutarchs life of Solon.*

সহিত হেলেনার বিবাহ হইয়াছিল। (১) আবার পেনিলোপির স্বামী যখন দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন তখন গ্রীসের বহুরাজা তাহার পাণি প্রার্থী হইয়া আসিয়া ছিলেন। দময়ন্তীর স্বামী নলের নিরুদ্দেশ কালে তাঁহার দ্বিতীয়বার সয়ম্বর সভার আয়োজনের সহিত পেণিলোপির স্বয়ম্বরের অনেক সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। বোধ হয় ভারত গ্রীস হইতেই এই স্বয়ম্বর প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ বৈদিক অথবা রামায়ণী যুগে ভারতে স্বয়ম্বর প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া আমরা অবগত হইতে পারি না।

আমরা আরও দেখিতে পাই, রাজা আইডুনিয়াস তাঁহার কন্যা করিকে বিবাহ দিবার জন্ত পণ করিলেন যে যিনি তাহার প্রিয় কুকুর সারবিরাসকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবেন, তাহাকেই তিনি কণ্যা সম্প্রদান করিবেন। (২) ইহা আমাদের দ্রৌপদীর বিবাহে দ্রুপদ রাজার লক্ষ্যভেদ ও জানকীর বিবাহে জনক রাজার হরধনু ভঙ্গ পণের অনুরূপ।

লাইকারগাসের সমাজ চিত্রে স্পার্টার নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রথার আভাস পাওয়া যায়। সেখানে তখন যুবতীগণ বিবাহের পূর্ব্বে নগ্নবেশে যুবকগণের সমক্ষে নৃত্য-গীত বাদ্যাদি করিত। ইহার ফলে যুবক যুবতীগণের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইত। (৩) যে যাঁহাকে ভালবাসিত সে তাহাকেই বিবাহ করিত। স্পার্টায় বিবাহের দিন কন্যার কেশদাম কর্ত্তন করা হইত। (৪) হিন্দুদিগের বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে নরসুন্দরগণ ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া থাকে। এই কেশ কর্ত্তন কি হিন্দুনারীর শুভ বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই ক্ষৌরকর্ম্ম?

যথাবিধি কেশ কর্ত্তনের পর কন্যাকে নবীন বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া একটা বিছানার উপর অন্ধকারে শোয়াইয়া রাখা হইত। তখন বর অতি সঙ্গোপণে কণ্যার নিকট আসিয়া তাহার মেখলার (Girdle) সহিত নিজ মেখলার গ্রন্থি বন্ধন করিয়া অদূরে সুসজ্জিত সুকোমল ফুলশয্যায় কন্যাকে নিয়া যাইত। (৩) ইহাই বরশয্যা বা বরকণ্যার পরিণয় ক্রিয়া। এই শুভানুষ্ঠানের ভিতর হিন্দু বিবাহের বাসর ঘরের অভিনয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

গ্রীক সমাজে দিনের বেলায় গুরুজনের সমক্ষে নব-দম্পতীর সাক্ষাৎ ও বিশ্রম্ভালাপ গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দুকুল বধূর, লজ্জাশীলতা ও হিন্দু দম্পতীর জিতেন্দ্রিয়তার আদর্শ গ্রীক সমাজ কোথা হইতে গ্রহণ করিলেন, ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

পাইথাগোরাস, ডায়ওনিসাস (৪) প্রভৃতির ন্যায় লাইকারগাসও ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ভারতের অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও দার্শনিকের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল। (৫) জেনোফোণ ও এরিষ্টক্রেটিস বলেন যে লাইকারগাস ভারতে ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসী ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের জিতেন্দ্রিয়তা ও কঠোর সংযম সাধনা ও গুরুগৃহে ছাত্রগণের ত্যাগ ও সংযমশীলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। (১) তিনি বোধ হয় হিন্দু সমাজের কঠোর সংযম সাধনার আদর্শের সহিত গ্রীক সভ্যতা ও সাধনার সামঞ্জস্ত বিধান করিয়া গ্রীক সমাজে তাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। লাইকারগাস মিশর, এসিয়ামাইনর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমন কালে যেখানে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইয়াছিলেন সেখানের তাহাই নূতন ছাঁচে ঢালিয়া স্বদেশে ও স্বসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। (২) সোলোনের এথেন্সের ন্যায় লাইকারগাসের স্পার্টায় বর অথবা কন্যাপণ প্রথা ছিল না। কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের রীতি গ্রীক সমাজে প্রচলিত ছিল। লাইকারগাস ও সোলোন (৩) উভয়ই এই প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইল শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন সন্তানের একান্ত

(১) *The Oracle Eecyclopaedia and Encyclopaedia Bitanica Helen*—শব্দ দ্রষ্টব্য। *Apollodotus :—*

(২) *Plutarchs life of Theseus.*

৩। *Plutarch's Life of Lycurgus.*

৪। *Ibid*

৩। *Ibia*

৪। *Grote's History of Greece Vol I. P. 224*

৫। *Plutarch's Life of Lycurgus.*

১। *Plutarch's Life of Lycurgus and Xenophon*

২। *An Universal History Book I P 486*

৩। *Plutarch's Life of Solon*

প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই স্বামী দুর্ব্বল অথবা ক্লীব হইলে অন্য শক্তিশালী বীরপুরুষের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা গ্রীক সমাজের চক্ষে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত না। ভারতের ক্ষত্রিয় নারীগণের ন্যায় গ্রীক রমণীগণ বীরপুত্রের জননী ও বীরপত্নী হইতে পারিলেই নিজকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। লিউকট্রার যুদ্ধে যাহাদের পতি পুত্র প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল তাহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যে সকল রমণীর পতিপুত্র কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়া অক্ষত শরীরে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল তাহাদের পরিতাপের আর সীমা ছিল না।

হোমারীয় যুগে দেবতার ঔরসেই অধিকাংশ ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইত। এই প্রথা ঠিক আমাদের মহাভারতোক্ত প্রথার ন্যায়। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই কুন্তী দেবগণের ঔরসে যুধিষ্টির, ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরপুত্রগণ প্রসব করিয়াছিলেন। মহাভারতীয় সমাজে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের প্রথাটী খুব সম্ভব গ্রীক সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতার সংমিশ্রণের অন্যতম ফল। কিংবা ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে লাইকারগাস আসিয়া তদানিন্তন সভ্য ভারতের যে সামাজিক প্রথা দেখিয়া গিয়াছিলেন, সেই রীতি কল্পনায়ই গ্রীক সমাজের পুরাণ ইতিহাস রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। কেননা লাইকারগাসের সময় হইতেই গ্রীকের ইতিহাস রক্ষার সূচনা হয়।

মহাভারতীয় যুগে কুমারীগণের কানীন পুত্র উৎপাদন যেমন নিন্দনীয় ছিল, প্রাচীন গ্রীক সমাজেও ইহা তদ্রূপ ঘৃণিত ছিল। (১) যদি কোন গ্রীক কুমারী দেবতা ঔরসে গোপনে গর্ভধারণ করিতেন, তবে তাহার পিতা উহা জানিতে পারিলে ঐ কুমারী কন্যার নাক কান কাটিয়া দিতেন। ভারতেও কানীন পুত্র উৎপাদন সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই কুন্তী কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত সঙ্গোপনে রাখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

হোমারীয় সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রিয়াম (২) অসকফ্রিকিস ও সক্রেটিস প্রভৃতি অনেক বড় লোকের একাধিক পত্নী ছিল। ভারতীয় সমাজের বহু বিবাহ চির প্রসিদ্ধ। অদ্যাপিও ভারতে কোন কোন সমাজে বহু বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসে বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।

রামায়ণী সমাজের শৈলুষ বৃত্তি প্রাচীন গ্রীসের কুলীন সমাজে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। বড় পরিবারে আত্মীয় স্বজন তাঁহার স্ত্রী উপভোগ করিতে পারিত। ইহা সমাজ অনুমোদন করিত। (২) বর্ত্তমান সিংহল ও তিব্বত প্রভৃতির ন্যায় গ্রীসেও বহু ভর্ত্তৃকতার আভাস পাওয়া যায়। গ্রীসে অনেক পরিবারেই "দুই গৃহস্থের এক গৃহিণী" ছিল। (৩) ইহা মহাভারতের দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ব্যবস্থার ন্যায়।

গ্রীসেও একদিন নারীর বস্ত্রহরণ ব্যাপারের অভিনয় হইত। চরিত্রহীন গ্রীক রমণী কোন যাগযজ্ঞে যোগদান করিলে রাজার আদেশে যে কোন ব্যক্তি তাহার বস্ত্রহরণ করিয়া তাহাকে অপমান করিত।

প্রাচীন গ্রীসের বড় লোকেরা উপপত্নীর নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। (৪) তজ্জন্য তাহাদের পারিবারিক জীবন বড়ই অশান্তিময় ছিল। পত্নী ও উপপত্নীগণের মধ্যে সময় সময় এমন ভীষণ কলহ উপস্থিত হইত যে ইহার ফলে নানা পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইত। ফনিক্সের বিষাদময় করুণ কাহিনী হইতে উপপত্নী উপভোগের বিষময় ফলের কথা আমরা বিশেষ ভাবে জানিতে পারি। লেয়ারটিস এবং এন্টিক্লিয়ার শোচনীয় কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। ১।

এ পর্য্যন্ত আমরা গ্রীক সমাজ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমাদের মনে হয় মহাভারতীয় সমাজের সহিত প্রাচীন গ্রীক সমাজের অনেক সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কে কাহার নিকট কতটুকু ঋণী, তাহা ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

---

(১) *Grotes History of Greece Vol. II P. 202.*

২। *Illiod XXI 88*

২। *Grotes History of Greece Vol II and Plutarch's life of Lycurgus*

৩। গ্রীক ও হিন্দু—৩৭৫ পৃঃ।

৪। *Grotes History of Greeee Vol II P 201*

১। *Odyss I 430, Iliad IX 450*

মাদুলী।

(১)

গোলদীঘির চারিটা দিক দুইবার ঘুরিয়া আসিতে পারিলে প্রায় এক মাইল পথ হাঁটিবার মত শারীরিক শ্রম হয়। পেনসন লইয়া আসিয়া এই একটা নিয়ম করিয়াছিলাম—রোজ দু'বেলা গোল দীঘির চারপাড়ে, হাঁটিয়া বেড়াইতাম। সেখানে বেড়াইতে গিয়া উপর্য্যুপরি কয়েক দিনই লক্ষ্য করিলাম—একটী ছেলে রোজ নিয়মিত ভাবে একখানা বেঞ্চের এক কোণে বিষন্ন মনে বসিয়া থাকিতো; এবং প্রায়ই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ নিঝুম নীরবে বসিয়া থাকিয়া চলিয়া যাইত।

তার অবস্থা দেখিয়া অনেকবার মনে হইয়াছে, বোধ হয় প্রেমে হুতাশ হইয়াই এভাব হইয়াছে। অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াও করিতে সাহস পাই নাই। মনে ক্রমশঃ একটা কৌতুহল হইল; একদিন সকাল থাকিতেই আসিয়া সে বেঞ্চের সে কোণা দখল করিয়া বসিলাম। নিয়মিত সময়ে সে ছেলেটীও ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কি মনে করিয়াই যেন সে আমার পাশে বসিল।

ছেলেটীর চুল উস্কখুস্ক, ধূলি পরিপূর্ণ; মুখের দাড়িতে বহু দিন ক্ষুর পড়ে নাই; সার্টের বোতাম দু'একটী আছে বটে কিন্তু সার্টটী অত্যন্ত ময়লা এবং ছিন্ন; পরিধেয় বস্ত্র ও মলিন; ঠনঠনের চটিজুতা যাহা পায়ে আছে, তাহাও শততালি গ্রস্ত। এমন দারিদ্র্যের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি যে রাজধানীর বুকে প্রেমের ব্যবসায় পাতিয়া হতাশ হইবে, তেমন চিন্তা মনে আনিতেও ইচ্ছা হইল না।

আমি বৃদ্ধ, সে যুবক। আমার পক্ষে তাহাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করা আমি মোটেই আপত্তি জনক মনে করিলাম না। আমি তাহাকে উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম—সে সম্প্রতি এম্. এস্ সি পরীক্ষায় অঙ্ক শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতায় চাকুরীর খোঁজে আসিয়া সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটা মেসে থাকে; এবার Finance Departmentএর যে পরীক্ষা গৃহীত হইবে তাহাতে সে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা রাখে; তবে nomination এপর্য্যন্ত পায় নাই; কারণ দলে পড়িয়া মাঝে মাঝে বেলুড় মাঠে যাতায়াত করিত। কলিকাতায় আসিয়া একটী টুইশনির কাজ পাইয়াছে, তাহাতে মাসে যাহা পায়, তাহাদ্বারা কোনমতে চলে। অনেক কলেজে ।১টা চাকুরীর জন্য উমেদারী করিয়াছে, কিন্তু কোথাও স্থান করিতে পারে নাই। কলিকাতার সরকারী বেসরকারী আফিস সমূহে, দেশী বিদেশী সওদাগরী আফিস সমূহে—সে অনেক ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; কোন স্থানে বা গলাধাক্কা ও খাইয়াছে। কোনস্থানে বা স্থান নাই—এই সুস্পষ্ট উত্তর পাইয়া বিদায় হইয়াছে; কোনস্থানে "আমরা এম, এস সি, চাই না" শুনিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়াছে কোন সহৃদয় সাহেব বা "I pity you, Babu" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আপ্যায়িত করিয়া দিয়াছেন। যুবকটী অশ্রুপূর্ণ লোচনে এই সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের গভীর দুঃখ ব্যক্ত করিল, তারপর ফ্যেল ফ্যেল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহাকে—Executive service এর জন্য দরখাস্ত করিলে যে ফল হ'তে পারে—সে আশ্বাস প্রদান করিলাম। শুনিলাম, সে সে পন্থারও বাদ রাখে নাই। এবার মুসলমান candidate বেশী নিবে এবং তাহার বয়স এখনও পার হয় নাই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছে।

যুবকটী তাহার দুঃখের কথা বলিতে বলিতে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, কেন সে এমন স্তব্ধ ভাবে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। শুনিয়া আমার নিজের মনেও কেমন একটা কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সম্মুখে ঐতো লম্বা থামওআলা সিনেট হল। বৎসর বৎসর কত যুবক ইহার বিশাল কক্ষ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহির হয়, আর এইরূপ এই গোল দীঘির বেঞ্চেই এমন নিরাশ ভাবে বসিয়া দিন রাত কাটাইয়া দেয়। এত উচ্চশিক্ষা প্রাণপাত পরিশ্রম, তার বিনিময়ে কি এই হাহুতাশই পরিণাম! গভীর মনঃকষ্টে সেদিন বাড়ীতে ফিরিলাম। না জানি বঙ্গের কত হতভাগ্য যুবক এমনই ভাবে দিনের পর দিন কাটাইতেছে। এইরূপ উচ্চ শিক্ষার তবে সার্থকতা কি?

সমস্ত রাত্রিই যেন কি একটা অস্পষ্ট মনোবেদনায় কাটা-ইলাম। আমি এ ছেলেটির কি করিতে পারি? আমার কি শক্তি আছে? কলিকাতা নগরীতে আমিই বা কে?

পরের দিনও দেখি, ছেলেটী একই স্থানে বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছে। আমি তার কিছুই করিতে পারিব না, মনে করিয়া বড়ই কষ্ট বোধ হইল। তবু কেন জানি না, তাহাকে দেখিয়া বড়ই মায়া হইল; তাহাকে সান্ত্বনা বাক্যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম।

আমার পরিচয় ও সে অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল। এবং যখন জানিল আমি একজন পেন্সন প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্‌স্ জজ; শরীর অসুস্থ হেতু কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আছি; এই নিকটেই বেনিয়াটোলা লেনে থাকি।' তখন ছেলেটী আমার পা জড়াইয়া ধরিল এবং "আমাকে একটা উপায় করিয়া দিতেই হইবে" বলিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল।

আমি "করকি! করকি!" বলিয়া পা দুটা টানিয়া লইলাম। বলিলাম—"আমি এখন তোমার কিই বা করিতে পারি। ক্ষমতাও তো এখন আর আমার কিছু নাই!"

সে আমার মুখের দিকে উপায় হীনের মত চাহিয়া রহিল এমন একটা যুবক কেবল আত্মদৈন্য চিন্তা করিয়াই জীবনটা নীরবচ্ছিন্ন দুঃখের বোঝা করিয়া তুলিবে, ইহা কখনো হইতে পারে না। কিন্তু তাহার মনের এই দৈন্যভাব দূর করিবারই বা উপায় কি?

আমি অনেকক্ষণ ভাবিলাম। আমি তাহারই কথা ভাবিতেছি মনে করিয়া সেও যেন একটু আশ্বস্ত হইল।

আমি বলিলাম—"আমার কাছে একটা সন্ন্যাসী দত্ত মাদুলী আছে. আমি এই মাদুলীর প্রভাবেই এতকাল সসম্মানে চাকুরী করিয়া আসিয়াছি। আমার নিজের কোন ছেলে পিলে নাই, তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে; তুমি যদি চাও, তোমাকে তাহা দিতে পারি; তাহা হইলে তুমি কাল সকালে আমার বাসায় যাইও।"

ছেলেটী শুনিয়া খুব আশ্বস্ত হইল দেখিলাম, কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে যেন তাহার মলিনমুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে আমার চরণে লুটাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিল।

(২)

বাসায় আসিয়া আমার মনে বড় অনুশোচনা হইতে লাগিল। একটা অমূল্য জীবন—উচ্চশিক্ষিত আশাপ্রলুব্ধ জীবনকে আমি যেন নষ্ট করিতে যাইতেছি। আমার এই আশ্বাসে তাহার ভিতরে যে বিশ্বাস জাগিয়াছে, যদি তাহাতে সে ফল না পায় তাহার পরিণাম কি হইবে? কেন আমি এই মিথ্যা ব্যবহার করিলাম? মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম। অনেক রাত্রি পর্যান্ত এটা ওটা খুজিলাম; দেখি যদি কোন পুরাণ মাদুলী পাই। বাসায় পাইলাম না। সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া পুরাণ লোহা লক্কড়ের দোকান হইতে মাদুলীর মত একটা জিনিষ কিনিয়া আনিয়া রাখিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছেলেটী বাসায় আসিলে তাহাকে ঘরে বসাইয়া আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা বাদ করিলাম। সে বারে বারে শুধু মাদুলীটাই চাহিতে লাগিল।

দেখিলাম—কত আশা, কত আগ্রহ তাহার মনে। ভগবান তাহার কল্যাণ করুন। আমি তাহার হাতে সেই জিনিষটী দিয়া বলিলাম "দেখো সব সময়ে যেন এটা হাতে থাকে—এক নাগা সন্ন্যাসী আমাকে ইহা হরিদ্বার দিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, যে হাত হইতে আপনি যদি ছুটিয়া যায় তবে অমঙ্গল হইবে কিন্তু যতক্ষণ উহা হাতে থাকিবে, সর্ব্ববিষয়েই কৃতকার্য্য! আমার জীবন এখন একরকম শেষ হইয়াই গিয়াছে; ওটায় আর কোন দরকার নাই। তুমিই রাখ।"

আমি নিজেই তাহার হাতে মাদুলীটা বাঁধিয়া দিয়া চুপি চুপি কাণে কাণে বলিলাম—"সন্ন্যাসীর নিষেধ আছে বলিতে, কিন্তু তোমাকে জানাইয়া রাখিতেছি—যতদিন ও যতক্ষণ তোমার হাতে এটী থাকিবে, ততদিন ও ততক্ষণ তোমাকে সকলে খুব সুন্দর দেখিবে।'

ছেলেটীকে অশেষ সাহস ও ভরসা দিয়া বিদায় করিলাম। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল কেন চাপিল এবং কেন এসব কথা তাহাকে বলিলাম, তাহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে মনে একটু কুতুহল ভাব এই হইল—দেখিই না, বিশ্বাসের কি শক্তি। মনে মনে শতবার শত নাগা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"দোহাই, তোমরা যদি কেহ অন্তর্য্যামী হও, অপরাধ নিওনা, আমি তোমাদের নামে যাহা

করিয়াছি, মিথ্যা হইলেও একটা নিরাশ্রয় প্রাণীর—একটী নিরুপায় পরিবারের মঙ্গলের জন্যই করিয়াছি।

(৩)

ছয়সাত দিন আর—গোলদীঘিতে গেলাম না—পাছে ছেলেটীর সঙ্গে দেখা হয় এবং আমার মাদুলী যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, তাহা আমাকে জানাইয়া তাহার আরও অধিকতর নিরাশ পূর্ণ মূর্ত্তি আমাকে প্রদর্শন করে।

কয়েক দিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া একদিন কৌতূহল বশতঃই গোলদীঘিতে আসিলাম। দেখি—সেই বেঞ্চিখানা অন্যান্য লোকের দ্বারা ভর্ত্তি হইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তবে কি তার কোন অসুখ হইল? না বাড়ী হইতে কোন দুঃসংবাদ পাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। মেসের ঠিকানাটাও তেমন মনে ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ছেলেটীর দুরদৃষ্টের কথা শুনিয়া কেমন একটা মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল। পরের দিন বৈকালে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে গিয়া কয়েকটা মেসে খোঁজ করিলাম। একটী মেসে বলিল "হাঁ এখানে থাকে বটে, তবে এখনও আফিস থেকে ফিরে নাই।"

আফিস?—তবে কি তার চাকুরী হইয়াছে? মনে সন্দেহ হইল; পুনরায় প্রশ্ন করিলাম। উত্তরে জানিতে পারিলাম—সে Finlay Muir & Co'র আফিসে ১০০৲ একশত টাকা মাহিনায় একটী ঠিকা চাকুরী পাইয়াছে; কথা আছে 'ছ' মাস পরে 'পাকা' হইবে।

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম—মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম। মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয়েও একটা নিষ্ফল জীবনের যে একটা গতি করিয়া দিতে পারিয়াছি, তাহা ভাবিয়া মনে বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করিলাম।

পরদিন সকালে সে মেসে পুনরায় গেলাম। দেখি, ছেলেটী স্নান করিতেছে। হাতে মাদুলীটি আছে। আমাকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিল। তার শরীরে বাস্তবিকই যেন কেমন একটা কমনিয়তা ও লাবণ্য খেলা করিতেছিল সে সলজ্জ মাধুরী গোলদীঘির বেঞ্চে বসা সেই রুক্ষ যুবকের অঙ্গে আমি দেখি নাই। তার বেশ ভূষায়ও আর সেই ছেঁড়া চটি, জীর্ণ বস্ত্র নাই। তাহাকে দেখিয়াই আমার মনে হইলো বিশ্বাসই মানুষকে অনন্ত দুঃখে ও সুখের স্বপ্ন দেখাইয়া থাকে, তারপর সে স্বপ্ন আপনা আপনি বাস্তব হইয়া উঠে। মনে হইলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এত উচ্চ শিক্ষা তাহাকে যেটুকু দান করিতে পারে নাই, আমার শুধু একটা খেয়ালের মুষ্টিযোগ আজ তাহাকে তেমন টুকু পাইবার অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেদিনের মত বিদায় হইলাম।

(৪)

বৃদ্ধবয়সে তীর্থ পর্যটন করিতে ইচ্ছা হওয়ায় এর কিছুদিন পরেই আমি কলিকাতা ছাড়িয়া আসি। সুতরাং ছেলেটির যে অতঃপর কি হইল, খোঁজ নিতে পারি নাই। ইহার পর কালক্রমে সে বালকের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম ৫।৬ বৎসর পরে কাশীতে থাকার সময়ই একদিন একখানা English man পড়িতে যাইয়া দেখি, তাহাতে প্রায় এক পৃষ্ঠা ব্যাপী একটা ছবি ও বিজ্ঞাপন। Finlay Muir & Co নাম সেই বিজ্ঞাপনে দেখিয়া তাহা পাঠ করিলাম। তাহাতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—Finlay Muir & Coতে আরও কতকগুলি ব্যবসা একত্র করা হইয়াছে সুতরাং তাহাতে পুরাতন আফিসে আর সুবিধা হয় না; তাই কলিকাতায় Clive street এ নূতন উদ্ভাবিত Patent stone দ্বারা যে বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছে; সেখানে আফিস স্থানান্তরিতকরা হইয়াছে। এই নূতন অট্টালিকারই একটা ফটো এবং তাহাতে কি কি বিভাগের ব্যবসা তাহারা করিতেছেন—তাহারই তালিকা দেওয়া আছে।

বিজ্ঞাপনটা দেখিয়াই ছেলেটীর কথা মনে হইয়াছিল। এখন তাহা পাঠ করিয়া ভাবিলাম, আফিস যখন বড় হইয়াছে, তখন সে ছেলেটিরও মাহিয়ানা নিশ্চয় বেশী হইয়াছে। এবং আমার মাদুলিটিও বোধ হয় সে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া পরিত্যাগ করে নাই।

বৃদ্ধ হাড়ে কাশীর কন্‌কনে শীত অসহ্য। তাই শীতে কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। একদিন Clive street এর আফিসেও গিয়াছিলাম। যুবকটীর নাম

বলিতেই দারোয়ান সেলাম করিয়া বলিল—"সাহেব আভি বাহার গেয়া"।

বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া আসিলাম। কথায় কথায় জানিলাম—সাহেব এখন কোম্পানীর অ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার হইয়াছেন এবং শীঘ্রই অংশীদার (Partner) হইবেন।

পরের দিন সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার বাসায় গেলাম। ষ্ট্রীটের উপরে সুন্দর একটা সুসজ্জিত বাড়ী। ঢুকিয়াই দেখি, বারান্দায় ড্রেসিংগাউন গায়ে ইজিচেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। সম্মুখে টেবিলে চা আছে, ও তাহার পাশে Asshtrayর মধ্যে অর্দ্ধনিঃশেষিত একটী সিগার (Cigar)।

এতদিন পরে চিনিবে কিনা—মনে করিয়া ঘরে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমাকে ইতস্তত: করিতে দেখিয়া তিনি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে? আপনি কি চান।" আমি বলিলাম—"বাবুকে চাই।"

তিনি—"প্রয়োজন?"

আমি দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম। সাহেবি ভাব দেখিয়া বলিলাম—"মাপ করিবেন; আমাকে আপনি চিনিতে পারিতেছেন না। আপনার মনে পড়ে—সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের...মেসে আপনি ছিলেন না কি?"

তিনি—"হাঁ, বলে যান; তাহাতে কি হইয়াছে?"

আমি—"তখন একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক আপনাকে একটী মাদুলী দিয়াছিলেন—মনে পড়ে কি?"

তিনি যেন একটু উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন—"কেন কি হইয়াছে তাতে?"

আমি—"না এমন কিছু নয়; তবে আমিই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী..."

আমার কথা শেষ না হইতে দিয়াই তিনি বলিলেন—"তা আপনি এখন চান কি? মাদুলীর মূল্য বাকী আছে কি?"

অবস্থা বুঝিলাম। অত্যন্ত দুঃখ হইল। বয়সকালে রাজকীয় পদ গৌরবের প্রভাবে যে গরম মেজাজছিল, তাহা এই বৃদ্ধ বয়সে নাই। যাহা হউক এই অকৃতজ্ঞ যুবকের এইরূপ ধৃষ্টতাকে খুব ধৈর্য্যের সহিত উপেক্ষা করিলাম। শিক্ষার কি শোচনীয় পরিণাম। বয়সের মর্য্যাদাটাও লোকটা রাখিল না।

আমি বলিলাম—"আপনার তো কাজ হইয়া গিয়াছে, এখন মাদুলীটী ফেরত দিতে বোধ হয় আপত্তি নাই।"

তিনি বলিলেন—"বটে! আপনি যে সে ব্যক্তি, প্রমাণ দিতে পারেন কি?"

আমি ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। হা ভগবান, কি লোককে তুমি কি করিয়াছ? সেই গোল দীঘির বেঞ্চে বসা নিঃসহায় ছোকরা এখন কোথায়?

আমি বলিলাম—"আমার কথাই প্রমাণ; আমাকে মনে পরে নাকি আপনার?"

"কতলোক কত মতলবে ঘুরিতেছে, আপনিই বা কোন মতলবে এ সকল কথা বলিতেছেন—আমার বহু শত্রু আছে—আপনি কোন শত্রুতা সাধনের জন্য ..."

আমার আর এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল না।

"ধিক তোমার উচ্চ শিক্ষায়! অকৃতজ্ঞ..."

আমার, আর মুখ হইতে কথা বাহির হইলনা; এই কথাগুলি বলিতে বলিতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। আর সে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিতেও ইচ্ছা হইল না।

শ্রীকালিদাস বাগচী।

বুদ্ধগয়া দর্শনে।

এই সেই বুদ্ধগয়া, সে যুগের উরুবিল্ল গ্রাম!
দারুণ অশান্তি লয়ে, বুদ্ধ হেথা অরণ্যে পশিয়া,
ষড় বর্ষ তপশ্চরি', শান্ত তার করে ছিল হিয়া!
এই বোধি দ্রুমতলে পূর্ণ শেষে হোলো মনস্কাম!
হেথায় সে পেয়েছিল জরা রোগ মৃত্যুর বিরাম!
রোমাঞ্চিত হোলো দেহ অকস্মাৎ একথা স্মরিয়া!
আনন্দে সরে না বাণী; বর্ত্তমান গেলাম ভুলিয়া!
হেরিলাম মনশ্চক্ষে ধ্যানী বুদ্ধ নয়নাভিরাম!

পিতৃশোক ভুলিলাম; ভুলিলাম সংসার-বন্ধন!
মনে হোলো মিথ্যা সবি পুত্রস্নেহ দাম্পত্য প্রণয়!
নিভন্ত বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিল লভিয়া ইন্ধন!
নির্ম্মোক খুলিল আত্মা, সারা বিশ্ব হোলো জ্যোতির্ম্ময়!
বহুক্ষণ স্তব্ধরহি; শেষে দেখি—কোথা তপোধন?
ঘনায়ে আসিল রাত্রি; ফিরে আসি প্রবাস-আলয়!

রামায়ণে বাল্মীকির রচনার পরিমাণ কত?

বালকাণ্ডের প্রথম চারি সর্গের রচনা যে বাল্মীকির রচনা নহে, তাহা আমরা অনুমান করিতেছি এবং আমাদের অনুমানের কারণ গুলি পূর্ব্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমাদের মনে হয়, পঞ্চম সর্গের ৫ম শ্লোক হইতে প্রকৃত রামায়ণী কথা আরম্ভ হইয়াছে।

কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত এই পঞ্চম সর্গের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোক আলোচনা করিয়া রামায়ণ উপাখ্যান যে বাল্মীকির বহু পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, তাহা দেখাইয়া অসামঞ্জস্যের ত্রুটী ধরিয়াছেন। শ্লোক দুটী এইরূপ :—

ইক্ষ্বাকুণামিদংতেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্॥ ৩ *
তদিদং বর্ত্তয়িষ্যাবঃ সর্ব্বং নিখিলমাদিতঃ।
ধর্ম্মকামার্থ সহিতং শ্রোতব্যমনসূয়তা॥ ৪

অর্থাৎ "সেই ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহাত্মা নৃপতিগণের বংশে রামায়ণ নামে বিখ্যাত এই সুমহৎ উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মকামার্থ সাধন এই উপাখ্যান আদ্যন্ত সমস্ত নিঃশেষরূপে গান করিব; আপনারা অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

এই রচনাকে বাল্মীকির রচনা বলিয়া মনে করিলে দোষ বর্ত্তে। প্রতিসংস্কারকের মুখবন্ধ বলিয়া মনে করিলে সে দোষ মোটেই বর্ত্তে না। বাস্তবিক ইহা সংগ্রহ কারকের মুখ বন্ধেরই শেষ কথা। ইহার পর ৫ম শ্লোক হইতে সংগ্রাহক মূল রামায়ণ শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বাল্মীকির আদি গীতকাব্য "পৌলস্ত বধ" যে কত বড় ছিল, তাহা অবগত হইবার কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়—বাল্মীকির গীত রামায়ণ ৫০ সর্গে ও ২১৭১ শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে অযোধ্যা মহাত্ম বর্ণন অধ্যায়েও রামায়ণের শ্লোক সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সে সংখ্যা এককোটী। পদ্মপুরাণের টীকাকার বলিতেছেন এখন আর এককোটী পাওয়া যায় না; চব্বিশ সহস্র মাত্র পাওয়া যাইতেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ—জ্ঞান প্রস্থানের টীকা মহাবিভাষায় মাত্র বার হাজার শ্লোকের উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে প্রদত্ত হইল। মহাবিভাষা, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও পুরাণ গ্রন্থগুলি আর্য্য রামায়ণে অনেক পরবর্ত্তী গ্রন্থ সুতরাং এই সকলের উক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না। আলোচ্য রামায়ণের সংস্করণগুলিতে ও প্রতি-সংস্কারক, রামায়ণের শ্লোক সর্গ ও কাণ্ডের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই উক্তির মূল্যও অতি অকিঞ্চিৎকর।

যাহা হউক, আমরা এই স্থলে সংগ্রাহকের উক্তি অবলম্বন করিয়াই আলোচনায় অগ্রসর হইব। সংগ্রাহক তাঁহার মুখবন্ধে (৪র্থ সর্গে) রামায়ণের শ্লোক, সর্গ ও কাণ্ড সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

প্রাপ্ত রাজ্যস্ত রামস্ত বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ। *
চকার চরিতং কৃতস্নং বিচিত্র পদমর্থবৎ॥ ১
চতুর্ব্বিংশ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গ শতান্ পঞ্চষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ ২

অর্থাৎ মহর্ষি বাল্মীকি রাজ্য প্রাপ্ত রামের চরিত কথা এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে, পঞ্চশত সর্গে ও ছয় কাণ্ডে (এবং শেষ উত্তর কাণ্ডে) বিবৃত করিয়াছেন। ইহা যে বাল্মীকির নিজের উক্তি নহে, তাহা শ্লোক দুটীই নিজে নিজে বলিয়া দিতেছে।

বেদের মণ্ডল, সূক্ত প্রভৃতি যেমন বেদকর্ত্তা ঋষিগণ নির্দ্দেশ করেন নাই, পরবর্ত্তী ব্যাসগণ করিয়াছেন, রামায়ণের এই সর্গ-কাণ্ড নির্দ্দেশও সেইরূপ ঋষি নিজে করেন নাই, শ্লোকাবলীর সংগ্রহ কর্ত্তাই করিয়াছেন। এখন, এই যে চব্বিশ সহস্র শ্লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সংখ্যা কি সংগ্রাহকের মুখবন্ধ ও পাদপূরণ ইত্যাদি শ্লোকাবলী সহ, না ঐ সকল ব্যতীত—তাহা অবগত হওয়া যায় না।

* এই শ্লোকের পাঠান্তর আছে যথা—ইক্ষ্বাকুণা মিদং তেষাং বংশে কীর্ত্তিবিবর্দ্ধণম্। নিবদ্ধং পুণ্যমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্।

* মহাভারতকার ব্যাসদেবও ২৪ সহস্র শ্লোক সমন্বিত মহাভারত প্রথম রচনা করিয়া স্বীয় পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই ২৪ সহস্রেরই পুনরুক্তি রামায়ণের পরবর্ত্তী সংগ্রহ কর্ত্তা করেন নাই তো?

সংগ্রাহক যে বাল্মীকির সমগ্র রচনাই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। পরন্তু যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহা তিনি নিজে রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। যে সকল স্থানে সংগ্রাহক বা তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণ এইরূপ রচনা প্রবেশ করাইয়াছেন, বাল্মীকির আদি রচনার সহিত অনেক স্থলেই তাহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, আমরা সে সকল স্থান বিষয়-আলোচনায় সাধ্যানুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রক্ষিপ্ত বিচার।

রামায়ণ হিন্দুজাতির ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া পূজিত। এরূপ গ্রন্থের উপর প্রক্ষিপ্ততার দোষারূপ করিলে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির মনে আঘাত লাগিবে। এরূপ লাগাই স্বাভাবিক। অথচ প্রক্ষিপ্ত বিচার না করিয়া পুরাণ গ্রন্থাদির উক্তিকে সমসাময়িক লেখকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা মূলক উক্তি বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে; ইতিহাস আলোচনার রীতি অনুমোদিতও নহে। সে জন্য প্রক্ষিপ্ততা নির্দ্দেশের হেতু গুলি স্বল্প কথায় উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা গেল।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারতের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত বাদ আলোচনায়ও সেই নির্দ্দেশ প্রযোজ্য; আমরা আমাদিগের নির্দ্দেশ গুলির সহিত সাহিত্য সম্রাটের নির্দ্দেশ গুলি যুক্ত করিয়া উপস্থিত করিলাম।

(১) যদি কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে কোন ঘটনা দুই বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ সেই বিবরণ পরস্পর বিরোধী, তাহা হইলে একটী প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি করিয়া আত্ম বিরোধ উপস্থিত করেন না। অনাবধানতা বা অক্ষমতা প্রযুক্ত যে পুনরুক্তি বা আত্ম বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। সেরূপ ত্রুটী অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

(২) শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনা প্রণালিতে প্রায়ই কতক গুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। যদি ঐ রূপ কোন শ্রেষ্ঠ কবির কোন অংশের রচনায় এরূপ দেখা যায় যে সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই; তৎপরিবর্ত্তে এমন সকল লক্ষণ আছে যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গত লক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

(৩) যদি কোন শ্লোকে এমন শব্দ প্রযুক্ত থাকে, যে সেই শব্দের মূলীভূত বস্তুর উল্লেখ ঐ গ্রন্থে বা উহার সম সাময়িক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, তাহা হইলে ঐ শব্দ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হইবে।

(৪) যদি শ্লোকাদিতে গ্রন্থকর্ত্তার সমকালীন পরিজ্ঞাত ও বিশ্বসিত বস্তু অথবা ভাবের অতিরিক্ত কোন বস্তুর বা ভাবের বর্ণনা বা অভিব্যক্তি দেখা যায়। তবে সেই বস্তু ও ভাবকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার বিষয় হইবে।

(৫) শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্র গুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।

(৬) যাহা অপ্রাসঙ্গিক তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ গুলির মধ্যে কোন লক্ষণ পাওয়া যায় তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ হইবে।

(৭) যাহা অনৈতিহাসিক, অস্বাভাবিক তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক ইতিহাসের আলোচনায় তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। তাহা বুঝিবার উপায় সমসাময়িক ইতিহাস, ভাব ও সমাজ।

কেবল যে রামায়ণেই পরবর্ত্তী চিন্তা ও রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে, প্রক্ষিপ্ততার হস্ত হইতে রামায়ণের ন্যায় বেদ, পুরাণ, মহাভারত, গীতা, তন্ত্র, কাব্য, সাহিত্য, নাটক কিছুই অব্যাহত চলিয়া আসিতে পারে নাই।

রামায়ণের আদি রচনার ভিতর যে পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিয়াছে তাহা এ দেশের লোক বড় বেশী আলোচনা করেন নাই। বৈদেশিকেরা যাহা করিয়াছেন,

তাহাও অতি সামান্য এবং মোটামুটি ভাবে প্রতি স্বর্গের পাঠ বিচার করিয়া নহে; তবু বিদেশীয়ের চেষ্টা এ স্থলে দেশীয় অপেক্ষা বেশী।

এই স্থলে ইয়ুরোপীয়েরা তাঁহাদের অনুরূপ জাতীয় গ্রন্থের কিরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইয়ুরোপের পণ্ডিতেরা হোমারের ইলিয়ডের সহিত রামায়ণের তুলনা করিয়া থাকেন। ঐ গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে। তাহারা শুধু '"প্রক্ষিপ্ত আছে' বলিয়াই আমাদের ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহেন নাই। তাঁহারা ইলিয়ডের ১৫৬৮১ টী পংক্তিই তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন্ পংক্তি হোমারের লিখিত ও কোন্ পংক্তি পরবর্ত্তী লেখকের প্রক্ষিপ্ত রচনায় কলুষিত, পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। কোন্ পৌরাণিক গল্পটী কবি নিজের রচনার সহিত গ্রন্থ বদ্ধ করিয়াছেন, কোন্‌টী বা পরবর্ত্তী ভাবে রচিত ও পরে সংযোজিত, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনা পূর্ণ— এক ইলিয়ড সম্বন্ধেই ইয়ুরোপের সাহিত্যে এত গ্রন্থ আছে যে তাহাতে একটী ছোট খাট গ্রন্থাগার পূর্ণ হইতে পারে।

আমাদের রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে এরূপ কয় খানা গ্রন্থ আছে? নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

নবীন ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের সুযোগ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুযোগকে ভারতবাসী এইরূপ পণ্ডশ্রমে ব্যয়িত হইতে দেন নাই; অপর পক্ষে এইরূপ সুযোগ শূন্য প্রাচীন যুগের বহুলোক অনন্যকর্ম্মা হইয়াই বোধ হয় কেবল এই সকল গ্রন্থের নিরর্থক আলোচনা করিয়া গিয়াছিলেন। আজকালকার লোক শুনিলে নিশ্চয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে যে রামায়ণের আলোচনার পুস্তক এখন একরকম নাই বলিয়া প্রকাশ করিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি না, এক সময় সেই রামায়ণেরই টীকা গ্রন্থ ছিল—সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত। (১) অর্থাৎ রামায়ণের কেবল টীকা গ্রন্থ দ্বারাই একটি ছোট খাট বৃটীশ মিউজিয়ম প্রস্তুত হইতে পারিত; বোধ হয় হইয়াছেও তাহাই

(১) ভারতীয় গ্রন্থাবলী (রাজেন্দ্র দত্ত) ৩৬ পৃঃ।

ভারতের সেই প্রাচীন হস্তলিপির যুগে কেবল বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের টীকা গ্রন্থ ছিল ১৪২৫০০ (২)। আমরা পরের দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া করিয়া নিজের দেশের প্রাচীন গৌরবকে অর্ব্বাচীন মনে করি, আর বৈদেশিকেরা আমাদের সেই সম্পদ ঝাড়িয়া মুছিয়া লইয়া তাহাদ্বারা তাহাদের নিজ সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া লয়; তারপর তাহার সাহায্যেই আমাদিগকে বর্ব্বর ও অর্ব্বাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে।

এইবার আমরা প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিব।

প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশের যে কারণ-গুলি আমরা উপরে নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, ঐ কারণ-গুলিই কেবল প্রক্ষিপ্ত বিচারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। রচনার দেশ কাল-পাত্র নির্দ্ধারণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। রচনার সময়, সমাজ ও দেশের আনুসঙ্গিক অবস্থা নির্দ্ধারিত হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ গুলির বিচার দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

রামায়ণের রচনা কাল নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটী মত প্রচলিত আছে। যাঁহারা প্রাচ্য ভাবাপন্ন অথচ প্রাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানেও সুপণ্ডিত তাহারা রামায়ণের রচনা কাল নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া উহাকে ঋষি যুগের কাব্য বলিয়া মনে করেন। মোটামুটি তাঁহাদের মত, এই ঋষিযুগ খ্রীঃ পূঃ সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিদের যেন এই রূপ মত। দ্বিতীয়—যাহারা প্রাশ্চাত্য ভাবাপন্ন অথচ প্রাচ্য শাস্ত্র সংহিতায়ও বিশেষ পারদর্শী তাহাদের বিশ্বাস রামায়ণ লৌকিক যুগের কাব্য। মোটামুটি তাঁহাদের মত— এই লৌকিক যুগ—ভারতে গ্রীক সংস্পর্শের পরবর্ত্তী সময়। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিদের যেন এই রূপ মত।

আমরা এই স্থলে কাহারও কোন স্পষ্ট মত উদ্ধৃত করিলাম না। দৃষ্টান্তের জন্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দুইজন

(২) বেদের ৯০০০০, মহাভারতের ১৫০০০, রামায়ণের ৩৭৫০০। এই বিষয়ের সত্যাসত্য তত্ত্ব যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা গ্রীন সাহেব, কাউয়েল সাহেব ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিবেন। ভারতীয় গ্রন্থাবলীতেও এই বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রধান ব্যক্তির মান উল্লেখ করিলাম মাত্র। ঋষি যুগ ও লৌকিক যুগ কথা দুইটীও আমাদের 'বানান' কথা; আলোচনার সুবিধার জন্য 'বানান' হইল মাত্র। যুগ পরিচয় সম্বন্ধে আমরা দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছি।

নিরপেক্ষ ভাবে কোন কাব্যের সময় নির্দেশ করিতে হইলে কাব্যের দোষ, গুণ ও ত্রুটীর উল্লেখ করিয়া যে বিচার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা যে কেহ করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু তথাপি মত ভেদহ রহিয়াছে; বোধ হয় থাকিতেও তাহা নিত্য।

এই মতভেদের প্রধান কারণ রামায়ণে এই উভয় যুগের ভাব এবং দেশকাল পাত্রের প্রভাব প্রায় পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। রামায়ণের যে স্বর্গে ঋষি যুগের ভাব ও প্রভাব আছে, ঠিক সেই স্বর্গেই লৌকিক যুগের ভাব, প্রভাবও বিদ্যমান; বরং ঋষি যুগের অপেক্ষা লৌকিক যুগের ভাবেই রামায়ণ বেশীর ভাগ ভাবাক্রান্ত। এরূপ অবস্থায়, যে যেমন ভাবের প্রভাবে ভাবুক হইয়া রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, রামায়ণের সমাজ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবের প্রভাবে আত্ম সমর্পন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ত্রুটী কাহারও নহে, ত্রুটী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ততার।

রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত বিচার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইলেও আমরা সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমাদের ত্রুটী নির্দ্দেশ করিতেও যদি অতঃপর কোন শক্তিশালী লেখক অগ্রসর হন, এই পণ্ডশ্রম স্বার্থক জ্ঞান করিব।

পরলোকগত রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

যে সকল সহৃদয় ভূম্যধিকারীর মহৎদান ও সদাশয়তার জন্য ময়মনসিংহ জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে এমন কি ভারতবর্ষের মধ্যে একটী উন্নত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন জেলা বলিয়া পরিচিত, রামগোপালপুরের পরলোকগত রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। গত ৯ই পোষ কলিকাতা ধামে চিকিৎসাধীনে থাকিয়া রাজা বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৮ বৎসর।

বঙ্গদেশে যখন টেকনিক্যেল এডুকেশন বা কার্য্যকরী শিক্ষা আন্দোলনের চিন্তা ফুটিয়া উঠে নাই, বিদ্যোৎসাহী রাজা যোগেন্দ্রকিশোর সেই দূর অতীতে তাঁহার, স্বর্গীয় পতৃদেব রাজা কাশীকিশোর রায় চৌধুরীর নামে এই ময়মনসিংহ কাশীকিশোর ট্যাকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা আনন্দমোহনের স্থানীয় সিটি কলেজকে যখন তাঁহার অভিভাবকগণ ধ্বংস করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত—এই আত্ম স্বার্থত্যাগী পুরুষ তখন সেই সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা আনন্দ মোহনের স্মৃতি রক্ষার্থ উদার হস্ত উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ময়মনসিংহের এই গৌরব ও সম্পদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা যোগেন্দ্রকিশোরের আত্ম ত্যাগের ফল, সেই লুপ্ত গৌরব—আনন্দমোহন কলেজ নামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহে যে বিরাট সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল, এই মহাপুরুষের প্রথম দানেই সেই পুণ্য কার্য্যের মঙ্গলাচরণ হইয়াছিল

ময়মনসিংহ শাখা সাহিত্য পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য রাজা বাহাদুর যে ভুমি ও অর্থ দান স্বীকার করিয়াছিলেন —তাহার তুলনা নাই। স্থানীয় মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকগণের আত্মবিরোধে সে কার্য্য পণ্ড হইয়া গেল। গৃহের অর্থ প্রত্যার্পিত হইল। রাজা বাহাদুরের সেই সঙ্কল্পিত ভুমির উপর আজ মিউনিসিপ্যালিটির জল-স্তম্ভ।

ব্যক্তিগত ভাবে আমরা রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে সাহিত্য চর্চ্চায় যে সহানুভূতি সূচক ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমাদের সাহিত্য-পথ যাত্রার মহামূল্য পাথেয় স্বরূপ আজীবন স্মৃতির ভাণ্ডারে সংরক্ষিত থাকিবে।

ভগবান তাঁহার পরমাত্মার শান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী কুমারগণের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

এই মাসের চিত্র।

এই মাসের সৌরভে শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের অঙ্কিত "ভাগ্যলক্ষ্মী" নামক ত্রিবর্ণ চিত্র প্রদত্ত হইল।
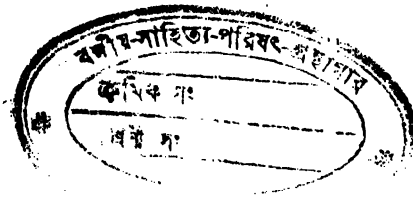
দ্বাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩৩০। | দ্বিতীয় সংখ্যা।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা।

আমরা ইংরেজীতে 'নেশন' ও 'নেশনেলিটি' দুইটী পৃথক শব্দ দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলা ভাষায় ইহাদের কোন প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। ইংরেজী 'নেশন' শব্দের সঙ্গে গবর্ণমেন্টের ও রাষ্ট্রের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যাহারা এক 'নেশন' ভুক্ত তাহাদের সকলেরই 'নেশনেলিটি' যে এক হইতে হইবে, তাহা নহে। সকল আমেরিকাবাসী, ও সকল সুইজারলণ্ডবাসী একই 'নেশনাধীন, কিন্তু তাহাদের 'নেশনালিটি' পৃথক্ পৃথক্। সকল ভারতবাসীর 'নেশন' এক হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের 'নেশনেলিটি' চিরদিনই পৃথক থাকিবে। ধর্ম্ম, সংস্কার (tradition), আচার ব্যবহার; রীতিনীতি ভাষা প্রভৃতির উপর 'নেশানেলিটি' নির্ভর করে। ভারতবর্ষে বহু 'নেশনেলেটির' লোকের বাস। তাহারা নিজ নিজ বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া এক নেশনেলিটে ভুক্ত হইবে সে কথা আশা করা অন্যায়; তবে ইংরেজ দার্শনিক মিল ও তাঁহার মতাবলম্বী অন্যান্য ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে রাষ্ট্রীয় সীমা ও নেশনেলিটির সীমা এক হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ এক রাষ্ট্রে দুই বা ততোধিক নেশনেলিটির লোক বাস করিতে পারিবে না। কিন্তু বাস্তব জগতে ইহার ব্যতিক্রম সদা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তারপর আদর্শের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ইহা ভাল নহে; কারণ বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া যাহাতে একত্র সম্মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারে, তাহা করাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অধিকন্তু কেবল এক গবর্ণমেণ্ট বা একই শাসনাধীন হইলেও চলিবে না, প্রত্যেকেরই এই জ্ঞান থাকা চাই যে সে কোন এক নির্দ্দিষ্ট দলভুক্ত, নতুবা একটা 'নেশন' হইতে পারে না। রাষ্ট্রীয় বন্ধন ব্যতীত আরো কতকগুলি স্বাভাবিক ও আন্তরিক বন্ধন না থাকিলে কোন সম্মিলনই সুদৃঢ় হইতে পারে না। সমান স্বার্থ (interest) ও সমান নৈসর্গিক বা ভৌগলিক অবস্থা হইলে বিভিন্ন নেশনেলিটির লোক সহজে একত্র সংবদ্ধ হইতে পারে।

আমরা দেখিলাম, 'নেশন' অনেকটা বাহিরের জিনিষ কিন্তু নেশনেলিটি ভাব রাজ্যের বস্তু। অর্থনীতিতে যে "নেশন" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই, উহার মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে কোন বিশিষ্ট রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করা। বাস্তব জগতের কোন বস্তু দ্বারা নেশনেলিটি বুঝান যায় না। ধর্ম্মের ন্যায় নেশনেলিটিও আধ্যাত্মিক ভাব ও আন্তরিক অনুভূতি মাত্র। ইহার কোন প্রতিকৃতি নাই। কিন্তু রাষ্ট্র একটা বাস্তব রাজনৈতিক সম্মিলন। ইহার সব সম্পর্ক বাহিরের জাগতিক পদার্থের সঙ্গে। নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রণোদিত স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতার উপর নেশনেলিটি প্রতিষ্ঠিত কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাধ্যতা বল প্রয়োগ মূলক। রাষ্ট্র সমূহ তাহাদের শক্তি বাহির হইতে সংগ্রহ করে এবং সেই শক্তির প্রভাবে কর্তৃত্ব করে; কিন্তু নেশনেলিটির শক্তি ভিতরকার জিনিষ, জনসাধারণের প্রাণের বস্তু। দেশহিতৈষিকতা নেশনেলিটির বাস্তবাকার মাত্র। নেশনেলিটি সম্মিলিত মত ও জ্ঞানের

অভিব্যক্তি মাত্র। সম্মিলিত (Corporate) জীবন, সম্মিলিত পরিবর্দ্ধন ও সম্মিলিত আত্মসম্মানবোধ, নেশনেলিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যাহারা এক মত পোষণ করে, যাহারা প্রেমপাশেবদ্ধ ও যাহাদের এক দেশে বাড়ী, এমন লোক সমষ্টিকে এক জাতি বলা যাইতে পারে।

শিক্ষিত ভারতবর্ষ এমন কি সমগ্র জগৎ আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে সৎজীবন যাপনের জন্য আত্মসম্মান যেমন দরকার; ব্যক্তিগত সম্মানার্থও নেশনেলিটি তেমনি প্রয়োজনীয়। নেশনেলিটীর ভাব সকলের ভিতরই এরূপ ভাবে নিহিত রহিয়াছে যে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলে সকলেই লজ্জা বোধ করে।

কতকগুলি লোকের সহিত সমতা জ্ঞান, আবার কতকগুলি লোক হইতে ভেদ জ্ঞান-সম্পন্ন সম্মিলিত লোক সমষ্টিকে জাতি বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় বন্ধন ব্যতীত এই প্রকার সম্মিলনের আরও অনেক উপায় আছে। তন্মধ্যে এক—নৈতিক আদর্শ, একই প্রকার সংস্কার, আচার ব্যবহার ও রাজনৈতিক প্রবৃত্তি, এবং এক ভাষা সম্বন্ধ ও বংশই উল্লেখযোগ্য।

বাস্তবিক পক্ষে নেশনেলিটি সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়; মোটেই রাষ্ট্রীয় বিষয় নহে। কেবল ঘটনাচক্রে রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

যখন দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী শাসন কর্ত্তাগণ সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল এবং যখন উৎপীড়িত জাতি সমূহ রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্বেচ্ছানুসারে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিত না, তখন হইতেই নেশনেলিটি রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িল। প্রকৃত পক্ষে সৎ গবর্ণমেণ্ট ও নেশনেলিটির ভিতর কোনরূপ বিবাদ থাকিতে পারে না। কাজেই দেখা যায়, উন্নতি প্রতিরোধ পরায়ণ রাষ্ট্র সমূহে লোকের সামাজিক বিষয় সমূহ রাজনৈতিকত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার সমূহ রাজরোষে পতিত হয়।

অত্যাচারী গবর্ণমেণ্ট জাতীয়ভাব সংবর্দ্ধক লোকে কোন বিষয়ে বাধা পাইলেই সে দিকে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হয়। কাজেই যখন পোলবাসীদিগকে তাহাদের নিজের ভাষা ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইল, তখনই তাহারা একটা সুদৃঢ় জাতিরূপে গড়িয়া উঠিল। কিন্তু কোন জাতিই 'ডিপ্লোমেসি' দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। ভিতরে স্বাধীনতা লাভ করা চাই। স্বাধীনতার জন্য একটা আন্তরিক স্পৃহা ও অদম্য তৃষ্ণা চাই।

সকলের ভিতরই এই জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত করা উচিত। পতিত ও দুর্ব্বল লোকের ভিতর নেশনেলিটি ও আত্মসম্মান বোধ জাগাইতে হইবে, এবং জাতীয় সংস্কারের (tradition) প্রতি আসক্তি জন্মাইতে হইবে। শিক্ষা জাতীয় ভাব সংবর্দ্ধনের একটি অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। শিক্ষা দ্বারা আমরা তাহাদিগকে সম্মিলিত (Corporate) জীবন, সম্মিলিত কাজ ও সম্মিলিত সঙ্ঘের উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে পারি। ইহার সাহায্যে জন সাধারণ তাহাদের অতীত ইতিহাস এবং তাহাদের শক্তি ও বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহারা একজাতি ভুক্ত ও তাহারা সকলেই এক—তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উল্লিখিত উপায়ে আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া 'নেশনেলিটির' ভাব জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট জাতির সম্যকরূপে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকার দাবীই জাতীয় ভাবের নিদর্শন। অতএব প্রত্যেক বিশিষ্ট সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার ও অন্যান্য পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ না রাখিবার পূর্ণ অধিকার আছে। আমেরিকাবাসীদিগের স্বাধীনতা প্রাপ্তিও উক্ত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সারা উনবিংশ শতাব্দী ভরিয়াই একের সহিত অপরের ভেদ বুদ্ধি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এমন কি যেস্থানে রাষ্ট্র ও নেশনেলিটির ভিতর কোন পার্থক্য নাই সেই ফ্রান্সেও এই দোষ পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি বা সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংবর্দ্ধনার্থ স্থানীয় নিয়ম প্রণালি, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার প্রাদেশিক ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত সমূহ সজীব রাখা দরকার। জাতিত্বের বন্ধন এক প্রকার লোক সমূহকে এক সঙ্গে সংবদ্ধ করে, আর বিভিন্ন প্রকৃতির লোকদিগকে বিভাগ করিয়া দেয়। পারিপার্শ্বিক ও বংশপরম্পরাগত বিশেষত্ব এই প্রকার বিভিন্ন নেশনেলিটির

মূল কারণ। যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের মত ও আদর্শ নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। আকৃতির সামঞ্জস্য, মানসিক প্রবৃত্তি, ও আচার ব্যবহারের ঐক্যতা এবং ভাষা ও পরিচ্ছদের সমতা প্রভৃতি যেসকল নেশনেলিটির চিহ্ন আমরা বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, উহার মূল বাস্তবিক পক্ষে অতীতের অন্ধকার গর্ব্ভে নিহিত রহিয়াছে। হঠাৎ বিভিন্ন লোকের মধ্যে মিলন সম্ভবপর নহে। বহুদিনের অপরিচিত ও অজ্ঞাত মিলন সূত্র একদিনে আবিষ্কৃত হইতে পারে সত্য কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, এই ঐক্যতার বীজ বহুপূর্ব্বে পূর্ব্ব পুরুষদিগের ভিতরই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং সুদীর্ঘ কাল পর আজ তাহা প্রকাশ ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের পারিপার্শ্বিক দুই প্রকার; স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। দেশের জল বায়ু ও আর্থিক অবস্থা সমাজিক অবস্থার সবিশেষ পার্থক্য জন্মাইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তি বা পরিবার অপর এক ব্যক্তি বা পরিবারের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, উহাই অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক। এতদ্ব্যতীত tradition বা সংস্কারও নেশনেলিটি গড়নে খুব প্রভাব বিস্তার করে। যাহারা বহুদিন একত্র বাস করিয়াছে; তাহাদের নিজেদের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে বেশ একটা বিশিষ্ট ধারণা জন্মে এবং তাহাদের আইন কানুন গবর্ণমেণ্ট ও শাসন পদ্ধতি কি ধরণের হইবে তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, শতাব্দীর পর শতাব্দী একত্র সহবাস করিলে, ভাষা, পরিচ্ছদ প্রভৃতির বৈষম্য ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে বাধ্য; কারণ দুইটা বিপরীত ভাবাবিষ্ট লোক সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করিতে পারে না। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বাংলা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'নেশন' ও 'নেশনেলিটি' অর্থ কি" তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। জাতীয়তা শব্দ আমরা উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিব। এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, জাতীয়তা কেবল সংপ্রসারণই করিয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে ইহাই জাতীয়তার সব নহে। ইহা একই সময় সম্প্রসারণ ও সম্মিলন এই দুই কার্য্যই করিতে পারে। ইহার কর্ম্মক্ষেত্র কেবল দুইটি সমভাবাপন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট নহে, এমন কি একই রাষ্ট্রের ভিতর ইহার যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু জাতীয়ভাব সাধারণতঃ সম্প্রসারণ গুণ বিশিষ্ট। তাই আমারা দেখিতে পাই, অধিকাংশ লোকই নিকটবর্ত্তী পাড়াপর্শীর সঙ্গে যেমন সহানুভূতি ও সাহচর্য্য করিয়া থাকে, বৃহত্তর ও দূরবর্ত্তী সমাজের সঙ্গে সেরূপ করিতে পারে না। শিক্ষার বিস্তার ও স্বার্থের সংবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভাগ করিয়া দিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। পক্ষান্তরে জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সকলকে একত্র কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আবার শিক্ষার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ও সবিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্বে যাহাদের পরস্পরের ভিতর কোন পরিচয় ছিল না, এখন পরিচয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ফলে তাহাদের ভিতর একটা সহানুভূতি ও সদ্ভাব দৃষ্টি গোচর হইতেছে। অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে গত উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিয়াছে।

আন্তর্জাতিকতার অর্থ কি—এখন দেখা যাউক। অধিকাংশ লোকই দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিষয় সমূহকে আন্তর্জাতিক বলিয়া থাকে, যথা,—আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইত্যাদি।

জাতীয়তার ভিতর দিয়াই আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছিতে হয়। যে সকল আচার ব্যবহার রীতিনীতি বিভিন্ন নেশনেলিটি ও বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায়ের প্রভেদের কারণ, সেই সমুদয় বৈষম্যের ভিতরও মিলন সূত্র রহিয়াছে। সেই সূক্ষ্ম সম্মিলনী শক্তি বিশিষ্ট স্থায়ী শাশ্বত বস্তুর অবলম্বনে আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই শাশ্বত বস্তুতে পৌঁছান কিংবা সেই সূক্ষ্ম মিলন সূত্র আয়ত্ত করা সহজ নহে। তবে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতর সহিষ্ণুতা বা সহগুণ, সদ্ভাব ও সাহচর্য্য থাকিলে অতি সহজেই আন্তর্জাতিক ভাব পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধাসমন্বিত সহিষ্ণুতাই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। জাতীয়তা ধ্বংস করিয়া মিলন সম্ভবপর নহে। জাতীয়তার ধ্বংসের উপর আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না,

বরং সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খলিত, জাতীয় ভাব হইতেই আন্তর্জাতিকতা উদ্ভূত হয়। শুধু 'নেশন' নহে ব্যক্তিরাও পরস্পর পরস্পরের sentiment এর বা মতের সম্মান না করিলে, কোন সম্বন্ধই গড়িয়া উঠিতে পারে না। যতই জোড় করিয়া ব্যক্তির বিশেষত্ব টুকুকে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করা যায়, ততই ব্যক্তিগণ পৃথক হইয়া পড়ে! একে অপরের sentiment বা মতের সম্মান না করিলে কখনই দুই জন লোক একত্র থাকিতে পারে না। সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। আমাদের সম্মুখে আজ হিন্দু মুসলমান সমস্যা উপস্থিত। সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান কিংবা সমস্ত মুসলমানকে হিন্দু করিয়া এই সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভবপর হইবে না। এজন্য চাই পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, এবং পরস্পরের ধর্ম্ম, মত প্রভৃতির প্রতি সম্মান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা। এই প্রকার বৈষম্যের মধ্যেও সাম্য না থাকিলে কোন বৃহৎ, দৃঢ়, ও স্থায়ী সম্মিলন কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব সহিষ্ণুতা আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছিবার প্রথম সোপান। এতদ্ব্যতীত যাতায়াতের সুবিধা, এক আধ্যাত্মিক ভাব, এবং বাণিজ্যব্যবসায়ে পরস্পর নির্ভরতা প্রভৃতি বিষয় সমূহও বিবিধ 'নেশনের' সম্মিলনের পক্ষে অনুকূল।

বর্ত্তমান জগৎ পুরাপুরি আন্তর্জাতিক। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক জিনিসের ভিতরই আন্তর্জাতিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব শুধু রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও ব্যবসায় মাত্র সম্পর্কীয়। তাই আমারা দেখিতে পাই—ইংরেজ, কেনাডাবাসী, আমেরিকান, জার্ম্মেন ও অন্যান্য দেশের অধিবাসীগণ সম্মিলিত ভাবে Canadia Pacific Railwayএর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। খাদ্যের জন্য ইংলণ্ড আমেরিকার দিকে তাকাইয়া আছে, আবার অন্যান্য দেশ টাকা না যোগাইলে আমেরিকার উপায় নাই। বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর এইরূপ ভাবে নির্ভর করে বলিয়াই তাহাদের কতকগুলি সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণার্থ আন্তর্জাতিক বিভাগ সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এক দেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত, শ্রমজীবি সম্পর্কীয় আইন কানুন, তাহাদের গমনাগমন বিধি, যুদ্ধের আয়োজন প্রভৃতি বিষয় অপর দেশ ও উহার আইন কানুন সমূহের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। উল্লিখিত ইউরোপীয় আন্তর্জাতিকতা খাটি আন্তর্জাতিকতা নহে। ইউরোপীয় বিভিন্ন নেশনগুলি শুধু নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অস্বাভাবিক ভঙ্গুর সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতেছে। যতদিন নেশনগুলি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কাজ না করিবে, ততদিন আন্তর্জাতিক লীগ, ইম্পিরিয়েল কনফারেন্স প্রভৃতি সবই বৃথা। এতাদৃশ স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি তখনই ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে যখনই দুর্ব্বল 'নেশন' স্বার্থপর বলবান 'নেশনের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সুবিধা পাইবে। তবে একথা ঠিক, এই স্বার্থপর প্রচেষ্টা হইতেই ভবিষ্যতে খাটি জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে।

১৮৫৬ অব্দে ইংরেজগণ যখন কেনাডাবাসী দিগের ভাষা, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের সম্মান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তখনি আন্তর্জ্জাতিকতার সূত্রপাত হয়।

এখন আমরা নির্ভীকভাবে বলিতে পারি জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ভিতর কোন স্বাভাবিক কলহ নাই। 'আমরা এক' (we belong to ourselves.) আন্তর্জাতিকা এই ভাবের বিরোধী নহে। কিন্তু 'আমরা তোমার জন্য নহে' আন্তর্জাতিকতা এই ভাব সহ্য করিতে পারে না।

যদিও ইতিমধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে, তবু গত এক শত বর্ষে মানব জাতির মুলীভূত একতা খুব বেশী পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ফেডারেল (federal) প্রণালী খুব প্রসরতা লাভ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রের প্রাচীন অর্থও সকলেই পরিত্যাগ করিতেছেন। জাতীয় ভাবের উপর অত্যাচার না করিলে কোন রাষ্ট্র কখনও বিভিন্ন রাষ্ট্রের একতায় হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু কেহ ইহাকে আত্মমত প্রকাশ করিতে বাঁধা দিলে সে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করে। সহিষ্ণুতার অভাব ও শাসনকর্ত্তাদের ব্যক্তিগত অত্যাচারই ইহার প্রধান কারণ। তাই আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি, যদি পরস্পরের ভিতর সহিষ্ণুতা ও সাহচর্য্য থাকে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাষা, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহা হইলে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ভিতর কদাচ কলহ থাকিতে পারে না।

শ্রীমাখনলাল লাহিড়ী।

ময়মনসিংহের কবি-কাহিনী

(কৃষক কবি-ছলিম সেখ্)।

ছলিমের বাড়ী ছিল ময়মনসিংহের অন্তর্গত সিংহেরবাঙ্গলা। তাঁহার পিতার নাম,—সোণাউল্লা ও মাতার নাম ছিল ময়নাজান। দরিদ্র কৃষক সন্তান ছলিম,—দেখিতে শুনিতে খুব হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুন্দর চেহারাবান্ পুরুষছিলেন। তাঁহার হাস্য প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের উপর সারল্য সংযুক্ত প্রসন্নতার দিব্য জ্যোতি সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইত। অতি শৈশবে মা মরিয়া গেলে, মাতৃহীন ছলিম বিমাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া ধীরে ধীরে বাল্য-কৈশর অতিক্রম পূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ছলিম যখন যৌবনের প্রমোদোদ্যানে,—আমি তখন বাল্যের নন্দন কাননে। ছলিম কিছুই লেখা পড়া জানিতেন না। তাঁহারা বহু পুরুষ যাবত লক্ষ্মী সরস্বতীর কৃপাকটাক্ষের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন।

লেখা পড়া না জানিলেও, কবি ছলিমের কোমল অন্তঃকরণ স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফুরণ শূন্য ছিল না। তিনি ভাল করিয়া গান গাইতে পারিতেন না বটে,—কিন্তু গান বাজনা তাহার বড় ভালবাসার বস্তু ছিল। কবি ভাবাপন্ন ছলিমের চরিত্র যতদূর হইতে পারে সুন্দর ছিল। আমোদানন্দের ভিতর থাকিয়া শান্তি লাভ করা,—প্রাণকে সরস রাখা,—তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। ছলিমের কবিত্ব শক্তি বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমাকে বাধ্য হইয়া কয়েকটি অন্য কথার অবতারণা করিতে হইল।

যখন বৃক্ষ-বল্লরী সমাকীর্ণ,—পত্র-পুষ্প সমলঙ্কৃত ময়মনসিংহের পল্লী সমূহ কুসুমমণ্ডিত লতামণ্ডপে সুশোভিত থাকিয়া মানব-মনের আনন্দ বর্দ্ধন করিত,—পক্ষীকুলের কলকাকলীতে কাণে-প্রাণে অমৃত ধারা ঢালিয়া দিত,—যখন পল্লীবাসী নরনারীগণ, অন্ন বস্ত্রের তীব্র তাড়নায় দিবারাত্রি হা হুতাশ করিয়া মরিত না,—যখন ছোট বড় সকলেই,—দুধে-ভাতে খাইয়া সচ্ছন্দ মনে শান্তির নিরাময় ক্রোড়ে পড়িয়া ঘুমাইতে পারিত,—যখন বিশুদ্ধানন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া পল্লীবাসীগণ গান বাজনা করিয়া আমোদে প্রমোদে দিন কাটাইত,—সেই সুখের দিনে গ্রামের ছোট বড় সর্ব্ব সাধারণে মিলিয়া কার্ত্তিক পূজার সময় নাট্যাভিনয় করিতেন। সে নাট্যাভিনয়ে বর্ত্তমান সময়ের নাট্যাভিনয়ের মত রাজবাটী, শ্মশান, বধ্যভূমি কি পুষ্পোদ্যানাঙ্কিত যবনিকাদির সাহায্য লওয়া হইত না, কি বেহালা, হারমনিয়ম ও ফ্লুট ইত্যাদিও ব্যবহার করা হইত না। কেবল ঢোলক, রামকরতাল আর পাঞ্জনী।

মুক্ত প্রাঙ্গণে চাঁদুয়ার তলে বসিয়া দশ পনর জন গান বাজনা করিত,—দলের বাকি কয়েক জন, (যাহারা অভিনেতৃ) রঙ্গ ভূমির নিকটস্থ একখান ঘরে সাজ-সজ্জা করিয়া ক্রমশঃ আসিয়া বাহির হইত। এই প্রকার নাট্যাভিনয়ের নাম ছিল,—তামাসা। আর এই তামাসার বিষয় ছিল,—অধিকাংশ স্থলেই রাম রাবণের যুদ্ধ।

অভিনয় স্থলে, রাম-লক্ষ্মণ আসিতেন,—ভগ্নদূত ও শুক-সারণ সহ মহারাজ রাবণ আসিতেন,—বিভীষণ, সুগ্রীব জাম্বুবান, কুম্ভকর্ণ, মহীরাবণ ইন্দ্রজিৎ, অঙ্গদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ সকলেই আসিতেন। আর হনুমান ত আসিতেনই।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকলকেই মুখস বা মুখা পরিয়া আসিতে হইত এই সমস্ত মুখা বা মুখস পল্লীস্থ মেস্তরিগণ ছাতিয়ান কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করিয়া দিত।

কিছুকাল পর দোহাখলা নিবাসী ৺ দুর্গাচরণ সরকার মহাশয়ের নির্ম্মিত কাগজের মুখার বড় আদর হইতে লাগিল। কারণ কাঠের মুখা হইতে কাগজের গুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও পাতল। শুনিয়াছি,—দুর্গাচরণ সরকার মহাশয়ের স্ত্রী নাকি এই প্রকার কাগজের মুখস প্রস্তুতের প্রথমাবিষ্কর্ত্রী।

প্রাচীন কথার আনন্দ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অজ্ঞাতসারে অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম। এখন আবার আমাদের কৃষক কবি ছলিম সেখের কবিত্ব কথা তুলিয়া লইতেছি।

হিন্দুগণ বৎসর বৎসর এই প্রকার রাম-রাবণের যুদ্ধ ঘটনাবলম্বনে তামাসা করেন, তদ্দর্শনে ছলিম কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে কল্পনার কোলে বসিয়া এক অভিনব তামাসার সৃষ্টি করিয়া লইলেন। সেই তামাসার নাম হইল,—বাদসাহের তামাসা। সাধারণ লোকে বলিত,—"বাসসার" তামাসা।

বাদসাহের নাম---সোনাধর,---বেগমের নাম,---সোণাজান বিবি। সময়,---ইংরেজ রাজত্বের প্রথম,---রাজধানী,---দিল্লী।

ছলিম সোনাধরকে মোসলমান রাজত্বের ইতিহাস পৃষ্ঠায় দেখিয়াছেন কিনা,---তাহা তিনিই জানেন। আমরা বুঝিতেছি, সোণাধর ছলিমের কল্পনা সম্ভূত।

অল্প দিন মধ্যেই ছলিম কয়েক জন হিন্দু বালকের সাহায্যে নিজ কৃত তামাসা তালিম দিয়া সর্ব্বজনে সমক্ষে বাহির করিলেন।

(পালা-আরম্ভ।)

কতকগুলি লোক বাহের বাড়ীর উঠানে চাটী-পাটী ফেলিয়া ঢোলক লইয়া বসিয়া গেল, ছলিম বন্দনা গাইতে আসরে অবতরণ করিলেন।

(বন্দনা।)

১নং---আমি সিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা করি।

(বন্দনা করি গো, আমি বন্দনা করি।)

সিন্দুর বরণ তন, চতুর্ভুজ গজানন,

সর্ব্বদেবের আগে হয় পূজা যাঁহারি॥

(আমি বন্দনা করি।)

২নং---সরেস্বতী মা, বন্দনা করি তোমার চরণে।

(বন্দনা করি তোমার চরণে।)

আমি অতি মূঢ় মতি, না জানি ভজন স্তুতি

কিরপা কৈরে আইসগো মা, আমার আসরে॥

সুনজরে চাইলে তুমি, গান গাইতে পারি আমি,

তোমার কিরপা না হইলে পারি কেমনে!॥

(সরেস্বতী মা)

এই দুইটী বন্দনা গীত স্বর সংযোগে গাইয়া ছলিম কবিগানের ছড়ার মত কিছু বন্দনা গাইতেন যথা,---

৩নং---সারে আলমের কর্ত্তা, খোদাতাল্লা তানে।

পয়লাম বন্দনা করি অতি সাবধানে॥

দ্বিতীয়ে বন্দনা করি, ওস্তাদের চরণ।

যে শিখাইল গান-বাজনা করিয়া যতন॥

তীরতীয়ে বন্দনা করি,---পিতা মাতার পায়।

যাঁর লৌ-গোস্তে জর্ম্ম, দিয়াছইন্ আমায়॥

চতুর্থে বন্দনা করি, মুর্শিদের চরণ।

শিখাইল খোদার কইলমা আমারে যে জন॥

আসমান জমীন বন্দি, পাতালের নাগ।

সুন্দর বনে গাজী আর বন্দি তান বাঘ॥

দশদিক্ বন্দনা কর্ব্ব, দশদিক পাল।

করযোড়ে বন্দনা করিব সপ্ততাল॥

চন্দ্র বন্দম্, সূর্য্য বন্দম, আর বন্দম্ তারা।

শিবদুর্গা বন্দিব আর,---দেবতা যাঁরা যাঁরা॥

পীর পেগাম্বর বন্দি, যুড়ি দুই হাত।

ছিক্ষেত্রে বন্দনা করি,---ঠাকুর জগন্নাথ॥

মক্কা-মদিনা বন্দি, গয়া গঙ্গা-কাশী।

মাস-বচ্ছর বন্দি,---অমবস্যা-পুনমাসী॥

আউলিয়া দরবেশ বন্দম, যত মুচ্ছাফির।

সাধু মহন্ত বন্দি,---বৈষ্ণব ফকির॥

খোদার দোস্ত মহম্মদ, বন্দি তান পায়।

কিতাব কোরাণ বন্দি, লইয়া মাথায়॥

সাত সমুদ্র বন্দি,---পাহাড় পর্ব্বত।

বিষ্ণুর গরুড় বন্দি,---ইন্দ্রের ঐরাবৎ॥

রাম সীতা বন্দিলাম, অযোধ্যা নগরে।

মুল্লুকের পতি বন্দি, দিল্লীর সহরে॥

বরাহ্মণ পণ্ডিত বন্দি যত মমিনগণ;

বৈকণ্ঠে বন্দনা করি, লক্ষ্মী নারায়ণ॥

সভাতে বস্যছেন যত, হিন্দু মুছুলমান।

জনে জনে করি আমি, হাজার ছেলাম॥

মুর্খ আমি নাই চিনি, আখেরের পথ।

গান-বাজনা হাওয়া বাতী, খোদার কোদ্রৎ॥

বন্দনা শেষ হইবা মাত্র,---

"পুল.পুরী খবরদার,---

দেশে আইল লোড়া চকিদার।

বড় মানুষ যত আছে তারে দিবাম ছাইড়া,---

আবু-দুবুধ কইয়া যাইবাম,---

ছাপার মাঝে ছেইড়া।"

(এই গীত গাইতে গাইতে চুণে চিত্রিত লাটী কাঁধে কটোয়ালের প্রবেশ।)

কটোয়াল। (উচ্চৈঃস্বরে) বস্তিওয়ালা জাগো,---

বস্তিওয়ালা জাগো।

বস্তিওয়ালা। তুমি অত রাত্রের পর কে আইলা ?
কটোয়াল। দিল্লী হতে আইলাম আমি, দিল্লীর কটোয়াল।
যতেক বাসীন্দা লোক,—জাগাইতে সকাল ॥
বস্তিওয়ালা। কিজন্য জাগাইতে আইলা,—
এত রাত্র পরে। কিবা অমঙ্গল হৈল, বাস্‌সার মুলুকে ॥
কটোয়াল। আমি না কহিব, ছিপাই কইরা দিছে মানা।
নকীব আসিয়া সব করিব বন্ননা ॥
(কটোয়ালের প্রস্থান।)
(পাগড়ী বান্ধা, জামা গায়, জুতা পায়, লাঠি হাতে নকীবের প্রবেশ।)

গীত।

আমি আইলাম গো, বাস্‌সার হুকুমে।
জাগহে বাসীন্দা লোক,—কেন আছো ঘুমে ॥
ঢাক বাজে ডঙ্কা, বাজে আর বাজে ঢোল।
ছুষমনে লাগাইছে আইয়া বড় গণ্ডগোল ॥

নকীব। বস্তিওয়ালা কি জাগো ?
বস্তিওয়ালা। হাঁ,—জাগি। আপ্‌নে কে আইলাইন ?
নকীব। আমি বাস্‌সার নকীব।
বস্তিওয়ালা। কি নিমিত্ত আইচইন্ ?
নকীব। কহিবার কথা না ত, কইতে আছে মানা।
হুজুরে হইব কথা, চল সর্ব্বজনা ॥
রাত্রেতে কাচারি হৈব গোপনে গোপনে।
বাস্‌সায় গৰ্দ্দান লৈব,—যদি কেউ শুনে ॥

গীত।

লোকজন সাজ,—সাজরে আর্দ্দালী।
বাস্‌সায় কাচারী কর্ব্বাইন,—ঐ বাহের বাড়ী ॥
হাত্তী সাজে, ঘোড়া সাজে, সাজে সব লোক।
বাস্‌সার হুকুমে সাজে, বনের বাঘ ভালুক ॥

(বস্তিওয়ালা,—নছু—পঁচুর প্রবেশ।)

নছু। নছু বলে পঁচু ভাই, বড় করে ভয়।
রাইৎ কৈরা কাচারি হৈব, কোন্ কথার বিষয় !!
বার বচ্ছর থাকইন বাস্‌সা, আরামে অন্দরে।
বাইর বাড়ী কাচারী করইন, বার বচ্ছর পরে ॥
আষ্টবচ্ছর গেছে আর, চাইর বচ্ছর বাকী।
আজ কেন্ রাত্রে কাচারি হয়, তুমি কও কি ? ॥

পঁচু। কি কৈবাম ভাই তোমার কাছে—কৈতে করে ডর।
আইচে বুলে ভিন্‌দেশী কয়েক সদাগর।
সপ্নে দেখছইন, বেগম্, বড় হৈব অমঙ্গল।
দিনে দিনে বাড়িতেছে, সদাগরের দল ॥
নছু। ফেরেঙ্গী আইসাছে দেশ—আমরাও শুনছি ভাই।
বাস্‌সা থাকইন অন্দরেতে, তান খবর নাই ॥
ঠেংচিরা, পিরাণ গায়, করে যত মত।
মাথায় দেয় মাথুল একটা পাগলের মত ॥
সাদা সাদা শরীল তারার, রাঙ্গা রাঙ্গা মুখ;
দখল কৈরা লৈছে আইয়া, বাস্‌সার মুলুক !!
পঁচু। কি কাম আম্‌রার কইয়ারে ভাই, লও আগে যাই।
বাস্‌সার তলপ হৈছে, দেরী করণ নাই ॥
রাতা রাতি যাওন লাগব যেখানে দরবার।
না গেলে বাস্‌সার আগে, হৈব গুণাগার ॥

(নছু পঁচুর প্রস্থান।)
(স্বজন সঙ্গে বাদ্‌সাহের প্রবেশ)।

গীত।

আইলরে সোণাধর বাসসা মুল্লুকের মালীক রে।
মুল্লুকের মালীক রে,—বাংলার মালীক রে ॥
মাথার উপুর সোণার ছাতি,
উজীর-নাজির সঙ্গের সাথী,—
আগে পাছে কটুয়াল-নকীবরে ॥

বাদ্‌সাহ আসিলেন,—এখন তাঁহার বসিবার ব্যবস্থা। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি,—তখন, এখনকার মত অনেক বড় বড় বাড়ীতেও টুল, টেবিল, চেয়ার থাকিত না। তামাসার আসরে অভিনেতৃ রাজ-বাদ্‌সাহের শুভাগমন হইলে তখন তাড়াতাড়ি বংশশলাকা- নির্ম্মিত পাঠা-খাসী বা ছাগীর চাম্‌ড়ায় ছানি দেওয়া বড় গোছের একটি মোড়া বা মাচিয়া আনিয়া দেওয়া হইত। তদভাবে ঘাইল বা গামাইল (ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় "উদূখল।") আনিয়া উবুড় করিয়া দিলেও হইত।

বাদসাহকে আসন দেওয়া হইল,—বাদসাহ বসিলেন। তখন প্রজারা বলিতে লাগিল।

১ম প্রজা। বেগমে যে দেখলাইন স্বপ্ন,—মিথ্যা কথা নয়।
ফেরেঙ্গী আইসাছে দেশে,—বড় হৈছে ভয় ॥

২য় প্রশ্ন। (একটি টাকা দেখাইয়া)

নতুন নক্‌শা আইল বাংলা মুলুক

টেকার ভিতরে দেখি, মুনুষ্যের মুখ ॥

গণিয়া গণিতে কৈছে, মাছু মল্লের বাড়ী।

বাদ্‌সার মুল্লুকে হৈব, অমঙ্গল ভারি ॥

বাদসাহের হুকুম মত তখন গণককে আহ্বান করা হইল।—আহ্বান মাত্র,

পত্রের ছত্রস্কন্ধে, পঞ্জিকাসহ গণকের প্রবেশ।

গীত।

আইলরে ছিলট্যা ও ভাই পাঞ্জি পুঁথি লৈয়ারে।

পাঞ্জি-পুঁথি লৈয়ারে --দুয়াইৎ কলম লৈয়ারে ॥

(আইলরে ছিলট্যা ভডাই।)

গণক। বড় দেখি অমঙ্গল, আইচে ফেরেঙ্গীদল,

দখল কৰ্ত্তে তোমার মুল্লুক।

আপদে লইছে দেশ, দুঃখের হৈব এক শেষ,

তোমার বরাতে নাই সুখ ॥

বরাত হালিয়া গেছে, দুষমন লাগিছে পাছে,

গণায় কয় রক্ষা নাই আর।

যদ্যপি বাঁচিতে চাও,—আপনার ঘরে যাও,—

শীঘ্রি শীঘ্রি কর পিত্তিকার ॥

বাদসাহ। কি করিতে হৈব, সত্য বলত গণক।

তোমার কথাতে আমি হইয়াছি হাঙ্ক ।।

গণক। পুত্র-কন্যার সাদি দেও সকাল ঘরে যাও।

তোমার পুত্রে লৈয়া আইছে,—বার বচ্‌রের আউ ॥

বার বচ্‌রের পুত্র ঐছে ষোল বচরের কন্যা।

সকাল সকাল সাদি করাও বাড়ীর মাঝে আন্ডা ॥

তবেসে বাঁচিব তোমার পুত্র গুণধর।

গণিয়া বাছিয়া, কৈলাম, পাঞ্জীর খবর ॥

বাদসাহ। কন্যার কথা কি কহিলা গণক ঠাকুর।

যাহা কও, তাহা করি, দুঃখু হৌক দূর ।।

গণক। ষোল বচরের কন্যা আছে তোমার অন্দরে।

বার বচরের জামাই আন্ডা বিয়া দিবা তারে ॥

× × × × ×

তবে তোমার অমঙ্গল সব যাইব দূরে ।।

পুত্র কন্যা তোমার ঘরে হইয়াছে কাল।

সাদি দিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঘুচাও জঞ্জাল ।।

দেশ ছাড়ি পরদল পলাইব পরে।

চুপে চুপে কৈয়া গেলাম, না শুনাইও কারে ।।

(গণকের প্রস্থান।)

গণক ঠাকুর চলিয়া গেলে, সভা ভঙ্গ করিয়া বাদসাহও অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কবি ছলিমের এই সুদীর্ঘ পালা লিখিলে একখান বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। বাহুল্য ভয়ে অল্প লিখিয়া বিরত রহিলাম।

বাদসাহের কন্যা-পুত্রের বিবাহ—মোল্লার আগমণ, ফৌজ সংগ্রহ,—ইংরেজ আগমন, যুদ্ধ, তৎপর সন্ধি সংস্থাপন ইত্যাদি বহু বিষয় এই পালায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই সমস্ত বিষয়ের গীত কবিতা গুলিও এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইতেছেনা।

একজন নিরক্ষর কৃষক কর্তৃক এইরূপ একটী কল্পিত পালা-কীর্ত্তন সৃষ্ট হওয়া বাস্তবিক বিস্ময় জনক বিষয় বটে! কৃষক কবির কল্পনার বাহাদুরী কম নহে। তবে জানিনা যে ছলিমের এই কল্পিত কুসুমস্তবকে একটুকু ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের ক্ষীণ গন্ধ কেমন করিয়া মিশিয়া গেল!

ছলিম কবির তামাসাটি অসম্পূর্ণাবস্থায় শেষ করিয়া নিম্নে তাঁহার কয়েকটি ঘাটুগান ও হোলী গান লিখিতেছি।

কবি ছলিম অল্প দিন মধ্যেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রসময়ী লীলা কাহিনী ও রামায়ণ মহাভারতের অমৃত মধুর কথাবলি, লোকের মুখে শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। এবং তৎ সাহায্যে ঘাটুগান, বাউলগান, ও বৈঠকী খেয়াল গান রচনা করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত প্রিয় হিন্দু-মোসলমান সকলেই অতি আদরের সহিত সেই সকল গীতাবলী গাইতেআরম্ভ করিলেন। এইরূপে ছলিম কবি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

কবিত্ব শক্তি যে কি প্রকারে কাহার ভিতরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার মৌলিক তত্ত্ব আমরা অবগত নহি। এই বিশ্ব মোহিনী শক্তি যত্ন বা চেষ্টা লব্ধ সাধনার ফল নহে। ইহা জাতি কুল কি পণ্ডিত মূর্খের বিচার না করিয়া কোন কোন সকল জন্মা মানুষের অন্তঃকরণে আপনাপনি ফুটিয়া উঠে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমাদের কৃষক কবি ছলিম সেখকে ধরিয়া দিতে পারি।

নাটক রচনার পর ছলিমের ভাষা ও ভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। নাটক রচনা ছলিম কবির কৈশোর কীর্ত্তি। ঘাটু ও হোলী গান তাঁহার যৌবনের সম্পত্তি।

ঘাটু গান।

গৌরচন্দ্র।

১। নদীয়া নগরে নাচে, নবরঙ্গের গৌরকিশোরা।
(গৌরকিশোরা নাচে,—মুনির মন চোরা
নাচে,—গৌরকিশোরা ॥)
হরি হৈয়া বল্‌ছে হরি,—কান্দে বইলে রাইকিশোরী,
প্রেমে বিভোরা ॥—
(প্রেমে বিভোরা রে গোরা,—প্রেমে বিভোরা—রে
গৌরা,—প্রেমে বিভোরা ॥)
(নদীয়া নগরে নাচে প্রেমে বিভোরা)।

বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীমতীর উক্তি।

২। বংশী বাজিল আরে সখি,
ঐ শুনা যায়,—গহিন বনে।
(গহিন বনমে সখি, গহিন বনমে—সখি,
যমুনা পুলিনে ॥)
পিউর বংশারী গানে, জীউ না ধৈরজ মানে,
বনে নাকি,—বাজে মেরা মনে ;—
(বাজে মেরা মনে নাকি,—বাজে মেরা মনে ॥)

বাঁশীরপ্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

৩। কাঁহে বাজরে বংশারী,—রাধা, রাধা রাধা নাম ধরি।
রাধা নাম ধরিরে বংশী,—রাধা নাম ধরিরে বংশী,
রাধা নাম ধরি ॥
কুলের বৌয়ারী হাম, কাঁহে কহ মেরা নাম,
শুনি মেরা চিত্ত বাউরী ॥
(চিত্ত বাউরীরে বংশী, ননদী বৈরীরে বংশী
চিত্ত বাউরী ॥

বিরহ।

৪। কোন্ বা দেশে রৈলরে পিউ,
জীউ দয়ে বিরহ অনলে।
(বিরহ অনলে সইরে, বিরহ অনলে সইয়ে,—
বিরহ আনলে ॥)
কৈমন কামিনী তাঁরে, ভুলায়েছে যাদু কইরে,
কাল ভমরা ভুইলাছে কোন্ ফুলে!
(ভুইলাছে কোন্ ফুলে সইরে,—
ভুইলাছে কোন্ ফুলে,—সইরে, ভুইলাছে
কোন ফুলে।)

প্রায় সমস্ত ঘাটু গানই তিন চারিটি পদই উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া অনেকক্ষণ গাইতে শুনা যায়। ঘাটু গানের স্থর এত মধুর যে অনেকক্ষণ শুনিলেও তৃষ্ণা মিটে না ;—ক্রমশঃ প্রাণ উদাস করিয়া তুলে।

ঘাটুগানে ব্যবহৃত অনেক শব্দ খাটি বেখাটি হিন্দী, উর্দ্দু ও ব্রজ বুলি। যথা—তেরা, মেরা, পিউ, জীউ, ছাতিয়া, রাতিয়া, ডারি, হামারি ইত্যাদি।

ঘাটুগান রচক কবিগণ, পূর্ব্বময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের পল্লবাসী। তাঁহারা শুধু মাতৃভাষায় ঘাটুগান রচনা না করিয়া অন্য ভাষার শব্দ ভেজাল দিয়াছেন কেন ? ইহা একটুকু ভাবনার বিষয়। আবার দেখা যাইতেছে,—অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঘাটুগান-রচনার পদ্ধতি এই প্রকার যথা,—

"পিউ দুর পরবাসে, ধিক্ ধিক্ পরাণ হামারি।
ধিক্ ধিক্ পরাণ হামারিরে সখি, পরাণ হামারি ॥
পিউ বিনে ছাতিয়া,—দহে দিবা রাতিয়া,
সুরত শিঙ্গার মেরা, দেহ যমুনামে ডারি ॥"

ঘাটুগানে এইরূপ শব্দ ব্যবহারের প্রথা, কোন্ সময় হইতে কি কারণে চলিয়া আসিতেছে,—তাহা আমরা অবগত নহি। তবে অনুমান দ্বারা একটা ধরা যাইতে পারে।

ঘাটু গানগুলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের মধুময় লীলা রসাত্মক গীতি কবিতা। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতেও এইরূপ হিন্দী, মৈথিল ও ব্রজ ভাষার সমধিক সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পথাবলম্বন পূর্ব্বক, পল্লী কবিগণ ঘাটুগান রচনা করিয়াছেন.—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

বহুকাল হইতে এইরূপ বিজাতীয় শব্দ যোজনার ফলে, ঘাটুগানের চেহারা পল্লীর অন্যান্য গীতাদি হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। বিজাতীয় শব্দগুলির স্থলে পল্লীভাষা বসাইয়া দিলে, গানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা,

ঘাটু গানের কবিদিগের সংস্কার সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ছলিমের হোলী গান।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলিতেছেন।

১। ওলো রঙ্গিনি! আজু রঙে খেলিব হোরী।
রঙের ভাস্ক রাধে তুমি, ভানু রাজার কুমারী॥
আতর গোলাপ ভরি, মার্ব্ব রঙের পিচকারী,
(মরি হায়! হায় মরি, হায় রে!!)
ভিজাইব, রঙ্গে রঙ্গে, তোমারি লাল চুনারী॥

২। ওলো পিয়ারি! খেলব হোরী লালে লালে।
নাচাইব তোমারে আইজ,—বংশারীর তালে তালে॥
আবির কুমকুম্‌দল, আমি কিষ্ণ নন্দলাল,—
(মরি হায়! হায় মরি হায় রে!)
আমার সঙ্গে, রতি রঙ্গে, সাজলো রাই সকালে॥

শ্রীমতীর পক্ষে সখির উক্তি।

৩। ছিছি!! লাজে মরি,—কি কথা শুনাইলে মুরারি।
জাননা নিলাজ কানাইয়া, আম্‌রা যে পরের নারী!
নাম্‌টি তোমার নন্দলাল,—বনে রাখ ধেনুর পাল,
(মরি হায়! হায় মরি হায় রে!!)
রাখুয়ালের মুখে কিহে, শোভে কলা সবরি॥

৪। যদি খেলিবে হোরী,—আগে কিষ্ণ কও সত্য করি।
হারিলে কি দিবে? নিবে জিতিলে রাজকুমারী॥
হারিলে রাধার সনে, ঠিক কৈরাচি মনে মনে,—
(মরি হায়! হায় মরি হায় রে!)
ভাঙব তোমার নাগরালী, কাইড়া লব বংশারী॥

সিংহের বাঙ্গলার চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ মধ্যে ২।৪ জন হোলী গানের কবি ছিলেন। তাঁহারা স্বগ্রামে এবং সময় সময় গ্রামান্তরে গিয়া হোলী গানের "লড়ক" গাইতেন। বিপক্ষ পক্ষকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রায়শঃই তাঁহাদিগকে ছলিমের সাহায্য লইতে হইত। ছলিম পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অল্প পরিমাণে জানিলেও রস প্রবর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ বাহাদুরী ছিল। ছলিমকে দেখিলে, প্রতিপক্ষ কিছু নরম হইয়া পড়িত। লোকে বলিত,— "চিন্তা নাই,—ছলিম আসিয়াছে,—আজ রঙের তুফান ছুটবে।"

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

হিন্দু সংগঠন।

আমি হিন্দু সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য ময়মনসিংহে আহুত হয়েছি। প্রথমতঃ হিন্দু শব্দটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে ভাটপাড়া গিয়েছিলাম। সেখানে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনলাম,—হিন্দু শব্দটি আমাদের প্রাচীন কোষেতে নাই, বেদ উপনিষদ পুরাণে পর্য্যন্ত হিন্দু শব্দের উল্লেখ নাই। পরিশেষে তিনি অনেক রকম আলোচনা করে এই মীমাংসা করেন, যারা বৈদিক ধর্ম্ম বা বৈদিক ধর্ম্ম হতে যে যে উপধর্ম্ম হয়েছে তার যে কোন একটা অনুসরণ করেন, তাদেরকে হিন্দু বলা যায়। হিন্দু মহাসভাও হিন্দু শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারা বলেন,—যে কেহ কোন ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ভুক্ত, তিনিই হিন্দু বলে পরিগণিত হবেন; যেমন সনাতনী, আর্য্য সমাজী, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি। এই সংজ্ঞার উপর হিন্দু মহাসভা গড়ে উঠেছে। এই সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমাদের মনে হয়, যে বর্জ্জননীতির ফলে হিন্দু সমাজ এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, সেই বর্জ্জননীতি অনুসরণ কল্লে এখন আর চলবেনা। তারা যদি পূর্ব্বের মত কোন বর্জ্জননীতি অনুসরণ করে চলে, তাতে হিন্দু সমাজ রক্ষা পাবে কিনা, ২০০ কিম্বা ৫০০ বৎসর পর হিন্দু নাম ভারতবর্ষে থাকবে কিনা, হিন্দু সভ্যতা হিন্দু সাধনা হাতে কলমে যারা গড়ে তুলেছে, আচারে চরিত্রে যারা কুড়িয়ে তুলেছে,—তারা থাকবে কিনা, তাও সন্দেহ। প্রত্যেকবার লোক সংখ্যা গণণার পর—দেখা যায়, হিন্দুর সংখ্যা কমেছে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এইটা লিখে নূতন যারা করেছেন, তাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা বলছেন, ওপথে চল্লে চল্‌বেনা। বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে গ্রহণ নীতি অবলম্বন করতে হবে, যার সঙ্গে মিলিতে পারা যায়, যার সাথে বেশী ঐক্য আছে, তাদেরকে হিন্দু বলে নিতে হবে। এইটা দেখে তারা হিন্দু কথায় সংজ্ঞা দিয়েছেন। তারা বলেছেন— ভারতবর্ষে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়েছে, সে ধর্ম্মের লোক মাত্রই হিন্দু—এই বলে হিন্দু মহাসভার অনুষ্ঠান করেছেন, ইহার ভেতর দিয়ে হিন্দুসমাজ পুনর্গঠিত হয়ে উঠ্‌বে।

হিন্দু মহাসভায় হিন্দু সংগঠনের চেষ্টার কথা ভাবিলে আর একটা কথা আমাদের মনে পড়ে।

সেটা হচ্ছে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ভাল করে বুঝিতে হবে। দেহ অঙ্গী স্বরূপ, হস্ত পদাদি এসব দেহের আছে, হস্ত পদাদির সঙ্গে দেহের যে সম্বন্ধ হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত সমগ্র হিন্দু সমাজের সেই সম্বন্ধ। উপনিষদে আমরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঝগড়া ও দেহ হইতে প্রাণের পলায়ন উপক্রম ইত্যাদি পড়ে থাকি। বিরাট সমাজ দেহের একটা অঙ্গ, লক্ষ লক্ষ নমঃশূদ্রও তেমনি সমাজ দেহের বিশাল অঙ্গ। এদের বর্জ্জন করলে সমাজের শক্তি বাড়বেনা। এদের সমাজে তু'লে নেওয়া উচিত। যদি তাতে সমাজে বিপ্লব বাঁধে, তাও ভাল। বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সমাজ গড়ে উঠবে। অন্যান্য যাদেরে আপনারা বর্জ্জন করেছেন, তাদেরে সমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তা হলে, হিন্দু সমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

তাঁরা আরও বলেন হিন্দু সমাজে বিভিন্ন শাখা আছে,
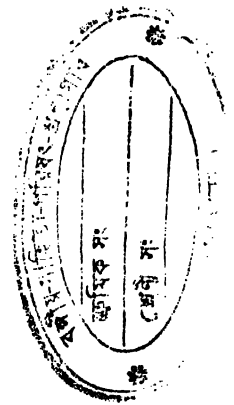
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।

সেখানেও ঋষি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের কথা বুঝাবার চেষ্টা কচ্ছেন। "চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" এর মানে—'আমি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি—এ নয়; এর আসল মানে হচ্চে "আমি চতুর্ব্বর্ণ বিশিষ্ট সমাজ সৃষ্টি করিয়াছি।" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ, বিশিষ্ট বিরাট সমাজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র। এইজন্যই ব্রহ্মার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি কল্পনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে—যথা দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শঙ্কর পন্থী, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি। হিন্দু মহাসভা বলেন—তাঁরা বৈষ্ণবকে শাক্ত করতে চান না, সকলে আপনার আপনার সিদ্ধান্ত অবলম্বন ক'রে আপনার আপনার স্বাধীন পথে চল্‌বে। নিজ নিজ সামাজিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে চল্‌বে, কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভিতর একটা মিলন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সকলে মিলে এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করবে,

সকলের এটা অনুভব করা উচিত। সকলে এক বৃহৎ অঙ্গীর অঙ্গ, বৃহত্তর হিন্দু সমাজের শাখা, সকলে সকল অঙ্গ অঙ্গীর সহিত সম্মিলিত হয়ে আপনার স্বাধীনতার যে লক্ষ্য সেই লক্ষের সাহায্য করবে। স্বাধীন থেকে, স্বতন্ত্র থেকে, পরস্পরের স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে, সকলে সম্মিলিত হয়ে, সাধারণ হিন্দু সমাজের যে লক্ষ্য সে লক্ষ্য অনুসরণ করে সে চেষ্টা করবে,—এটা হিন্দু সংগঠনের মূল কথা।

ইহার ভিতর আর একটা কথা আমরা দেখতে পাই। এই যে ভিন্ন ভিন্ন মত, যার উপর প্রাচীন ও আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে, সকলের ভিতর একই জিনিষ আছে। ঋগ্বেদে ঋষি বলেছেন, "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" জ্ঞানীরা এক জিনিসকেই বিভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই বহুত্বের ভিতর একত্বের সন্ধান হিন্দু সাধনার বাহ্যতঃ একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দু সাধনা বাহ্যতঃ বহু স্থলেও মূলে এক। এই জন্যই হিন্দু এত উদার। হিন্দু—যে লোকায়তেরা (চার্ব্বাকেরা) বেদমানেনা, ঈশ্বর মানেনা, স্বর্গ অপবর্গ মানেনা তাদিগকেও পর্য্যন্ত অহিন্দু বলে নাই। তারাও হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা মুক্তি প্রতিপাদক, তাই হিন্দুর নিকট শাস্ত্র। শিখেরা গ্রন্থ সাহেবকে বেদের মত প্রামাণ্য মনে করে; বৈষ্ণবেরা চৈতন্য চরিতামৃতকে তাঁদের বেদের প্রামাণ্য দেন। এই নিয়ে কেহ ঝগড়া করে না। এই ভাবে দেখতে পাই, ভারতে হিন্দু সাধনা উদার পথ অবলম্বন করে আসছে। নানা সম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়াও একটা উদার সার্ব্বভৌমিকতা হিন্দু সাধনায় দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই সার্ব্বভৌমিকতা হিন্দু সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দু সাধনার এই উদারতার উপরই হিন্দু সংগঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

অন্তের সঙ্গে রেষারেষি বা মারামারি করবার উদ্দেশ্যে—হিন্দু সংগঠনের আয়োজন হয় নাই। আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আততায়ীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করবার জন্যই হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়া দরকার। হিন্দু সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করতে হলে—স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

কেহ কেহ আমাকে হিন্দু মুসলমানের একতা সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করেছেন। federation of religions এর ভিতর দিয়েই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য স্থাপিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। মৌলানা মহম্মদ আলীও তাঁহার অভিভাষণে একথা বলেছেন। *

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

হোমারীয় যুগে গ্রাক পারিবারিক ও সামাজিক জীবন।

হিন্দুদিগের ন্যায় প্রাচীন গ্রীকদের পারিবারিক জীবন এত শান্তিময় না হইলেও তাহাদের পারিবারিক বন্ধন নেহাত শিথিল ছিল না। গ্রীক পরিবারে পিতা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। পুত্র কন্যা সকলই পিতার আদেশ ও উপদেশ মানিয়া চলিতেন। পুত্র উপার্জ্জন কম হইলে বৃদ্ধ পিতার ভরণ পোষণ করিতেন। (১) গ্রীক সমাজে পরশু রামের ন্যায় পিতৃভক্ত পুত্রের অভাব ছিল না। টেলিমেকাস তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। পতিব্রতা পত্নী ও প্রীতিশীল পতি প্রাচীন গ্রীক পরিবারে বিরল ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আদর্শ সতী পেনিলোপির—সহিষ্ণুতা, সংযম, আত্মত্যাগ ও পতিভক্তির কথা ভাবিলে চিরদুঃখিনী জনক নন্দিনীর কথা মনে পড়ে নাকি? সীতার রাম ও হেলেনার মেনিলাস উভয়ই প্রেম প্রবণতার পবিত্র আদর্শ; উভয়ই পত্নী বিরহে কাতর; উভয়ই সমরাঙ্গণে পত্নীর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত।

কিন্তু হোমারীয় যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক সমাজ ততটা উন্নত ছিল না। তখন পেণিলপির পাতিব্রত ও মেনিলাসের পত্নী প্রেমের আদর্শ গ্রীক পরিবারে ছিল না বলিলেই চলে। থুসিডাইডিস বলেন—ট্রয় যুদ্ধের পূর্ব্বে গ্রীকেরা অসভ্য বর্ব্বর ছিল; তাহারা কোন প্রকারে পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিত; তাহারা নিতান্ত দরিদ্র ও হীনভাবে জীবন

---

* স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে বিপিন বাবু যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার সার অংশ—শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথক র্তৃক গৃহীত।

(১) *Grote's History of Greece—Vol II. P. 200.*

যাপন করিত এবং তাহারা বেশী দিন এক জায়গায় বাস করিত না। তাহারা পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে জানিত না। পশু চর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ ও ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। (১) এইরূপ বর্ব্বর সমাজে পতি বা পত্নী প্রেমের উচ্চ ও মহান্ আদর্শ ফুটিয়া উঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আতিথেয়তা হোমারীয় যুগে গ্রীক পরিবারের আর একটা বিশেষত্ব ছিল। অতিথি সৎকারে গ্রীকেরা তখন কাহারও চেয়ে ন্যূন ছিলেন না। তাহাদের আতিথেয়তা "অতিথিঃ সর্ব্বেষাং গুরুঃ" এই উচ্চশিক্ষার আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা বটে, কিন্তু তাহারা আগন্তুককে সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে কখনই ক্রটী করিতেন না। অতিথি গৃহে আসিলে তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার পরিচর্য্যায় রত হইতেন। এমন কি যদি অতিথি ইচ্ছা করিতেন যে গৃহস্বামীর স্ত্রী তাহার পরিচর্য্যা করিবেন, তবে তিনি অম্লান বদনে স্ত্রীকে অতিথি সৎকারে অনুমতি দিতেন। আমরা হোমারের ইলয়ড কাব্যে দেখিতে পাই যে পেরিস মেনিলাসের গৃহে অতিথি-রূপে উপস্থিত হইলে মেনিলাস পত্নী হেলেনার উপর অতিথি সৎকারের ভার অর্পণ করিয়া ক্রিটে চলিয়া গেলেন। এই শুভ সুযোগেই সৌন্দর্য্যের উপাসক পেরিস তখনকার রমণীকুলের সেরা হেলেনাকে হরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিলেন। রাবণ কেবল সীতাকেই অপহরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পেরিস মেনিলাসের ধন সম্পত্তি অপহরণ ও লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই জন্য হোমার পেরিসের ঘাড়ে দস্যুতার অপবাদ চাপাইতে ক্রটী করেন নাই। (২) পেরিসের ন্যায় কৃতঘ্ন অতিথি তখন বোধ হয় গ্রীক সমাজে খুব বিরল ছিল।

কেহ কেহ বহুমূল্য উপহার প্রদানে অতিথিকে অভিনন্দিত করিতেন। গ্রীক পরিবারে প্রীতিভোজন ও অভিনন্দন প্রভৃতি দ্বারা কোন নবাগত আগন্তুকের সহিত একবার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইলে তাহা পুরুষানুক্রমে চলিত। (৩) রাজা মহারাজ প্রভৃতি বড়লোকের অতিথি সৎকারে যাহা ব্যয় হইত, তাহা প্রজাদের নিকট হইতে তাহারা আদায় করিতেন। (৪) বড় লোকের বাড়ী কোন অতিথি আশ্রয় ভিক্ষা করিলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার জলযোগের বন্দোবস্ত করা হইত, তৎপর নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সম্বন্ধে সকল সংবাদ অবগত হওয়ার রীতি ছিল। (১) অতিথিকে স্বেচ্ছায় কেহ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন না। কিন্তু অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে বিনা সৎকারে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার প্রথা ছিল না। (২) লাইকারগাস কিন্তু চানক্যনীতি অনুসরণ করিয়া অজ্ঞাত কুলশীল কোন ব্যক্তিকে স্পার্টায় সহজে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন নাই। (৩) বৈদিক হিন্দু ও প্রাচীন ইহুদী সমাজে অতিথি গৃহে আসিলে গোবৎস হত্যা করার রীতি ছিল। (৪) এই জন্য হিন্দু সাহিত্যে অতিথির সংজ্ঞা গোঘ্ন।

আমরা উত্তর রাম চরিতে দেখিতে পাই বাল্মীকি বশিষ্ঠকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু গোবৎস হত্যা করিয়াছিলেন। মহাবীর চরিতেও দেখা যায় যে বশিষ্ঠ, জনক, জামদগ্ন্য প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছেন, "এই বৎসতরী আপনাদের জন্য হত্যা করা হইতেছে" ইত্যাদি (৫) কিন্তু প্রাচীন গ্রীক সমাজে অতিথি সৎকারের জন্য গো হত্যার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তখন গ্রীসে অতিথি সৎকারের সুব্যবস্থা থাকিলেও ভারতের ন্যায় মুষ্টিভিক্ষা, পয়সাভিক্ষা, উদরভিক্ষা ও বাস-ভিক্ষার প্রথা ছিল না। (৬)

আমরা গ্রীক সমাজের আতিথেয়তার প্রশংসা করিয়াছি বটে কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত অতিথি পরায়ণ ব্রাহ্মণ পরিবারের ত্যাগের আদর্শ কোথাও আমরা হোমারীয় গ্রীক পরিবারে দেখিতে পাই নাই। কোন পলাতক উৎকট অপরাধী দেবতার সমক্ষে যথারীতি আশ্রয় প্রার্থনা

(১) *Thucy—III, 94. Iliod. X. 151.*

(২) *Iliad III. 144; VII 350—363.*

(৩) *Grote's History of Greece—Vol II P. 202.*

(৪) *Odyss XIII, 14; XIV, 197.*

(১) *Odyss—I, 123, III, 70*

(২) *Ibid—XVI 383.*

(৩) *Plutarch's life of Lycurgus.*

(৪) *Indo-Aryan Vol 1 chap vi. P. 354.*

(৫) *Ibid Vol 1 chap Vi P. 358.*

(৬) গ্রীক ও হিন্দু

করিলে প্রাচীন গ্রীসে সকলই তাহাকে আশ্রয় দান ও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিত। এই নীতি অবলম্বন করিয়াই রাজদ্রোহী পলাতক আসামী থেমিষ্টক্লিস মোমোলিয়ান্‌ রাজ এমিটাসের নিকট আশ্রয় পাইয়াছিলেন। (৭) কিন্তু বিজিত শত্রু গ্রীক বিজেতার নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেও তাহার প্রতি আশ্রয় প্রার্থী পলাতক আসামীর ন্যায় সদয় ব্যবহার করা হইত না। বিজেতা হয় তাহাকে বধ করিত, না হয়, টাকা লইয়া তাহাকে জীবন দান করিত। এড্রেষ্টাস যখন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মেনিলাসের নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিলেন তখন মেনিলাস ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু আগামেমনন্‌ কিছুতেই রাজী হইলেন না; বরং তিনি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। (১)

মিশরের ন্যায় প্রাচীন গ্রীসে নরমেধ-যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। (২) এসিলিস বারজন ট্রোজান বন্দীকে পোট্রাক্লাসের নিকট উৎসর্গ করিয়া নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গ্রীক সমাজে নরহন্তাগণ যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সমাজচ্যুত হইতেন এবং দেবদেবীর উপাসনায় তাহাদের অধিকার থাকিত না। (৩) এসিলিস আরসিসাইটিস্‌কে হত্যা করিয়াছিল। সেই জন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। ইলিয়ড ও ওডেসীতে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ভারতের ন্যায় প্রাচীন গ্রীসেও শবাদাহ করিবার প্রথা ছিল। যাহারা দেশের ও দশের উপকার করিতেন, কেবল তাহাদের মৃতদেহই শ্মশানে ভস্মীভূত করা হইত। গ্রীকদিগের বিশ্বাস ছিল, স্বদল ও স্বজাতির কল্যাণকামী ব্যক্তিদিগের পার্থিব দেহ ভস্মীভূত করা প্রয়োজন। কারণ পার্থিব মরদেহ স্বর্গে যাইতে পারে না। কেবল তাহাদের অমর আত্মাই অমরধামে গমন করিয়া ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা হিরাক্লিস্‌, ডায়ওনিসিয়াস প্রভৃতি বড় লোকদিগের মৃতদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। (৪) আমরা হোমারের ইলিয়ড কাব্যেও দেখিতে পাই, পোট্রাক্লিসের মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল। (৫) ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে হোমারীয় যুগে গ্রীক সমাজে শব দাহ করার পদ্ধতি ছিল। প্রাচীন ইটালী এবং দক্ষিণ ইউরোপে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এমন কি বর্ত্তমান সময়েও শ্লেভোলিয়ান আর্য্যগণ শবদেহ দাহ করিতেছেন। (৬) এই বিংশ শতাব্দীতেও সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক স্পেনসারের মৃতদেহ সমাহিত না করিয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছে।

আবার ঋগ্বেদে দেখা যায়, বৈদিক যুগের আর্য্যগণ মৃতদেহ সমাহিত করিতেন। (১) হোমারীয় যুগের গ্রীকগণ আর্য্যদের নিকট হইতেই মৃতদেহ সংস্কারের উভয় পন্থা—"অগ্নিদাহ" ও "অনগ্নিদাহ" শিক্ষা করিয়াছিলেন কি? বৈদিকযুগ হোমারীয় যুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। কাজেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

এখন আমরা মদনোৎসবের কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বসন্তকালে তরুলতা মঞ্জুরিত, হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিশ্বব্যাপী একটা মদনোৎসবের সাড়া পাওয়া যায়। তাই বুঝি প্রাচীন গ্রীস রমণীগণের মদনোৎসব, আর ভারত নারীগণের কন্দর্প পূজা ও উদ্যান বাটিকার আমোদ উৎসব সম্পন্ন হইত। দশকুমার চরিত ও রত্নাবলী নাটিকার মদনোৎসব ঠিক যেন গ্রীক ডায়নিসাসের উৎসবের অনুরূপ। প্লুটার্ক বলেন—গ্রীস, এশিয়া ও মিশর হইতেই এই মদনোৎসবের রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন গ্রীস এজন্য শুধু মিশরের নিকট ঋণী। (২) কে কাহার নিকট কতটুকু ঋণী, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে সভ্যতা ও ভাবের আদান প্রদানের ফলে গ্রীস ও ভারত উভয়ই উভয়ের নিকট স্বল্পবিস্তর ঋণী।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

(৭) *Grote's History of Greece Vol ii. P. 198.*
(১) *Grote's History of Greece Vol ii P 203 foot note*
(২) *An Universal History Book 1 P 483*
(৩) *Iliod II, 665; Odyss XV 224*
(৪) *Hellenism in Ancient India P 198*
(৫) *Iliod 110*
(৬) *Hellenism in Ancient P 198 200*
(১) ঋগ্বেদ সংহিতা মঃ ১০।১৫।১৪; মঃ ১০।১৮।১০
(২) *Grote's History of Greece Vol 1 P 28*

রামায়ণে বাল্মীকির রচনার পরিমাণ কত ?

প্রক্ষিপ্ত বিচার। (২)

আমরা প্রথমতঃ ঋষি যুগের সমর্থন যোগ্য ও লৌকিক যুগের সমর্থন যোগ্য বিষয়গুলি পৃথক পৃথক করিয়া প্রদর্শন করিব।

যাঁহারা রামায়ণকে ঋষি যুগের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষের সংক্ষিপ্তযুক্তি এইরূপ—যে কালে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, সে কালে ভারতে লিপি বিজ্ঞান প্রচলিত হয় নাই; বুদ্ধদেব বাল্যকালে লিপি শালায় যাইতেন, বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি রামের সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। রামায়ণের একটী ছত্রেও লিপি বিজ্ঞানের পরিচয় নাই। রামায়ণে লৌকিক দেবতাগণের নাম নাই। বেদের দেবতার ন্যায় রামায়ণের সমাজেও ৩৩ দেবতা। রামায়ণে বেদ ব্যতীত বেদের পরবর্ত্তী ঋষি যুগের আর কোন গ্রন্থের নাম নাই। রামায়ণে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শক কোন বাক্য নাই। লৌকিক দেবতাগণের কোন কথা রামায়ণে নাই। রামায়ণে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের যেরূপ নিদর্শন আছে, চিত্র—বিশেতঃ মনুষ্য চিত্র অঙ্কনের তেমন কোন কথাই নাই। রামায়ণে জ্যোতিষের বিশিষ্ট আলোচনার পরিচয় নাই। বার গণনার প্রথা তখন ছিল না। রামায়ণের কোন স্থানেই লিঙ্গ পূজার বা মূর্ত্তি পূজার কোন আভাস নাই। সে সময় গৃহমেধিন মাত্রেই বেদ পাঠ করিতে পারিত। তখনও ভারতবর্ষে ধাতুর রাসায়নিক ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। সিন্দুর প্রস্তুত হয় নাই। কাচ ও পাদক দ্বারা দর্পন প্রস্তুত হয় নাই। রামায়ণী যুগের ভাষার আলোচনায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যতীত বৌদ্ধযুগের পালি প্রভৃতি ভাষার কোন উল্লেখ নাই। লৌকিক যুগের অঙ্কিত মুদ্রার কোন আভাসও রামায়ণে নাই। রামায়ণের কথা মহাভারতে আছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইগুলি বিচার করিবার সময় পাঠক মহাকবি বাল্মীকির অশেষ কবিত্ব শক্তির কথা স্মরণ করিবেন এবং এই বিষয় গুলির প্রত্যেকটী বিষয়েরই যে তাঁহার আলোচনার সুযোগ ছিল এবং সেই সুযোগ তিনি দেশ, কাল, পাত্রভেদে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাও চিন্তা করিবেন।

এইবার আমারা রামায়ণকে লৌকিক যুগের রচনা বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষের যুক্তিগুলি ঐরূপে, সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি:—রামায়ণের ভাষা মার্জ্জিত, সে ভাষা আধুনিক ভাষা। রামায়ণ যে সকল ছন্দে রচিত সে সকল ছন্দ আধুনিক; অনুষ্টুপ পুরাতন হইলেও রামায়ণের অনুষ্টুপ আধুনিক ছন্দে বাঁধা। রামায়ণের অবতারবাদ লৌকিক যুগের চিন্তা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কথা রামায়ণে ভূরি ভূরি আছে। কৌশল্যা ও রাম বিষ্ণু ও নারায়ণের পূজা করিয়াছিলেন। রামায়ণে ব্রাহ্মণ, অর্থর্ব্ব, কঠশাখা ও তৈত্তিরীয়, কল্পসূত্র ও মনু স্মৃতির কথা আছে। রামায়ণে বুদ্ধের কথা আছে—'তথাগতের নামটীপর্য্যও আছে। রামায়ণে রাশি চক্রের কথা আছে। নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের কথা আছে। রামায়ণে বহু পৌরাণিক গল্প আছে। পানিনির অষ্টাধ্যায়িতে মহাভারতের কোন কোন নামের উল্লেখ আছে, রামায়ণের কোন নামের উল্লেখ নাই। রামায়ণ প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের হইলে বৌদ্ধ-দশরথ জাতকে রাম চরিত কথার এরূপ অদ্ভুত বর্ণনা বাহির হইত না। রামায়ণে মহাভারতের জনমেজয়, কৃষ্ণ প্রভৃতির নাম আছে। লঙ্কাকাণ্ডে লক্ষ্মীমূর্ত্তির বর্ণনা আছে। জ্যোতির্ব্বিদের গণনা ও সামুদ্রিক গণনার কথা আছে। রামের মদ ও মাংস আহারের কথা আছে। চৈত্য, ভিক্ষুণী শ্রমণী প্রভৃতির কথা আছে। ইত্যাদি। ইঁহারা বলেন, রামায়ণের গল্পটী ব্যাসের কল্পনায় মহাভারতে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইলে ঐ মহাভারতের গল্পটী লইয়া লৌকিক যুগে রামায়ণ-লিখিত হইয়াছিল। ইঁহারাও রামায়ণে প্রক্ষিপ্ততা স্বীকার করেন। এ স্থলেও পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে উপর্য্যুক্ত নির্দ্দেশ গুলি একেবারে ভিত্তিহীন নহে।

এ স্থলেও আমারা কোন ব্যক্তি বিশেষের মত উদ্ধৃত করিলাম না। প্রচলিত বাদ প্রতিবাদ গুলিরই সমান সংখ্যায় কয়েকটি মাত্র উপস্থিত করিলাম। এই সকল বিরুদ্ধ ভাবের আলোচনা আমরা এই গ্রন্থের যথাযথ স্থানে করিয়াছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছি। আমরা প্রথমোক্ত মত সমর্থ করিয়াছি ও

শেষোক্ত মতের নির্দ্দেশ গুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার কতগুলিকে প্রক্ষিপ্ত, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এইস্থানে এখন প্রক্ষিপ্ত বাদের মোটামুটি কারণ গুলির আলোচনা করিব।

রামায়ণের বর্ত্তমান সংস্কারণ গুলিতে সাধারণতঃ তিনটি রচনার স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। (১) আদি কবির রচিত আদিম স্তর, (২) সংগ্রাহকের রচনা ও (৩) পরবর্ত্তী বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন সময়ের জাল (Forged) রচনা। রামায়ণের আদি রচনার ভিতর কি পরিমাণ প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী জাল রচনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, মোটামুটি ভাবে তাহা আলোচনা করিবার এক সহজ পন্থা আছে।

মহর্ষি প্রণীত রামায়ণের শ্লোক সংখ্যা ও স্বর্গ সংখ্যা আমরা রামায়ণের সংগ্রাহকের উক্তিতে বালকাণ্ডের ৪ সর্গে দেখিতে পাই। ঐ সংখ্যা ঐতিহাসিক প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়ার উপযুক্ত না হইলেও তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাদ্বারা আপাততঃ ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারি, যে রামায়ণের সংগ্রহ কারক যখন রামায়ণের শ্লোকাবলী সংগ্রহ করিয়া, গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার নিজের রচনা সহ রামায়ণে ২৪ সহস্র শ্লোক, পাঁচশত সর্গ ও ছয়টী কাণ্ড বর্ত্তমান ছিল। এখন প্রচলিত সংস্করণ গুলির শ্লোক সর্গ ও কাণ্ড গুলি গণনা করিয়া দেখিলেই মোটামুটী ভাবে রামায়ণের কলেবর সংগ্রাহকের সময় অপেক্ষাও ইদানিং বৃদ্ধি হইয়াছে, কি হ্রাস হইয়াছে, পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

এই পরীক্ষারও বড় বেশী মূল্য নাই এবং পরীক্ষাও সহজ সাধ্য নহে। পরীক্ষা সহজ সাধ্য নহে, তাহার কারণ বর্ত্তমানে রামারণের যে সকল সংস্করণ প্রচলিত আছে, তাহার কোনটীর সহিতই কোনটীর শ্লোক, সর্গ, এমন কি রচনায়ও মিল নাই। অথচ সকলগুলিই বাল্মীকির রামায়ণ বলিয়া পরিচিত। যাহা হউক, আপাততঃ যতদূর সম্ভব, তাহার বিচার ও পরীক্ষার চেষ্টা করা গেল।

বর্ত্তমান সময় রামায়ণের তিনটী প্রধান সংস্করণ প্রচলিত আছে। প্রথম কাশী সংস্করণ বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রামায়ণ; দ্বিতীয় বোম্বাই সংস্করণ; তৃতীয় গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয় সংস্করণ। এই তিন সংস্করণের পাঠে

কাণ্ড	কৃষ্ণগোপাল ভক্তের রামায়ণ	বঙ্গবাসীর রামায়ণ	বঙ্গবাসীর শ্লোক	বোম্বাইসং	বোম্বাইসং বিশ্বকোষ উদ্ধৃত	বোম্বাই অন্য প্রকার	প্রতাপ রায় সংস্করণ	নিমাই বিদ্যাবিনোদ হস্ত লিখিত	সাহিত্য পরিষৎ উদ্ধৃত (রামায়ণ তত্ত্ব) বোম্বাই সং	উত্তর পশ্চিম সংস্করণ বিশ্বকোষ উদ্ধৃত	গৌড়ীয় বিশ্বকোষ উদ্ধৃত
বালকাণ্ড	৮০	৭৭	২২৯৬	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৬৪	৭৭	৭৭	৮০
অযোধ্যাকাণ্ড	১২৭	১১৯	৪১১৮	১১৮	১১৩	১১৮	১১৯	১১৪	১১৯	১১৯	১২৭
আরণ্যকাণ্ড	৭৯	৭৯	২৪৭৮	৭৫	৮০	৭৫	৭৫	৮০	৭৫	৭৯	৭৯
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	৬৪	৬৭	২৫৫৭	৬৭	৬৪	৬৭	৬৭	৬৪	৬৮	৬৭	৬৭
সুন্দরাকাণ্ড	৪৩	৬৮	২৮৪০	৬৮	৬৮	৯৫	৬৮	৪৩	৬৮	৬৮	৯৫
লঙ্কাকাণ্ড	১০৫	১৩০	৫৭৬৪	১৩০	১৩০	১১৩	১১৩	১০৫	১২৯	১৩০	১১৩
	৪৯৮	৫৩৬	১৯৯৫৩	৫৩৫	৫৩২	৫৪৫	৫৫৬	৪৭০	৫৩৬	৫৪০	৫৬১
উত্তরকাণ্ড	৯০	১২৪	৩৯৯২	১১৫	১১১	১১৫	১২৪	৯০	১২৪	১১১	১১৫
	৫৮৮	৬৬০	২৩৯৪৫	৬৫০	৬৪৩	৬৬০	৬৮০	৫৬০	৬৬০	৬৫১	৬৭৬

বিস্তর প্রভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত এই তিন প্রদেশের তিনটী সংস্করণ হইতে যে বহু উপসংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহাতে মূল সংস্করণ গুলির সহিত ইহাদের রচনার দূরত্ব আরো বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। ফল এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কোনটীর সহিতই প্রায় কোনটীর মিল নাই এবং কোন্‌টী বিশুদ্ধ সংস্করণ, তাহা আর বুঝিয়া লইবার উপায় নাই।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে যে সকল সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তাহাদিগের সর্গ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

এইরূপ প্রভেদ হইতে প্রকৃত সিদ্ধান্তের নিকটবর্ত্তী হইতে যাওয়ার চেষ্টা যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা এস্থলে কেবল বঙ্গবাসী সংস্করণেরই শ্লোক সংখ্যা প্রদান করিলাম। এই (প্রায়) বিশ হাজার শ্লোকেরও বহু সংখ্যক শ্লোক যে পরবর্ত্তী যোজনা, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। সর্গ সংখ্যা—কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সংস্করণ ও নিমাই বিদ্যাবিনোদের হস্ত লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন খানারই পাঁচ শতের ন্যূন নাই। ভক্তের সংস্করণ ও বিদ্যাবিনোদের পুঁথিকেই অনেকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

১২৮৯ সালে বঙ্গদেশীয় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংস্করণের গ্রন্থ মিলাইয়া ভক্ত মহাশয় রামায়ণের এই সংস্করণটী বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতেও অনেক অবান্তর কথা রহিয়াছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থের বিশেষত্ব এই—মহাভারতের পর্ব্বাধ্যায়ের ন্যায় ইহাতেও পর্ব্বাধ্যায় আছে। তাহাতে কাণ্ড-সংগ্রহ এবং প্রতিকাণ্ডের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা আছে। এই বিশেষত্ব গুলিও যে অর্ব্বাচীন তাহা বলাই বাহুল্য।

ইটালী দেশস্থিত টিউরিন্ নগরের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সিগনর গোরেসিও বঙ্গীয় সংস্করণের ইটালীয় ভাষায় অনুবাদ সহ মূল সংস্কৃতের এক সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। (১৮৪০—৬০ খৃঃ অঃ) ঐ সংস্করণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সংস্করণে সংস্করণে এইরূপ প্রভেদ কিপ্রকারে হইতে পারে? প্রমান হীন অতীত ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অনুমান ব্যতীত অন্য আশ্রয় কিছুই নাই। অনুমানের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, এ কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। অভিজ্ঞতা মূলক দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনুমানকে প্রমাণের স্বরূপ ধরিয়া লইবার চেষ্টা করা যায় মাত্র।

আমাদের মনে হয়, লিপি বিদ্যার প্রচলন হইলে মহাকবির সঙ্গীতে রচিত রামায়ণ কথা—'পৌলস্ত্যবধকাব্য' জন গণের স্মৃতির সাহায্যে যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা যাইতে পারিয়াছিল, রামায়ণের প্রথম সংগ্রহকারক তাহা সংগ্রহ করিয়া অপ্রাপ্তভাগ ও অসম্পূর্ণ ভাগ, নিজে পূরণ করিয়া প্রথম চারি সর্গে বর্ণিত (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সর্গের সকল রচনাও সংগ্রাহকের বলিয়া মনে হয় না) মুখবন্ধটী সহ সর্ব্ব প্রথম রামায়ণ প্রচার করেন। এই প্রথম প্রচার কর্ত্তাই রামায়ণ কথাকে—কাণ্ডে ও সর্গে বিভাগ করিয়াছিলেন; প্রতি সর্গের শেষে পরবর্ত্তী সর্গের আভাস জ্ঞাপক শ্লোক গুলিও তিনিই রচনা করিয়াছিলেন। শ্লোকের এবং সর্গের সংখ্যা-নির্দ্দেশও তিনিই করিয়াছিলেন।

উত্তরকাণ্ড খৃষ্টোত্তর যুগের লিখিত। প্রথম প্রচারের পরে যখন উত্তরকাণ্ডের রচয়িতা উত্তরকাণ্ডটীকে রামায়ণের অঙ্গ বলিয়া রামায়ণের পশ্চাতে যুক্ত করিয়া প্রচার করেন, তখন তিনি ৪র্থ সর্গের উল্লেখিত শ্লোক, সর্গ ও কাণ্ড সংখ্যার পরিবর্ত্তন করিয়া—

"চতুর্বিংশ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গ শতান পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥"

এই শ্লোকটীর মধ্যেও পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন সংসাধন করেন। এই দ্বিতীয় প্রতি সংস্কারক দ্বারা "চতুর্বিংশ", "পঞ্চ" ও "তথোত্তরম্" এই তিনিটী শব্দের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। আমাদের বিশ্বাস —১ম প্রচারকের সময় শ্লোক সংখ্যা ২৪ হাজার অপেক্ষা অনেক কম ছিল; সর্গও পঞ্চ শত অপেক্ষা কম ছিল এবং 'ষট্‌কাণ্ডানি' শব্দের পরের শব্দটী পরিত্যক্ত হইয়া সেই স্থলে "তথোত্তরম্" যুক্ত হইয়াছিল; এবং এই "তথোত্তরম্" কে সমর্থন জন্য দ্বিতীয় সর্গের ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় গল্পটী ও ৩য় সর্গের শেষ ভাগের উত্তরকাণ্ড সম্পর্কীয় কয়েকটী ঘটনা সূচীভূক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

উত্তরকাণ্ডেও যে অনেক পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত সর্গ আছে, তাহা রামানুজ প্রভৃতি রামায়ণের প্রাচীন টীকাকারগণও স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। (১) যাহা হউক, উত্তরকাণ্ডের

(১) "এতেষাং প্রক্ষিপ্তত্বাৎ..." বলিয়া রামানুজ বহু সর্গ ও শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উত্তর কাণ্ডের ২৩শ সর্গ হইতে ২৮সর্গ;

রচয়িতা উত্তরকাণ্ডকে রামায়ণের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া যে তাহাতে মোট চব্বিশ সহস্র শ্লোক ও পাঁচশত সর্গ পাইয়াছিলেন, এ অনুমান যে আমরা করিতে পারি, তাহার প্রমাণ উত্তরকাণ্ড রচয়িতাই আমাদিগকে উত্তরকাণ্ডের ১০৭ম সর্গে বলিয়া দিতেছেন।

উত্তরকাণ্ডে আছে, কুশী-লবের গানে রাম প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কাব্যের পরিমাণ কত, কাব্যের বিষয়ইবা কি, রচয়িতাইবা কে? সেই মুনিবরইবা কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে কুশী-লব বলিতেছে:—

বাল্মীকির্ভগবান্ কর্ত্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্।
যেনেদং চরিতং তুভ্যমশেষং সম্প্রদর্শিতম্॥ ২৪
সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎ সহস্রকম্।
উপাখ্যান শতঞ্চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা॥ ২৫
আদি প্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গ শতানি চ।
কাণ্ডানিষট্ কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা॥ ২৬

এই স্থানে উত্তরকাণ্ড সহিতেই যে ২৪ সহস্র শ্লোক ও পাঁচ শত সর্গ, তাহা নির্দ্দেশ করা হইতেছে। শুধু তাহা নহে; এখানে একটী অতিরিক্ত কথারও যোগ আছে—তাহা এই যে রামায়ণে এক শত উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তরকাণ্ডটী যোগ করিয়া শ্লোকের সংখ্যা ও সর্গের সংখ্যা আদিকাণ্ডের ৪র্থ সর্গের নির্দ্দেশ অনুরূপ ঠিক করা হইয়াছিল। ইহার পর শ্লোক সংখ্যা অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সংখ্যা নির্দ্দেশক শ্লোকটী আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বোধ হয় পরিবর্ত্তন করিবারও কাহার রুচি হয় নাই।

সর্গ সংখ্যা বৃদ্ধির একটী স্বাভাবিক কারণ আছে; তাহা এই স্থলে আলোচ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে যে একটী বিষয়কেই দুই, তিন বা ততোধিক সর্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে সর্গ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে; এইরূপ বৃদ্ধি প্রাচীনকালে হস্তলিপি কারকের খেয়ালে হইত; বর্ত্তমান কালে প্রকাশকগণের ইচ্ছায় হয়। অনেক বাঙ্গালা পাণ্ডু লিপিতে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। রামায়ণের সংস্করণ গুলিতেও তাহার অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি—বেণীমাধব দের রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডের ১৫শ সর্গ ও বঙ্গবাসীর আরণ্য কাণ্ডের ১১শ সর্গ এক বিষয়ক। বঙ্গবাসীর রামায়ণের ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ও লঙ্কা-কাণ্ডের দুইটী সর্গে এইরূপ গোল হওয়ায় সর্গ সংখ্যা এই দুই খানার ভিতর গড়মিল হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রামায়ণে দুই সর্গ এক সর্গের অধীন, বঙ্গবাসীর সংস্করণে পৃথক পৃথক। এইরূপে সর্গ সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, ও হইয়া থাকে।

উত্তরকাণ্ড ব্যতীত রামায়ণের বর্ত্তমান সংস্করণ গুলিতে এখন প্রায় কুড়ি হাজার শ্লোক ও ৪১০ হইতে ৫৬১ সর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রক্ষিত সম্পদেরও যে বহু অংশ কৃত্রিম, তাহা ইতিহাস অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে আলোচনা মাত্রেই ধরা পড়িবে।

প্রাচীন গ্রন্থের ভিতর কৃত্রিমতা কি প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে এবং কেন প্রবেশ করিয়া থাকে?

এরূপ স্থলে, এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উত্থিত হইতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তরে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহার অনেক গুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কারণ গুলি এইরূপ—

(১) বর্ত্তমান যুগের লেখকদিগের ন্যায় সেকালের লেখকদিগের নাম করিয়া যশঃ অর্জ্জনের স্পৃহা ছিল না; কিন্তু নিজ লেখাকে বা স্বকীয় মতকে সাধারণ্যে প্রচার করিবার প্রবৃত্তি ছিল। উত্তরকাণ্ডের অজ্ঞাত নামা লেখক এই কারণেই তাঁহার বিরাট শ্রমকে বাল্মীকির নামে প্রচার করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন; এইরূপ কারণে হরিবংশ লেখক তাঁহার হরিবংশকে মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; গীতাকার তাঁহার মহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক যুক্তিবাদকেও ব্যাসের নামে প্রচার করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ নির্দ্দেশ অসমীচীন হইবে না।

(২) স্বার্থান্বেষী লোক, নিজ সম্প্রদায়গত স্বার্থ সাধন জন্য প্রাচীন গ্রন্থে অনেক স্বার্থের কথা প্রবেশ করাইয়া থাকেন; এইরূপে প্রাচীন গ্রন্থ কলুষিত হইয়া থাকে।

---

৪৩ সর্গ হইতে ৬৭ সর্গ, ৭০ হইতে ৭২ সর্গ একেবারে সম্পূর্ণই প্রক্ষিপ্ত। এই সর্গগুলি উত্তরকাণ্ড লেখকেরও নহে। বঙ্গীয় পাঠকগণ এই প্রক্ষিপ্ত সর্গগুলি হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের অনুবাদে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। অনুবাদক এই ১৩টী অধ্যায়কে অনুবাদে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

রামায়ণের পত্রে পত্রে এইরূপ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা প্রমাণিত হইবে। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে এখনও এইরূপ কৃত্রিমতা চলিতেছে।

(৩) দেশকাল পাত্রের প্রভাবে মানুষের মন পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষের মনের ও চিন্তার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পুস্তকে নুতন চিন্তা প্রবেশ করিতে অবকাশ পায়। এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্প্রদায় বিশেষের ইচ্ছায় হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন জন্য হয়, ব্যক্তিগত অজ্ঞতার জন্য হয় এবং ব্যক্তিগত কবিত্বের প্রভাবে হয়। মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পূর্ব্বে হস্তলিখিত পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া প্রচারিত হইত। অনুলিপি কারকের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কবিত্ব যে অন্ধ ভাবে আদর্শ লিপিরই অনুসরণ করিত, তাহা নহে। লিপি কারকের রুচির আদর্শও সময় সময় কবিত্বে উৎসারিত হইয়া অনুলিপিকে কলঙ্কিত করিত। নিজের বা সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথাও এই অবসরে প্রতিলিপিতে প্রবেশ করিতে সুবিধা পাইত। এইরূপে আদর্শ ও অনুলিপিতে পাঠ ভেদ হইত। বাঙ্গালা কৃত্তিবাসী রামায়ণকে এইরূপেই জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের হস্তে পড়িয়া আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে।

(৪) আদর্শ লিপির অক্ষর দোষ। আদর্শের হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও পাঠ্য না হইল অনুলিপিতে ভুলের ও ত্রুটীর মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া যাইত। হস্তাক্ষর অপাঠ্য বা অস্পষ্ট হইলে অনুলিপি কারকের জ্ঞান বিশ্বাসের প্রভাব অনুসারে শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনুলিপিতে স্থান পাইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গীয় সংস্করণ ও বোম্বাই সংস্করণের একটা ব্যতিক্রম পাঠের উল্লেখ করিতেছি।

বঙ্গীয় সংস্করণের রামায়ণে (অযোধ্যা, ৪৮ সর্গে) আছে, যে দিন রাম বনবাসে যাত্রা করিলেন, সে দিন—

'ন চাহুন্যন্ চামোদান বণিজোনপ্রসারয়ণ।

ন চা শোভন্ত পণ্যানি না পঠন গৃহমেধিনঃ॥ ৪।২।১৪৮

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির "না পঠন" স্থলে বোম্বাই সংস্করণে আছে 'ন পচন'। ফলে বঙ্গীয় সংস্করণ অনুসারে অর্থ হইয়াছে—রাম যেদিন বনে গিয়াছিলেন, সে দিন অযোধ্যার লোকদের এত দুঃখ হইয়াছিল যে গৃহস্থেরা সেদিন বেদ পাঠ ছাড়িলেন। বোম্বাই সংস্করণের অর্থ হইল...'গৃহস্থেরা রান্না করিল না।'

এই পাঠ বিভ্রাটের কারণ লিপিকারকের সংস্কার ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? *

লিপি কারকের সংস্কার অনুসারে যে লিপি প্রমাদ ঘটিতে পারে এবং আর্য্য-রামায়ণের অনেক স্থানেই এরূপ ঘটিয়াছে, এই গ্রন্থের বিষয় আলোচনায় স্থানে স্থানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইবার আমরা রামায়ণের বিশেষ বিশেষ প্রক্ষিপ্ত বিষয় গুলির নির্দ্দেশ করিব এবং প্রক্ষিপ্ততার জন্য রামায়ণের কি পর্য্যন্ত গৌরব হানি হইয়াছে তাহার আলোচনা করিব।

ডাক্তার।

ফাইন্যাল এম, বি, পাস করিয়া অনেকগুলি সোণার মেড্যাল পাইয়া যখন সিনেট হল্ হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তখন সংসারই অশেষ আদর অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি, তার উপর এ বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা ; সুতরাং ভবিষ্য জীবনের জন্য কাহারও নিকট উমেদারী করিতে হইবে না—স্বাধীন ব্যবসা, স্বাধীন ভাবে করিব, লোকের উপকার করিব—এইরূপ কত আশা ভরসার সোণালী কল্পনা আমাকে অনেক সময় বিভোর করিয়া রাখিত।

এই সময় আর একটা উপদ্রব জুটিয়া গেল, আমার পেছনে ; যাহার উৎপাতে দেশ ছাড়া হইবার উপক্রম পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সেটা বাঙ্গালার কন্যাদায় গ্রস্তদের উপদ্রব।

কলেজে পড়িবার সময় এ বালাই চিন্তা একেবারেই করি নাই ; বিশেষ হাসপাতালের বিভৎস দৃশ্যাদি দেখিয়া এই সকল ব্যাপারের উপর কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাবই প্রবল ছিল।

---

* আমরা উপায়হীন হইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের শরণাগত হইয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"এখানে বেদ পাঠই খুব সঙ্গত, কেননা বেদ পাঠ তখন গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম ছিল। অশৌচ হইলেই কেবল ঐ কার্য্যে বাধা পড়িত। রাম বনবাস এত গুরুতর বিবেচিত হইয়াছিল যে অশৌচের ন্যায় গৃহস্থেরা নিত্যকর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বেদপাঠ ছাড়িয়া দিয়াছিল"।

যাহা হউক, যে কাল সকল রোগের মহৌষধ; সেই কালই আমার ভিতরও ক্রিয়া দেখাইল; লোভে পড়িয়াই হউক, আর উপায়হীন কন্যাদায় গ্রস্তের উপকার সাধন মানসেই হউক, একটী আসবাব পত্র সমন্বিত ডিস্পেন্সারির সম্যক অর্থের বিনিময়ে আত্মত্যাগ বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। জীবন স্রোত নূতন ভাবে, নূতন গতিতে প্রধাবিত হইল।

(২)

দুই বৎসর অতীত হইল ডিস্পেন্সারি সাজাইয়া বসিয়াছি। ডিস্পেন্সারির আয়ে এ দুটা বৎসর মন্দ যায় নাই। দুই বৎসর অন্তে যখন একটা বড় রকমের ইন্‌ডেন্ট করার প্রয়োজন হইল, তখন নূতন চিন্তা আসিয়া উদিত হইল। এ দুই বৎসর তহবিল ভাঙ্গিয়া খাইয়াছি, সুতরাং ডিস্পেন্সারি রক্ষা করিতে হইলে "ইয়াদিকির্দ্দের" আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নাই। কম্পাউণ্ডারের নিকট হিসাব চাহিতে গিয়া জানিলাম, সে নাকি বহুদিন যাবৎই আলমারীর শিশিগুলি খালিই দেখিয়া আসিতেছে। অবস্থা বুঝিলাম; তাহাকে যথেষ্ট ধমকাইলাম। পেটে খাইলে যে পিঠে সহিতে কোনরূপ আপত্তি করা উচিত নহে,এ নীতিটী তাহার বেশ জানা ছিল, সুতরাং সে আমার সমস্ত গালি ও অপমান অম্লান বদনে হজম করিয়া আমার মুখের দিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। অগত্যোপায় হইয়া তাহাকে বিদায় করিলাম।

(৩)

বৈদ্ধ যখন বাড়িতে লাগিল, সংসারে জন সংখ্যা ততই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে চারিটী বৎসর গত হইল। এই দীর্ঘ চারিটী বৎসরেও আমার 'সার্জ্জারীর' মেডেলের যে কি কদর, একটা 'কেসের' সুযোগেও তাহা জন সমাজে দেখাইতে পারিলাম না; সহরের একটা লোকও বুঝিল না, চিন্তা করিয়া দেখিল না—ইউনিভার্সিটী এই লোকটাকে কেন পদে পদে পদক দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া সকলের পুরোভাগে তার নামটা ছাপাইয়া প্রচার করিল! দুর্ভাগ্য—দুরদৃষ্ট আর কাহাকে বলে!

ক্রমে প্রাক্‌টীসের অভাবে অনভ্যাসে অনেক বিষয়ই ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার দোষ কি? দোষের মধ্যে আমার এই ছিল যে আত্মাভিমানেই হউক, কিম্বা অন্যের চেয়ে নিজকে একটু বিশেষ করিয়া দেখাইবার জন্যই হউক, আমার ফিসটা ছিল একটু বেশী।

যাহা হউক, অবস্থা দেখিয়া ফিসের ওজর ছাড়িয়া দিলাম, তবু কিন্তু রোগী জুটিল না। এইরূপ অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসের মধ্যে যখন তীর্থের কাকের মত ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় জানিতে পারিলাম, ঢাকার প্রধান সার্জ্জন রাজেন্দ্র বাবু মারা গিয়াছেন। ঢাকায় ভাল সার্জ্জন নাই, তাই কোন কোন বন্ধু উপদেশ দিলেন—এ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

বন্ধু বান্ধবের এইরূপ সহানুভূতি সূচক উপদেশে আমার উৎসাহ বেশ কার্য্যকরী হইল। আমি নবীন আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আসিয়া ঢাকা বসিলাম।

এবার ফিস্ সম্বন্ধে আর বিশেষত্ব রাখিলাম না।

'ভেকে ভিখ'—তাই একখানা মাস্-চুক্তি মটরকার ভাড়া করিলাম, একখানা ইংরেজী দৈনিক না হইলে সম্মান থাকে না, তাহা সাবস্‌ক্রাইব করিলাম। এইরূপ সম্মান রক্ষার উপযোগী নিদর্শন গুলি সব আগুলিয়া লইয়া বসিলাম। প্রথম প্রথম দুই একটা কেসও হাতে আসিল। কিন্তু একটা অপরেশন্ কেসে রোগীটা হাটফেল করিয়া মারা যাওয়ায় আমার শত্রুপক্ষ যে বদনাম রটনা করিলেন, আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাতে সমূলে নষ্ট হইয়া গেল। ইহার পর সমস্ত দিন মোটরে থাকিয়া, দৈনিক কাগজের উপর চক্ষু আবদ্ধ রাখিয়া, লোক দেখান নিস্ফল ভ্রমণ করিয়া যখন রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম, তখন কত যে তীব্র গ্লানিতে বুক ভরিয়া যাইত, তাহা আর কি বলিব। মাস্কাবারে যে ভীষণ অবস্থা হইত, ভুক্তভোগী ব্যতীত সে অবস্থা অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। দালান ভাড়া, মোটর ভাড়া, দৈনিক পত্রের মূল্য দোকানীর পাওনা, দুধের মূল্য, চাকরের বেতন—এক এক দিন তাগাদার যন্ত্রণায়, অপমানের ভয়ে, উন্মত্তের ন্যায় ছুটা ছুট করিতাম।

এইরূপ অবস্থায় একদিন ঢাকার পরীক্ষাও শেষ করিলাম। বাকী রহিল, রাজধানী কলিকাতা। কলিকাতায় নাকি লোক বসিয়া থাকে না।

অদৃষ্টলক্ষ্মী কোন্ সময় যে কোন্ সূত্রে আসিবেন

কেহ বলিতে পারে না বটে, কিন্তু তিনি যে আকাঙ্ক্ষীর আকাঙ্ক্ষা একদিন পূর্ণ করিবেনই, এ বিশ্বাসটী আমার ছিল। না থাকিলে ধৈর্য্যের পুরস্কার কোথায়?

(৪)

কলিকাতা আসিয়া কিছু কিছু পাইতেছিলাম। যে পল্লিতে বাসা নিয়াছিলাম, সেখানে অন্য ডাক্তার ছিল না; গরীব পল্লি, যে যাহা দিত, তাহাই লইতাম। সুতরাং কোনরূপে দিন চলিতেছিল।

একদিন প্রাতে একটু কাজে বাহিরে গিয়াছিলাম; পথে এক পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি হাতে ধরিয়া তাহার বাসায় লইয়া গেলেন এবং বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

তাহার সহিত বসিয়া যখন আলাপ করিতেছিলাম, তখন তাহার বাসার সম্মুখবর্ত্তী রাস্তার অপর পার্শ্বের বৃহৎ অট্টালিকার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অট্টালিকার গায় অগণিত প্ল্যাকার্ড টাঙ্গান রহিয়াছে। আর অনবরত তাহাতে লোক যাতায়াত করিতেছে।

আমার অপলক দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বন্ধুটী বলিলেন—"বেশ পসার করিয়াছে এ ডাক্তারটী।"

আমি বলিলাম—"অদৃষ্ট।"

বন্ধু বলিলেন—"অদৃষ্ট আবার কি? লোকটা খাটে কত?"

গত জীবনের দুরদৃষ্টের কথা বন্ধুকে বলা প্রয়োজন মনে করি নাই; এখনও নিজ অভিজ্ঞতার পরিচয় না দিয়াই বলিলাম—"অদৃষ্ট বই কি?"

বন্ধু বলিলেন—"পুরুষকারের নিকট অদৃষ্ট কিছুই নহে; অদৃষ্ট অক্ষমের দোহাই।"

বন্ধুর এ তর্কে সায় দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলাম না। বন্ধুর সৌজন্যে প্রীত হইয়া তাহার চা, চুরট, মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ডাক্তারের ডিস্পেন্সারির সম্মুখ দিয়াই চলিলাম। দরজার পার্শ্বেই পিত্তল ফলকে লেখা রহিয়াছে।

Dr. M. C. Sarkel M. D. (Phil.)

L. R. C. P., M. R. E. C. &

এ ডাক্তার কে? মোহিনী না তো? সে আবার M. D. হইল কবে? ফিলাডেলফিয়াই বা গেল কবে?

মোহিনী সার্কেল আমাদের সতীর্থ ছিল। বার বার ফেল হইয়া মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করিয়াছিল—আমি তাহারই কথা ভাবিতেছিলাম। মনে নানারূপ সন্দেহ ও কুতূহল আসিয়া আমাকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় উৎগ্রীব করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি ডিস্পেন্সারির দরজায় উকি মারিয়া কোট প্যান্টপরা ডাক্তার সার্কেলকে দেখিতে চেষ্টা করিলাম।

সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। ডাক্তারের মুখখানা ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। অগ্রসর হইলাম। ডাক্তার টেবিল সম্মুখে লইয়া উপবিষ্ট—তাহার সম্মুখে, ডানে, বামে ঘিরিয়া লোক বসিয়া আছে। ডাক্তার একবার একজনের কথা শুনিতেছেন, পুনরায় অন্য জনের দিকে চাহিতেছেন; তারপর ডাকিয়া কম্পাউণ্ডারদিগকে ঔষধের উপদেশ দিতেছেন।

আমি একটু বেশী অগ্রসর হইলেও ডাক্তার আমার দিকে যেন দৃষ্টি ফিরাইতেও অবসর পাইলেন না।

আমার সন্দেহ দূর হইল। আমি—মোহিতকে চিনিতে পারিলাম। মোহিত—ডাক্তার—M. D. কি আশ্চর্য্য!

ততক্ষণে মোহিত ও আমারদিকে চক্ষু ফিরাইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিল।

আমি বসিলে, আমাকে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিল। আমি সসব্যস্তে বলিলাম—"না না, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর; তোমার ফরসুৎ যখন, তখনই বরং আমি আসিব, এখন যাই।"

মোহিত আমাকে ব্যাকুল আগ্রহে বসিতে অনুরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নিকট সমাগত রোগী গুলিও যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাকাইয়া রহিল।

এরূপ অবস্থায় আমি সেখানে সেই সময় অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিলাম না। তাহার পৃষ্ঠে আমার স্নেহ হস্ত বুলাইয়া আমার বাসার ঠিকানাটা বলিয়াই উঠিয়া পড়িলাম। সে আসিয়া দরজা পর্য্যন্ত আমাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া গেল।

আমার সেই কম্পাউণ্ডার মোহিত, যাহাকে আমি ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমার তহবিল তশ্রুপকারী বলিয়া জবাব দিয়াছিলাম, সেই মোহিত, আজ রাজধানীর বুকে বসিয়া

হাস্ত মুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করিয়া আপন পুরুষকারের জয় ঘোষণা করিতেছে—ভাবিয়া ভাবিয়া আনন্দে আমার হৃদয় উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

(৫)

৬টা বাজিয়াছে। আমি শয্যায় শুইয়া একটা দৈনিক বাঙ্গলা কাগজ দেখিতেছিলাম. ইংরেজী কাগজ আর এখন লই না। আমার মেয়ে রেণু আসিয়া বলিল—"বাবা, আমাদের দরজায় একটা মটর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

আমি ব্যস্তভাবে কাগজখানা হাতে লইয়াই উঠিয়া পড়িলাম। ইহার পরেই দেখি, মোহিত আমার বড় ছেলেকে হাতে ধরিয়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার পরিধান—সেই হেট্ কোট।

মোহিতকে এ বেশে দেখিয়া আমি মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম। সে কি আমার স্ত্রীকে এই বেশ দেখাইয়া একটা গৌরব নিতে আসিয়াছে? মোট কথা, আমার মন তাহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবেই প্রত্যাশা করিয়াছিল। প্রাতে তাহাকে দেখিয়া যে ভাব লইয়া আসিয়াছিলাম, হটাৎ তাহাকে এভাবে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আমার ভিতর একটা বিদ্রোহভাব দেখা দিল।

আমি তাহাকে এরূপ অবস্থায় কোনপ্রকার সৌজন্তের ভাষায় অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না। আমার এই মুহূর্ত্তের কুণ্ঠিত ভাব বোধ হয় সে লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

সে আসিয়াই আমাকে বলিল—"আপনি পোষাক নিন; একটা অপারেসনে যাইতে হইবে"

এই বলিয়াই সে আমার স্ত্রীর অনুসন্ধানে ছাদে চলিয়া গেল।

আমি তখন আমার ক্রটী বুঝিলাম; তাহার এই পোষাক এ ক্ষেত্রে যে ঠিকই হইয়াছে; তাহাতে আমার আর কোন কুণ্ঠার বিষয় রহিল না।

আমি মনে মনে সিদ্ধিদাতা গণদেবতার নাম লইতে লইতে মোহিতের মতই হেট্ কোট্ লইয়া ফেলিলাম। তারপর মোহিতের সহিত বাহির হইলাম।

মোহিত একটু অগ্রসর হইলে আমি আসিয়া স্ত্রীকে—আমরা উভয়ে আসিয়া যেন একটু জলযোগের ব্যবস্থা পাই—তাহার বন্দোবস্ত রাখিতে বলিয়া গেলাম। মোহিতকে একটু আদর আপ্যায়ন দেখানই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

আমি সর্জ্জারিতে সোনার মেডেল পাইয়াছিলাম। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার যোগ্যতা দেখাইবার আমার আর অবসর হয় নাই—সেটি যখন হইয়াছিল, অদৃষ্টের পরিহাসে তাহাই তখন আমার ব্যবসায়ের কাল হইয়াছিল।

আজ এই ধনী মারোয়ারীর উপর অস্ত্র করিয়া সে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইলাম।

মোহিত আমাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত সেখানে পরিচিত করাইয়াছিল। আমি যে তাহার শিক্ষক, একথাও সে বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অপারেশনটা একটু শক্তই ছিল, সে জন্য আমরা কৃতকার্য্যতার দরুণ যথেষ্ট পুরস্কৃত হইলাম। ইহার উপর ভবিষ্যতেরও প্রত্যাশা রাখিয়া আসিলাম।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মোহিতকে যথেষ্ট সমাদরে অভ্যর্থনা করিলাম। সে আমার এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে ভয়ানক লজ্জিত হইয়া পড়িল। চিরজীবনের দৈন্যভাব, আজ যে আমার ঘুচাইয়া দিয়াছে—সে কি আমার অভিনন্দন পাইবার যোগ্য নয়?

মোহিত কেমন করিয়া M. D. হইল, সে প্রকৃতই আমেরিকা গিয়াছিল কিনা—এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা আমি একেবারে নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। এ সকল সম্বন্ধে কোন সন্দেহও যাহাতে মোহিতের মনে উদয় না হইতে পারে, সে পক্ষে আমি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রহিলাম।

আজ মোহিতকে প্রকৃত বন্ধু জানিয়া, নিজের দীনতাকে তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে আমি মোটেই সঙ্কুচ বোধ করিলাম না।

সেও তাহার জীবনের ইতিহাস আমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইল না। সে যে পুরুষকারের প্রভাবেই তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত পদে পদে দেখিতে পাইলাম। মারোয়ারী মহলে তাহার অসম্ভব প্রতিপত্তি। এক মারোয়ারীর অর্থেই সে প্রথম ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিয়া M. C. Sarkel নামক এক ডাক্তার রাখিয়া ব্যবসায় চালাইয়াছিল। ইহার পর ডাঃ Sarkel

চলিয়া গেলে মোহিতই তাহার স্থান অধিকার করিয়া ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে। মোহিত এখন মাসে হাজার টাকার কম পায় না। সার্জ্জারীতে হাত থাকিলে ৪।৫ হাজারও পাইতে পারিত।

শেষে মোহিত আমাকে বলিল—"কোন চিন্তা করিবেন না। কাল আপনার জন্য একটা ভাল বাড়ী দেখিব, আমার সার্জ্জারির কেসগুলিও এখন আর হাতছাড়া হইবে না।"

মোহিত তাহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিল। সে তাহার বুকের রক্ত দিয়াই যেন তাহার দু'দিনের প্রতিপালক প্রভুর কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল।

শ্রীকালিদাস বাগচী।

স্নেহের দান।

২৪

রেল ষ্টেসনে মাখনের জন্য গাড়ী ও লোক অপেক্ষা করিতেছিল; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে আসিয়া বাড়ীতে পঁহুছিল। ম্যানেজার বাবু এবার তাহাকে খুব শ্রদ্ধার সহিত অভ্যার্থনা করিলেন। তাহার কৃতকার্য্যতার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রসংশা করিয়া—তাহাকে সঙ্কোচিত করিয়া ফেলিলেন; তারপর নিরাশার সুরে বলিলেন "দলিল দশটার সময় সব রেজেষ্ট্রারের বাসায়ই রেজেষ্টরী হইয়া গিয়াছে; রাত্রি দশটায় স্বামীজী বাড়ী আসিবেন, বাবু পূর্ব্বেও আসিতে পারেন, স্বামীজীর সঙ্গেও আসিতে পারেন—সে সংবাদ এখনও পাই নাই। আপনি বিশ্রাম করুন, তারপর, যাহা পরামর্শ হয় করা যাইবে।"

মাখন ভিতর বাড়ীতে আসিয়া মাসীমাকে ও জেঠিমাকে প্রণাম করিল। কনক অভিমান করিয়া রহিল, আসিয়া সাক্ষাৎ করিল না।

মনে মনে কনকের রাগ—কেন মাখন তাহাকে এরূপ অগ্রাহ্য করিয়া চিঠি লিখিল? মাখন যদি তাহার তেমন কেহ না হয়, তবে সে তাহার কে? তাহার সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ? আজ অভিমান করিয়া কনক মাখনকে তাহাই বুঝাইয়া দিবে। এই জন্যই সে এই তিন মাস মাখনকে এক খানা চিঠিও লিখে নাই। এতগুলি বৃত্তি লইয়া, এতগুলি পুরস্কার পাইয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া, পাশ হইয়াছে শুনিয়াও কনক মাখনকে একটী অক্ষর লিখিয়া মনের গুপ্ত আনন্দ ব্যক্ত করে নাই।

কনক যে মাখনের গৌরবে, কৃতকার্য্যতায় মনে সুখ অনুভব করে নাই, তাহা নহে; বরং মাখনের কৃতকার্য্যতার সংবাদে তাহারই আনন্দ হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আজও এই বাড়ীতে যদি কেহ বেশী করিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া থাকে, তবে সে—কনক।

কিন্তু তথাপি কনকের যেন কি হইল? যখন গোপাল আসিয়া ভিতরে খবর দিল—"দাদা বাবু—আসিয়াছেন" তখন কনক যাইয়া নিজ শয্যায় শুইয়া পড়িল।

কনক ভাবিতেছিল—তিনি চিঠিতে এমন ভাবে আমাকে কেন অগ্রাহ্য করিলেন? তিনি অগ্রাহ্য করিলেন তো মা চিঠি দেখিলেন কেন? মা দেখিলেন তো আমাকে তাহা বলিয়া লজ্জা দিলেন কেন?

অবসর ও অভিমান কনকের মনে এইরূপ আবশ্যক অনাবশ্যক, প্রাচীন নবীন অনেক কথা জাগাইয়া তুলিতেছিল। আজ তিন মাস ধরিয়াই কনক গোপনে এই সকল কথা ভাবিয়াছে—মনে মনে অভিমান করিয়া কাটাইয়াছে। আজ সেই গুপ্ত অভিমান সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহের উগ্র মূর্ত্তি ধরিয়া আত্ম প্রকাশ করিল।

মাখন কনককে না দেখিয়া মাসিমার নিকট জিজ্ঞাসা করিল—"কনক কোথায়?"

মাসীমা কনকের ভাব ভঙ্গিতে তাহার মনের চাপা ভাবের পরিচয় কিছু পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মাখন নিজে যাইয়া তাহাকে সাধিলেই তাহার সব অভিমান জল হইয়া যাইবে।

তিনি বলিলেন "যাও, ঘরেই আছে—।"

মাসীমা নিজ হস্তে মাখনের জন্য রান্না করিতেছিলেন সুতরাং তিনি চলিয়া গেলেন। মাখন কনকের উদ্দেশে ধীরে ধীরে যাইয়া তাহার কক্ষে উপস্থিত হইয়া অলক্ষিতে তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। সে ধরা, কত কোমল,—কত মোলায়েম।

কত আদর, কত স্নেহ, কত ভালবাসা যে সে স্পর্শে ছিল, তাহা কনক প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল কিন্তু কনকের বিদ্রোহী অভিমান সে অনুভূতির সাড়া দিতে পারিল না। সে অভিমানে কনক মাখনের সে স্নেহ হস্ত সজোড়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরিয়া গেল।

মাখন বিরক্ত হইল না। সে পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ একটা প্রচ্ছন্ন অভিমানের দারুণ ধিক্কার আশঙ্কা করিতেছিল। যে প্রতি সপ্তাহে দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠিতে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিত, আজ তিন্ মাস সে তাহার সেই প্রাণের কথা চাপা রাখিয়াছে; সুতরাং তাহার আত্ম প্রকাশে বিপ্লবের তুফান বহিবে, ইহা অনাশঙ্কিত কি? এ কল্পনা সে যে একেবারেই করে নাই, তাহা নহে। মাখন তাই জোড় করিয়া কনকের মাথাটী টানিয়া ধরিয়া তাহার কোলে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিল।

কনক রাগ করিয়া বলিল—"তুমি আমার মাথা ধরিও না, আমি তোমার কে?..."

মাখন কনককে ছাড়িয়া দিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"সারাদিন খাই নাই দিদি; তুমি আজ আমাকে উপবাস রাখিবে?"

কনক দম ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মাখন বলিল—"তবে চলিলাম।"

কনক তবু সাড়া দিল না।

মাখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মাখনকে যাইতে দেখিয়া মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইল?,'

মাখন কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—"রাগ করিয়াছে।"

মাসীমা মাখনের অন্তরের ভাব বুঝিয়া অতি মোলায়েম ভাবে সে গুরুভারকে লঘু করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"এখন তুমি খাও; তারপর দেখ, ওরা সব কি পরামর্শ পাকাইয়াছেন।"

মাখন বলিল—"খাইব, একেবারে সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়াই। এখন যাই, ম্যানেজার বাবুর নিকট অবস্থা শুনি গিয়া···।"

এক গোছা ধান।

আমরা দোঁহে ধান-কাটা ক্ষেত মাপ্‌তে গিয়ে দেখি,
সোনার ফসল ফেলে গেছে—লক্ষ্মী ছাড়া একি!
এক গোছাতে এক মুঠো ভাত, ভুল ধারণা নয়;
মুঠেক্ ভাতের তরে এখন ছুটছি জগৎময়!
আফ্রিকাতে ফিজিদ্বীপে গেলাম পেটের দায়ে;
খেটে-খুটে বন্-বাদাড়ে ঘুমাই গাছের ছায়ে!
কাজের বেলা কাজী ছিলাম, এখন মেহাৎ পাজী;
কুকুর-তাড়া করছে তবু, ছাড়্‌তে নহি রাজী!

নির্য্যাতনের মূল সে মুঠেক্ ভাত!
মুখ বুজে' সব সইছি দিবস রাত!
দেশের মানুষ বুঝ্‌লো না তা,
রইলো গুঁজে' উচ্চ মাথা;
আর কি ভবে,
জাগ্‌বো সবে?
হাতির মত মস্ত জাতি,
দেশ্-বিদেশে খাচ্ছে লাথি!
অঙ্কুশে খুব চাপ্‌চাই থেকে থেকে;
জ্যান্ত জাতি টিট্‌কারি তার্ দেখে'।

ভাব্‌ছে তারা হস্তি যদি গা ঝাড়া তার্ কভু,
ছিটকে গিয়ে পড়্‌বে কোথায় মাহুৎ মহাপ্রভু!
চীন তুর্কী আফ্‌গানেরা শক্তি পেল যুঝে';
এখন স্বত্ব—স্বাধীনতা নিচ্ছে সবাই বুঝে'।
মুক্ত মাঠের মধ্যিখানে কাটা-ধানের ক্ষেতে,
ভাবায় কে গো এম্‌নি ক'রে, উঠ্‌লো হৃদয় তেতে'।
পাকা ধানের গুচ্ছ মোটেই তুচ্ছ নহে আর;
এক মুঠো ভাত পাইনা যখন, জগৎ অন্ধকার।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

এই মাসের চিত্র।

এই মাসের সম্মুখ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ শ্মশ্রু সমন্বিতা যুবতী জুলিনা পেট্রনার চিত্র প্রদত্ত হইল। আগামীবারে তাহার জীবন-কথা বিবৃত হইবে।
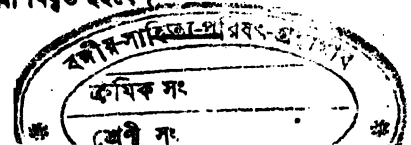
শ্মশ্রুসমন্বিতা যুবতী জুলিনা পেষ্ট্রলা।
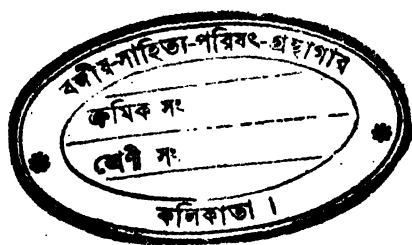
সৌরভ

দ্বাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩৩০। | তৃতীয় সংখ্যা।

গণ-তন্ত্র।

এক কথায় গণতন্ত্র বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন।

স্যার হেন্‌রী মেইন্ বলেন 'গণতন্ত্র একপ্রকার শাসন প্রণালী বিশেষ। রাজতন্ত্র, সম্ভ্রান্ততন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় ইহাও একপ্রকার শাসনপদ্ধতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক লাওয়েলও স্যার হেনরীকেই সমর্থন করেন। লিঙ্কোনের মতে গণতন্ত্র—'Government of the people, by the people and for the people.' অর্থাৎ জনসাধারণই গবর্ণমেণ্ট, তাহারাই শাসন কার্য্য পরিচালনা করে এবং তাহাদের হিতার্থেই শাসন কার্য্য পরিচালিত হয়।

কিন্তু গণতন্ত্রকে একমাত্র কিংবা প্রধানতঃ শাসন প্রণালী বিশেষ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। গণতন্ত্র অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় অবস্থা ও সামাজিক অবস্থা (form) প্রকাশ করে। যখন গবর্ণমেণ্টের কোন অস্তিত্বও ছিল না, তখনও সমাজ এবং রাষ্ট্র ছিল। কাজেই বাস্তব জগতের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র অতি প্রাচীন। শাসক সম্প্রদায় সংগঠিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই যে সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছিল, সে কথা অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু হব্‌স্, লক, রুসো প্রভৃতি দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে সামাজিক চুক্তি খুব পুরাকালীয়। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যেখানে গবর্ণমেণ্ট গণতন্ত্রমূলক, সেখানে রাষ্ট্র গণতন্ত্রমূলক, কিন্তু যেখানে রাষ্ট্র গণতন্ত্রমূলক সেখানে গবর্ণমেণ্ট গণতন্ত্রমূলক না হইতেও পারে।

যেখানে প্রতিনিধি নাই, পরন্তু সমগ্র সমাজ সমুদয় শাসন কার্য্য পরিচালনা করে সেখানেই গবর্ণমেণ্ট গণতন্ত্রমূলক। রাষ্ট্র খুব ছোট না হইলে এই প্রকার সকল লোকের শাসন চলিতে পারে না। অতএব এরূপ আদর্শ গণতন্ত্র বাস্তব জগতে খুব কমই দেখা যায়।

আদর্শ গণতন্ত্র বাস্তব জগতে সম্ভবপর নহে, কাজেই লোকে ইহাকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কখন কখন জনসাধারণের ডেলিগেট্ (delegate) শাসন কার্য্য পরিচালনা করে। নির্ব্বাচনকারীদিগের মত ভিন্ন এতাদৃশ ডেলিগেটদিগের নিজ মত প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। তাহারা স্বাধীনভাবে কোন কাজই করিতে পারে না। তাহাদিগকে যেরূপ বলা হয়, তাহারা ঠিক ঠিক সেইভাবে কাজ করিতে বাধ্য। নগররাষ্ট্র (City state) সমূহে ডেলিগেট দ্বারা শাসন কার্য্য চলিতে পারে কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রে ইহা সম্ভবপর নহে। কাজেই জগতে গণতন্ত্রমূলক গবর্ণমেণ্ট বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

এখন গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রের বিষয় আলোচনা করা যাউক। গণতন্ত্র, সম্ভ্রান্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতি সকল প্রকার শাসন প্রণালীই গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রে থাকিতে পারে। কারণ যে রাষ্ট্রে জনসাধারণ ওরফে সমগ্র সমাজ সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের চরম (ultimate) হর্ত্তাকর্ত্তা ও রাষ্ট্রে কি প্রকার শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়, সেই রাষ্ট্রই গণতন্ত্রমূলক। কিন্তু উল্লিখিত তিন প্রকার শাসন পদ্ধতির মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়, তাহা দেশের অবস্থানুসারে নির্দ্ধারিত হয়। গণতন্ত্রমূলক শাসন পদ্ধতিতে যাহারা শাসনকর্ত্তা, তাহারাই শাসিত; কাজেই

সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বেশী এবং এতাদৃশ শাসন প্রণালীর উপর সর্ব্বসাধারণের ভক্তি বিশ্বাসও গাঢ়তর। কিন্তু এই প্রকার শাসন প্রণালী মোটেই কর্ম্মক্ষম (efficient) নহে। বড় বড় গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রে প্রজাগণ নিজেরা শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারে না এবং গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রমূলক শাসননীতি পরিলক্ষিত হয় না, কারণ সকলের শাসন (government of all) অত্যন্ত জটিল এবং সকলকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করা বড়ই দুরূহ। কাজেই বড় বড় গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে শাসন কার্য্যের কিছুই স্বহস্তে রাখে না কিংবা রাষ্ট্রেগণতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে মোটেই চেষ্টা করে না।

অতএব গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রে কোন না কোন প্রকার সম্ভ্রান্ততন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র সর্ব্বদাই সর্ব্বসাধারণের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করে। Mazz'ni defined democracy as "The progress of all, through all under the leading of the best and wisest" অর্থাৎ মেটসিনীর মতে শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞের অধিনায়কত্বে সর্ব্বসাধারণের সাহচর্য্যে সর্ব্বসাধারণের উন্নতিই গণতন্ত্র। প্রতিনিধির সংখ্যার উপর শাসনপদ্ধতির ভালমন্দ নির্ভর করে না। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন পদ্ধতি ও তাহাদিগকে পদচ্যুত করিবার নিয়মের বিভিন্নতা বশতঃ বহুবিধ সম্ভ্রান্ততন্ত্র বা প্রতিনিধি মূলক শাসন পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে প্রায় সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে কেবল অভিজাত সম্প্রদায়ই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে কিংবা ভোট দিতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রে জনসাধারণ বা ভোটারগণ তাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিলে, তাহাদিগকে সম্মিলিত মতদ্বারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে; কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে একবার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ত হর্ত্তা কর্ত্তা। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রতিনিধিমূলক (Representatives) গবর্মেণ্ট দৃষ্ট হয় (১) Cabinet অর্থাৎ দুই বা ততোধিক প্রতিনিধির শাসন (২) President অর্থাৎ একজন প্রতিনিধির শাসন।

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃতিগত সমান, একথা স্বীকার করিয়া লইলেও প্রত্যেক রাষ্ট্র গণতন্ত্রের পক্ষে সমান প্রশস্ত নহে। যদি রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ প্রত্যেক প্রত্যেককে সাধু বলিয়া বিশ্বাস না করে, কিংবা তাহাদিগকে জ্ঞানী ও বিচারশক্তি সম্পন্ন মনে না করে; কিংবা যদি সামাজিক ঐক্য (solidarity) অথবা সাধারণ মত (general will or common will) না থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সাধারণ মত সকলের বিভিন্ন মতের সমষ্টি নহে—উহাদের ভিতরকার সাধারণ জিনিস; অর্থাৎ উহাদের মতের সে অংশটুকু সকলের ভিতরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সর্ব্বদাই বিরাজ করে। যদিও এই সাধারণ মত সময় সময় কোন ব্যক্তি বিশেষ কিংবা সংঘ বিশেষের মতের সহিত মিলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া উহা তাহাদের নিজের মত মনে করিলে ভুল করা হইবে।

আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, গণতন্ত্র সমাজের একটা বিশেষ অবস্থাও হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ও রাষ্ট্র রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়; কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও সম্মিলন আছে। যথা—ধর্ম্ম বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সম্মিলন। এই সমুদয়ের সাধারণ নাম দেওয়া যাউক "সমাজ"। সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিতর যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে সত্য কিন্তু উহাদের পার্থক্যও কম নহে। সমাজ গণতন্ত্রমূলক হইলেও সেই স্থানের শাসন প্রণালী রাজতান্ত্রিক, সম্ভ্রান্ততান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক কিংবা স্বেচ্ছাচারপূর্ণ হইতে পারে।

রাজনৈতিক বিষয়ে সমাজ ওরফে জনসাধারণের উপরে অন্য কোন শক্তি না থাকিলে সেই রাষ্ট্র গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সমাজের রাজনৈতিক অধিকার থাকুক আর না থাকুক, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান, এই ভাব ও আদর্শ সকলের ভিতর না থাকিলে সমাজ গণতন্ত্রমূলক হইতে পারে না যদিও স্বভাব ও আকৃতি প্রকৃতিতে দুইজন একপ্রকার লোক পৃথিবীতে দেখা যায় না এবং মানুষে মানুষে বাহ্য পার্থক্য আছে, তথাপি একটু মনোযোগ পূর্ব্বক লোকের ভিতরের

দিকে তাকাইলেই সব প্রভেদ দূর হইয়া যায়। সকলকেই জন্মিতে হয় এবং মরিতে হয়; সকলের ভিতরই মানব জাতির বিশেষত্বটুকু বিদ্যমান আছে; সকলেরই সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল; প্রত্যেককেই বিরুদ্ধভাব আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ভাবের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে এসকল বিষয়ে সকল লোকই সমান এবং এগুলিই মানুষের পক্ষে মুখ্য। মূলকথা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সকলেই সমান। এই আদর্শ অবলম্বন করিয়াই প্রথমে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। নানাপ্রকার প্রভেদ সত্বেও ভগবানের ন্যায় গণতন্ত্রও সকলকে সমান জ্ঞান করে। কাজেই গণতন্ত্রের আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল অনেকেই ইহার ধর্ম্মের দিকটা ভুলিয়া একমাত্র রাজনীতির দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছেন। মেটসিনীও বর্ত্তমান গণতন্ত্র আন্দোলনের এই দোষটি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। ডিউয়ে (Dewey) বলেন ব্যক্তিত্বই গণতন্ত্র। এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের নিমিত্ত স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী আবশ্যক। কিন্তু ইহাদেরও একটা সীমা আছে। ঐ সীমা অতিক্রম করিলে ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় কুফলই প্রসূত হইয়া থাকে। ডিউয়ের মতে সেই সমাজই গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সকলের অধিকার সমান এবং সকলের অবস্থা, চিন্তাধারা ও আদর্শের সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেই সমাজই গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে সকলেই সমান। তবে সমান মানে ইহা নহে যে সকলেই সমবেতভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করে। সেই রাষ্ট্রই গণতন্ত্রমূলক, যেখানে রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহে সমাজের উপর আর কোন শক্তি নাই। সেই শাসন প্রণালীই গণতন্ত্রমূলক যেখানে জনসাধারণ স্বয়ং কিংবা তাহাদের নির্বাচিত ডেলিগেট শাসন কার্য্য সম্পন্ন করে।

গণতন্ত্রের চক্ষে সকলেই সমান। কিন্তু এই সাম্যেরও একটা সীমা আছে। উহা অতিক্রম করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরই একটা মানব সুলভ প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য আছে; এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সকলেই সমান। নতুবা বাহ্য দৃষ্টিতে দুইটি লোকের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকেরই সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকা উচিত। আইনের চক্ষে সকলেই সমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আইন কখনই ন্যায় সঙ্গত নহে। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশ সমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির জন্য পৃথক পৃথক্ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, উহা সর্ব্বদা গণতন্ত্রনীতি বিগর্হিত। সকলকেই সমান আর্থিক সুযোগ দেওয়া উচিত এবং সকলেই যাহাতে লেখাপড়া শিখিবার সমান সুবিধা পায় তাহার বন্দোবস্ত করা বিধেয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মবিকাশের সমান অধিকার আছে, এবং প্রত্যেকেরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় সমান করিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়াই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইবে না, এমন নহে। গুণবান্ পুরুষের গুণের আদর করিতেই হইবে; নতুবা তাহার গুণাবলী অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিলে ভয়ানক কুফল ফলিবে। কাজেই গণতন্ত্র যেমন একদিকে ভেদের পরিবর্ত্তে সাম্য সংস্থাপন করিবে, আবার তেমন সাম্যনীতির অপব্যবহার নিবারণ করিবে। ভেদ যখন খুব বৃদ্ধি পায়, তখন এক বা ততোধিক ব্যক্তি প্রভুত্ব লাভ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। আবার সাম্যের প্রভাব অতিরিক্ত হইলে সকলেই স্বেচ্ছাচারী হয় এবং প্রকৃত স্বাধীনতা থাকে না। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কোন কিছুরই চরমে যাওয়া ভাল নহে। আমাদের মতে প্রত্যেকেরই নিজ ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিবার সমান অধিকার, সুযোগ ও সুবিধা থাকা উচিত এবং কাহাকেও কোন অস্বাভাবিক উপায়ে খর্ব্ব করিয়া রাখা কখনো ন্যায় সঙ্গত নহে।

আমরা উপরে দেখিয়াছি—বড় বড় রাষ্ট্রে পূর্ণ গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবপর নহে। কারণ সেখানে লোক সংখ্যা খুব বেশী। অধিকন্তু সাধারণলোকের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার শক্তি ও অবসর নাই। কাজেই বাস্তব জগতে দেখা যায়—তাহারা কোন বিষয় স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া সমস্ত ভার প্রতিনিধির উপর অর্পণ করিয়া থাকে। আজ কাল আমরা যে গণতন্ত্র দেখিতে পাই, উহার অধিকাংশই এই প্রকার "প্রতিনিধি মূলক গণতন্ত্র"। (Representative Dimocracy) বর্ত্তমান

বর্ত্তমান গণতন্ত্রে শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন ও মোটামুটি শাসন প্রণালী নির্ণয় করাই জন সাধারণের অধিকারভুক্ত, তথাপি কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আরো অধিকার থাকা দরকার; যথা, Specific mandate (প্রজার বিশেষ সম্মতি), Referendum (প্রজার সম্মতি গ্রহণ প্রথা), initiative (প্রজার দ্বারা প্রবর্ত্তনরীতি), Recall. (পদচ্যুত করিবার অধিকার)

আমরা উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতেই বর্ত্তমান গণতন্ত্র আন্দোলনের বেশ একটা আভাস পাওয়া যাইবে। এখন গণতন্ত্র প্রণালীর প্রধান প্রধান দোষগুলি আলোচনা করা যাউক।

(১) গণতন্ত্র প্রণালীতে শাসনকার্য্য উত্তমরূপে পরিচালিত হইতে পারে না। যে গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়, স্থায়ী, ক্ষমতাপন্ন, দক্ষ, সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল বিধায়ক এবং তাহাদের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই গবর্ণমেণ্টই ভাল; কিন্তু এখনো প্রজাগণ সময় সময় উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্বার্থদ্বারা পরিচালিত হয়, কাজেই উত্তম শাসনকর্ত্তার অভাবে শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

(২) গণতন্ত্রে কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধারা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ সাময়িক স্বার্থানুসারে শাসন করিয়া থাকেন, জাতির স্থায়ী শুভাশুভের প্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। তাহাদের শাসনকাল স্বল্প হওয়ায় তাহারা কেবল অদূর ভবিষ্যতে কিসে ভাল হইবে, কিসে মন্দ হইবে এবং কিসেই বা সুবিধা হইবে, তাহাই বিচার করিয়া থাকেন কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতের ফলাফলের উপর তাহাদের কোন দৃষ্টি থাকেনা বলিলেই চলে।

(৩) আজকাল জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন ভাব দেখা যায়। তাহারা সম্প্রতি প্রতিনিধিগণের কার্য্যাবলীর উপর খুব বেশী হস্তক্ষেপ করিতে ব্যস্ত। কাজেই প্রতিনিধিগণ নিজ বিচার শক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত পথ অনুসরণ করিতে পারেন না, তাহাদিগকে নির্ব্বাচনকারীদিগের মতের উপর নির্ভর করিতে হয়—উঁহাদের মত ভালই হউক কিংবা মন্দই হউক। কাজেই সর্ব্বসাধারণের হিতাহিতের দিকে তাহারা তাকাইতে পারেন না। আইনকর্ত্তারা ভয়ে ভয়ে কেবল সময়োপযোগী আইন করিয়া থাকেন এবং বিচারকগণ কপট ও অসাধু হইয়া উঠেন। ইহার ফল যে খুব খারাপ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

(৪) গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র সমূহে লোকের ভিতর অবাধ্যতা ও অরাজকতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অরাজক দেশে কেহই স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারে না।

(৫) গণতন্ত্রে নানাবিধ কুসংস্কার (Corruption) প্রবেশ করিয়াছে। উৎকোচ দ্বারা লোক বশীভূত ও লোকমত পরিবর্ত্তন করা হয়। বিভিন্ন দল সমূহ নিজ নিজ দল পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিতেও দ্বিধা বোধ করে না।

(৬) আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই—গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মবিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। একথা আংশিক সত্য হইলেও ইহার ব্যতিক্রম আছে। কোন দলের আদেশ ও নিয়মাবলীর অধীন থাকিতে গেলে ব্যক্তিত্বকে অল্প বিস্তর খর্ব্ব করিয়া চলিতে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

(৭) অধিকন্তু গণতন্ত্রে শাসনকার্য্য অধিকাংশের মতানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাদের মতটা জোর করিয়া অপরাপর সকলের ঘাড়ে চাপান হয়। কাজেই গণতন্ত্র যে সকলের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেকথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। তবে সকলের মত নির্ণয় করিবার কোন ভাল উপায় আছে কি না, সে অন্য কথা।

গণতন্ত্র নির্দ্দোষ নহে—একথা স্বীকার্য্য কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় কোন শাসন প্রণালীই দোষ শূন্য নহে। অধিকন্তু গণতন্ত্রের যুগ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আশা করা যায়, কিছু দিন পরেই ইহার দোষ সমূহ দূরীভূত হইবে। এই সব দোষ সত্ত্বেও গণতন্ত্রেরও আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে কেহই আপত্তি করিতে পারিবেন না। আদর্শ হিসাবে বিবিধ শাসনপ্রণালীর মধ্যে গণতন্ত্রের স্থান সর্ব্বোচ্চে। এতদ্ব্যতীত গণতন্ত্র সকলের প্রিয়। ইহার ভিত্তি ধর্ম্ম ও দেশহিতৈষিকতার উপর

প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য শাসন প্রণালীর ন্যায় গণতন্ত্র নিজ দোষ সমূহ গোপন করিয়া রাখিতে পারে না, ইহার দোষ গুলি শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক প্রকাশ হইয়া পড়িতে বাধ্য। অধিকন্তু গণতন্ত্র মূলক গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ রাখেন। তারপর গণতন্ত্রে শাসনকর্ত্তাগণেকে বিভিন্ন মতের লোকের ভিতর সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করিতে হয়, কাজেই তাঁহারা কোন বিষয়েই চরম পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না, সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে মধ্যমপথ অবলম্বন করিতে হয়। মিলের মতে যেখানে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে লোকমতের উপর অপর কোন শক্তি নাই, সেখানেই জাতীয় চরিত্র সহজে উন্নতি ও পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারে। কেবল মাত্র গণতন্ত্রই জনসাধারণের উক্ত অধিকার স্বীকার করে। কাজেই সংক্ষেপে বলিতে গেলে গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসন প্রণালী।

শ্রীমাখনলাল লাহিড়ী।

দরিদ্র ভোলানাথ।

ক্ষিধেয় তারে বিদেয় নাহি দেয়;
এম্নি ভালবাসে!
অভাব তারে জবাব দিতে গিয়ে,
নিত্য কাছে আসে!
দুঃখ তারে বক্ষে ক'রে রাখে—
ব্যথা-ভরা স্নেহে!
লাঞ্ছনাতে বঞ্চিত সে নহে—
লিপ্ত সারা-দেহে!
পীড়ন তাহার শরণ নিয়ে, বাঁধে
অস্থি মাঝে বাসা!
গঞ্জনা সে গুঞ্জনের ছাঁদে
কর্ণে কহে ভাষা!
বিদ্রুপের ভদ্রতার বাণী
নিত্য তার সাথে!
পুরস্কার—ঘৃণা তিরস্কার—
মালা সম মাথে!
বিশ্ব-হৃদি মন্থনেতে যত
উত্থিত গরল,
দরিদ্র সে ক্ষুদ্র ভোলানাথ
কণ্ঠে করে তল!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

স্নেহের দান।

(২৫)

মাখনকে পাইয়া ম্যানেজার বাবু নিজের দায়িত্ব অনেকটা লঘু মনে করিলেন। তিনি তাঁহাদের পরামর্শের সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর গুপ্ত উপদেশও ইঙ্গিতে তাহাকে জানাইলেন।

মাখন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"জমিদারী কার্য্যে আপনারা অভিজ্ঞ, এ বিষয় আমার পরামর্শ মোটেই গ্রহনীয় নহে। তবে আমার মনে হয় কি, আপনারা যদি এখন খড়্গা হস্ত হইয়াই বাড়ী হইতে এই লোক গুলিকে সরাইতে চেষ্টা করেন, ইহাদের স্ত্রী পুত্র, কন্যা, বধূ, শিশু, এগুলিকে লইয়া ইহারা এই আষাঢ়ের অন্ধকার রাত্রে কোথায় দাঁড়াইবে, ইহাও একটা চিন্তা স্থির করিয়া তাহা করিবেন। মা, ভগিনী, শিশু—ইহা যে মানুষ মাত্রেরই আছে, এ কথ আমাদিগকে এরূপ কার্য্যের প্রারম্ভে ভুলিয়া গেলে চলিবে না।"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন—"বেশ কথা, তাহা হইলে মেয়েদিগকে শিশুসহ বাহের বাড়ীর ঘরে, অতিথিশালায় ও অন্যান্য স্থানে সরাইয়া দিয়া ভিতর বাড়ী মুক্ত করা যাইতে পারে।"

মাখন—"পারে বটে; কিন্তু তাতে কি লাভ? স্বামীজী যদি আরামে আসিয়া রাত্রিতেই গদী অধিকার করিয়া বসেন—তখন তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে বাধা দবে কে?"

ম্যানেজার—"একদম্ হাজার উম্মেদ। একবার বাহির করিতে পারিলেই হয়। তারপর প্রবেশ করা খুব সহজ হইবে না। জোড় করিয়া বাহিরে রাখিব—আপনি কেবল বাবুকে .."

মাখন বাধা দিয়া বলিল—"বাবুকে রাখিতে পারিলেতো সবই হয়; সেতো এখন কেবল কল্পনার কথা; যাক, স্বামীজীর তহবিলখানাটার অবস্থা কি, তাহা এখন কাহার হস্তে?"

ম্যানেজার—"চারজন দারোয়ান ঘরের চার দরজায় মোতায়েন আছে। রাম কৃষ্ণ নামক একটা লোকের হাতে এখন তহবিল রক্ষার ভার। তাহার উপর দৃষ্টি রাখারও

পৃথক লোক রাখিয়াছি। তাহাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেওয়া হয় নাই।"

মাখন চুপে চুপে বলিল—"আর একটা গুরুতর চিন্তার বিষয় দেখুন; যদিই স্বামীজীর উপর কোন অত্যাচার হয়, একটা পুলিস এন্‌কোয়ারীতো কালই হইবে; এখন যদি আমরা এখানেও এ সকল লোককে বাহির করিয়া দেই—সেটা আমাদের পূর্ব্বাপর যোগ-সাজসেরই একটা মস্ত পোষক প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে—আপনি কি মনে করেন?"

ম্যানেজার বলিল—"এ চিন্তা যে আমরা করি নাই, তাহা নহে। পুলিসের প্রাপ্য দিতেই হইবে।"

মাখন একটু সংযত ভাবে বলিল—"ম্যানেজার বাবু এখন সার্ভিসের উমেদারীতে আছি; আমার যেন মনে হয়, আমাদের আজকার দিনটা একটু ইন্‌ডিফারেণ্ট থাকাই নিরাপদ। পুলিসের জন্য যদি কিছু ধরিয়াই থাকেন—তাহা খরচ করিয়া নিরাপদে কার্য্য করাই বোধ হয় সঙ্গত।

* * * * *

মন্ত্রনা শেষ হয় নাই; সুতরাং আহারের পর মাখন যাহের বাড়ীতেই চলিয়া গেল।

গোপাল তাহার জন্য বিছানা চাহিলে মাসীমা বলিলেন "মাখনের বিছানা বড় ঘরেই করা আছে, তাহাকে যাইয়া আসিতে বল।'

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া ছোট কর্ত্রীকে জানাইল—"আজনাকি রাত্রিতে অনেক পরামর্শ আছে; পড়গড়ীর কর্ত্তাও আসিবেন; তাঁহারা সকলে একত্র থাকিবেন।"

শুনিয়া ছোট কর্ত্রী আর আপত্তি করিলেন না।

রাত্রি ৮টায় একজন বাইক চালক আসিয়া সংবাদ দিল—মণিবাবু রাজেন্দ্র বাবুর সহিত ৭টায় রওয়ানা হইয়াছেন, স্বামীজী রাত্রি ৮টায় যাত্রা করিবেন।

* * * * *

রাত্রিতে কনক আর উঠিয়া খাইল না। মা কত সাধ্য সাধনা করিলেন—"দাদা তোর শুনিলে রাগ করিবে, কত ভালবাসে তোরে, কত কথা বলিবে বলিয়া আসিয়াছে। কাল-টাল্যা যাইবে—তোর জন্য কত পুস্তক আনিয়াছে—" কিছুতেই কনক উঠিল না। কিন্তু তাহারও ঘুম হইল না।

প্রথম রাত্রিতে কনক অভিমানে ফুঁফাইয়া কাঁদিল, তার পর অনুশোচনায় হৃদয় ভরিয়া গেল; তখন নিজের প্রতিই তাহার রাগ হইল—নিজের ক্রটীর কথাই মনে হইতে লাগিল। কেন তাহাকে অপমান করিয়া সরাইয়া দিলাম?

কনকের মনে হইতে লাগিল—যদি দাদা এখন আসিয়া আর একবার মাত্র ডাকিত, তবে তাহাকে পুনরায় লইয়া গিয়া বসিয়া খাইতাম। কনক ঘণ্টায় ঘণ্টায় এইরূপ আশার প্রতীক্ষা করিয়া বিষম উদ্বেগে রাত্রি কাটাইল—তারপর দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া শেষ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

(২৬)

সারাদিন গোলযোগ অবস্থায় থাকায় রাত্রিতে খুব গরম বোধ হইতেছিল; সে জন্য প্রথম রাত্রিতে মণির ভাল ঘুম হয় নাই।

আজ হটাৎ রাজেন্দ্র বাবুর কথায় মণির বিচিত্র সম্ভোগের চিন্তা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। একাকী শুইয়া শুইয়া সে তাহার ষ্টেটের কথা ও ঋণের কথাই ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—"রাজেনবাবু বলিলেন, দেড়লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে—কেবল মতি চাঁদের কুঠিতে; এই দুই বৎসরে, এরতো আমি কিছুই জানিনা। স্বামীজী চার বৎসরে বাহুল্য খরচ কমাইয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন—ইহাই ছিল বন্দোবস্ত। আমি তাহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত, এখন দেখিতেছি—সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত।"

এই দুশ্চিন্তা ও আনুসঙ্গিক বহু কুচিন্তা সমবেত হইয়া তাহার দুর্ব্বল মন আচ্ছন্ন ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপ চিন্তায় চিন্তায় ক্লান্তচিত্তে মণির তন্দ্রার ভাব আসিয়াছিল; সেই অবস্থায় মণি স্বপ্ন দেখিতেছিল—মণি ও মাখন তাহার গ্রীন বোটে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে; ক্ষুদ্র খালের পথ, দুইদিক হইতে অন্নহীন দরিদ্র কৃষকেরা উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহাদিগের নিকট অন্নভিক্ষা চাহিতেছে। মাখন বলিতেছে, মণি, ইহারই নাম জনসেবা; দরিদ্র নারায়ণের সেবা; ইহাতে কার্পণ্য করিও না। ভগবান শক্তিবানের হাতেই অর্থ দেন—দরিদ্রের সেবার জন্য, কুকার্য্যে প্রশ্রয় দান জন্য নহে। ধনের ব্যয়েও শক্তির পরিচয় আছে। টাকায় মানুষ চিনিবার শক্তি মানুষের টাকা চিনিবার শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী।

টাকার চারি চোখ, মানুষের মাত্র দুটী চোখ। দাও দুহাতে চদিকে ফেলিয়া—দাও। না, না, এঁকে দিওনা—ও—ও—"

তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দরজায় শব্দ হইতেছিল। মণি, স্বামীজী আসিয়াছেন ভাবিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিল।

স্বামীজীকে না দেখিয়া মণি জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যা খবর? স্বামীজী আয়া হ্যায়?"

"মহারাজ স্বামীজী খুন হোয়া—কোচ্‌ওয়ান খালি গাড়ী লেকের আয়া...."

মণি ত্রস্তপদে বাহির হইল। বারান্দার সম্মুখেই গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। মণিবাবুকে সম্মুখে দেখিয়া কোচ্‌ম্যান সেলাম জানাইয়া তাহার বিচিত্র ভাষায়, সে যে দুঃসংবাদ প্রদান করিল তাহা এইরূপ—

ঠিক ৮টায়ই রওয়ানা হইয়াছিলাম। দরজা বন্ধ ছিল, স্বামীজী ঘুমাইতে ছিলেন। গাড়ীর ভিতরে পাটাতন ফেলিয়া তাঁহার ঘুমের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বংশীর মাঠের মধ্যখানে আসিলে হটাৎ ৮। ১০ জন লোক পাট খেত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ী আটকাইয়া ফেলিল। তারপর স্বামীজীকে চুলে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। তিনি একটী মাত্র চীৎকার করিয়াছিলেন। তখন ঘোড়া লাফাইয়া উঠিয়া খালি গাড়ী সহ দৌড়িতে লাগিল; আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না। লোক গুলিকেও চিনিতে পারিলাম না। কিছু দূরে আসিয়া ঘোড়া থামিলে; আমরা গিয়া আর লোক গুলিকে দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী ঘুরাইয়া আনিয়া আমরা স্বামীজীকে অতি কষ্টে গাড়ীতে তুলিয়া পুনরায় রূপগঞ্জ নিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে রাখিয়া আসিয়াছি; থানাতেও এজাহার দিয়া আসিয়াছি।

শুনিয়া মণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"কিরূপ অবস্থা তাঁর? বেহুঁস অবস্থা কি?.. ..."

"হাঁ হুজুর, বেহুঁস; মাথা ও পিঠের গুর্দ্দান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে"

মণি ধীরে ধীরে আসিয়া রামকৃষ্ণকে সে সংবাদ দিল। ক্রমে শিষ্য সেবকেরা সকলেই শুনিল। রামকৃষ্ণের নিকট মণি-কোঠার চাবি ছিল। তাহাকে দারওয়ান বাহির হইতে দিল না। বহু শিষ্য এই সংবাদ পাইয়া রাত্রিতেই রূপগঞ্জ রওয়ানা হইয়া গেল।

দ্বাররক্ষক পাঁড়েজী ভাণ্ডার খানায় কর্ত্তা মহারাজ অর্থাৎ মণি বাবুকে ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিল না; অথবা ভাণ্ডার খানা হইতে রামকৃষ্ণকেও বাহির হইতে দিল না। পাঁড়ের এইরূপ ব্যবহারে মণিবাবু একবার মাত্র ধমক দিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—কাঁহে তোম লোক লোকজনকো এইছা দিক করতেহেঁ?"

পাঁড়েজী সঙ্গীন নোয়াইয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল—"কর্ত্তা মাইকা হুকুম মহারাজ।"

শুনিয়া মণি আর দ্বিরুক্তি করিলনা।

মণির মন দুঃশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। কোঠার ভিতরে বসিয়া বা শুইয়া, আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, এমন একজন উপদেষ্টার জন্য, যে আজ এ দুঃসময়ে তাহাকে দুটী সদোপদেশ দিয়া তাহার অস্থির হৃদয়কে অবিচলিত রাখিতে পারে। ভোর না হইতেই হয়ত পুলিসের ফৌজ আসিয়া বাড়ীটাকে পুলিসের আড্ডায় পরিণত করিয়া বসিবে। আর কিছু না হউক, অর্থ বৃষ্টি যে এইরূপ ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, মণি তাহা বুঝিয়াছিল, এবং সে চিন্তায়ই তাহার উদ্‌বেগ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মন তাহার এই দুশ্চিন্তার ভিতরও মাখনের মত একটা অন্তরঙ্গ লোক, ম্যানেজারের মত একটা গম্ভীর অথচ সৎ পরামর্শদাতা লোকের কথাই বেশী করিয়া ভাবিতেছিল।

দুই হিস্তার মধ্যস্থলে যে দীর্ঘ এজমালী দালান—দুই হিস্তারই বাহের খণ্ডকে ভিতর খণ্ড হইতে পৃথক করিতেছিল, সেই দালানের দীর্ঘ-বারান্দায় পদচারণা করিতে করিতে মণি এই সকল কথা ভাবিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে রাত শেষ হইল। মণির চিন্তার বিরাম নাই। ক্রমে অন্ধকার কাটিয়া পূর্ব্বাকাশে উষার আলো ফুটিয়া উঠিল—মণি স্থির করিল—এখনই মাখনকে একটা টেলিগ্রাফ করা যাউক; তারপর ম্যানেজারকে ডাকাইয়া লইয়া পরামর্শ করা যাইবে।

মণি ছোট হিস্তার বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই সকল কথা ভাবিতে ছিল। সহসা খট্ করিয়া তাহার পার্শ্বের দরজা

খুলিয়া গেল।

মণি চমকিয়া উঠিল—"একি মাখন তুমি?" ...

মাখন ও মণিকে এই সময় এইস্থানে দেখিয়া—আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া গেল। মাখন বলিল—"দুর্গা, দুর্গা, সাধু দেখিয়া রাত্রি প্রভাত হইল। দেখা যাউক—আজকার দিনের ফল—কি প্রকার হয়।"

মণি মাখনকে টানিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। মাখনও মণিকে সেইরূপে ধরিয়া বলিল—"সাধু সংস্পর্শে অঙ্গ শীতল হইল! ভাই, যুধিষ্ঠির স্বর্গের সিড়িতে উঠিয়াও কুকুরটাকে ভুলিতে পারেন নাই। আর তুমি এই মর্ত্তে থাকিয়াও এ অধমগুলিকে ভুলিয়া গেলে! আচ্ছা ভাই, স্বর্গটা আর কত দূরে, একটা হিসাব নিকাশ হইতেছে কি?"

মণি মাটির দিকে মাথা নত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কবে আসিলে?

মাখন বলিল—"আমিতো এখানেই আছি।"

মণি—"তবে আমার খবর করিলে না কেন?"

মাখন—"তোমার মা তো রোজ তোমার খবর লইয়া থাকেন। মাতৃপদে যার এমন মতি—তার খবর আমরা ইতর জনের লইবার শক্তি কি? আর আমরা তো স্বর্গের কাঙ্গালী নই যে লেজ ধরিয়া পাড় পাইব। যাক্ ভাল থাকিলেই ভাল।"

মণি কাতর স্বরে বলিল—"আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া আমাকে পীড়িত করিয়া তুমি কি খুব সুখ অনুভব করিতেছ ভাই?"

মাখন নরম হইয়া বলিল—"তোমার যে কাটা ঘা কোথায়, আমি তো তা জানিনা! নুনকে আমি ভাল জিনিস বলিয়াই সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকি। যাক্, তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট হইতেছে, তুমি যাও; আমিও প্রকৃতির আহ্বান এবং ধর্ম্মের যোগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করি গিয়া। অবসর থাকিলে দেখা করিও।"

মণি মাখনের গলা দুই হাতে বেড়িয়া ধরিয়া তাহার ঘাড়ের উপর মুখ রাখিয়া বলিল—"ভাই, একটু হৃদয়ের দিকে চাহিয়া কথা বল ভাই; আমি বড়ই বিপন্ন, বড়ই অবসন্ন; আমার সদোপদেশ দাও, বন্ধুভাবে হৃদয়ে স্থান দাও।"

মাখন রাত্রির কোন খবর জানিত না; একটা কোন কিছুর আশঙ্কা করিতেছিল মাত্র। মণির কথায় বলিল—"তুমি যে কিরূপ বিপন্ন, কিরূপে অবসন্ন, তাহার তো কোন খবর আমি জানি না।..."

মণি বলিল—"স্বামীজী কাল রাত্রিকালে আহত হইয়াছেন; তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে ..."

ইহার পর মণি মাখনকে তাহার দুশ্চিন্তার কথা সকল বলিয়া উপায়হীনের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাখন নরম হইয়া বলিল—"ক্ষমা কর ভাই। আমি এ খবর কেমন করিয়া জানিব? এখন জানিলাম যাও তুমিও হাত মুখ ধোও; আমিও আসি। তারপর ম্যানেজার বাবুকেও ডাকান যাউক। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন নিশ্চয় প্রয়োজন।"

সেই দিনই অপরাহ্নে দারগা আসিয়া ডহরের তদন্ত সমাপন করিয়া গড়গড়ি চলিয়া গেলেন। পরদিন স্বামীজীর অবশিষ্ট শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে পাথেয় দিয়া স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্য বিদায় করা হইল। রামকৃষ্ণ তহবিল বুঝাইয়া দিবার জন্য রহিয়া গেল মাত্র।

মণির মা বাড়ী আসিলেন। দরজার তালা খুলিতে যাইয়া তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার তালাটী বদলাইয়া সেই স্থানে পৃথক তালা লাগান রহিয়াছে।

দরজা খোলা হইলে কর্ত্রী ঘরে গিয়া তাঁহার সিন্দুকের অবস্থা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও মাখন রে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে—মণি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

মণি ও মাখন গিয়া দেখিল—লোহার সিন্দুকের তালা ভাঙ্গা।

অবস্থা দেখিয়া তাহারা উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন রামকৃষ্ণ হইতে চাবি লইয়া স্বামীজীর মণিকোঠার সিন্দুক খোলা হইল এবং তাহাতে বড়কর্ত্রীর অনেক নোট ও মোহর পাওয়া গেল। অলঙ্কার পত্র ও নগদ টাকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অপমান ও নির্য্যাতনের ভয়ে রামকৃষ্ণ সরল ভাবে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মণি নতমস্তকে সকল কথা শুনিল!

———

তিনটি

(পল্টু দাসের হিন্দী হইতে)

জগৎ মাঝে সবার মনই করতে পারি হরণ।
সবারেই প্রাণের মাঝে করবো আমি বরণ॥
কিন্তু আমি তিন জনাতে হবই নাকো রাজী।
আর কেহ নয় সে তিন জনা—বৈরাগী, পণ্ডিত, কাজী॥

জীবন-সমস্যার একদিক।

দেশের সর্ব্বতোমুখী এই জাগরণের দিনে প্রত্যেক দেশবাসীর আহার্য্য-সমস্যা-সমাধান সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক মনে হয়। দিন দিন খাদ্য দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য ও দুর্ল্লভ হইতেছে—সামান্য গৃহস্থ হইতে ধনীগণ পর্য্যন্ত—দেশের প্রায় সর্ব্বত্র সকলেই এজন্য ন্যূনাধিক ক্লেশ অনুভব করিতেছে। পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবে দেশবাসী ক্রমেই নানাপ্রকার অজ্ঞাতপূর্ব্ব রোগাক্রান্ত হইয়া অসুস্থ দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইতেছে। সুতরাং অল্প ব্যয়ে আহার্য্যের উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করা আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার পক্ষে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

অন্নের সহিত দুগ্ধ, মৎস্য, ডাল ও তরিতরকারীই সাধারণতঃ বাঙ্গালীর জীবনধারণোপযোগী চির প্রচলিত পুষ্টিকর খাদ্য। অধুনা ডা'ল ব্যতীত অন্যান্য প্রায় প্রত্যেক খাদ্যই শুধু দুর্ম্মূল্য নহে—দুষ্প্রাপ্যও হইয়া পড়িয়াছে। ডা'লও মহার্ঘ্য হইয়াছে বটে, তবে নানাদেশ হইতে আমদানী হওয়ায় দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। কিন্তু ডা'ল অতি দুষ্পাচ্য খাদ্য; দুর্ব্বল অজীর্ণ রোগগ্রস্ত অধিকাংশ বাঙ্গালী তাহা সম্যক্ পরিপাক করিয়া বলসঞ্চয় করিতে অসমর্থ। কাজেই দুগ্ধ মৎস্য ও তরিতরকারীই একণে আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু গো-জাতির দ্রুত অবনতিতে এখন গব্য দ্রব্যাদিও এদেশে অতি দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যকালে আমরা যে স্থলে টাকায় অন্যূন ষোল সের খাঁটী দুগ্ধ দেখিয়াছি, আজ এই চল্লিশ বৎসরে তথায় টাকায় মাত্র দুইসের খাঁটী দুগ্ধ পাই। সুতরাং দৈন্যপ্রপীড়িত বাঙ্গালী আজ সে অমৃতোপম খাদ্য কচিৎ নয়নে প্রত্যক্ষ করিতে পায়। তদ্দ্বারা রসনাতৃপ্তির সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত না হইলেও অতি সত্বরেই—"কান্তে-কাণার দুধ"—প্রবাদের সার্থকতা যে ক্ষীণদৃষ্টি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যে ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারপর মৎস্য। নৈসর্গিক কারণে এবং রক্ষাকল্পে যত্ন চেষ্টার অমার্জ্জনীয় শৈথিল্যে নদী খাল বিলাদিতে ক্রমেই জলাভাব ঘটিতেছে। দেশে পুষ্করিণী খনন একালের লোক আর ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করে না। বিত্তশালীগণ যে কেবল এপক্ষে উদাসীন তাহাই নহে,—অল্লাধিক বিঘ্নদায়কও বটে। কাজেই মৎস্যও আজ কাল দুর্ল্লভ সুতরাং দুর্ম্মূল্য।

বাঙ্গালীর শেষ সম্বল তরিতরকারী। পূর্ব্বে এদেশের সাত্ত্বিক প্রকৃতির হিন্দুগণ নিরামিশাষী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যে দুর্ব্বল ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্র সমূহও বহুস্থলে নিরামিষ আহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণতো আজকাল জান্তব খাদ্যের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া শতমুখে নিরামিষ আহারের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু হায়! বাঙ্গালা আজ সে সম্পদেও দীন হইতে দীনতর হইতে চলিয়াছে! যে সময়ে সমগ্র পাশ্চাত্য ভূভাগ ও যুক্তরাজ্য দ্রুতগতিতে শাক সব্জীর ক্রমোন্নতি সাধন ও নব নব শঙ্কর জাতীয় ফল মূল তরিতরকারীর উৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত ও তৎপর, এদেশে তখন অসাধারণ আলস্যের ফলে পৈত্রিক সম্পত্তি—দেশের স্বভাবজাত উৎকৃষ্ট ফল মূলাদি হইতেও বঞ্চিত হইতে অগ্রসর। রুগ্ন ভগ্নদেহে অনশন অর্দ্ধাশনের জ্বালা আমরা বিশ্রাম-শয্যায় শায়িত অবস্থায় পরের প্রতি অসার তর্জ্জন গর্জ্জনেই নির্ব্বাপিত করিয়া শান্তি লাভ করি; পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া যে প্রতিকার পক্ষে হস্ত সঞ্চালন করিব, সে শক্তিও আমাদের লুপ্ত অথবা লোপোন্মুখ। স্বাধীনতা হীনতায় আমরা যতটা দাস-মনোভাব পাইয়াছি বলিয়া অধুনা আন্দোলন উঠিয়াছে, ততোধিক দাস-মনোভাব বোধ হয় আমরা লাভ করিতেছি উৎকট আলস্যাধীনতায়।

আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখেই ঐ রব। আমরা রাজনীতি ভাল বুঝিনা. তাই ঠিক বলিতে পারি না—রাজনীতিই আগে না উদরনীতিই আগে। তবে এটা বুঝি যে রুগ্ন দুর্ব্বল অভুক্তের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ দূরদেশে পৌছায় না। আর একথাটাও ঠিক যে দেশশুদ্ধ আপামর সাধারণ সকলেই রাজনৈতিক বা অন্য কিছু গুরুতর কর্ত্তব্যেও সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত নহেন। সুতরাং অন্ততঃ অবসর সময়েও আহার্য্য সমস্যার সমাধান বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে বোধ হয় উপকার বই অপকারের সম্ভাবনা নাই। গৃহ সংস্কার, পল্লী সংস্কার, স্বাস্থ্যচর্চ্চা, অন্ন ও বস্ত্র সমস্যার মীমাংসা প্রভৃতি বহু সংকল্পের নির্ঘণ্ট নানা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রচারিত হইতে দেখিয়াছিলাম—দেখিয়া আশ্বস্ত ও আশান্বিতও হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক খদ্দর প্রচলনের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কোন সঙ্কল্পই মূর্ত্ত হইতে দেখা গেল না। আমরা কাহাকেও অনুযোগ দিবার ধৃষ্টতা রাখি না। সমগ্র দেশবাসীকে সাগ্রহে কেবল অনুরোধ করি—এদিকে তাহাদের দৃষ্টি পতিত হউক!

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা ইত্যাদি আহার্য্যের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জীবন ধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য্য চাউল ডা'ল আদি শস্য উৎপাদনের জন্যও যে গো-জাতির উন্নতি বিধান আবশ্যক, তাহা বোধ হয় লেখা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমানকালে পল্লীগ্রামে যাঁহারা বাস করেন বা কার্য্য-ব্যপদেশে আসেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই চাষের রুগ্ন দুর্ব্বল কঙ্কালসার বলদ-গাভী প্রভৃতি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন এবং ক্ষণেকের জন্যও হয়তো মানবের পরম কল্যাণ বিধায়ক এই নিরীহ মূক জাতির শোচনীয় অবস্থার জন্য অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অন্ততঃ বিবেকের মৃদু আঘাত ও অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু আমরাতো কই আজও এই জীবন মরণের মীমাংসিত সত্য স্বরূপ গো-জাতির রক্ষা ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য দেশময় কোনো সুনিয়ন্ত্রিত আয়োজন করিতেছি না। গো-রক্ষা কল্পে এদেশে যে দুই একটী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে তাহার মূলেও মাড়োয়ারী বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী—বাঙ্গালার প্রবাসী ভদ্রমণ্ডলী। তাহাদের আগ্রহে দুই দশজন বাঙ্গালী তৎসহ যোগ দিয়াছেন মাত্র। অবস্থার গুরুত্বানুযায়ী কোন অনুষ্ঠানই হয় নাই। অবশ্য একথা সত্য যে রাজশক্তির সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট ব্যাপার সম্পাদন সম্ভবপর নহে; কিন্তু আমাদের এদিকে লক্ষ্য কই,—আগ্রহ কই,—সমবেত চেষ্টা কই?—যদি থাকিত, তবে রাজার হৃদয় গলিত, আ..ন টলিত—রাজা সাহায্য না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে স্বতন্ত্র আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

তারপর নদী খাল বিল প্রভৃতির সংস্কার, পুষ্করিণী খনন ও পঙ্কোদ্ধার সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই অবস্থা। মৎস্যাদি খাদ্য দূরে থাক্ যেদেশে বিশুদ্ধ পানীয় জলাভাবে অজীর্ণ উদরাময় বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে সহস্র সহস্র নরনারী প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে; লক্ষ লক্ষ লোক বৎসরের অনূন এক তৃতীয়াংশ কাল শুষ্ক কণ্ঠ চাতকের মত তৃষ্ণায় ছট্ ফট্ করিয়া থাকে এবং শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী দেশবাসী নীরব ঔদাস্যে বারেকের জন্যও তাহাদের দিকে তাকাইয়া দেখিবার প্রয়োজন মনে করেন না, সেদেশে মৎস্যের উন্নতির প্রত্যাশা করা বাতুলতা বই আর কি হইতে পারে? ইহাও বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য। রাজা ও দেশের ধনী সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই অভাব দুরীকরণ সুদূর পরাহত। *

যাহা হউক, এ বিষয়ের বিস্তৃত অনুশীলন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এক্ষণে বাঙ্গালীর অবশিষ্ট (কিন্তু অপকৃষ্ট নয়) খাদ্য তরকারী সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজকাল তরিতরকারী স্বাস্থ্যের পক্ষে—বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী খাদ্য বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। কিন্তু বাহুবিলাস-স্পৃহা আমাদের এদেশের আপামর

* আমি বঙ্গীয় লাট-সভায় দেশের নদী খাল প্রভৃতি জলাশয়ের সংস্কারের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছিলাম; গভর্ণমেণ্টও আমাকে কতকটা আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপর আমার দীর্ঘকাল ব্যাপী অসুস্থতা ও অন্যান্য নানাকারণে আর কোন চেষ্টা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। ভগবানের কৃপা হইলে আমি পুনরায় চেষ্টা করিব। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না;—দেশবাসীর সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। প্র—লে।

সাধারণের মনে এরূপ মোহের সৃষ্টি করিয়াছে যে গৃহস্থগণতো দূরের কথা কৃষকরাও নিজ গৃহের 'আনাচ কানাচ' পর্য্যন্ত পাটের চাষে আবদ্ধ করিয়া তরকারী ক্রয় করিয়া খাওয়াই সুবিধাজনক মনে করিয়াছে। ফলে, রাজার 'দুধ-পুকুরের' দুধ জলে পরিণত হওয়ার ন্যায় সকলেই হাট বাজারে তরকারী পাইবার আশা করিয়া থাকে;—কিন্তু অধিকাংশ কৃষকই তরকারীর চাষ না করায় উহা ক্রমে দুর্ঘট ও মহার্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে।

সেদিন আমার পরিচিত কোন ভদ্রলোক (ইনি নিজ বাটীতে প্রয়োজনীয় তরিতরকারীর আবাদ করেন) জনৈক কৃষককে বাজার হইতে কচু ক্রয় করিতে দেখিয়া দুঃখের সহিত তাহাকে বলিয়াছিলেন—"ভাই, তোমরাও কচু কিনিয়া খাও; বাড়ীতে চাষ করনা কেন?" চাষীভায়া কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল! কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তি বোধ হয় তাহার ছিল না, এবং সম্ভবতঃ পাট বিক্রীর টাকা তখনও তাহার হাতে কিছু ছিল। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাহার মনে হইয়াছিল যে,—"আমরা চাষা বলিয়া কি তরকারী কিনিয়া খাইতে পারিনা,—আমরা কি এতই অধম?"—তাই ভদ্রলোককে কঠোর ভাষায় দুই চারি কথা শুনাইয়াও দিয়াছিল।

কৃষকের এই আচরণে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কারণ, উচ্চ আদর্শ অনুকরণের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই মানুষের মধ্যে রহিয়াছে। সেকালে ভদ্রগৃহস্থমাত্রেরই ফল-তরকারীর বাগান থাকিত, পয়স্বিনী গাভী থাকিত, পুকুরে মাছ থাকিত; তাঁহারা এই সকলের উন্নতিকল্পে কেবল যে তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাই নহে,—অনেক স্থলে স্বহস্তে গরুর সেবা যত্ন করিতেন, তরিতরকারীর আবাদ করিতেন, পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতেন। ফলে, সেই আদর্শ অনুসরণে নিরক্ষর সরলপ্রাণ কৃষকগণও এই সকল কার্য্যে অনুরাগী ও উৎসাহশীল ছিল। এখন আমরাও এই সকল জীবন-সমস্যা সমাধানের একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলির প্রতি উদাসীন হইয়াছি, এবং সেই কুদৃষ্টান্ত কৃষককুলের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া কুফল প্রসব করিতেছে। একটা সাধারণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই পাঠক আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে এদেশের ভদ্রমণ্ডলী সাধারণতঃ সর্ব্বদা খালি গায়েই থাকিতেন। রাজ দরবারে বা কোন বিশিষ্ট স্থানে গমন কালেই জামা পরিধান করিতেন মাত্র। সেই দৃষ্টান্তে নিরক্ষর লোকেরাও পিরাণ কোট ইত্যাদি বড় একটা গায়ে দিত না, কচিৎ দুই একটী মোড়ল বা বর্দ্ধিষ্ণু শ্রেণীর কৃষকই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে উহা ব্যবহার করিত। এক্ষণে বর্ত্তমান সভ্যতার উন্মেষে আমরাও যেমন অকারণে দারুণ গ্রীষ্মেও জামা কোট পরিয়া দেহটীকে শীতাতপ সহনে অযোগ্য ননীর পুতুলে পরিণত করিতেছি,—নিরক্ষর অনুকরণপ্রিয় কৃষককুলও ইহাকেই সভ্যতার অঙ্গ মনে করিয়া বাবুদের অনুকরণে অযথা নিজ দৈন্য বৃদ্ধি করিয়াও জামা কোট প্রভৃতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অপরিণামদর্শিতার কথা মনে করিয়া প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে চাই না। আমরা এক্ষণে এই সকল দুর্দ্দশা দূরীকরণ মানসে শিক্ষিত সুধী দেশবাসীগণের কর্ম্ম সহায়তা প্রার্থনা করি। তাঁহারা এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিলে দিন দিন দেশের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এমনই এক শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইবে, যাহার কল্পনায়ও দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। দেশের শিক্ষিত সমাজ এই কার্য্যে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করুন, বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে আবাদ করিয়া প্রয়োজনীয় তরিতরকারী ফলমূলাদি উৎপাদন করিয়া নিজ নিজ অভাব পূরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে তদ্দ্বারা কৃষকগণকে স্বতঃপরতঃ শিক্ষাদান করিয়া তুলুন।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে আমরা তরিতরকারী ও ফলমূলাদি উৎপাদন সম্বন্ধে প্রতি মাসেই ধারাবাহিকরূপে "সৌরভে" আলোচনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। চিন্তাশীল দেশবাসীগণও যদি এতদুদ্দেশ্যে নিজ নিজ অভিমত সৌরভে জ্ঞাপন করেন, তবে আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

লোমশ মানব।

এ পর্য্যন্ত জগতের যে সকল লোমশ মানবের সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, জুলিয়া পেষ্ট্রনাই তাহাদিগের মধ্যে

জগতের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে। জুলিয়ার পিতৃ গৃহ মেক্সিকো দেশে ছিল। জুলিয়ার গোফ ছিল না কিন্তু দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল। তাহার মাথার চুলগুলি ঠিক সজারু কাটার মত ছিল। চুয়ালের সম্মুখের দন্ত গুলিও ছিল না।

যৌবনে পেট্রনার বিবাহ হয় এবং যথা সময়ে তাহার একটী সন্তানও জন্মগ্রহণ করে।

জুলিয়া পেট্রনা।

বিবাহের পর পেট্রনা স্বামীর সহিত রুষিয়ার প্রাচীন রাজধানী মস্কোতে বাস করিতেছিল। এই স্থানেই ১৮৬০ সালে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার সন্তানটীও মারা যায়। উভয়ের দেহই Praucher's museumএ স্পিরিট সংযোগে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

লোমশ মানবের আদি পুরুষ—সিউমঙ্গ।

এসিয়ার লোমশ মানব সমাজের যে বংশ বিস্তৃত হইয়াছে মানব তত্ত্ববিদ গণের মতে ঐ বংশের আদি পুরুষ—সিউমঙ্গ।

রুষিয়া দেশবাসী একটী লোমশ মানব।

রুষিয়ার ও লোমশ পরিবার বিরল নহে। রুষিয়ার লোমশ মানবের আকৃতি ঠিক সেন্টবানর্ড কুকুরের ন্যায়।

একটী লোমশ বালিকা।

১৮৯৭ সালের লণ্ডন প্রদর্শনীতে দক্ষিণ ইয়ুরোপের যে একটী সুন্দরী লোমশ বালিকাকে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার সারা শরীর লোমযুক্ত জামাতে যেন আটা ছিল।

মান্দালায় একটী লোমশ পরিবার আছে, বর্ত্তমান সময় তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ লোমশ পরিবার।

একরাত্রির অতিথি।

(১)

আমার পর্ণকুটীর সমুখে দীঘির দখিন পাড়ে,
জুটিল আসিয়া কুলী নরনারী সাঁঝে পউষের জাড়ে।
দল বেঁধে তারা এসে ময়দানে পাতে সংসার ভারী ;
আহারের তরে একসাথে সবে কাজ করে তাড়াতাড়ি।
মাটি খুঁড়ে কেহ চুল্লী গড়িয়া ইট এনে উঁচু করে,
কেহ রন্ধন-ইন্ধন লাগি শুধু সন্ধানি' মরে।
গাগরি ভরিয়া জল এনে কেহ মিছে করে কোলাহল ;
কেহ বসিবার ছালাটি বিছায়ে গায়ে দিল কম্বল!
কড়াই ভরিয়ে তণ্ডুল নিয়ে কেহ বা আনিল ধুয়ে ;
কেহ শিশু নিয়ে বুকে তাও দিয়ে গরম করিছে শুয়ে।
সকলের প্রাণে আছে সন্তোষ, কোনো অশান্তি নাই ;
বেড়াবার ছলে পথে যেতে যেতে চেয়ে চেয়ে দেখি তাই।

(২)

ক্ষুধার তাড়নে এসেছে বঙ্গে ছাড়িয়া আজমগড় ;
তোয়াকা কভু করে না কারেও এই দুনিয়ার পর।
মাটি কেটে এরা পুকুর বানায়, পথ গড়ে বিল ভরি'
মোটা ভাতে সদা আনন্দে রহে খায় না ভিক্ষা করি'।
ছয়টি ঋতুরে করিয়াছে বশ, প্রকৃতির সন্তান!
আপিসে আপিসে চাকুরী কখনো নাহি করে সন্ধান!
অল্পে তুষ্ট, হয় না রুষ্ট, ইহারা জিতেন্দ্রিয় ;
এদের সরল জীবন যাপন সুন্দর রমণীয়!
পুরুষের সে কি বিশাল বক্ষ, নারীর নিটোল রূপ ;
পাথর-খোদানো চেহারা নেহারি' মেরে আছি নিশ্চুপ!
নড়্‌বোড়ে দেঁতো যুবা বাঙ্গালীর ঘুচিল মনের ভ্রম ;
জগতে কখনো তুচ্ছ হবে না কায়িক পরিশ্রম।

(৩)

বলিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছি, ঠিক কথা পড়ে মনে ;
ভোরে কোথা গেল, দেখা নাহি হোলো আর তাহাদের সনে!
পোড়া চুল্লীর চিহ্ন রয়েছে, অতিথিরা গেছে চলি'।
আজ বিচ্ছেদে আঁখি দিয়ে হৃদি পড়িতেছে গলি' গলি'।
কথা জমাবার হয়নি সুযোগ, তবু বাসিয়াছি ভালো ;
এক রাত্রির অতিথিরা প্রাণে জ্বালালো প্রীতির আলো।
দাঁড়ায়ে দেখেছি দু চার পলক, কত কথা ভেবে মরি!
নিয়ত যাদেরে বাসিতেছি ভালো, তারা গেলে কি যে করি।
এদের মতন যদিও প্রবাসী, অধিক উপার্জ্জন ;
তথাপি চিত্ত হোলো না তৃপ্ত, অভাব বিলক্ষণ!
বড় সাধ হয় এদের সঙ্গে প্রাণ বিনিময় করি!
নূতন করিয়া বাঙ্গালী-জীবন ভেঙ্গে চুরে পুনঃ গড়ি!

(৪)

নাহি পিতামহ, গেছেন পিতাও, ভগিনীও গেল চলি'!
সদা জ্বলন্ত স্মৃতির চুল্লী আমিও যাইব জ্বলি'।
আমিও প্রবাসী উহাদের মত, খাটিতে এসেছি ভবে ;
উহারা স্বাধীন, আমি পরাধীন, তফাৎ এইতো হবে।
কিছু পড়ে' শুনে' গেছি 'বাবু' বনে', লেখনী চালাই শুধু ;
ত্যাগের মহিমা ভুলিতে বসেছি, জীবন করিছে ধু ধু!
ভাগ্য বিধাতা তাই বুঝি মোরে ফিরায়ে আনিতে আজি,
এক রাত্রির অতিথির রূপে সমুখে আসিল সাজি'!
প্রকৃতির বুকে নাচিয়া কুদিয়া কীর্ত্তি যাইব রাখি ;
সহসা কোথায় চলিয়া যাইব প্রিয়জনে দিয়ে ফাঁকি।
আমারি মতন কেহবা কাঁদিবে—দগ্ধ চুল্লী সম,
রঙ্গ-ব্যঙ্গ-হাহাকার-ভরা রহিবে কবিতা মম।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা।

(১)

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটী যে মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের ন্যায় সম্পূর্ণ একখানা পৃথক গ্রন্থ, এ মত শিক্ষিত সমজে খুব প্রবল ; আমরা এই গ্রন্থের স্থানে স্থানেও তাহার আলোচনা করিয়াছি ; প্রয়োজন হইলে গ্রন্থান্তরেও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

রামায়ণের আদিকাণ্ড বা বালকাণ্ডকেও কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। লঘুরামায়ণের গ্রন্থকার তাঁহাদের মধ্যে একজন। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—

বৃত্তং প্রথয় রামস্য যথাতে নারদাচ্ছ্রুতম।
সহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্‌বৃত্তং তস্য ধীরতঃ॥" ৩৩।১।২

অর্থ—তুমি নারদের নিকট রামের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছ, সেইরূপে তাহা প্রকাশ কর।

লঘু রামায়ণের "বৃত্তং প্রথয়" স্থলে আমাদের গ্রন্থে আছে 'বৃত্তংকথয়'; ইহাতে অর্থের কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

এই শ্লোকটী হইতে নাকি লঘু রামায়ণকার মনে করেন যে বাল্মীকির রামায়ণ আদিতে অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত ছিল। পরে তাহাতে উত্তরকাণ্ড এবং আদিকাণ্ড রামায়ণে যুক্ত করা হইয়াছে।

আমরা দ্বিতীয় সর্গের এই ব্রহ্মার উক্তিকে রামায়ণের সংগ্রহ কারকেরও পরের, অপর কোন ব্যক্তির রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং এইরূপ মনে করিবার কারণ যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

এই উক্তিটীকে সংগ্রাহকের মুখবন্ধের অন্তর্গত ধরিয়া লইলেও তাহা হইতে সমগ্র আদিকাণ্ড যে এইরূপ নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়া রচনা করা যাইতে পারে না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। সত্য বটে, প্রথম সর্গের প্রস্তাবনায় আছে, নারদ বাল্মীকির নিকট রামের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন— "ঈদৃশ গুণ যুক্ত যে রাম, সেই রামকে মহিপতি দশরথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলে......বিমাতা কৈকেয়ীর প্রীতির জন্য পিতৃ আজ্ঞানুসারে তিনি বনে গমন করিলেন। এবং ইহাও সত্য যে এই স্থল হইতেই গ্রন্থ আরম্ভ হওয়া উচিত।

লঘু রামায়ণকার তাহাই মনে করিতেছেন। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন।

রামের বনে গমন হইতে নারদের বিবৃতি আরম্ভ হওয়ায় এবং সেই বিবৃতির উপর ব্রহ্মার অনুমোদ থাকায়—লঘু রামায়ণকার আদিকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততার যে কারণ অনুমান করেন, আমাদের মনে হয়, এই কারণ অতি অকিঞ্চিৎ কর।

মহাকবি বাল্মীকি সম্বন্ধীয় উদ্‌ভট গল্প কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যদি তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে এই পরবর্ত্তী কাল্পনিক উক্তির কোন মূল্য থাকে না।

বাল্মীকিও রামকে যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে বাল্মীকি যে রামকে জানিতেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; কাব্য ও কবির পরিচয় প্রসঙ্গে তাহা আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি। আর যদি রামায়ণকে কাব্যের হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়, তবে কবি যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নির্দ্দেশে বাধ্য নহেন, এই সত্য স্বীকার করিতে হইবে।

কবি যে কাব্য রচনা করিতে কাহারও নির্দ্দেশ গ্রাহ্য করিতে পারেন না; তাহা বুঝিয়াই আদি কবি ব্রহ্মাও পুরাণকবি বাল্মীকিকে পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিয়াছেন—

রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্‌বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ॥ ৩৪
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতন্তে ভবিষ্যতি
ন তেবাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥ ৩৫।১।২

অর্থাৎ—রাম লক্ষণ সীতা ও রাক্ষস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা তোমার অজ্ঞাত (অর্থাৎ তোমাকে বলা হয় নাই) তাহাও তুমি বিদিত হইবা।

প্রকৃত প্রস্তাবেই কবি যে নারদের করধৃত পুত্তলিকায় ন্যায় তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়াই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন না, তৃতীয় সর্গের ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্লোক তাহার প্রমাণ। ১০ম শ্লোকটী দ্বারা, বাল্মীকি যে রামের জন্ম কথাও রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে প্রদর্শন করা গেল।

"জন্ম রামস্য সুমহদ্বীর্য্যং সর্ব্বানুকূলতাম্।
লোকস্য প্রিয়তাংক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্॥" ১০।১।৩

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক গুলিতে আদিকাণ্ডের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঘটনা গুলিরও উল্লেখ আছে। সুতরাং লঘু রামায়ণ কারের উদ্ধৃত ব্রহ্মার উক্তির সমর্থনে সমগ্র আদিকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

আদিকাণ্ডের মূল ঘটনাবলীতে আমরা প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার মত কোন নিদর্শন বিদ্যমান দেখি না বটে কিন্তু ঐ কাণ্ডের অনেক উপঘটনার বর্ণনাই যে প্রক্ষিপ্ত, এবং মূল ঘটনার প্রাচীন স্তরের মধ্যেও যে অনেক পরবর্ত্তী রচনা প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা মনে করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। নিম্নে কারণ সহ সেই প্রক্ষিপ্ত রচনা গুলির আলোচনা করা গেল।

আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের পঞ্চম শ্লোক হইতে বাল্মীকির রচনা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই প্রারম্ভ ভাগ হইতে চতুর্দ্দশ সর্গ পর্য্যন্ত রচনার ভাব প্রাচীন। এই রচনার ভিতর স্থানে স্থানে শব্দ পরিবর্ত্তন ব্যতীত এবং দুই একটী শ্লোক পরিবর্ত্তন ব্যতীত—গুরুতর পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্ন নাই।

১৫শ সর্গ হইতে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির জন্ম কথার সূচনা হইয়াছে। এই সর্গে অনেক পরবর্ত্তী চিন্তার নিদর্শন আছে; এবং সে নিদর্শন খুব স্পষ্ট। এই সর্গে প্রথম রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাল্মীকির নিজের তাহা ইচ্ছা হইলে, ৯ম সর্গে সুমন্ত্র যখন রাজা দশরথকে তাহার পুত্র প্রাপ্তির কল্পিত প্রাচীন ইতিহাসটী বিবৃত করিয়াছিলেন, সেই স্থলেই তাহার আভাস থাকিত। অথবা দ্বাদশ সর্গে যে স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশরথকে—

সর্ব্বথা প্রাপৃস্তসে পুত্রাংশ্চতুরোঽমিতবিক্রমান্।
যস্ত তে ধার্ম্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা॥ ১৩।১।১২

"আপনি অবশ্যই অতি বিক্রমশালী চরিটী পুত্র প্রাপ্ত হইবেন; যেহেতু পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার ঈদৃশ সাধু সঙ্কল্প হইয়াছে—" এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন, সেই স্থানেই তাহার আভাস থাকিত৷

রামকে অবতার প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা বাল্মীকির থাকিলে, তাঁহার অন্তরের ভাব রামায়ণের সর্ব্বত্র সমানভাবে ফুটিয়া উঠিত। কৃত্তিবাসের হৃদয়ে যে প্রকৃতই রাম-সীতা প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়া ছিলেন, তাহার নিদর্শন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাতায় পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রভাবে বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়েও কৃত্তিবাসী রাম-সীতা লক্ষ্মীনারায়ণরূপে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন।

বাল্মীকির রাম-সীতা তাঁহার রচনায় দুটী আদর্শ দম্পতিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন, ভরত চরিত্রও সাধারণ মানব অপেক্ষা উন্নত আদর্শের।

ভারতীয় আর্য্য সাহিত্যে অবতারবাদের কল্পনা খুব আধুনিক না হইলেও রামকে অবতাররূপে প্রচার করিবার ভাব পরবর্ত্তী। বুদ্ধদেব যখন আর্য্যচিন্তায় অবতারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, রামও সেই সময়ে অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে রাম বা বুদ্ধ আর্য্য (হিন্দু) সাহিত্যে অবতার বলিয়া গৃহীত হন নাই।

এস্থলে প্রাচীন আর্য্য সাহিত্য হইতে অবতারবাদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বেদে অবতার কথা নাই। অবতার কথার প্রথম উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৮) আছে—মৎস্য মনুকে জলপ্লাবনের সংবাদ জানাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অনুসারে মনু প্লাবন প্রাক্কালে মৎস্যের শরণাগত হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শতপথের এই কাহিনীই হিন্দুর পুরাণে ও খৃষ্টানের বাইবেলে পল্লবিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুরাণ ও বাইবেল, মূল পরিত্যাগ করিয়াও চিন্তার ধারায় ঐক্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রজাপতি যে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, একথাও শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৩) আছে। এস্থলে কূর্ম্মকেই কচ্ছপ বা কশ্যপ বলা হইয়াছে; এবং উৎপন্ন প্রজাকে কাশ্যক বলা হইয়াছে। পুরাণ এই কূর্ম্মকেই বিষ্ণুপদ বাচ্যে অভিহিত করিয়াছেন। (কূর্ম্মপুরাণ দ্রষ্টব্য।)

শতপথে বরাহের ও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বরাহের নাম তথায় এমুষ। বামনরূপী বিষ্ণুর উল্লেখও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। *

এই বৈদিক কল্পসূত্রে এই প্রাচীন চারি (অবতারের) কথাই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাষায় প্রাপ্ত হাওয়া যায়। ইহার পর তৈত্তিরিয় আরণ্যকে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভিন্ন ভিন্ন নামের পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণগুলি রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল। হইলেও বৈদিক যুগে যে পুরাণ কথা প্রচারিত ছিল, তাহাই ব্রাহ্মণ সমূহে গৃহীত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণগুলির গল্পাভাস রামায়ণে থাকা স্বাভাবিক।

কোন্ অবতার কোন্ সময় জন্ম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত থাকা, দেশ-কাল ভেদে খুব অস্বাভাবিক

* বামন অবতারের গল্পটী কিভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কথা ২৯শ সর্গের আলোচনায় প্রদত্ত হইল।

নহে। সুতরাং এইরূপ চিন্তা সে যুগের বিশ্বাসের বিষয় হইলে তাহা রামায়ণে থাকা অস্বাভাবিক নহে। রামায়ণের আর কোন স্থানেই এবিষয়ের তেমন উল্লেখ নাই। এস্থলে কিভাবে হটাৎ এই অবতার কথার অবতারণা করা হইয়াছে, পাঠক তাহা লক্ষ্য করুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ বেদ বিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ যথা নিয়মে সমবেত হইলেন। যথা—

ততোদেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ

ভাবপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি॥ ৪। আদি। ১৫

দেবগণ যজ্ঞস্থলে সমবেত হইয়াছেন, এ বেশ স্বাভাবিক। এরূপ স্থলে হটাৎ দেবগণের দ্বারা একটা কুট মন্ত্রনার সৃষ্টি আমরা স্বাভাবিক মনে করি না।

এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকেই আছে—দেবতারা সেই যজ্ঞস্থলে সমবেত হইয়াই লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন্! আপনার বর লাভ করিয়া রাবণ নামক রাক্ষস বীর্য্য বলে আমাদিগের সকলকে পীড়িত করিতেছে।.. ... আপনি শীঘ্র তাহার নিধনের উপায় বিধান করুন। (৫-১১ শ্লোক) ব্রহ্মা চিন্তিত হইয়া ক্ষণকাল থাকিয়া রাবণ বধের উপায় বলিলে দেবগণ হর্ষলাভ করিলেন; ইত্যবসরে পীতাম্বর বিষ্ণু ও গরুড় পৃষ্ঠে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।......তখন দেবগণ বিষ্ণুকে দশরথের পত্নীগণের গর্ভে চারিভাগে যাইয়া জন্ম লইতে প্রস্তাব করিলেন এবং প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। বিষ্ণু দেবগণের ভয়ের কারণ সম্যক চিন্তা করিয়া একাদশ সহস্র বর্ষ (?) নরলোকে বাস করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া দেবগণকে আশ্বস্ত করিলেন। দেবগণ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু বিষ্ণুর চিন্তা দূর হইল না। তিনি তখনও চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কোথায় যাই, নরলোকে কার ঘরে জন্ম গ্রহণ করি?"

"এবং দত্ত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্॥

মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিতথাত্মনঃ॥" ৩০।১।১৫

বিষ্ণুকে দিয়া এরূপ চিন্তা করাইবার সময় বোধ হয় প্রক্ষিপ্তকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে মন্ত্রনাটা হইতেছে কোথায়? স্বর্গে, দেবসভায়? না দশরথের যজ্ঞস্থলে?

এইরূপে ১৫শ হইতে ১৮শ সর্গ পর্য্যন্ত এই প্রক্ষিপ্তভাব বিস্তৃত হইয়াছে। ১৮শ সর্গে বিষ্ণু চারি অংশে দশরথ পত্নীগণের গর্ভে আবির্ভূত হন। রাম বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশরূপে, ভরত বিষ্ণুর সিকি অবতাররূপে, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন মিশ্রিতভাবে বাকী সিকিরূপে আবির্ভূত হন।

এই রচনা যে বাল্মীকির ভাব সমর্থক নহে, ইহার আর এক প্রধান কারণ এই যে, যে রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য এত মন্ত্রনা, প্রক্ষিপ্তকার ১৫শ সর্গে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বাল্মীকির রামায়ণের মাঝে মাঝে সেই প্রক্ষিপ্তকারেরই কৃত ২।৪টা প্রক্ষিপ্ত উক্তি ব্যতীত এত গুপ্ত মন্ত্রনা করিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্যে হুলুস্থূল বাঁধাইয়া বধ করিবার মত চরিত্র রাবণের ছিল বলিয়া দেখা যায় না। বাল্মীকি তেমন ভাবে রাবণকে কোথায়ও চিত্রিত করেন নাই। বাল্মীকির রাবণ যে ধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য পশু ভাবাপন্ন ছিলেন না, সীতার অংশলীলা ক্রমে সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকার ব্যাপারই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এই ভাবটাকে কলুষিত করিবার জন্যই উত্তরকাণ্ডকার রম্ভাধর্ষণের আখ্যায়িকাটী উত্তরকাণ্ডে জুড়িয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থোক্ত প্রজাপতির মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হইবার ভাব অপেক্ষা মানব সমাজে ভগবানের অবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যে ভাব, তাহা বহু পরবর্ত্তী। এই পরবর্ত্তী ভাবের জন্ম দান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। আমাদের মনে হয় গীতার—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।

ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই উক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তৎ পরবর্ত্তী কালে বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্ম পরিগ্রহের কল্পনা পুরাণ সমূহে গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই মতের প্রবক্তা করিয়া দণ্ডায়মান করিলেও ভিন্ন মতাবলম্বী সমাজ শ্রীকৃষ্ণকে দশ অবতার মধ্যে গণনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নহে, মহাভারতের সমাজ আলোচনায় তাহা করিতে চেষ্টা করিব।
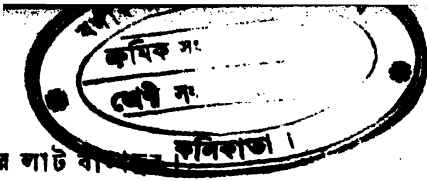
একদিনের লাট বাহাদুর।

ভারতের লাটগিরি সকল ইংরেজের পক্ষে শোভনীয় না হইলেও লোভনীয় পদ সন্দেহ নাই। লাট বাহাদুরের আসন শূন্য হইলেই বিলাতের রাজনৈতিক মহলে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। যাহাদের লাটগিরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহারা সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগে। এমন কি প্রয়োজন হইলে ছল বল কৌশল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ইংরেজ যখন সবে মাত্র ভারতের মসনদে বসিয়াছিলেন, এই লাট গিরি নিয়া তখন একদিন একটি কৌতুকাবহ ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল। বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতে আসা অবধি ব্যবস্থাপক সভায় একটা তীব্র দল দলি সৃষ্টি হইয়াছিল। এক দলের নেতা ছিলেন হেষ্টিংস স্বয়ং; ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও নিমকবিভাগের কর্ম্মচারী বারওয়েল ছিলেন, হেষ্টিংসের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। অপর দলের নেতা ছিলেন ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রেনসিস; ভারতের প্রধান সেনাপতি ও ব্যবস্থাপক সভার প্রবীন সদস্য ক্লেভারিং ফ্রেন্‌সিসের হস্তে ক্রীড়ণক মাত্র ছিলেন। তিনি ফ্রেন্‌সিসের ইঙ্গিতেই সকল কার্য্য করিতেন। ফ্রেন্‌সিসের দল সর্ব্বদাই হেষ্টিংসের ছিদ্রান্বেষণ করিত। এদিকে নন্দকুমারের ফাঁসী এবং চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমের নিকট হইতে অন্যায়রূপে টাকা গ্রহণের দরুণ বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষও হেষ্টিংসের প্রতি এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তাহার জন্য তাঁহারা নাকি হেষ্টিংসকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। (১)

যাহা হউক, কর্ত্তৃপক্ষের এই অসন্তুষ্টি হেষ্টিংসের প্রতিপক্ষের অনেক সাহায্য করিল। তাঁহারা হেষ্টিংসকে পদে পদে অপদস্ত করিতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষের প্রতিবাদে একদিন হেষ্টিংসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি প্রকৃতপক্ষেই একদিন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টার এই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আদেশ দিলেন;—হেষ্টিংসের পদত্যাগ গৃহীত হইল, অতঃপর ব্যবস্থাপক সভার প্রবীন সদস্য হুইলার সাহেব ভারতের বড়লাট হইবেন।

ইতিমধ্যে হেষ্টিংসের দল পুষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি লাটগিরি বজায় রাখিতে আবার কৃত সংকল্প হইলেন। এদিকে ফ্রেন্‌সিসের প্ররোচনায় ভারতের প্রধান সেনাপতি ক্লেভারিং লাট বাহাদুরের পদের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় সম্পাদককে বাধ্য করিলেন।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন শুক্রবার রেভেনিউ বোর্ডের মিটিং হইবার কথা ছিল; কিন্তু ক্লেভারিং এর দল সে দিন প্রাতে ৮টার সময় ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করিতে সংকল্প করিলেন। ক্লেভারিং ব্যবস্থাপক সভার সম্পাদক অরিয়ল সাহেবের উপর হুকুম জারি করিলেন, তিনি যেন বিলাত হইতে ভারতের বড়লাটের নিযুক্তি পত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত ডিস্‌পাস্ ও কাগজ পত্র আসিয়াছে, তাহা লইয়া প্রাতে ৮টার সময় সভাগৃহে উপস্থিত থাকেন। ক্লেভারিংএর হুকুমনামা পাইয়া অরিয়ল যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। ষড়যন্ত্রের নেতা ফ্রেন্‌সিসও নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাজির হইলেন। ক্লেভারিং ও ফ্রেন্‌সিস তথায় পরামর্শ করিয়া অরিয়লকে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য বারওয়েলের নিকট পত্র লিখিতে বলিলেন। পত্রে লেখা হইল,—"আমি (ক্লেভারিং) অদ্য বড়লাটের কার্য্য ভার গ্রহণ করিব। আপনি এখানে উপস্থিত থাকিবেন।"

ক্লেভারিং হেষ্টিংসকেও এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন,—"বিলাত হইতে ভারতে যে ডিস্‌পাস্ আসিয়াছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ আপনার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আমি ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইয়াছি বলিয়া হুইলার সাহেবের নিয়োগ পত্রও বাতিল হইয়া-গিয়াছে। অতএব আপনাকে জানাইতেছি যে আপনি অদ্যই কোর্টউইলিয়ম ও কোম্পানীর ধনাগারের চাবি আমার হাতে সমর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন।"

বারওয়েল যখন রেভেনিউ বোর্ডের সভায় যাইতেছিলেন, তখন পথে ক্লেভারিংএর স্বাক্ষরযুক্ত পত্র পাইলেন। হেষ্টিংসও রেভেনিউ বোর্ডের সভাগৃহে পৌঁছিবা মাত্রই ক্লেভারিংএর পত্র পাইলেন। পত্র পড়িয়া বারওয়েল ও হেষ্টিংস উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে ক্লেভারিং হেষ্টিংসের হাত

(১) হরিচরণ দাস প্রণীত "চাহার গুলজার সুজা—ই" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে হেষ্টিংস পদত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় সমরজঙ্গ্ মেক্কাবুলল্ ইংলণ্ডের রাজার আদেশে হেষ্টিংসকে বন্দী করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন।

হইতে লাটগিরি ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য একটা বড়যন্ত্র করি তেছেন।

তখন হেষ্টিংস ও বারওয়েল উভয়ে মিলিয়া ক্লেভারিংএর পত্রোত্তরে লিখিলেন, "সপারিষদ ভারতের বড়লাট আপনাকে জানাইতেছেন, কাহার আদেশে হেষ্টিংস বড়লাটের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঐ পদ শূন্য করিলেন, অথবা আপনি কিরূপে কাহার আদেশানুসারে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইলেন, ইহার বিন্দু বিসর্গও তাঁহারা অবগত নহেন। এবং তাহারা ইহাও স্থির করিয়াছেন, কর্তৃপক্ষ হেষ্টিংসের হস্তে আইনতঃ যে ক্ষমতা ও কাজের ভার অর্পন করিয়াছেন, তাহা সর্বপ্রকারে অক্ষুন্ন থাকিবে, কোন অংশে ইহার ব্যতিক্রম হইবে না।"

এ দিকে ক্লেভারিং ভারতের বড়লাট রূপে রেভেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীর উপর হুকুম জারি করিলেন—তিনি যেন বেলা ৮টার সময় রেভেনিউ বোর্ডের সভা আহ্বান করেন, এবং বারওয়েল ও ফ্রেন্সিসকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ পাঠান।

বোর্ডের সেক্রেটারী ক্লেভারিংএর হুকুম তামিল করিলেন না। তিনি বরং ক্লেভারিংকে সগর্বে লিখিয়া পাঠাইলেন, "কোম্পানীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারী হেষ্টিংসও বারওয়েলের সমক্ষে আপনি যথাসময় হাজির হইবেন, কারণ, ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যই সেখানে উপস্থিত থাকিবেন।"

ক্লেভারিং সেখানে উপস্থিত হইলেন না। হেষ্টিংস দেখিলেন, ব্যাপার বড় গুরুতর। সুতরাং আপন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য তিনি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হেষ্টিংস সুপ্রীম কোর্টের চিফ্‌জাষ্টিস ইলাইজা ইম্পির নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন "ভারতের লাটগিরি নিয়া মস্তবড় গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি আপনাদের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি গণকে আহ্বান পূর্ব্বক সকলের মতামত গ্রহণ করিয়া এ সম্বন্ধে যথাবিহিত আদেশ প্রদানে আমাকে উপকৃত ও কৃতার্থ করিবেন।"

হেষ্টিংসের পত্র পাইয়া প্রধান বিচারপতি তৎক্ষণাৎ একসভা আহ্বান করিলেন। সেখানে স্থির হইল, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ রেভেনিউ বোর্ডের সভাগৃহে যাইয়া সরকারী কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া এ সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। তদনুসারে শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকার সময় বোর্ডের সভাগৃহে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। সেখানে ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত কার্য্য বিবরণী জজদিগকে পড়িয়া শুনান হইল। অরিয়লকে বিলাতের ডিস্‌পাস্ ঐ সভায় দাখিল করিতে বলা হইল। অরিয়ল উত্তরে বলিলেন, "আমার নিকট ডিস্‌পাস্ নাই; অদ্য প্রাতে ৮টার সময় ক্লেভারিংএর নিকট সমস্ত কাগজপত্র দিয়া ফেলিয়াছি।" তখন বারওয়েল স্বয়ং যাইয়া ক্লেভারিংএর নিকট ডিস্‌পাস্ চাহিলেন। ক্লেভারিং তাহার নিকট কাগজপত্র দিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ক্লেভারিং বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, "ভারতের বড় লাট ক্লেভারিংএর মন্তব্য সহ ডিস্‌পাস্ ও অন্যান্য কাগজ পত্র অদ্য সন্ধ্যাকালে জজদিগের নিকট পাঠান হইবে।" অগত্যা জজেরাও সেই দিন সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় কাগজ পত্র পড়িয়া দেখিতে স্বীকৃত হইলেন।

সেই ২০শে জুন শুক্রবার ভারতের ইতিহাসে বড় একটা স্মরণীয় দিন। সেই দিন ছিলেন ভারতের লাট দুই জন। উভয়ই অধীন কর্ম্মচারি গণের উপর হুকুম জারি করিয়া নিজ নিজ লাট বাহাদুরী বজায় রাখিতে কৃত সংকল্প। হেষ্টিংস বুঝিলেন, তাঁহার লাট বাহাদুরীর আসন টলিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি সমস্ত প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা ও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের উপর এই মর্ম্মে সার্কুলার জারি করিলেন,—"তাহারা যেন হেষ্টিংস ব্যতীত অন্য কাহারও আদেশ গ্রাহ্য না করেন।" ব্যাপার ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেখিয়া তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজদিগকে গোপনে জানাইলেন—কেবল সরকারী কাগজ পত্র পড়িয়া একটা সরাসরি মন্তব্য প্রকাশ করিলে চলিবে না; তিনি সুপ্রীম কোর্টের নিকট এ বিষয়ে বিচার প্রার্থী। তাঁহাদিগকে আইনানুসারে সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইবে। কারণ তখন কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে, সুপ্রীম কোর্টই ইহার বিচার ও মীমাংসা করিতেন; ঐ আইন সকলের সিদ্ধান্ত সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য হইত।

ক্লেভারিংকে হেষ্টিংসের চেষ্টার বিন্দু বিসর্গও জানিতে দেওয়া হইল না। তিনি জানিবার বড় চেষ্টাও করিলেন না। তিনি লাট বাহাদুরীর নেশায় বিভোর।

ক্লেভারিং শুক্রবার ১১টার সময় ফ্রেন্সিসের সহিত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপক সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া যথাবিধি শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বড় লাটের গদি অধিকার করিয়া বসিলেন। নবীন লাট বাহাদুরের হুকুমে সেরিফ আসিয়া হাজির হইলেন। ক্লেভারিং যে ভারতের বড় লাট হইয়া কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন, এ সংবাদ সেই দিনই বিকালে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে সেরিফকে আদেশ দেওয়া হইল। সেরিফ ঘোষণা পত্রের পাণ্ডুলিপি গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক ডইলী সাহেবের নিকট পাশী ভাষায় অনুবাদ করিতে দিলেন। অনুবাদক বলিলেন, সপারিষদ বড় লাটের লিখিত আদেশ না পাইলে তিনি ইহা অনুবাদ করিবেন না।

এতক্ষণে ক্লেভারিংএর সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল। ক্লেভারিং ও ফ্রেন্সিসের ষড়যন্ত্র আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। কারণ তাঁহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, হেষ্টিংস সুপ্রীম কোর্টের নিকট এ বিষয়ে বিচার প্রার্থী হইয়াছেন। এখন ক্লেভারিং সুপ্রীম কোর্টের আইন সঙ্গত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। হায়! এত করিয়াও বুঝি ক্লেভারিংএর ভাগ্যে লাটগিরির সুখ-সম্মান ঘটিল না!

২০শে জুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত জজ সাহেবদিগের সভা হইল। তাঁহারা সকলে ডিস্‌পাস কাগজ পত্র ও আইন কানুন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক অনেক বিচার বিবেচনা ও চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলেন, "ক্লেভারিং কিছুতেই ভারতের বড় লাট পদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। কারণ ঐ পদ এখনও খালি হয় নাই। হেষ্টিংস মাত্র পদত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন কিন্তু এখনও পদত্যাগ করেন নাই। করিলেও ক্লেভারিংএর দাবী বেআইনী বলিয়া অগ্রাহ্য।"

সুপ্রীম কোর্টের রায় শুনিয়া হেষ্টিংসের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল; ক্লেভারিং এর মাথায় যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল। ক্লেভারিং মরমে মরিয়া গেলেন, তাঁহার বড় সাধের লাটগিরির সকল আশায় ছাই পড়িল।

অবশেষে তাঁহার এই ষড়যন্ত্রের দরুণ তিনি ভারতে সেনাপতি ও কাউন্সিলের সদস্য পদ হইতেও বঞ্চিত হইলেন। হায়! এক দিনের লাটগিরি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল। মানুষ আশার কুহকে ও প্রভুত্বের নেশায় এমনি করিয়া অধ্রুবকে সেবা করিতে যাইয়া ধ্রুবকে হারাইয়া বসে। (১)

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

অকৃতজ্ঞের দণ্ড।

জজ সাহেব এজলাসে বসিয়া খুনী আসামী পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তীর বিচার করিতেছিলেন। লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ-হস্তপদ পাঁচকড়ি পুলিশ বেষ্টনে দণ্ডায়মান। সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি তাহার উপর পতিত! সকলের কর্ণই হাকিমের শেষ হুকুম শুনিবার জন্য ব্যগ্র।

পাঁচকড়ির তৈল বর্জ্জিত দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, বিশৃঙ্খল দাঁড়ি গোঁফ, ধূলি মণ্ডিত দীর্ঘ দেহ ও আরক্ত চক্ষু তাহাকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পেশল বাহু, প্রশস্ত বক্ষ—তাহার অতীতের বাহুবলের পরিচয় দিতেছিল। কারা ক্লেশে যে সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার চেহারায় ইহাও প্রমাণিত হইতেছিল। এই ব্যক্তিই যে দস্যু সর্দ্দার গোবিন্দলাল, তাহাও সাক্ষীর জবান বন্দীতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত। একবৃদ্ধ মোক্তার দয়া পরবশ হইয়া তাহার পক্ষে সাক্ষীর জেরা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহার পক্ষে একটী কথাও কেহ বলে নাই। বলিবার বেশী কিছু ছিলও না। বিপক্ষে বহু সাক্ষী। দারোগা আবু মহাম্মদ ও গোপাল বক্সীর হুকুমের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষীই কিছু বলিতে সাহস করিল না। সুতরাং খুনী ডাকাত গোবিন্দ লালের এই পাঁচকড়ি নামের আবরণ—কোনও সহায়তা করিতে পারিবে, এরূপ ধারণা কেহই মনে স্থান দিলেন না।

আজ দুই সপ্তাহ ধরিয়া ইহার বিচার হইতেছে। পুলিশ দেশ ছাঁকিয়া অসংখ্য সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহ করিয়া পাঁচকড়িকে

---

(১) এই প্রবন্ধে "*Bengal: Past & Present*" হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ব্যক্তি যে গোবিন্দলাল এ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ বহু পাওয়া গেল। গোবিন্দলালের জন্ম ভূমি ফতেপুরবাসী ধনঞ্জয় ঘোষ তাহাকে আপন জ্ঞাতি বলিয়া জবানবন্দী দিয়া গেলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় দুই সপ্তাহের এত ঝাঁকানিতেও পাঁচকড়ি একটী কথাও বলে নাই। একদৃষ্টিতে সে হাকিমের মুখেরদিকে চাহিয়া থাকিত। কখনো বা সাক্ষীর কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত; এই পর্য্যন্ত।

জজসাহেব আগামী কল্য রায় দিবেন বলিয়া আসামীকে কহিলেন--তোমার কি কিছুই বক্তব্য নাই গোবিন্দলাল?

আজ পাঁচকড়ি কথা কহিল। সে যোড়হাতে কহিল—"আমার ফাঁসী দিন্ এই মাত্র প্রার্থনা। তৎপূর্ব্বে আমার জীবনের ইতিহাসটা আপনার নিকট বলিতে চাহি।"

বিপক্ষের উকীল দৃঢ়ভাবে কহিলেন—"এটা, আসামীর পলায়নের একটা ফন্দী। গোবিন্দলাল পাঁচ সাতবার পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া কারাগারের পাঁচিল ডিঙাইয়া গিয়াছে। অতএব...সাবধান!"

হাকিম আসামীর মৌখিক ইতিহাস শুনিতে ইচ্ছা করিলেন না।

অনোন্যপায় হইয়া আসামী নিজকে নির্দোষ বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

জজ জুরীগণকে চার্য্য বুঝাইলেন। জুরীগণ পরামর্শে বসিল। অবশেষে তাহারা একবাক্যে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল। জুরীর মন্তব্য অনুসারে জজ আসামীর প্রতি দণ্ডের আদেশ করিলেন; যাবজ্জীবন আসামীর দ্বীপান্তর দণ্ড হইল।

যথা সময়ে আসামী গোবিন্দলাল সেসন জজের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করিল।

আত্ম কাহিনী প্রকাশ করিতে না পারিয়া সে এতদিন কেবল্য যাতনা ভোগ করিতেছিল। আজ সে তাহা আমূল প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল। মনের গূঢ় কথা প্রকাশ করিতে পারিলে, অতি পাপীও প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকে। গোবিন্দলাল তাহা করিল। এখন দ্বীপান্তর ভোগ কেন, মৃত্যু দণ্ডেও তাহার আপত্তি নাই।

পাপীর বর্ণিত কাহিনী শুনিবার অবকাশ সকল ধর্ম্মাধিকরণের নাই। তাহারা অনেকেই নথি দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন। পাগলের প্রলাপ, বিরহীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ও আইনের সঙ্গীন প্রমাণ—কথা এক নহে, ইহা বলাই বাহুল্য সুতরাং হাইকোর্টও আপিল অগ্রাহ্য করিলেন।

আসামীর লিখিত জবাবে তাহার উকিলের প্রতি এই একটী নিবেদন বা প্রার্থনা ছিল যে তিনি যেন তার আত্ম কথাটী সম্ভব হইলে সংবাদ পত্রের সাহায্যে প্রচার করেন। উদ্দেশ্য আসামীর নিরুদ্দিষ্ট অগ্রজ যেন তাহা জানিতে পারেন। নিঃসহায়ের—আত্মীয় বন্ধু হীনের—এই শেষ প্রার্থণাটী তাঁহার করুণ হৃদয় উকীল পূর্ণ করিয়াছিলেন।

আসামীর সেই উক্তি, হাইকোর্ট আপিল নিষ্পত্তির পর সংবাদ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল তাহা এইরূপ :—

* * আমার বাড়ী ঢাকা জিলায়। আমরা উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ। আমার বাবার বংশ মর্য্যাদার সঙ্গে প্রচুর অর্থও ছিল। কাকা দেশে থাকিয়া সেই অর্থে সুদী কারবার করিতেন, বাবা ময়মনসিংহে চাকুরী করিতেন। মা আর আমরা দুটী ভাই তথায় থাকিতাম।

সহসা সংবাদ আসিল পদ্মা আমাদের বাস্তুভিটা—মায় লোহার সিন্ধুক-টাকা-কড়ি—গ্রাস করিয়াছে। টাকার শোকে নাকি—কাকা—পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তির কয়েকদিন পর একই দিনে বাবা মা দু'জনই একই চিতায় স্বর্গ যাত্রা করিলেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত তখন নূতন বাড়ীর পত্তন দিয়াছেন। আমাদের বাসাখানি তাঁহার সীমানায় পড়িল। কিছু টাকা পাইলাম। বাবার বন্ধুরা কহিলেন—যাক্, তোমার বাবার শ্রাদ্ধটা তবে হলো! হবে না কেন—কেমন লোক ছিলেন তিনি!

পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিয়া আমি আর দাদা—কপর্দ্দক-হীন ভিক্ষুকের মত পথে দাঁড়াইলাম। দীনের বন্ধু কালীশঙ্কর আমাদের জন্য কোন পাতিয়া দিলেন। কিন্তু দাদা তাহা পছন্দ করিলেন না। পরের পরগ্রহ হওয়া তাঁহার বড় অনিচ্ছা। কাজেই মায়ের গহনাগুলি বিক্রয় করা হইল। সে অতি সামান্য মূল্যেই তাহা বিক্রয় করিলাম।

দাদা তখন স্থানীয় সিটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িত। আমি কহিলাম—দাদা, দুজনের পড়া হবে না। তোমাকে সকলেই বলে ভাল ছাত্র তুমি। তুমি পড়—আমি ভিক্ষা করিয়া খরচ যোগাইব। তুমি মানুষ হও—আমি মানুষ না-ই হইলাম, তোমার সেবাত করিতে পারিব। দাদাও কাঁদিত, আমিও কাঁদিতাম।

* * * *

চীনাবাদাম কিনিয়া ফিরি করিতাম। লাল, নীল, সাদা কাগজে এক এক পয়সার প্যাক করিয়া লইয়া সহরে ঘুরিতাম। সহরে আর চীনাবাদাম বিক্রেতা ছিল না। আমার বেশ বিক্রী হইত। সকালে বেচিতাম, গরম হালুয়া। তখন আমার বয়স ১১।১২ বৎসর। দাদার বয়স ১৫ বৎসর।

কতিপয় গ্রাহক আমার নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহাদের মধ্যে বালিকাবিদ্যালয়ের একটী মেয়ে প্রত্যহ তাহা কিনিত। ধরণ ধারণে বুঝিতাম, মেয়েটী বড় ঘরের। বোর্ডিংয়ে সে প্রায় কাহারো সঙ্গে যেন বেশী মিশিত না। তার বয়স আমার চেয়ে বেশী বোধ হইল না।

একদিন সে আমাকে কহিল, "তোমার চেহারায় মনে হয়, তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে। তুমি কেন ফিরি কর?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। এত পরিচয়ের গরজ আমার ছিল না। শেষটা মেয়েটীর নিকট হারমানিতে হইল। আমি আমার সত্য পরিচয় দিলাম। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া সে সহানুভূতিতে কাঁদিয়া ফেলিল। সেই করুণারূপিণী বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের এতখানি মহত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করিল। সে আমার হাতে একটা আধুলি দিয়া কহিল—"তুমি সহরে ঘুরিয়া অনর্থক আত্ম সম্মান নষ্ট করিও না। আমি প্রত্যহ তোমাকে কিছু কিছু দিব। তুমি আমাকে চীনাবাদাম দিয়া যাইও। আমি যাহা দিব, তাহাতে তোমাদের দু'জনের চলিবে। কোন দ্বিধা করিয়ো না।"

আমি সেদিন তাহা গ্রহণ করিলাম না বটে, কিন্তু সেই বালিকার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হইলাম। সে রোজ আমার নিকট হইতে চীনাবাদাম লইত। এমন কি কোন দিন এক পয়সার জিনিষ লইয়াও একটী টাকা দিত।

দাদা এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া পড়িতে গেল ঢাকায়। আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। কিন্তু আমার মন শান্ত হইয়াছিল। মন বলিল, দাদাকে নীচে নামাইও না; তাই সই।

দাদার চিঠি পাইলাম এলাহাবাদ হইতে। কোন একটা ভদ্রলোকের সাহায্যে তিনি তথায় গিয়াছেন। আমি প্রথম প্রথম ভয় পাইতাম—বাবা সে কতদূর—?

শেষটায় আমি সুহাসিনীর দান লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং তাহা দ্বারা দাদার সাহায্য করিতাম।

দাদা দুই চারি মাস অন্তর আমাকে চিঠি দিতেন। আমিও বুঝিতাম, খরচের টাকাই চলে কষ্টে; পত্র লেখার বাহুল্য অনাবশ্যক। এদিকে আমি একটু আধটু লেখা পড়াও শিখিয়াছিলাম। নানা বিষয়ে ঘুরিয়া দুই দশটা পয়সা পাইতাম; একরকম চলিত।

দুই বৎসর পর সহসা একদিন একটী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনিই সুহাসিনীর পিতা। তাঁহার অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে পূজায় তাঁহাদের বাড়ী যাইতে হইল। হাঁ বড় মানুষ বটে। পল্লী গ্রামের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাজা মহারাজা ইনিই। বিশাল বাড়ী—প্রকাণ্ড অবস্থা। তবে বংশমর্য্যাদায় খাটো।

ইনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে নিজের ছেলের মত গ্রহণ করিলেন। পরিবারে লোক খুব বেশী নহে। সবাই আমাকে ঘরের ছেলে মানিয়া লইল। কমলাকান্ত রায়ের পত্নীর ইচ্ছা—আমার সঙ্গে সুহাসিনীকে বাঁধিয়া দেন। মেয়ের জন্য একখানা বাড়ী করিয়া কিছু সম্পত্তি দিয়া দিবেন। কথাটায় রায় মহাশয়ও সায় দিলেন। আমি আর সুহাসিনী সেদিন ফুলের মালা বদল করিলাম। দেখিলেন অন্তর্য্যামী ভগবান। হায়! আগে জানিতাম না সেদিন মাসদগ্ধ!

* * * *

আবার মৈমনসিংহ গেলাম। পুনরায় বড় দিনের ছুটিতে সুহাসিনীদের বাড়ী যাইতে হইল। সুহাসিনী আর স্কুলে যাইত না—বড় হইয়াছে বলিয়া। কাজেই তাহার সাহায্য ও আমার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নিজে খাটিয়া দাদার টাকা পাঠাইতে হইত।

* * * *

সুহাসিনীর পত্র পাই নাই। তাহার মাতা পিতা ও সে তাড়াতাড়ি কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। কমল বাবুর শক্ত ব্যামো, আমাকে সংবাদ দেওয়ার ফুরসৎ হয় নাই। তারপর সুহাসিনী তাহার হৃদয়ের সুবাসিত অর্ঘ্য আমার চরণে উপহার দিয়া অনেক কথাই লিখিয়াছে। তাহারা কলিকাতা হইতে আসিলেই বিবাহ হইবে এরূপ কানাঘুষাও সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে।

সেই পত্রের শেষভাগে এক সংবাদ—সুহাসিনীরা তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিতেছে। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, হরিদ্বার পর্যন্ত! সুহাসিনী লিখিল "তোমার ভাই না এলাহাবাদে থাকেন, তাঁহার ঠিকানা আমাকে জানাইও, তাঁহাকেও আমাদের সংবাদ দিও।"

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, আজ পাঁচ ছয় মাস মধ্যে দাদার কোন চিঠি পাই নাই। বি এ পরীক্ষার পর এই দুই বৎসরের যেন মোটে খান দুই সংক্ষিপ্ত পত্র পাইয়াছি। আর পাইয়াছি—মাসে মাসে মণি অর্ডার রসিদে তাঁহার ইংরাজী দস্তখত। ওই আমার সান্ত্বনা।

* * * *

সহসা আমার মাথায় বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। চিঠি আসিল—

স্নেহের গিরিজা,

আগামী ২৬শে বৈশাখ সুহাসিনীর বিবাহ। এখানে একটী বাঙ্গালী ছাত্রের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে। ছেলেটীর নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সে এম, এ পরীক্ষা দিবে। পঞ্চাশটী টাকা পাঠাইলাম, তুমি সত্বর চলিয়া আসিবা।

এলাহাবাদ
বাদশাহীমণ্ডী

শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীকমলাকান্ত রায়।
C/o বিশ্বনাথ দত্ত উকীল।

আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যেন আগুন উঠিতে ছিল। চক্ষু ফাটিয়া আগুনের হল্কা বাহির হইতে ছিল।

সুহাসিনীর চিঠিও পাইলাম। অক্ষরে অক্ষরে অশ্রু মাখান। তাহাতে তাহার রক্তাক্ত হৃদয়ের কত যাতনা ব্যক্ত। শেষটা লিখিয়াছে, ওগো, আমার হৃদয়ের দেবতা—আমি ইউনির্ভাসিটীর ডিগ্রীও চাই না, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও চাই না—তুমি এসে আমার উদ্ধার কর। আমি তোমার নহিলে আত্মঘাতিনী হইব।"

কমল বাবুর পত্রের উত্তরে লিখিলাম—আমার শরীর অসুস্থ, আসিতে অক্ষম, ক্ষমা করিবেন। আর সুহাসিনীকে লিখিলাম—

স্নেহের সুহাসিনী,

আর দুই সপ্তাহ পরেই তোমার জীবনের পট পরিবর্ত্তন হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও। আমাকে ভুলিয়া যাও। স্বামীর নিকট আমার নামটীও বলিও না। তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন। আর একটী কথা তোমাকে এতদিন গোপন করিয়াছি—আমি অন্যত্র আমার চিত্ত বিক্রয় করিয়াছি। ইতি—

এই মিথ্যা কথাটা লিখিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে ছিল।

একবার ভাবিলাম, যাই এলাহাবাদ আমার সুহাসিনী—আমারই থাকিবে। তার অমতক্রমে তা'র বিবাহ হবে না। কিন্তু—কিন্তু—না—না

* * * *

বিবাহ উপলক্ষে দাদার কোন চিঠি পাইলাম না। ভাবিলাম—বিশ্ব বিদ্যালয়ের অতবড় ডিগ্রীওয়ালা দাদার ভাই নিরেট মূর্খ আমি—আমার সে বিবাহে নিমন্ত্রণ থাকিবে কোন হিসাবে? তবু—তবু—দাদার কর্ত্তব্য—থাক্—

তথাপি আমার চক্ষের সাম্নে যেন বিশ্বজগৎ ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। কাজকর্ম্ম ভাল লাগিল না। উদ্‌ভ্রান্তের মত দুইদিন সারা সহর ঘুরিলাম।

এই সময় পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চলে বিখ্যাত দস্যু গোবিন্দলালের বড় ভয়। তাহার প্রতাপে গবর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত। থানার দারোগারা স্বপ্নের ঘোরে আপন আপন মুণ্ডহীন দেহ দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিত। তাহার ভয়ে ধনী ব্যতিব্যস্ত। দরিদ্রেরা গোবিন্দলালের নামে আনন্দিত।

ঠিক এই সময়ই আমার মণিঅর্ডারগুলি এলাহাবাদ হইতে ফেরৎ আসিতে লাগিল। প্রাপকের সন্ধান না পাইয়া পিয়ন কৈফিয়ৎ দিয়া ফেরৎ দিয়াছে। আমি একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। আমার ভাই—এমন ভাই,—যার যোড়া মিলে না,—যাদ তার কোন

অমঙ্গল হয়—আমি বিষ খাইয়া মরিব। কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত আমি কমল বাবুর বাড়ী গেলাম। শুনিলাম তিনি পুরীতে সপরিবারে বাস করিতেছেন। এলাহাবাদে উত্তরের মাশুল দিয়া টেলিগ্রাম করিলাম, কোন উত্তর নাই। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পুঁজী পাটা গুছাইয়া এক অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে যাত্রা করিলাম। জানি না কোথায় এলাহাবাদ—জানি না তাহার কোন সংবাদ।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে তীর্থ-কাকের দল আমাকে লইয়া লোফালুফি আরম্ভ করিল। এই সুযোগে আমার কোমর হইতে থলি সমেত দুইশত টাকা অপহৃত হইল। পুঁজী রঙিন শার্টের পকেটে গোটা ত্রিশেক টাকা মাত্র।

দাদার কোন খোঁজ নাই। একজন দোকানী বলিল মিঃ দত্ত তিন বৎসর হইল কলিকাতায় গেছেন—আর আসেন নাই। বিবাহের পর মাত্র কয়েক মাস এখানে ছিলেন।

আসিলাম কলিকাতায়। আমার বিদ্বান্ ভাই! উকীল, ব্যারিষ্টার ভদ্র লোক দেখিলেই তাহার মুখখানির দিকে চাহি—কিন্তু হায়—

জানিনা কত দিন কত জায়গায় ঘুরিয়াছি। রাত্রে ঘুম হয় না! দাদা—ও দাদা তুমি কোথায়?

গয়া গঙ্গা, বারাণসী আবার ঘুরিলাম—শেষটা বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। শরীরে আর বল নাই—সে তেজ নাই—চক্ষে জ্যোতিঃ নাই—নিরাশ্রয়—আবার ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলাম।

সুসঙ্গে এক বন্ধুর নিকট আমার কিছু টাকা ছিল। সেই টাকাগুলী হাতে পড়িতেই আমার মনে হইল দাদার কথা। তাই দরিদ্রদিগকে দান করিতে লাগিলাম। দুই চারি পয়সা—টাকা—সিকি—যখন যাহা মনে হয়—মানুষকে দেই—আনন্দ—নিরানন্দ কিছুই বুঝি না। পদব্রজে চলি। আহারের জন্য ব্যস্ত নই—কিছু মিলেত খাই। খালি ভাবি—আমার মায়ের পেটের ভাই—সে আজ না জানি কোথায়?

এই ভাবে দিন যায়।

* * * *

বাজারের পথে ভিক্ষুকের দলকে কিছু দান করিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। বাজারের অনতিদূরে এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলাম। তাহারা কিজাতি জানিনা। এদিকে উহারা অতিথিকে অনাহারে থাকিতেও দিতে রাজী নহে। কাজেই আমি বলিলাম—"আমি ব্রাহ্মণ—"

গৃহস্বামী একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নাম"?

"পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী।"

"হুঁ"

পাকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গৃহস্বামী শুইতে গেলেন। তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ নাই।

* * * *

তখনো রাত্রি প্রভাত হয় নাই। আমার শয়ন গৃহের চারিদিকে লোকের ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনিলাম। একটু কৌতুহল হইল। দরজা খুলিবামাত্র ৮।১০ জন সশস্ত্র পুলিশ ঘরে ঢুকিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। দারোগা আবু আহম্মদ হাসিয়া কহিল—"কিহে গোবিন্দলাল! আবার পাঁচকড়ি হইলে কবে?"

মন্দ নয়! দারোগাকে সত্য ঘটনাটা বলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিলের চোটে আর সুসভ্য গালিতে আমি বেকুব বনিয়া গেলাম। ছোট দারোগা গোপাল বক্সী কহিল—"আমরা অষুদ জানি—তাতেই সুধ শালা ঠিক হয়। মুষ্টি যোগের মত অষুদ আর নাই।"

নীরবে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া—ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম। তারপর ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি।

এখন আমার আর দুঃখ নাই। এক দুঃখ আমার মার পেটের ভাই—যে ভাইকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছি। সেই ভাই কেমন আছে, যদি জানিতাম, তবে আমি শান্তিতে মরিতে পারিতাম।

* * * *

আমি পাঁচকড়ি ও নহি, ডাকাত গোবিন্দলাল ও নহি। আমি নির্দ্দোষ।"

বিভিন্ন সংবাদ পত্রে দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত আসামীর

এই আশ্চর্য কথা প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে স্থানীয় সংবাদ পত্র "মিহিরে" এই সংবাদটী বাহির হইয়াছিল—

"স্থানীয় সেসন জজ মিঃ এন ডত্ বিবেকী হইয়া পদ ত্যাগ করিয়াছেন। শুনা যায়, স্থানীয় আদালতে দস্যু দলপতি গোবিন্দ লাল বলিয়া জজ সাহেব যাহাকে জুরির সাহায্যে বিচার করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই দণ্ডিত ব্যক্তি নির্দোষ; এবং সেই নির্দোষ ব্যক্তি তাহারই আপন কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। দস্যু দলপতি প্রকৃত গোবিন্দলাল এখনও অবলীলা ক্রমে ডাকাতি করিয়া ফিরিতেছে।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য সংবাদ।

—বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন—

পঞ্চদশ অধিবেশন।

আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ (১৩৩১) ১৯এ ২০এ এপ্রিল শনি ও রবিবার খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের আহ্বানে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় জমিদার মহোদয় পৃষ্ঠপোষক; মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু এম্ এ বিএল্ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি; কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাধারণ সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, এম, এ, এফ, আর, এস,; সাহিত্য শাখার সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর; ইতিহাস শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল; দর্শনশাখার সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ; বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্ সি, বি এ।

প্রবন্ধ লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া ২০শে চৈত্রের মধ্যে তাঁহাদের প্রবন্ধ ও আত্মপরিচয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, মহাশয়ের নিকট ৫৩।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সাহিত্যিক অনুষ্ঠান ও পাঠাগার প্রভৃতি যাহারা সম্মিলনে প্রতিনিধি পাঠাইবেন তাঁহারা উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ২০শে চৈত্রের মধ্যে প্রতিনিধির নাম ঠিকানা প্রভৃতি পাঠাইয়া দিবেন। টাকাকড়ি যিনি যাহা পাঠাইবেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট উপরি লিখিত ঠিকানায় অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয়ের নিকট ১৪নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে পাঠাইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্দ্দশ অধিবেশনের একটী প্রস্তাব।

"হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমন ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।"

সমালোচনা।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা—আমরা ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট স্থিত স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ হইতে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রচারিত 'স্বাস্থ্যধর্ম গৃহ-পঞ্জিকা' পাইয়া সুখী হইলাম। এই পঞ্জিকায় এত নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যে এইরূপ অল্প মূল্যের কোন পঞ্জিকাতেই এত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে চিকিৎসার প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি বেশ সুন্দর ভাবে সরল পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সহজ চিকিৎসা প্রণালীর ন্যায়, ব্যায়াম, প্রণালী, গোপালন, গো চিকিৎসা, প্রভৃতির সংবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ।/১৫ মাত্র।

এ মাসের চিত্র।

গত মাসে যে চিত্র দেওয়া হইল বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, যথা সময়ে তাহা হস্তগত না হওয়ায় দেওয়া হয় নাই। এই সংখ্যায় তাহা দেওয়া গেল।

সৌরভ

দ্বাদশ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩১। } চতুর্থ সংখ্যা।

রাষ্ট্রের ভিত্তি।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, আবাহমানকাল যাবত একে অন্যের ধ্বংসের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্। কিন্তু একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় এই কলহের কোন ভিত্তি নাই—বাস্তবিক পক্ষে উহাদের ভিতর বেশ একটু সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কিন্তু এই ভিতরকার সত্য অনুভব করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে বোধ হয়, রাষ্ট্র জোর করিয়া তাহার মত, ব্যক্তির উপর চাপাইতেছে। রাষ্ট্রের পিছনে একটা বৃহৎ দৈহিক শক্তি রহিয়াছে; ঐ শক্তির সাহায্যেই রাষ্ট্র তাহার মত অনিচ্ছুক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিতে পারে, ইহাই কাহারো কাহারো বিশ্বাস। কিন্তু উক্ত রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, জনসাধারণ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। আজকাল সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে, জনসাধারণ কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে রাষ্ট্রের স্থিতি সন্দেহজনক হইয়া উঠে। লোক সমষ্টি রাষ্ট্রীয় শক্তির সম্মান করে বলিয়াই, উহার এত প্রভুত্ব; নতুবা রাষ্ট্রের এতটা শক্তি থাকিতেই পারে না।

এখন জিজ্ঞাস্য—জনসাধারণ কিজন্য রাষ্ট্রীয় আদেশ ও নিষেধের সম্মান করে? প্রত্যেক মানুষের উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মজ্ঞান লাভ করা ও নিজের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলা। কেবল নিজের ভাল ও সুবিধা অনুসন্ধান করিলেই হইল না; প্রত্যেককে দেখিতে হইবে, সকলেই যেন স্ব স্ব মঙ্গল সাধন করিতে পারে। কাজেই দেখা যায় জনসাধারণের উদ্দেশ্য হইতেছে, সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল। (common good). কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক একটা খেয়াল ও স্বার্থ আছে তাহারা ঐ খেয়াল ও স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক সময় common good অর্থাৎ সকলের কিসে ভাল, কিসে মন্দ হইবে, সে কথা ভুলিয়া যায়। এমন কি কখনো কখনো উহার বিরুদ্ধাচরণ করে। উল্লিখিত দুই প্রবৃত্তি দমন রাখিয়া সকলেই যাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার সমান সুবিধা পায়, সেজন্য একটা শক্তির প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় শক্তি এই জন্যই ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য সকলের মঙ্গল বিধান করা। রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করিবার সময় এই আদর্শের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। রাষ্ট্র বৃহৎ সম্মিলনের সহিত সম্পর্কযুক্ত; অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের ভালমন্দ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুসন্ধান করা, ইহার লক্ষ্যও নহে, কিংবা আয়ত্তও নহে। সাধারণ মঙ্গল (common good) সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কাহারো কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না; তখন সকলেরই স্থায়ী উন্নতি সম্ভব হয়। অতএব জনসাধারণ যখন দেখে, রাষ্ট্রের ভিতরে থাকিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করিবার অধিকতর সুবিধা, তখন তাহারা রাষ্ট্রকে সম্মান করে।

কেহই অপরের আত্মবিকাশের পথ রোধ করিয়া নিজে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অপরকেও সে সুবিধা দিতে হইবে। প্রত্যেকে সমান সুবিধা পাইতেছে কি না, বিচার করিবার জন্য একটা শক্তির প্রয়োজন, উহাই রাষ্ট্রীয় শক্তি। রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার উপরই উহার নিজের শক্তি নির্ভর করে। প্রত্যেকে যখন প্রাণে প্রাণে রাষ্ট্রের উপকারিতা অনুভব করে, তখনি তাহারা উহাকে মানিয়া চলে। বাহির হইতে রাষ্ট্রীয় শক্তি আসে না—রাষ্ট্রের লোক সমষ্টির মতই তাহার একমাত্র শক্তি।

সময় সময় রাষ্ট্র সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যধিক প্রভুত্ব দেখাইতে আরম্ভ করে; তখন জনসাধারণ উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করে। অস্বাভাবিক বল প্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষণকালও টিকিতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সাধারণের ইচ্ছা (common will) ব্যক্ত করে, ততদিনই ইহার স্থায়ীত্ব।

যেমন রাষ্ট্র সময় সময় সীমা অতিক্রম করে, আবার জনসাধারণও তেমনি কখনো কখনো রাষ্ট্রের নিকট অতিরিক্ত দাবী করিয়া বসে। তাহাদের এই দাবী সাধারণের মঙ্গলের (common good) প্রতিকূল। রাষ্ট্র উহাতে সম্মতি প্রদান করিতে পারে না। বলপ্রয়োগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপর ব্যক্তিদিগকে দমন করিয়া থাকে। এস্থলে আপাত দৃষ্টিতে শক্তির জয় দেখা গেলেও বুঝিতে হইবে, রাষ্ট্র সাধারণ মঙ্গল (common good) ব্যক্ত করে বলিয়াই দুষ্টের দমন করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার বিরোধ কলহ ও শক্তির খেলার ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের ভিত্তি জনসাধারণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত; রাষ্ট্রের দৈহিক শক্তির উপর নহে।

হবস্, লক, রুসো, গ্রীন প্রভৃতি বড় বড় দার্শনিকগণ অতিপুরাকাল হইতেই বলিয়া আসিতেছেন—লোকে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশের মত জনসাধারণ যখন উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের স্থিতি ও ক্রমোবিকাশের নিমিত্ত একটা শক্তির প্রয়োজন ও তখন তাহারা আবশ্যক মনে করিল। তখন তাহারা তাহাদের পছন্দানুসারে একটা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়া উহার উপর তাহাদিগের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিল। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সমস্ত রাষ্ট্রের মূলেই যে লোকমত প্রতিষ্ঠিত সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। তবে আজ কাল দেখা যায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ মত পোষণ করে। রাষ্ট্রের এদিক ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, বাস্তবিক পক্ষে লোকমতের উপরই রাষ্ট্রের স্থিতি নির্ভর করে। লোকমতই উহার ভিত্তি, লোকমত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া যায়। এবং লোকমত পুষ্ট ও দৃঢ় হইয়া উঠিলেই রাষ্ট্র সংস্কৃত হয় কিংবা নূতন রাষ্ট্র সংগঠিত হয়। শাসন প্রণালী প্রভৃতি আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানের অভিব্যক্তি রাষ্ট্রের উৎপত্তির objective দিক; কিন্তু নূতন রাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প অনেক দিন হইতে লোকের মনে দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। গঠনকার্য্য বহুদিন subjective অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে objective আকার ধারণ করে। আবার কেহ কেহ মনে করে, লিপিবদ্ধ গঠন পদ্ধতিই (written constitution) রাষ্ট্রের ভিত্তি, কিন্তু লোকমত পিছনে না থাকিলে উহার মূল্য কি? ছিন্ন কাগজের টুকরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি অনেক রাষ্ট্রে কোন লিপিবদ্ধ শাসনপদ্ধতি নাই। তারপর রাষ্ট্রের প্রধান অধিকারই হইতেছে—আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ও উহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি। একথা সত্য, রাষ্ট্রীয় মত আইনের ভিতর দিয়াই জনসাধারণে পৌঁছায়। অনেকে মনে করেন, এই আইন সমুদয় রাষ্ট্রের বা গবর্ণমেণ্টের স্বরচিত—ইহার সহিত লোকের কোন সম্বন্ধ নাই। বাহ্যতঃ এইরূপই প্রতীয়মান হয় সত্য, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লোকমতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া আইন আবিষ্কার করিলে লোকে ঐ আইনের সম্মান করে না। স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের এতাদৃশ বিধিসমূহ আইন নহে, পরন্তু বে-আইন (lawless law)। কাউণ্ট পোরটেলি নামক জনৈক আইনবিৎ বলিয়াছেন "the legislature should not invent law but only write it" অর্থাৎ আইন প্রণেতার কার্য্য—'নিয়ম' আবিষ্কার করা নহে, যে 'নিয়ম' লোকের ভিতর বিরাজ করিতেছে ও যাহা সর্ব্বসাধারণের ঈপ্সিত তাহাই লিখিয়া রাখা। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম হয়, সেখানেই বিবিধ অনিষ্ট ঘটে। স্বেচ্ছাচারিতা কিছু দিন বেশ অবাধে চলিতে পারে। কিন্তু বেশী দিন চলিতে পারে না। শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, লোকমতের নিকট রাষ্ট্রকে অবনত হইতে হইবে, নতুবা রাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সকলের সাম্মিলিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টভাবে জলন্তাক্ষরে একথা তাঁহাদের পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। যথেচ্ছাচারী রাষ্ট্র সমূহ রাষ্ট্র প্রজাবৃন্দের (citizens) ঔদাসীন্য, ভেদ ও অজ্ঞতার উপরই বাঁচিয়া থাকে। কাজেই অধীন

রাজ্যে যে শিক্ষা লোককে কর্ম্মপ্রবণ করিয়া তোলে, সকলের ভিতর ঐক্য সংস্থাপন করে ও স্বদেশহিতৈষণা উদ্বুদ্ধ করে, সেই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা সম্ভবপর নহে। এমন কি জগতের বিভিন্ন স্থানের আমলাতন্ত্র, অবাধ প্রভুতন্ত্র প্রভৃতি গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায় সমূহ ভেদনীতিকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারা রাষ্ট্র-প্রজাসমূহের ভিতর সুদৃঢ় একতার আভাস পাইলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। অতএব কোন রাষ্ট্র যথেচ্ছাচার হইয়া উঠিলে, তাহাতে নিরাশ হইবার কিছুই নাই, কারণ রাষ্ট্রের সংস্কার সর্ব্বসাধারণের উপর নির্ভর করে। বাহিরের কেহ রাষ্ট্রের প্রভূত সংস্কার করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় অত্যাচার অনাচার উৎপীড়ন প্রভৃতি নিবারণার্থ লোকমত গঠনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। অধীনদেশসমূহে লোকমত গঠন সহজসাধ্য নহে, স্বীকার করিতে হইবে; কারণ সেখানে যথেচ্ছাচার রাষ্ট্র বলপূর্ব্বক অসঙ্গতভাবে লোকমত প্রকাশের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু এরূপভাবে মুখবন্ধ করিয়া নিরাপদ হওয়া চলে না। প্রত্যেকের মনের সঙ্কল্প ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইয়া অবশেষে হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয়, তখন রাষ্ট্র বিপন্ন হইয়া জন-মতের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। পৃথিবীতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

আমেরিকা যখন নিজকে ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র ভাবিতে লাগিল, যখন সে ইংলণ্ডকে ত্যাগ করিয়া নিজ রাষ্ট্র ও শাসনপদ্ধতি নির্ণয় করিতে সঙ্কল্প করিল, তখন বৃটিশ সিংহের অমিতপ্রভাবও আমেরিকার সঙ্কল্পের পথে বাধা জন্মাইতে পারে নাই। সুদূর অতীতকালে যখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ অবাধ প্রভুতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, তখনো রাজাকে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছার নিকট অবনত হইয়া Mag a charta প্রদান করিতে হইয়াছিল। সেদিন ও ইংরেজগণ বুয়রদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অধীন করিয়া রাখিতে ব্যর্থ হইয়া অবশেষে তাহাদিগকে আত্মকর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। হাঙ্গেরী জোর করিয়া ইটালীর লোকমত দমন করিতে পারে নাই। ইটালী স্বীয় স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া নূতন রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র গঠন করিয়া ফেলিয়াছে। মেট্সিনী বলিয়াছেন যে—তিনটি বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিংশতি সংখ্যক নগরী ও বিংশতি লক্ষ লোক জাগিয়া উঠিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করিল ও স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, কিন্তু একটি প্রাণীও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না কিংবা এক বিন্দু শোণিতও পতিত হইল না। লোকমতের উপরে অন্য কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই। রাষ্ট্রের দৈহিক বল বা সৈন্যবল বাহিরের জিনিস। অন্যান্য রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে রক্ষার পক্ষে এসব শক্তির প্রয়োজন থাকিতে পারে কিন্তু এসব শক্তি রাষ্ট্রকে সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রজার আচরণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ইতিহাসে স্পষ্ট দেখাইতেছে—যখনি কোন রাষ্ট্র সম্মিলিত লোকমতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তখনি তাহার পতন হইয়াছে।

আমরা উপরে পুনঃ পুনঃ লোকমতের কথা উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু ইহার মানে কি? লোকমত বা General will কোন ব্যক্তি বিশেষের মত কিংবা সর্ব্বসাধারণের মতের সমষ্টি নহে। ইহার যেমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে আবার তেমনি এই মতটি সকলের মতেরই অনুকূল। আমরা গণিত শাস্ত্রে Resultant force পাইয়াছি, উহা কতকগুলি শক্তির (force) সমষ্টি নহে, কিন্তু এমন একটা শক্তি যদ্দারা কতকগুলি শক্তি সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়। সেই প্রকার লোকমতও সর্ব্বসাধারণের মতের সমষ্টি নহে সত্য কিন্তু উহা এমনই মত ব্যক্ত করে, যাহা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পোষণ করে।

গণিত শাস্ত্রে Resultant force নির্ণয় করিবার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কিন্তু লোকমত নিরূপণ করিবার এরূপ কোন উপায় নাই। সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধিকাংশের মতকেই লোকমত বলিয়া গণ্য করা হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি আঘাত লাগিলে কিংবা ভাবপ্রবণতা নিবন্ধন উত্তেজিত হইলে সকলেই সাময়িকভাবে স্থায়ী হিতাহিত ভুলিয়া যায়। তাহাদের তৎকালীন মতকে লোকমত বলিয়া মনে করা ভুল। এই জন্য গণতন্ত্রের, রাষ্ট্রের ও গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে। উহাদের সাহায্যে তাহারা বিপদের সময় অধিকাংশের মতকে অমান্য করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনকর্ত্তাগণ তাহাদের বিশেষ অধিকার সমূহের

অপব্যবহার করেন। অধিকাংশের সিদ্ধান্তই যে অভ্রান্ত ও সার্ব্বজনীন হিতকর, সেরূপ মনে করা ভুল। একজন সুক্ষ্মবুদ্ধি, স্থিরচিত্ত, আত্মস্থ, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মত, শত সহস্র লোকের মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। সাময়িকভাবে জনসাধারণের ভালমন্দ বিচার শক্তি লোপ হইতে পারে, কিন্তু পরিশেষে তাহারাও ঐ একজনের মতকেই তাহাদের মত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু লোকমত নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন এক ব্যক্তির মতের উপর নির্ভর করিতে গেলে অধিকতর ভুল হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট লোক বিরল। দ্বিতীয়তঃ একজনের চেয়ে দশজনে যাহা ভাল মনে করে, উহাই ভাল হইবার অধিকতর সম্ভব। সেখানেই অধিকাংশের মতকে লোকমত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, যেখানে সকলেই শিক্ষিত, উন্নত ও বিচারশক্তিসম্পন্ন। এইজন্যই ইতরজন সভার (mob meeting) মত, প্রকৃত লোকমত নহে। এতাদৃশ সভার মত অমান্য করিয়া রাষ্ট্র অবাধে টিকিয়া থাকিতে পারে।

দুঃখের বিষয় উল্লিখিত ব্যতিক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অধিকার মদে উন্মত্ত শাসনকর্ত্তাগণ জনসাধারণের ইচ্ছাকে সদাসর্ব্বদা অবহেলা করেন এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। ফলে রাষ্ট্রে অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসীমা থাকে না। তবে একথা সত্য যদি অধিকাংশের কথার পিছনে লোকমত থাকে, যদি বাস্তবিকই উহা সর্ব্বসাধারণের প্রাণের ইচ্ছা হয়, যদি উহা সম্পন্ন করিবার জন্য সকলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও সমস্ত দুঃখ কষ্ট বরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তবে রাষ্ট্রের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং জনশক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী। জগতের সমস্ত প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণই বলিয়া থাকেন—জনশক্তি যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণে সফলকাম হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের প্রচেষ্টাকে বিবর্ত্তন বা বিপ্লব (Revolution) কহে, নতুবা উহা রাজদ্রোহ মাত্র (anarchism)।

প্রজাবৃন্দই রাষ্ট্রের শক্তি। প্রজাসৈন্য ব্যতীত ধারকরা বিদেশী সৈন্যদ্বারা কোন বৃহৎ দেশ শাসন করা চলে না। অতএব রাষ্ট্র-প্রজার (citizen) ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র অধিককালও দাঁড়াইতে পারে না। দুই চারিজন রাষ্ট্রপ্রজা অর্থের লোভে রাষ্ট্র শক্তির সহায়তা করিলেও লোকমতের প্রভাব হ্রাস পায় না। তারপর বহিঃশক্তি কেবল লোকের বাহিরের কাজ নিয়মিত করিতে পারে, কিন্তু কাহারো মনের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। লোকমত ভিতরের জিনিস, বাহিরের জিনিস নহে। একবার লোকমত সুদৃঢ়রূপে গড়িয়া উঠিলে উহার অভিব্যক্তি (objective manifestation) হইবেই হইবে; কেহ উহার গতি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। যদিও কেহ কেহ বলেন 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অধিকাংশ দার্শনিকগণই ইহা স্বীকার করেন না। উপরে ও তাহাই দেখান হইয়াছে। অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে বল নহে, লোকমতের উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমাখনলাল লাহিড়ী।

হা-ভাতের হাহাকার।

তোর দেশ আজ ভাই, উন্মন চঞ্চল!
নির্ব্বোধ, ছাড়, ছাড় ভাবনার অঞ্চল!
হায়, কাম-চর্চ্চার কই তোর অবসর!
ডগমগ সংসার, অস্থির অন্তর!
ওই শোন আহ্বান, ওই শোন গর্জ্জন!
ঊর্দ্ধের স্থান চায় নিম্নের লোকজন!
বর্জ্জন-হর্ষের দেশ আজ সুখ চায়!
ধায় সব দিক্-দেশ সত্যের পন্থায়!
অম্বর পর্ব্বত প্রান্তর কান্তার,
হুংকার শঙ্কায় একদম নিঃসাড়!
দুর্ব্বল মানবের টগ-বগ অন্তর!
আওড়ায় দিনরাত মুক্তির মন্তর!
চাল নাই, ডাল নাই, বস্ত্রের নাই লেশ!
আজ তাই দেশটায় দুঃখের একশেষ!
চিৎকার কান্নায় আসমান টলমল!
এইবার একবার একসাথ পথ চল্!
দুঃখের বেদনায় আজ মন পস্তায়!
সম্মান বিক্রয় হয় খুব সস্তায়!
হায়, হায়, দেশময় ওই শোন গোলমাল!
এইবার ধন জন জান্ মান পয়মাল!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা।

(২)
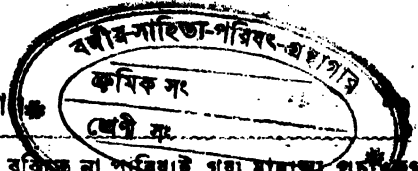
২৯শ সর্গে বামন অবতারের গল্প ভাগ প্রক্ষিপ্ত। এই গল্পের মূল উপাদান বিষ্ণুর ত্রি-পদ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গ—বেদে আছে। ঋক বেদের—

"ইদম্ বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদাধে পদং। ১।২২।১৭

ব্রাহ্মণদিগের আচমনের ঋকমন্ত্র—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়।" ।২২।২০

ইত্যাদি মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে গল্প কল্পিত হইয়াছে, বামন পুরাণ তাহা আশ্রয় করিয়াই মত্ত পুরাণে পরিণত হইয়াছে। রামায়ণে ব্রাহ্মণের গল্প গৃহীত হয় নাই; বামন পুরাণের ও অন্যান্য পুরাণের পৌরাণিক কল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

বেদের নির্দ্দেশকে পৌরাণিকেরা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত এই ঋক্ মন্ত্র দুটীর ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে দেখান গেল।

সূর্য্যকে বেদ সমূহে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বিষ্ণু (সূর্য্য) তিন পাদবিক্ষেপে আকাশ অতিক্রম করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আকাশকে তিন ভাগ করিয়া এক এক ভাগকে এক এক পাদ বলা হইয়াছে। এই পাদ বা ভাগ—কোথায় কোথায়?

প্রাচীন নিরুক্ত কার ঔর্ণবাভ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—"সমারোহণে। বিষ্ণু পাদে গয়া শিরসি।" নিরুক্ত ১২.১৯

ইহার অর্থ—প্রথম পাদ সমারোহণে অর্থাৎ উদয়ে বা উদয় গিরিতে আরোহণে দ্বিতীয় পাদ মধ্য আকাশে স্থিতি, তৃতীয় পাদ গয়াশিরসি বা অস্তাচল (গয়শিরস্তস্তং গিরৌ—দুর্গ চার্য্য)

মধ্য আকাশে অবস্থিত সূর্য্য-পাদকেই আচমন মন্ত্রে 'পরমং পদং' বলা হইয়াছে এবং ঔর্ণবাভ—'বিষ্ণু পাদ' বলিয়াছেন।*

এই সামান্য কথাগুলি হইতে যে কেবল বলি-বামনের কাহিনীই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; ঔর্ণবাভের "গয়া শিরসি" নির্দ্দেশ হইতে গয়া মহাত্ম্যেরও উৎপত্তি হইয়াছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন—ঔর্ণবাভের "গয়া শিরসি'র অর্থ বুঝিতে না পারিয়াই গয়া মাহাত্ম্য প্রচারকগণ গয়াতে বিষ্ণুপাদ স্থাপিত হওয়ার কল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষেও ঔর্ণবাভের পূর্ব্বের কোন সাহিত্যে গয়ার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। (১)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্পটী এইরূপ ভাবে আছে—'দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন,—বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন, ততটুক দেবগণের, অবশিষ্ট অসুরদিগের।' অসুরগণ সম্মত হইল এবং বিষ্ণু তিন পদ-বিক্রমে জগৎ বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। (ঐত-৬।১৫)

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে—"অসুরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয়, ততটুকু দেবগণের; দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন (শতপথ ১।২।৫)

তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৫।১) ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও (৭।৫) এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। (২)

রামায়ণে এই সকল বৈদিক আখ্যান গৃহীত হয় নাই। বলী ও বামনের পৌরাণিক গল্প গৃহীত হইয়াছে।

৩৫শ, ৩৬শ সর্গের গঙ্গোৎপত্তি বিষয়ক গল্পের কল্পনা পরবর্ত্তী। গঙ্গা খুব প্রাচীন নদী—ইহা বলাই বাহুল্য। এই নদী সম্বন্ধে বৈদিক যুগে যে কোন গল্প প্রচলিত ছিল না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এ স্থলে যে গল্পটী যুক্ত হইয়াছে তাহা পৌরাণিক।

৩৭শ সর্গ, ৩৬শ সর্গেরই অংশ। ৩৬শ সর্গে প্রাচীন ভাবের ভিতর অর্ব্বাচীন ভাব প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, এবং ৩৭শ সর্গটী ঐ ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য একেবারে নূতন করিয়া রচনা করা হইয়াছে। এই সর্গের উদ্দেশ্য কার্ত্তিকেয়র জন্ম কথা বিবৃতি। কার্ত্তিক বৈদিক দেবতা নহেন। বৃহদ্দেবতা প্রভৃতি বৈদিক দেবতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থেও এই দেবতার কোন উল্লেখ নাই। স্কন্দ পুরাণে স্কন্দের জন্মের যে পুরাণ ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, রামায়ণের বিবৃতি তাহা হইতে অন্যরূপ।

---

* মধ্য আকাশের সূর্য্যই যে বিষ্ণু—এ সম্বন্ধে সত্যব্রত সামাশ্রমীর ব্যাখ্যা, "সমাজের দেবতা" অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।

(১) যাক্ষ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর নিরুক্তকার। তিনি তাঁহার নিরুক্তে ঔর্ণবাভের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং ঔর্ণবাভ আরো পূর্ব্বের লোক। (২) ঋকবেদ সংহিতা (রমেশবাবু) ১।২২।১৭ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য।

রামায়ণের আদি রচনায় কুমারকে অগ্নির বীর্য্যে গঙ্গার গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতে ইনি রুদ্রের পুত্র; রুদ্র ও অগ্নি এক। এই কল্পনা বৈদিক পুরাণ আশ্রিত। ৩৭ সর্গে কেবল এই নির্দ্দেশটাই থাকিলে প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু রামায়ণের এই প্রাচীন ভাবের উপর এস্থলে জোর করিয়া আমরা উমা মহেশ্বরের সম্পর্ক যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উমা-মহেশ্বরের চিন্তাকে কেন আমরা রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত বলি, তাহার বিস্তৃত আলোচনা রামায়ণের দেবতা প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। স্কন্দের কল্পনা যে বেদে নাই, তাহা বলা যায় না। মহামতি তিলক বেদের সপ্তবধূ উপাখ্যানের মূলে স্কন্দ পুরাণের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য অনেকে ইহা স্বীকারও করেন না।

৩৮শ হইতে ৪৪শ সর্গ—সগর বংশের বিবরণ। এই বিবরণ পদ্ম পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ—এই তিন গ্রন্থে তিন ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গল্পটী প্রাচীন, অন্ততঃ ইক্ষ্বাকু কুলেরই প্রাচীন কথা বলিয়া রামায়ণের ভিতর তাহার স্থান থাকা উচিত। বোধ হয় আদি রচনায় ছিলও সেইরূপ নির্দ্দোষ ভাবে। ক্রমে তাহাতে আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া কপিলের অবতারত্ব ও মহাগজের কম্পন যে ভূমিকম্পের হেতু ইত্যাদি রূপ অর্ব্বাচীন ভাবও এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। বাসুদেব-কথাও পুনঃ পুনঃ এই সকল সর্গে আছে। যথা :—

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।

মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান প্রভুঃ॥ ২

কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম॥ আদি ৪০

অন্যত্র—দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥ ২৫।১ ৪০

এই সকল ভাবকে অনেকেই অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে করেন।

(Vide C. R. M rch. 1922.)

৪৫শ সর্গ—সমুদ্র মন্থন। রামায়ণের এই বিবরণটী শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতেও এই গল্প গৃহীত হইয়াছে। ঋক্‌বেদের ৯ম মণ্ডলের ৪৮।৪, ১০৮।৩, ১১০।৪ প্রভৃতি ঋকের আভাস লইয়া এই পৌরাণিক গল্পের উৎপত্তি বলিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদির আবির্ভাব ন রাই এই প্রসঙ্গটিকে সাজান[illegible] করিয়া তোলা হইয়াছে।

৪৬শ ও ৪৭শ সর্গ—ইন্দ্র কর্ত্তৃক দিতির গর্ভচ্ছেদন। দিতি শব্দ বেদে আছে, কিন্তু এই সর্গে বর্ণিত গল্পটী বৈদিক নহে। 'দিত' ধাতু ছেদনে—এই ভাব হইতেই বোধ হয় এই গল্পটীর সৃষ্টি। * রামায়ণের এই গল্প বিষ্ণু পুরাণ হইতে গৃহীত। বেদের ইন্দ্র, নিষ্টিগ্রীর পুত্র। ইন্দ্র যে পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন ঋক্‌বেদের ৪।১৮।১২ ঋকে তাহার আভাস আছে। ইন্দ্র কর্ত্তৃক দিতির গর্ভ ছেদন হইলে তাহা হইতে মরুৎগণের উৎপত্তি হয়। মরুৎ উৎপত্তির কথাও প্রাচীন। এত সব প্রাচীন ভাব থাকিতেও পৌরাণিক কল্পনার আবরণে গল্পটী সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪৮শ ও ৪৯শ সর্গ—ইন্দ্র অহল্যা সংবাদ। রাম যে বিষ্ণুর অবতার, তাহা প্রমাণের জন্য এই গল্পটী কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। অবতারবাদ কল্পনাটী যেমন ১৮শ সর্গের তিনটী মাত্র পংক্তিতে প্রাণহীন ভাবে উক্ত হইয়াছে, এই গল্পও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। গল্পের কোন স্থানেই উজ্জ্বল দেবভাব ফুটিয়া উঠে নাই। একটী মাত্র শব্দ "তারয়েনাং" দ্বারা মাত্র সে ভাব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে।

তারয়ৈণাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্।"

গল্পটী উত্তর কাণ্ডের ৩৫শ সর্গেও আছে। উভয় বর্ণনায় মিল নাই। উত্তর কাণ্ডের বর্ণনায় অবতার ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মণার্থে মহাবাহুর্ব্বিষ্ণুর্ম্মানুষবিগ্রহঃ॥ ৪২

তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।

সহি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ৪৩

কৃত্তিবাসে সে ভাব আরো প্রাণপ্রদ। পাঠক তাহা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

কোন এক ভাবের রচনার ভিতর পরবর্ত্তী যুগের ভিন্ন ভাবের রচনা প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিলে যে সে রচনায় সঙ্গতি রক্ষা হয় না, পরন্তু পদে পদে তাহা ধরা পড়ে, তাহা দেখাইবার জন্য এ স্থলে আমরা এত কথা বলিলাম।

এই সর্গটী যে একেবারেই বাল্মীকির রচনা নহে, মনে করিবার আরো কারণ আছে। বাল্মীকির ভাব

* এই স্থলে বৃহদ আরণ্যক উপনিষদের ৬।৪।২৩ শ্রুতিটি উল্লেখ যোগ্য। এই শ্রুতির অর্থ—হে ইন্দ্র তুমি সেই পথ অবলম্বন করিয়া [illegible]

সর্ব্বত্র সংযত। এরূপ অবস্থায় এই প্রকার অসংযত হীন রুচির পরিচয় এইরূপ সংযত চিন্তার মধ্য হইতে বাহির হওয়া—বিশেষ কবির সমসাময়িক একজন শ্রেষ্ঠ ঋষির পত্নীর বিরুদ্ধে—তথা, একজন সাক্ষাৎ সমুপস্থিত আচার্য্যের জননীর সম্পর্কে—আমরা কিছুতেই সমীচীন মনে করিতে পারি না। রামায়ণের কোন স্থলেও যদি এইরূপ হীন চিন্তার আভাস আমরা পাইতাম, তবে এরূপ মনে করিতাম না। উন্নত রুচির পরিচয় রামায়ণের কবি যত দিয়াছেন, জগতের কোন সাহিত্যে তেমন উন্নত রুচির কথা শুন যায় না।

রামায়ণের এই অহল্যা কথা পুরাণে আছে। পুরাণের পক্ষে এ গল্প পুরাতনই বটে কিন্তু রামায়ণের পক্ষে তাহা নহে। অহল্যার পুত্র শতানন্দ বিদেহ রাজ জনকের পুরোহিত, রাম লক্ষ্মণাদির বৈবাহিক ব্যাপারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। এরূপ সাক্ষাৎ উপস্থিত একজন ঋষির মাতার সম্বন্ধে বক্তা বিশ্বামিত্রইবা এসকল অপবাদ কথা প্রকাশ করেন কি প্রকারে?

দুরারোগ্য রোগ জন্মিলে রোগীর উদ্ধার জন্য সকল কার্য্যই করণীয়। কিন্তু বাস্তবিকই কি আমাদের হিন্দুর দেবতা, দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপই মনুষ্যেরও অধম পশু প্রকৃতির ছিলেন? তবে আমরা দেব চরিত্রের প্রসংশা করি কেন?

"Hindu Mythology"র ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—"জাতীয় চরিত্রের আভাস জাতির দেবতার চরিত্রে ফুটিয়া উঠে।...যে জাতির নৈতিক চিন্তা যেমন, সে জাতির কল্পনায় তাহাদের দেব চরিত্রও তেমন।"

কথাটী অপ্রিয় হইলেও সত্য। আমরা যে আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রকে গুরুপত্নী গমনরূপ ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে দেখি, আমাদের প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ কন্যার উপগত হইয়াছিলেন, বলিয়া পাঠ করি,—দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিয়া চন্দ্র কলঙ্কিত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রবণ করি এবং এই সকল কথাকে ধর্ম্মকথা বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা নয় কি?

আমাদের 'পুরাণ কথা' মূল্য হীন নহে। পুরাণ গুলি বেদের বাণী আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইয়াছে। বেদের সামান্য সামান্য শব্দকেই, কথাকেই পুরাণকারগণ বৃহৎ বৃহৎ উপাখ্যানে প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের রুচি যদি এক হইত, সকলের ভাব বুঝিবার শক্তি যদি অনুরূপ হইত, তবে পুরাণে পুরাণে এত প্রভেদ দৃষ্ট হইত না। এস্থলে এই অহল্যা উপাখ্যান দ্বারাই তাহার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করা গেল।

যোগবাসিষ্ঠে অহল্যার কথা এইরূপ আছে—অহল্যা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী। তিনি গোতম পত্নী অহল্যা ও ইন্দ্রের পুরাণ কাহিনী শুনিয়া ইন্দ্রনামক কোন এক ব্যক্তির প্রণয়ে আসক্তা হন; রাজা জানিতে পারিয়া প্রণয়ী যুগলকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

বিষ্ণু পুরাণে (৪।১৯।১৬) অহল্যার কথা এইরূপ—শারদ্বানের ঔরসে অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম। টীকাকার শারদ্বানকেই গৌতম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই স্থানে ইন্দ্রের কোন কথা নাই।

ভাগবত পুরাণেও (৯।২১।৩৩) গৌতমের ঔরসে অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম কথা ব্যতীত আর কোন কথা নাই।

তবে দেবরাজ ইন্দ্রের এই অপবাদের মূল কোথায়?

কথিত আছে যে বৌদ্ধ নিন্দুকেরা হিন্দু দেবদেবীর নিন্দা গাথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে মহা পণ্ডিত কুমারীল ভট্টের সহিত তাহাদের বিচার হয়। বৌদ্ধেরা বেদের অপব্যাখ্যা করিয়া যে সকল মত বাদ প্রচার করিয়াছিলেন কুমারীল ভট্ট তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস ইন্দ্র অহল্যার ব্যাপারটী বৌদ্ধ প্রচারক দিগকর্ত্তৃক বেদের অপব্যাখ্যারই ফল। সেই সময় এই গল্পটী এত প্রসার লাভ করিয়াছিল যে তাহা রামায়ণেও প্রচারিত হইয়াছিল। কুমারীল তখন এই গল্পেরই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কুমারীলের এই প্রতিবাদ ব্যাখ্যা তৎপ্রণীত বৈদিক দেবতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা অধ্যাপক মেক্সমুলারের "Ancient San crit Literature" গ্রন্থ হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কুমারীল বলেন—বেদের 'অহনির্জীয়মানতয়া' এই বাক্যাংশের বিপর্য্যয় কল্পনা হইতেই এই অপবাদ মূলক গল্পের

সৃষ্টি। ইহা প্রকৃত পক্ষে একটী রূপক বর্ণনা মাত্র। অহল্যা অর্থ রাত্রি, ইন্দ্র অর্থ সূর্য্য।

"সমস্ত তেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দ বাচ্যঃ সবিতৈবাহনিলীয়মান তয়া রাত্রেরহল্যা শব্দ বাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মক জরণ হেতুত্বাজ্জীর্যতা স্মাদনের বোদিতেন বেতাহল্যাজার ই চ্যতে ন পরস্ত্রী ব্যভিচারাৎ।"

অর্থ—তেজোময়সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতু ইন্দ্রপদ বাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয় রাত্রির নাম অহল্যা। রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করে বলিয়া সবিতাকেই অহল্যাজার বলে; ব্যভিচার জন্য নহে।

বেদের একটী কথা পরবর্ত্তী কল্পনার প্রশ্রয়ে বিরূপ বিপর্য্যয় সৃষ্টি সত্য করিয়া তুলিতে পারে - 'অহল্যা' ও 'ইন্দ্রজার' কথাদ্বয় তাহার প্রমাণ।

ব্রহ্মার কন্যা গমন সম্বন্ধে কুমারীল বলেন—'প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে বেদে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। অরুণ উদয় সময়ে তাহার আগমনে উষার উৎপত্তি। এজন্য উষা সূর্য্যের দুহিতা। উষার সহিত প্রজাপতি সূর্য্যের তেজের সংযোগ ঘটে, এই জন্য উষা ও সূর্য্য (প্রজাপতিকে) স্ত্রী পুরুষ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।'

বেদের এই সকল ভাবই বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল এবং সেই অনুসারে তৎকালীয় কবিগণ স্ব স্ব কল্পনার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন।

কুমারীল পঞ্চম শতাব্দীর লোক। তাঁহার আবির্ভাব কালের পূর্ব্বেই রামায়ণে এই গল্পটী গৃহীত হইয়াছিল এবং রামায়ণের অহল্যা কথার প্রতিবাদই তিনি করিয়াছিলেন।

সংস্কারের প্রভাব অচিন্তনীয়। সেই অচিন্তনীয় সংস্কার প্রভাবে যদি কেহ কুমারীলের ব্যাখ্যাকে অসার মনে করেন, এবং ইন্দ্র অহল্যার ব্যভিচারকেই সার সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই।

৫০শ সর্গে কোন পরবর্ত্তী ভাব নাই। এই সর্গের যজ্ঞটী, যাহার সমাপনের আর দ্বাদশ দিবস অবশিষ্ট আছে, বলিয়া ৫ম শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রক্ষিপ্তের চাপে এই যজ্ঞ উদ্‌যাপনের কোন কথাই আর পরবর্ত্তী কোন অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় না।

৫১শ হইতে ৬৬ সর্গ—এই কতিপয় সর্গে পৌরাণিক গল্প ও পরবর্ত্তী ভাব আছে।

৫১শ সর্গে শতানন্দের মুখেই তদীয় মাতা অহল্যার অপরাধ কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

৫২—৬০ সর্গ বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ সংবাদ। এই গল্প বৈদিক হইলেও তাহাতে বহু পৌরাণিক ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

রামায়ণের আদি স্তরের রচনায় জাতি বিদ্বেষের ভাব নাই, স্মৃতিতেউক্ত নিম্ন জাতি সমূহের কোন উদ্ভবের আভাস তাহাতে নাই। সে সময়ের পুরুষ, অযোধ্যার রাজা রাম দ্বারা তাঁহারই রাজধানীর অদূরবর্ত্তী নিষাদ জাতীয় রাজাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করাইয়াছেন, অনার্য্য সুগ্রীবকে করমর্দ্দন করাইয়া সখ্যতা বন্ধনে বদ্ধ করাইয়াছেন। যে সময়ের রচনায় জাতির উচ্চ নীচতার কোন মাপকাঠিই সৃষ্ট হইয়া ছিল না; চণ্ডাল বলিয়া কোন শ্রেণীই ছিল না, সেই সময়ের রচনার ভিতর যদি থাকে—

"ব্রাহ্মণা বা মহাত্মানো ভুক্ত্বা চাণ্ডাল ভোজনম্॥ ১৪।১৫৯
কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ।

তবে কি তাহা সেই এক সময়ের রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? এই কতিপয় সর্গে এইরূপ বহু পরবর্ত্তী ভাব আছে।

৬ম সর্গে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গ গমন কথা।

৬১।৬২ সর্গে শুনঃশেফ কাহিনী। শুনঃশেফ কাহিনীর আভাস ঋক বেদের ১।২৪ সূক্তে আছে। ঋকবেদের শুনঃশেফ অজীগর্ত্তের পুত্র কিন্তু রামায়ণের শুনঃশেফ ঋচিকের পুত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৩ ঋকবেদের শুনঃশেফের যে গল্প বিবৃত হইয়াছে, রামায়ণে তাহা গৃহীত হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে রোহিতের পিতা হরিশ্চন্দ্র রাজা রোহিতকে বলি দিবার প্রস্তাব করেন; রোহিত সম্মত না হওয়ায় অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফকে বলি দেওয়া স্থির হয়। শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের উপদেশে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের স্তুতি করিয়া মুক্তিলাভ করেন। রামায়ণে রাজার নাম হরিশ্চন্দ্র স্থলে আছে অম্বরীষ; অজীগর্ত্তের স্থলে আছে, ভৃগুপুত্র ঋচিক। ভাগবত এবং বিষ্ণু পুরাণেও এই গল্প আছে। ভাগবতের গল্পে আছে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়াছিলেন।

উপর্যুক্ত ৬০।৬১।৬২ এই তিন সর্গে বিশেষ কোন সন্দেহ জনক ভাব নাই। গল্পের অসামঞ্জস্যতা প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশের হেতু নহে। বৈদিকযুগেও শাখায় শাখায় রীতি ভেদ ছিল, সেই জন্য একই গল্প বিভিন্ন শাখার ব্রাহ্মণে বিভিন্ন রূপে বিবৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই বৈদিক গল্প গুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতির উপরই পৌরাণিক যুগে আধুনিক চিন্তা প্রবেশ করিয়াছিল এবং স্থানে স্থানে আধুনিক ভাবের শব্দ প্রবেশ করান হইয়াছিল।

আধুনিক ভাবের শব্দ পরিবর্ত্তনের একটা দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদান করা গেল।

রাম যে ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন, এই ধনুর্ভঙ্গই আদিকাণ্ডের একটা প্রধান বিষয়। এই ধনুটাকে রামায়ণে 'হরধনু' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। শিবের এক নাম—হর। "হরধনুকে" বাল্মীকির কল্পনা বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে, সমাজে হর বা শিবের আবির্ভাব কালকেও বাল্মীকির সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমরা তাহা করি নাই। সমাজের দেবতা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, রামায়ণের রচনা কালে আর্য্য সমাজে হরি-হরের তথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রিদেবতার কল্পনা ছিল না।

এখানে প্রাচীন স্তবের রচনা দ্বারা পরবর্ত্তী কালের শব্দ পরিবর্ত্তন চেষ্টার প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

বালকাণ্ডের ৩১শ সর্গে বিশ্বামিত্র এই ধনুর পরিচয় দিতে যাইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—"পূর্ব্বে দেবতারা যজ্ঞ সভাতে রাজা জনককে যে ধনু দিয়াছিলেন, তাহা অপরিমিত-বল, তোমরা সেই স্থানে গেলে যজ্ঞ ও ধনু দেখিতে পাইবে।"

এ স্থলে ধনুটী যে মহাদেবের দান, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

বালকাণ্ডের ৬৬ সর্গের ৭।৮ম শ্লোকে জনক রাজা নিজে ধনুর পরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছেন—"এই ধনু কি প্রকারে আমার নিকট আছে, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বিখ্যাত নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরাত নামে নরপতি ছিলেন, তাঁহার হস্তে দেবতারা এই ধনু ন্যাস স্বরূপ রাখিয়াছিলে।..."

এই অংশকে আমরা প্রাচীন স্তবের রচনা বলিয়া মনে করিতে আপত্তির কারণ দেখিনা; কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী ৯ম—১০শ শ্লোক আপত্তি জনক। এই দুইটি পর শ্লোকে এই ধনু যে দেবাদিদেব মহাদেবের,—তাহা দক্ষ যজ্ঞের একটী পৌরাণিক গল্পের উল্লেখ দ্বারা প্রচার করা হইয়াছে। এবং পরবর্ত্তী শ্লোক গুলিতে এ ধনুকে 'হরধনু' 'শৈবধনু' ইত্যাদি নামে পরিচিত করা হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গে—এ কথাও উল্লেখ যোগ্য যে দক্ষের অজ মুণ্ডের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। কিন্তু রামায়ণের দক্ষযজ্ঞের গল্পটী কালীকাপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গৃহীত।

এইবার সীতার মুখে ধনুর পরিচয় শুনুন। অযোধ্যা কাণ্ডের ১১৮ সর্গে সীতা অত্রি-পত্নীর নিকট নিজমুখে বলিতেছেন—

"আমার পিতার (জ্যেষ্ঠ) রাজা মহানুভব দেবরাতের মহাযজ্ঞে মহাত্মা বরুণদেব প্রীত হইয়া এই মহৎ ধনু ও অক্ষয় শায়ক সম্পন্ন তূণদ্বয় দিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

রামের মুখেও এই কথারই পুনরুক্তি অযোধ্যা কাণ্ডের ৩১শ সর্গে আছে। যথা রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"যে চ রাজ্ঞো দদৌ দিব্যে মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ম্।
জনকস্য মহাযজ্ঞে ধনুষী রৌদ্রদর্শনে॥ ২৯।২।৩১

বরুণ বৈদিক দেবতা; বাল্মীকি তাঁহার যুগের দেবতা বরুণের ধনু বলিয়াই এই ধনুকে পরিচিত করিয়াছিলেন। অতঃপর শৈব মতের প্রভাব কালে বরুণ ধনুকেই 'হরধনু' 'শৈবধনু' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছিল। এইরূপেই বৈষ্ণব প্রভাব কালে রামকেও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং রামায়ণের সাহায্যে বাল্মীকির চিন্তা দ্বারা তাহা সহজ করিয়া তোলা হইয়াছিল।

৬৬ সর্গ পর্য্যন্ত বিশ্বামিত্রের তপস্যার কথা বলা হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠ সম্বন্ধে এই একটী প্রশ্ন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে যে, বেদের বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ ও রামায়ণের বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ অভিন্ন কি না?

ঐতিহাসিক ভাবে দেখিতে গেলে বেদের সুদাস হইতে দশরথ ও রাম বহু পুরুষ পরবর্ত্তী অথচ এই সুদাস রাজারই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ উভয়ে। এ রূপ বিচারে এই দুই যুগের ঋষিগণ কখনই এক হইতে পারেন

না। কিন্তু রামায়ণকে যদি কাব্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উপস্থিত হয় না।

আমাদের মনে হয়, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ কাহারও নাম নহে। বংশের উপাধি মাত্র। বেদে ইহার প্রমাণ আছে। ঋক্‌বেদের বহু স্থলে 'বশিষ্ঠগণ' 'বিশ্বামিত্র গণ'—এইরূপ নির্দেশ আছে।

বেদে সপ্তর্ষির কথা আছে। সপ্তর্ষির একটী নক্ষত্র বশিষ্ঠ। লঙ্কাকাণ্ডের ৪র্থ সর্গে রাম ঐ সপ্তর্ষি মণ্ডল মধ্যস্থিত বসিষ্ঠকে তাঁহাদিগের কুল-পুরোহিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

ত্রিশঙ্কুর্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুরোহিতঃ।

পিতামহঃ পুরোহস্মাকং ইক্ষ্বাকুণাং মহাত্মনাম্॥ ৬।৪।৫১

অর্থ—মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরোহিত (বশিষ্ঠের) সহিত বিমল হইয়া প্রকাশ করিতেছেন। পুরোহিত শব্দটাকে টীকাকার গণ বসিষ্ঠ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন।

এদিকে বুদ্ধদেবের জীবনী গ্রন্থ "ললিত বিস্তারে" বিশ্বামিত্রের কথা আছে। বিশ্বামিত্রের নিকট বুদ্ধ লিপি শিক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ স্থলে সকল বিশ্বামিত্র ও সকল বসিষ্ঠকে অভিন্ন মনে করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। ইহার অধিক এই প্রসঙ্গে আর কিছু বলা সঙ্গত মনে করি না।

৭৪-৭৫ ও ৭৬ সর্গে রাম ও পরশুরাম সংবাদ। যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের প্রভাব অধিক প্রমাণ করিবার জন্য একই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এক সময় রামায়ণে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের গল্পের ন্যায় রাম-পরশুরামের এই বোগিতার কথা প্রবেশ করান হইয়াছিল, তাহাদের সেই অনুমান মূলহীন বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষ বিরোধেরই দেশ। দেশে যখন শৈব ও বৈষ্ণব প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল তখন এই উভয় ভক্ত দলের মধ্যে ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এই অধ্যায় গুলিতে সেই যুগ প্রভাবের চিহ্নও সেই সঙ্গে রুদ্র-বিষ্ণুর বিরোধ বর্ণনা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সর্গ গুলিতে এইরূপ আরও পরবর্ত্তী যুগের কল্পনা আছে।

৭৭ সর্গে বালকাণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার পর অযোধ্যা কাণ্ড।

এইরূপে আলোচনা করিতে গেলে প্রক্ষিপ্ত আলোচনার প্রসঙ্গেই একখানা বিরাট গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। তাই আমরা এই স্থানেই ধারা বাহিক আলোচনা শেষ করিলাম।

রামায়ণের প্রতিকাণ্ডেই এইরূপ পরবর্ত্তী যুগের রচনা প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতঃপর খুব বিশেষ বিশেষ আপত্তি জনক বিষয় গুলির উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা গেল।

অযোধ্যাকাণ্ডেও বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে, তন্মধ্যে মাত্র দুটী অধ্যায়ের উল্লেখ করা গেল।

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৮ ও ১০৯ সর্গে বর্ণিত রাম-জবালী সংবাদ প্রক্ষিপ্ত। এই প্রসঙ্গে যে যুক্তিবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা রামায়ণী যুগের যুগধর্ম্ম নহে। ইহাতে যুক্তির অবতারণা দ্বারা বুদ্ধের মতকে নিন্দা করা হইয়াছে। এক স্থানে "তথাগতের" নামটীরও স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। 'তথাগত' বলিতে বুদ্ধদেবকে নির্দেশ করা হয়। রামায়ণের যুগ, যুক্তির যুগ নহে—তাহা আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি। এই যুগ যুক্তিযুগ হইলে, রাম বনবাসের ন্যায় নিদারুণ ঘটনাতেই জাবালীর মুখে অথবা যে কোন স্পষ্টবাদী বক্তার মুখে এইরূপ যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাইতাম। এই দুটী সর্গকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে রামায়ণের কোন ক্ষতি হইবে না। বুদ্ধকে রামের মুখে নিন্দিত করিবার জন্য কোন বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী দ্বারা এই অধ্যায় দুটী রচিত হইয়াছিল।

এই সর্গের আদি রচনার ভিতরও বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও শব্দ প্রবেশ করাইবার চেষ্টার আভাস আছে। যথা—

দ্যুমৎসেন সুতং বীরং সত্যবন্তমনু ব্রতাম্।

সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিনীম্॥ ৬।২।৩০

সাবিত্রী-সত্যবান্ সম্পর্কীয় এই শ্লোকটী মহাভারতের শ্লোক। এখানে অবিকল গৃহীত হইয়াছে।

শব্দ প্রক্ষিপ্তের দৃষ্টান্ত এইরূপ।

"যাংগতি সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ। ৪২ ২।৬৪

'জনমেজয়' রামের পরবর্ত্তী রাজা। সুতরাং ইহাকে পরবর্ত্তী লেখকের অসাবধান-প্রয়োগ মনে করা অসঙ্গত নহে।

আরণ্যকাণ্ডের কবন্ধ প্রভৃতির গল্পগুলি প্রক্ষিপ্ত। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের—

"তত্র পঙ্কজনং হত্বা হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্।"

আজহার ভতঃচক্রং শঙ্খঞ্চ পুরুষোত্তমঃ। ২৮।৪।৫২ অর্থ—পুরুষোত্তম কৃষ্ণ) সেই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ আনিয়াছিলেন। ইত্যাদি ভাব যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। এই কাণ্ডের আরও অনেক বিষয়কে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

সুন্দর কাণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গের ১০—১২শ শ্লোক গুলিকেও প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বহু সন্দেহ জনক রচনা এই সর্গে আছে।

লঙ্কাকাণ্ডের বর্ণনায় পরিপাটী রচনার অবধিই নাই। এই কাণ্ডের শেষ অধ্যায়গুলি প্রায় সকলই রামায়ণের সংগ্রাহকের রচনা।

আমরা মোটামুটি ভাবেই এস্থলে প্রক্ষিপ্ত রচনার আলোচনা করিলাম। এই গ্রন্থের বিষয় আলোচনার মধ্যেও বহু প্রক্ষিপ্ত রচনার আলোচনা করা হইয়াছে।

উত্তর কাণ্ডটী যে বাল্মীকির রচিত নহে, তাহা উত্তর কাণ্ডের ৮৪শ সর্গটী পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ঐ সর্গে আছে, শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে গিয়া রামায়ণ গান শুনিয়া আসিয়াছিলেন। রামায়ণ পূর্ব্বে রচিত না হইলে তিনি উহা শুনিতে পারেন কি ? এই একটি কথাই উত্তর কাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততার পক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ না হইলেও উহা লক্ষ্যের বিষয় বটে।

উত্তর কাণ্ডের বর্ণনার সহিত বহু বিষয়েই মূল রামায়ণের বর্ণনার ঐক্য নাই—অহল্যা-উদ্ধার প্রভৃতি গল্প তাহার প্রমাণ। ইহাও উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা আলোচনার সময় লক্ষ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

উত্তর কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। ইহা যে যুগের রচনা, সেই যুগেরই যুগধর্ম্ম ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে—ইহা বলাই বাহুল্য।

সাগর পারের চিঠি।

বুলোন (ফ্রান্স)
১৮ই এপ্রিল ২৩

* * তোমার চিঠি পেয়েছিলাম গত বছর গরমের ছুটীতে জার্ম্মানী বেড়াতে যাবার ঠিক আগে। আমার সঙ্গে আর একজন বন্ধু ছিল এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের Dr. D. N. Mallik সপরিবারে সঙ্গে ছিলেন। আমরা Ostende,—Brussels হয়ে যাচ্ছিলাম, পথে Brussels এ দুদিন থেকে সহরটা দেখা গেল। Brussels হ'ল Belgium এর রাজধানী। এক দিন রাজাকে তার "প্রাসাদের" বারান্দা থেকে বক্তৃতা দিতে শুনলাম। এখানকার Palsade Justice অর্থাৎ বড় আদালত একটা দেখবার মত জিনিষ। উচু জমির ওপর প্রকাণ্ড এক বাড়ী, ভেতরে বাইরে দুই সুন্দর!

Brussels থেকে একদিন Louvain দেখতে গিয়েছিলাম। এখানে একটা খুব পুরাণো University আছে। যুদ্ধের সময় সব ভেঙ্গে চুরে গিয়েছে। বিখ্যাত একটা লাইব্রেরী ছিল, তার এখন শুধু দেয়াল গুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সন্ধ্যে বেলা Brussels থেকে রওনা হয়ে সকালে Berlin পৌঁছিলাম। বার্লিনে প্রায় দুমাস ছিলাম। দুমাস বেশ কেটেছিল। তখন সবে মাত্র Exchange নাবতে আরম্ভ করেছে। কাজেই বাজার দর Exchnge এর সঙ্গে তাল রাখিতে পারতনা। আমাদের ভারী সুবিধে হত। সব জিনিষ আমাদের কাছে নিতান্ত সস্তা বোধহত। আমি প্রথমে গিয়ে একটা হোটেলে উঠে ছিলাম। তারপর সেখানে দিলীপ রায়ের সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হল। সে আমাকে তার এক বৃদ্ধা বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বাকী সময়টা আমি সেই বৃদ্ধার বাড়ীতেই ছিলাম। ভদ্র মহিলা এক সময় খুব বড়লোক ছিলেন, এখন গরীব হয়ে পড়েছেন। বাড়ীতে এখনও আসবাব পত্র যা রয়েছে, তা দেখেই বোঝা যায়, কি রকম অবস্থা ছিল। সপ্তাহে একদিন এখনও বাড়ীতে Tea party হয়। তাতে অনেক বিখ্যাত লোক সব আসেন। একদিন একজন Count এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বৃদ্ধা দিলীপকে খুব ভালবাসত, দিলীপ ওখানে বেশ নাম করেছিল।

Berlinএ অনেক বেড়িয়েছি। যুদ্ধের আগে নিশ্চয়ই আরো সুন্দর ছিল। এখনও বার্লিন লণ্ডনের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভাল। বার্লিন দুএকটা যে রাস্তা আছে, লণ্ডনে সে রকম কিছুই নেই। দুটো জিনিষে বার্লিন হার মানে লণ্ডনের কাছে; একটা হয়েছে পুলিস, আর একটা হয়েছে

মাটির তলায় (underground) রেলগাড়ী। এখানকার পুলিসের নিয়মাবলী প্রথমতঃ খুব গোলমেলে; তারপর—পুলিসে সে সব যে কি তা জানে না। জানে এই পর্য্যন্ত, যে কতকগুলি নিয়ম আছে যা বিদেশীকে মানতে হবে। রাস্তার পুলিসও কিছু জানে না। রাস্তার খোঁজ করলে কলকাতার পুলিসের মত "সিধে চলে যাও, শালা" বলে না। খুব অমায়িকভাবে পকেট থেকে ছাপারখানা ম্যাপ, guide book ইত্যাদি বা'র করে আধঘণ্টা খোঁজ করেও হয়ত বলতে পারে না; নয়ত ভুল রাস্তায় খোঁজ এক মিনিটে বলে দেবে। লণ্ডনের underground রেলপথও লণ্ডনের একটা গৌরবের বিষয়। বার্লিনে প্যারিশে সব জায়গায়ই মাটির তলায় রেল আছে, কিন্তু লণ্ডনের মত বন্দোবস্ত কোথায়ও নেই।

বার্লিনে কাইজারের বাড়ী দেখলাম। এখন সেখান একটা মিউজিয়ম হয়েছে। দুএকটা ঘরে এখনও কাইজারের জিনিষ পত্র কিছু কিছু রয়েছে। বার্লিনের বাড়ীতে কাইজার বেশী থাকতেন না। তাঁর আসল প্রাসাদ হয়েছে পোট্‌স্‌ড্যামে (Potsdam)—বার্লিন থেকে কয়েক মাইল দূরে। Potsdamএর কাছে Wansee বলে অনেকগুলি হ্রদ আছে—ভারী সুন্দর। মোটর বোটে বেড়িয়েছি। দুধারে বাগানওয়ালা সুন্দর সুন্দর সব বাড়ী। কাইজারের সময় যত সব count ইত্যাদি বড়লোক থাকত এই সব বাড়ীতে। এখন কারা আছে, জানিনা। Potsdamএ কাইজারের দুটো বাড়ী ছিল। একটার নাম "Sans Sonee" এটা কাইজারের ঠাকুর দাদার তৈরী। তিনি ছিলেন খুব ফরাসীভক্ত। "Sans Sonee" ঠিক Versalleesএর Trianonএর নকল। একতলা বাড়ী, তেমন বিশেষ কিছু দেখতে নয়, তবে ঐতিহাসিক বটে। দেখবার জিনিষ Sans Soneeর বাগান। কাইজারের নিজের বাড়ী হচ্ছে "Nen Palase" বিরাট প্রকাণ্ড বাড়ী। ভেতরে মস্ত মস্ত ঘর। একটা প্রকাণ্ড Hall, দেয়াল শুধু সমুদ্রের ঝিনুক ও নানা রংএর সমুদ্রের পাথর দিয়ে মোড়া। অবাক্ হয়ে যেতে হয়। আর একটা ঘর আছে শুধু মার্কেল দিয়ে তৈরী। দেয়ালে কত সব সুন্দর সুন্দর ছবি! বাড়ীর মধ্যেই ছোট একটা থিয়েটার। ভারী সুন্দর! সেখানে শুধু কাইজার ও তাঁর বন্ধুবর্গ বসে থিয়েটার দেখতেন। কাইজারের বাড়ী দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেখানে শুধু ইয়োরোপের আদর, ভক্তি ও সম্মানের লোক সমস্ত হেঁটে বেড়াতেন সেখানে আমরা আজ ধুলোমাখা পা দিয়ে হট্ হট্ করে কেমন বেড়াচ্ছি; অবাক কাণ্ড! কেমন সময়ের পরিবর্ত্তন।

বার্লিনে অনেকগুলি মিউজিয়াম ও চিত্রশালা দেখলাম। অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি বার্লিনের চিত্রশালা গুলিতে রয়েছে, কিন্তু দেখবার জিনিষ হ'ল Dresden এর চিত্রশালা। Dresden ছিল Saxonyর রাজধানী, German Empire তৈরী হবার আগে। ড্রেসডেন বার্লিনের চেয়ে অনেক পুরণো সহর। এখানকার চিত্রশালায় সব বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রকরের আসল ছবি রয়েছে। Raphael, Rubens ইত্যাদির যত আসল ছবি এখানে আছে, অত আর কোথায়ও নেই। ড্রেসডেনে খুব ভাল চিনে মাটীর জিনিষ তৈরী হয়, তাও দেখলাম। ড্রেসডেনের নিকটে Saxon Switzerland বলে একটা জায়গা আছে। ভারী সুন্দর দেখতে। পাহাড়ে জায়গা, নীচে নদী। একটা বড় সহরের কাছে এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আর কোথায় আছে, জানি না।

বার্লিন থেকে প্যারিসের পথে Cologneএ একদিন ছিলাম। cologneএর গির্জ্জা এক দেখবার জিনিষ। ভেতরে গিয়েছিলাম। একজন পুরোহিত ল্যাটিন শ্লোক আওড়াচ্ছিল। ঠিক আমাদের দেশের মন্দিরের ভেতর পুরোহিতের সংস্কৃত শ্লোক পড়ার মত। আমাদের মন্দিরের মত চারিদিকে বাতি এবং ধূনাও ছিল। ইংরেজী protestant গির্জ্জায় এসব থাকে না। The Rhine নদীর ওপর পুল সেও এক বিরাট ব্যাপার, দেখতেও সুন্দর। কলোন তখন ইংরেজ অধিকারে। সেখান থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে Bonne ফরাসী অধিকারে। সেখানে যাবার আমাদের অধিকার ছিল না, তবুও গিয়েছিলাম। ছোট সহর। এখানেও একটা পুরানো University আছে।

কলোন থেকে আমার সঙ্গে যে বন্ধু ছিল, সে লণ্ডন চলে গেল। আমি Paris রওয়ানা হলুম। সে এক রাত্রি

গেছে। রাত্রি বেলা ৩ বার Pass port দেখাতে হয়েছে, ৩ বার বাক্স খুলে customsকে দেখাতে হয়েছে। আমার সঙ্গে ফটোগ্রাফীর অনেক জিনিষ ছিল। যে সব জিনিষের customs দিতে হয় না, আমি শুধু সেই সব জিনিষই এনেছিলাম। তবু তাদের সন্দেহ ঘোচে না। জিনিষ পত্র উল্টো পাল্টা করে এমন রেখে গেল যে প্যারীশ পৌছান পর্যন্ত আমি বাক্স বন্ধ করতে পারিনি।

প্যারীশে প্রায় দিন পনের ছিলাম। অনেক দেখবার জিনিষ আছে। এত জিনিষ তাড়াতাড়ি দেখতে গেলে ঠিক তারিখ করতে পারা যায় না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, সুন্দর সুন্দর ছবি, বড় বড় গেট্, বড় বড় রাস্তা, এসব দেখতে দেখতে এক ঘেয়ে হয়ে যায়। কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা সাধারণ মত বোঝ্‌বার শক্তি থাকে না। বার্লিন ইত্যাদি দেখে প্যারীশে এসে আমার ঠিক এই রকম লাগছিল। প্যারীশও বেশ সুন্দর সহর, তবে এর একটু বিশেষত্ব আছে। প্যারীশ দেখে মনে হয় যেন লোককে দেখবার জন্যেই সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছিল। এ রকম মনে হবার কারণ এই, যে, প্যারীশ মাঝে মাঝে ভারী সুন্দর আবার মাঝে মাঝে ভারী কদাকার ও নোংরা। কোনও একটা রাস্তা হয়ত বেশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে, রাস্তার মাঝখানে গুসারি গাছ ইত্যাদি, আর তার পাশের রাস্তাগুলি অতি কদাকার ও নোংরা। এই রকম প্যারীশের সব জায়গায়। দেখবার জিনিষ যেগুলি—যেমন Opera,—ইউরোপের মধ্যে সব চেয়ে বড় থিয়েটার; Etoile,—একটা প্রকাণ্ড গেট্; কোন্ যুদ্ধের স্মৃতি-চিহ্ন মনে নেই; Camps Elyses—একটা মস্ত রাস্তা; Rue de Rivoli একটা একেবারে সোজা রাস্তা, মস্ত লম্বা; Place de La Concorde একটা রাস্তার চৌমাথা, রাত্রে গ্যাসের আলোতে ভারী সুন্দর দেখায়, এখানে Louis XIV ও Marie Antonoiteএর মাথা কাটা হয়েছিল। এসব জায়গা সত্যিই অবাক্ করে দেয়।

প্যারীশ থেকে Versallies দেখতে গিয়েছিলাম। এটাই ছিল ফরাসী রাজাদের থাকবার জায়গা। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা এইখানে ঘটেছে। সবচেয়ে আধুনিক হচ্ছে গত যুদ্ধের Peace conference. যেখানে Conference হয়েছিল সে ঘরটার নাম Hall of mirrors. ঘরের একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালা আর তার ঠিক সম্মুখে অপর দিকে ঠিক জানালার আকারের আয়না। হঠাৎ মনে হয় দুদিকেই জানালা। Versallies এর বাগান ভারী সুন্দর।

প্যারীশে Napoleanএর কবর দেখলাম। বেশী কোন জাঁক জমক নাই, অথচ লোকটার গুরুত্ব জানিয়ে দেয়। Louveneএর Musenm দেখলাম। সব দেখবার সময় হয়নি। শুধু ছবিগুলি দেখে এলাম। English channelএর অপর পাড়ে ছোট একটা সহর। সুন্দর বেশ, তবে এখনও এদের "Season" আরম্ভ হয়নি। তাই লোকজন খুব কম।

মাঝে এখান থেকে হঠাৎ এক সপ্তাহের জন্যে Belgium বেড়াতে গিয়েছিলুম। প্রথমে গিয়ে উঠলুম Bruges। Bruges খুব একটা পুরানো সহর। মধ্য যুগের অনেক চিহ্ন এখনও রয়েছে। সে সময় Buges Europe এর মধ্যে খুব একটা বিখ্যাত জায়গা ছিল। সব চেয়ে বেশী সম্পর্ক ছিল ইংলণ্ডের সঙ্গে। তারা পাঠিয়ে দিত wool এদের কাছে। আর এরা কাপড় বুনে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিত। ঠিক যেমন আমরা পাঠিয়ে দিই তুলো ম্যাঞ্চেষ্টারে, আর ম্যাঞ্চেষ্টার আমাদের কাপড় বুনে পাঠায়। এক সময় Flamish art এর খুব নাম ছিল, Brugesই তার প্রধান জায়গা। Bruges থেকে গিয়ে ছিলাম Ypres. এখানে একটা ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। Ypres, Bruges এরই মত পুরণো সহর, তবে পুরণো সহরের বাকী আছে সামান্যই। যুদ্ধের সময় ভেঙে সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানে বেশ একটা চক্‌চকে সহর তৈরী হয়েছে। এসব দেখে কিন্তু মনে হয় যুদ্ধটা এক রকম ভালই। পুরণো পচা জিনিষ ভেঙে নূতন করে দেয়।

কলকাতার অর্দ্ধেকটা যদি এরকম করে ভেঙে নূতন হয়ে ওঠে, তবে ভাল বই মন্দ হবে না। বিখ্যাত Hillbo এর কাছেই, কিন্তু আমাদের সময় হয়নি, তাই যেতে পারিনি। যুদ্ধের চিহ্ন যথেষ্টই দেখলুম, চাষবাস অনেক জায়গায় আবার আরম্ভ হয়েছে। চাষকরা ক্ষেতের মাঝখানে হঠাৎ একটা firman "Pill Box" concre-

tiedর শক্ত ঘর অথবা একটা Batte , দেখতে ভারী অদ্ভুত লাগে। জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা কামানের চাকা ইত্যাদি, গোলা, shell, কাঁটাতার ইত্যাদি জড় করা রয়েছে। কোথাও বা একটা ঠ্যাং ভাঙ্গা Tank পড়ে রয়েছে। তার চারিদিকে হয়ত গমের চাষ। কোনখানে হয়ত একটা জঙ্গল ছিল, এখন সেখানে কতকগুলি মাথা ভাঙ্গা ডালপালাহীন গাছের গুঁড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব গাছের গায়েই কামান বন্দুকের গোলার দাগ। বেলজিয়ামের অনেক জায়গায় বাড়ী ঘর তৈরী হইতে আরম্ভ করেছে তবু ও অনেক জায়গায়ই; মাইলের পর মাইল শুধু ভাঙ্গা বাড়ী ঘর পড়ে রয়েছে। ভারী অদ্ভুত দেখতে! বাড়ীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার ছাদের মধ্যে হয়ত প্রকাণ্ড একটা ফুটো; কিম্বা ঠিক বাড়ীটার মাঝখান দিয়ে একটা গোলা চলে গেছে, বাকী বাড়ীটা ঠিক আছে। এই রকম সব।

Antwarpএ একদিন ছিলাম। এটা একটা মস্ত বড় বাণিজ্যের বন্দর। আমাদের দেশী সওদাগর এখানে কয়েক জন আছেন। একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল। আমাদের দেশী লস্কর কয়েকজন দেখলাম। পথে Lille (France) কয়েক ঘণ্টা ছিলাম। Lille একটা মস্ত বড় কারখানা সহর। যুদ্ধের সময় Germanরা খুব Bombard করেছিল। সহরের মাঝে একটা ধ্বংসের স্তূপ। ফরাসীদের আর বেলজীয়মের মধ্যে এই তফাৎ দেখলাম, যে বেলজীয়ামরা চটপট্ সব ভাঙ্গাচোরা জুড়িয়ে নিচ্ছে আর ফরাসীরা হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। বলে, টাকার অভাব; জার্ম্মানরা টাকা দিলেই সব তৈরী করব। আমার মনে হয়—আসল দোষ স্বভাবের। এখানে এক গাদা ছোট ছোট Tank দেখলাম। বোধ হয় Ruprএর দিকে চলেছে। ট্রেন থেকে দেখলাম Armentier সহর একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসের স্তূপ। লোকজন সব সহরের চারিদিকে কাঠের কুঁড়েতে বাস কচ্ছে। * * *

যাক একেবারে তোমাকে অনেক দিনের কথাই লিখে ফেললাম। * * *

বৈশাখী।

বোশেখ মাসের প্রথম দিনে
বিশ্বরাণীর হাল খাতা।
সকল গাছে সবুজে বাহার,
অশোক গাছে লাল পাতা॥
ধানের মাঠে পাৎলা সবুজ—
নূতন ধানের অঙ্কুরে।
আমের শাখায় অবাক কলন
টীয়ে পাখীর রংজুড়ে॥
কাল্ বোশেখীর প্রথম ঝড়ে।
ছোটিয়ে দিয়ে ধুল বালী;
নূতন ক'রে ফুলের ফসল
করলে সে কোন ফুল মালী?
ভুঁই চাপারা ফুট্‌লো ভুঁয়ে,
নাইকো তাদের গাছপালা।
মল্লী ফুলের কুঞ্জতাতে
পল্লি-বধুর লাজ ঢালা।
শুক্‌নো ভুঁইয়ে সুবাস ছুটে
প্রথম বারি-সম্পাতে।
তৃপ্ত চাতক ফটিক্ জলে
মেঘের অনুকম্পাতে॥
ভাটু শালিকে বাঁধ্‌বে বাসা
খুঁজে বেড়ায় ঘুল্‌ঘুলি।
ঝাপ্‌সা ঝোপের আড়াল খুঁজে,
জট্‌লা করে বুলবুলি॥
ঝিঙ্গে শশার ফসল করে
আঙ্গিনাতে ঠান্‌দিদি;
দিনের মাঝে শ-বার দেখা,
ঠিক যেন তাঁর প্রাণ নিধি!
দুপুর বেলা ঝিঁ ঝিঁর ডাকে
ঝর্‌ছে লতার মঞ্জরী।
সন্ধ্যেবেলা মেঘের সাথে
ভেকের বাজে খঞ্জরী।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

কবি জীবনী। *

কবি জীবনী লিখা অতি কঠিন কাজ। এমন কি ইহা অসাধ্য কাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত পক্ষে কবি-জীবনী তাহার ছাচে ঢালিয়া প্রকাশ করা যায় না। কবি প্রতিভার বিকাশ দেখান যদি কবিজীবনীর উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা কবির স্পষ্ট কাব্যেই আছে। কিন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া যদি কবি শক্তির উৎস আবিষ্কার করা কবিজীবনী লিখার উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্য কখনও সফল হয় না। গাছে ফুল ফুটে কেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া যেমন বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই, তেমনি কবির জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া কেহই কবি শক্তির উৎস আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখকের শক্তি অভাব হেতু অথবা উপাদান সংগ্রহের ত্রুটিতে যে কবিজীবনী লিখা ব্যর্থ হয়, তাহা নহে। কবি কোন্ নিভৃত উৎস হইতে তাঁহার কাব্যের রস সংগ্রহ করিয়া আনেন, তাহার সন্ধান কবিজীবনের ঘটনাবলীতে পাওয়া যায় না। মুরের লিখিত ইংরেজ কবি বায়রণের জীবন চরিত একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। মুর বায়রণের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। বায়রণের জীবনের কোন ঘটনাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মুর বায়রণের লিখিত বহু চিঠি-পত্র, অশ্রুত পূর্ব্ব অনেক আখ্যায়িকা ও জ্ঞাতব্য বিষয় অতিশয় দক্ষতার সহিত স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। উহা তথাপি কবি জীবনী হয় নাই, বায়রণের জীবনী হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত কবি টেনিসনের পুত্র তাঁহার পরোলোক গত পিতার জীবন চরিত সুবৃহৎ দুই খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। টেনিসন সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য সকলই তাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। বহু ঘটনাবলী সমাবেশে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে; কিন্তু তাহাও কবিজীবনী হয় নাই। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের স্বরচিত জীবন কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আত্মজীবন চরিতে অসামান্য কলা কৌশলের সহিত কত খুটিনাটি কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কবির জীবন নাটকের অভিনয় দেখিতেছি। কিন্তু তথাপি উহাদের একটীও কবিজীবনী হয় নাই; মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্র নাথের জীবনী হইয়াছে।

মাটির মূল্যের সহিত যেমন ফুলের সৌরভের কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তেমন কবির জীবনের ঘটনাবলীর সহিত কবি প্রতিভার কোন কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয় নাই। কাব্যই কবির প্রকৃত জীবন চরিত। কাব্য বাদ দিলে কবিও যা' অন্য দশ জনও তা'। কাব্য কুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত বাণীর বত্রিশ সিংহাসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইলে অন্যের সহিত কবির কোনই পার্থক্য থাকে না। কবির জীবন চরিত পাঠ করিলে দেখিতে পাই, শক্তিশালী কবিরাও সাধারণ লোকের ন্যায় সুখে আনন্দিত হন, দুঃখে বিচলিত হন, প্রশংসায় উৎফুল্ল হন, নিন্দায় মর্ম্মাহত হন। ব্যক্তিগত জীবনে বিচার বুদ্ধি, সংযম ও সহিষ্ণুতায় কবিরা বরং সাধারণ লোক অপেক্ষা হীনতর প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। বাস্তবিক কবির ব্যক্তিগত জীবন, আদর্শ জীবন নহে। কবির কবিত্ব তাঁহার কাব্যে, ব্যক্তিগত জীবনে নহে। যাহারা চরিত্রের বলে ত্যাগের মহাত্ম্যে পুণ্য ও ধর্ম্মের প্রভাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন তাহাদেরই জীবন—আদর্শ জীবন। সেই মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত্র পাঠে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। কবির জীবন সেই হিসাবে মূল্যবান নহে। যদি কাহারও কবি প্রতিভা মহৎ গুণরাশি সম্বলিত হয়, তবে সেই কবির জীবনও অনুকরণীয়। কিন্তু তাহা দৈবাৎ ঘটে। লোকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করে, তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য। কিন্তু কবি মধুসূদনের জীবন চরিত্র পাঠে সেই ফল হইবে না। এইজন্য কবি টেনিসন কবি-জীবনী লিখার বিরোধী ছিলেন। তিনি একটী কবিতায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন কাব্যই কবির কীর্ত্তি; কাব্য পড়িয়াই জন সাধারণের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কবির ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করা সঙ্গত নহে। কিন্তু টেনিসনের পুত্রও পিতার মতের অনুসরণ করেন নাই।

কাব্যের মধ্যে কবিকে যত বড় দেখা যায়, জীবন চরিত্রে তিনি তাহা অপেক্ষা অনেকখানি ছোট হইয়া পড়েন। কবি

* "স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস"—শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল ২৲ টাকা মাত্র।

তাঁহার সমগ্র শক্তি এবং ঐকান্তিক অভিনিবেশ কাব্য প্রণয়নে নিয়োজিত করেন। কাব্য কবির সাধনার ফল। অপর দিকে, কবি নিজ জীবন গঠনের জন্য কোন যত্নই করেন না। এই জন্য কাব্যেই কবির কৃতিত্ব, আত্মজীবন গঠনে নহে। ডাক্তার জনসন কবি গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"No man was more foolish when he had not a pen in his hand or more wise when he had" গোল্ডস্মিথের কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার ভাবের গভীরতা, ভাষার মাধুর্য্য এবং কলা সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; কিন্তু কবির জীবন চরিত তাঁহার অদূরদর্শিতা ও নির্ব্বোদ্ধিতার অভ্রান্ত প্রমাণ। অর্থাভাবে গোল্ডস্মিথের অনেক দিন আহার জুটিত না। ছিন্ন জামা ও ছিন্ন পেণ্টুলন পরিধান করিয়া অনেক সময় তাঁহাকে বাহির হইতে হইত। এমনও ঘটিয়াছে যে গোল্ডস্মিথকে বিছানার চাদর পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে হইয়াছে। তবুও গোল্ডস্মিথ সতর্ক হইতেন না। তাঁহার হাতে যত অর্থই আসুক না কেন, তাহা নিঃশেষ করিতে গোল্ডস্মিথের বেশী সময় লাগিত না। ঋণের দায় তাঁহার অনেকবার জেলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। জগতের অধিকাংশ প্রতিভাবান কবির জীবন চরিতই এই প্রকার। ইহার কারণ—কাব্য সৃষ্টিই কবির একমাত্র লক্ষ্য; জীবন গঠনে তাঁহারা চির উদাসীন।

তবে কবিজীবনী লিখিয়া ফল কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিজীবনী আদর্শের জন্য লিখিত হয় না। জগতের প্রাচীন মহাকবিদিগের জীবন চরিত নাই, তথাপি তাঁহাদিগের রচিত মহাকাব্য সকল বুঝিতে কষ্ট হয় না সত্য; কিন্তু যদি মহাকবিদিগের জীবনাখ্যায়িকা আমাদিগের জানা থাকিত তবে নিশ্চয় আলোক সম্পাতে তাঁহাদিগের কাব্যের সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কথা, যে কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া অবিনাশী কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন, যাহার অমর কাব্য ভাণ্ডারের সুধা আস্বাদন করিয়া বিশ্ববাসী অফুরন্ত তৃপ্তি লাভ করিতেছে, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী জানিবার জন্য অনিবার্য্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয় কথা; মহাকাব্যের সহিত মহাকবির জীবন আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ নাই। মহাকাব্য কবির অভিনব সৃষ্টি। কিন্তু গীতি-কবিতা কবির ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি। গীতি কাব্যের কবিদিগের জীবন চরিত জানা না থাকিলে তাঁহাদিগের কবিতার সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের আলোচ্য—কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন চরিতের কথা উল্লেখ করিতেছি। গোবিন্দ দাসের কবিতা পুস্তকগুলি তাঁহার দুঃখময় জীবনের কাতর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। তাঁহার এক একখানি কাব্য, জীবনের এক একটী করুণ অধ্যায়। আপন বুক ফাটা অশ্রুরাশি দিয়া কবি সুনিপুণ হস্তে মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের জীবনের ঘটনাবলী জানা না থাকিলে তাঁহার অনেক কবিতাই দুর্ব্বোধ্য হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যানুরাগিগণ সকলেই গোবিন্দ দাসকে চিনিতেন। তাঁহার দুঃখময় জীবনের কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। এই জন্য তাহাদিগের নিকট গোবিন্দ দাসের কবিতা অতিশয় মর্ম্মস্পর্শিনী হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিবৃত্ত যাহাদের নিকট অজ্ঞাত, তাহারা তাঁহার কবিতার রস পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে পারিবেন না। ইংরেজ কবি বায়রণের ন্যায় গোবিন্দ দাসও তাঁহার অধিকাংশ কবিতার নায়ক। সুতরাং গোবিন্দ দাসের কবিতা বুঝিতে হইলে আগে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী জানিতে হইবে। এই জীবন চরিতে লেখক যথাসাধ্য সেইরূপ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

গোবিন্দ দাসের এই উৎকৃষ্ট জীবন চরিতখানি পড়িয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। গোবিন্দ দাস ঢাকা জেলায় জন্ম গ্রহণ করিলেও ময়মনসিংহ তাঁহার কর্ম্মভূমি ছিল। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কার্য্যোপলক্ষে এই জেলায় বাস করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—কবি মৃত্যু পর্য্যন্ত ময়মনসিংহের অধিবাসীদিগের অর্থেই প্রতিপালিত হইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা গৌরব বোধ করিতেছি। সৌরভ পত্রিকা বিশেষভাবে কবির নিকট ঋণী। সৌরভ সম্পাদককেও কবি একজন বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। সৌরভ সম্পাদক সম্বন্ধে অনেক কথাই ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সৌরভে কবি যত কবিতা লিখিয়াছেন এক নব্যভারত ব্যতীত অন্য কোন পত্রিকারই তাঁহার এত কবিতা মুদ্রিত হয় নাই। চির দরিদ্র গোবিন্দ দাস জীবনে অনেক

দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন কিন্তু, জীবন চরিত সম্বন্ধে তিনি অনেক কবি হইতেই ভাগ্যবান্। তাঁহার মৃত্যুর পর চারি বৎসরের মধ্যে বহু সংখ্যক হাফ্‌টোন চিত্র সুশোভিত তিন শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুন্দর জীবন চরিতখানি প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার কবিস্মৃতির সম্মান ও বঙ্গ সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

উপসংহারে গ্রন্থকারকে একটী কথা বলিয়া আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই পুস্তকে লেখক কবির ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে যতটা মনোযোগ দিয়াছেন, তাঁহার কবিতা শক্তির বিকাশ দেখাইতে ততটা প্রয়াস করেন নাই। কবির ব্যক্তিগত জীবনের অভাব অভিযোগের কথাই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে গোবিন্দ দাসের একটু বিশিষ্টতা আছে। তিনি খাটি বাঙ্গালী কবি। তাঁহার কোথায়ও কোন কৃত্রিমতা নাই, ভেজাল নাই, অন্যের অনুকরণ নাই। তিনি প্রাণে যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক সরল মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গুণে তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের সমকক্ষ। শ্যামল-পল্লী প্রকৃতির চিত্র এরূপ সুন্দর নিখুঁত ও চিত্তাকর্ষক করিয়া আর কোন আধুনিক কবি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ের অনেক বিখ্যাত কবিদিগের কবিতা পড়িলেই বুঝাযায়, তাঁহারা প্রকৃতির মনোহারী শোভা প্রত্যক্ষ করেন নাই। বই পড়িয়া তাঁহারা প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছেন। স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস শস্য শ্যামলা, কুসুম শোভিতা প্রকৃতি রাণীর সুশীতল ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি অন্যের নিকট হইতে ধারকরা সাজ সজ্জায় কবিতা দেবীর দেহ ভূষিত করেন নাই। গোবিন্দ দাসের সৌভাগ্য অর্থাভাবে তিনি সুশ্যামল পূর্ব্ববঙ্গের নৈসর্গিক মাধুর্য্যের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সহরের কৃত্রিমতার মধ্যে বাস করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গের শস্যপূর্ণ সবুজ মাঠ, নানা বিচিত্র তরুলতা সুশোভিত বন-উপবন, অভ্রভেদী সুনীল পাহাড়-পর্ব্বত, পদ্ম-কুমুদ-কহ্লার প্রস্ফুটিত, ডাহুক-কাড়া-বক-পিপি পরিবৃত বর্ষার বিল, দিগন্ত ব্যাপী সুনীল হাওরর, তরঙ্গায়িত নদ-নদী, ও গ্রাম্য বধূর কলকণ্ঠমুখরিত ছায়া স্নিগ্ধ পথ, স্নানের ঘাটে পল্লী রমণী-দিগের জল ক্রীড়া ইত্যাদি গ্রাম্য চিত্র অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কবি সরল গ্রাম্য ভাষায় তাঁহার কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। পল্লীর ক্ষুদ্রতম পুষ্পটীও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। যে স্থানে যে গ্রাম্য শব্দটী ব্যবহৃত হয়, কবি সেই শব্দটী সেই স্থানের বর্ণনায় সযত্নে প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ ভাব-ব্যঞ্জক (suggestive) শব্দ ব্যবহার করায় কবির চিত্র অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। গ্রাম্য চিত্রাঙ্কনে কবি অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক একটী গ্রাম্য শব্দে এক একটী সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশা করি, পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার গোবিন্দ দাসের কবি প্রতিভার এই বিশিষ্টতাটী আরও বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

ভাব অভিব্যক্তির আদিম রীতি।

ভূমিষ্ট হইয়াই মানবশিশু কথা বলিতে পারে না, কিন্তু নানা উপায়ে সে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। শিশু করুণস্বরে কাঁদিলেই মা বুঝিতে পারেন—সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। শিশু দুই হাত তুলিলেই তাহার মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী—মনে করে, সে তাহাদের কোলে আসিতে চায়। নিদ্রিত শিশু বিছানায় মূত্রত্যাগ করিয়া সহসা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠে, তাহাতেই মা শিশুর কোন অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ নানা উপায়ে শিশু জনক-জননী, ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। মানসিক ভাবের এই অভিব্যক্তি একপ্রকার ভাষা।

আমাদের মনে হয়—আদিম মানব-সমাজে ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বে শিশুর ন্যায় আকার ইঙ্গিতেই মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করিত। শিশু যেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে, মানব সমাজও সেইরূপ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ভাষা সৃষ্টি করিয়া তাহার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে।

ভাষা ভাবের বাহন। ভাষার সাহায্যে মানুষ নানা প্রকারে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে। অনেক স্থলে কথা না বলিয়া অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যদি কেহ—যে দেশের ভাষা সে জানেনা—এমন দেশে ভ্রমণ করিতে যায়, তবে অঙ্গ ভঙ্গীর সাহায্যেই সে পানীঃ বা আহার্য্য দ্রব্যের প্রার্থনা করিয়া থাকে। মধ্য ও উত্তর ইউরোপের লোকেরা অদ্যাপি সম্মুখ দিকে মাথা নোওয়াইয়া অথবা ডান বামে মাথা নাড়িয়া "হাঁ" বা "না" ভাব প্রকাশ করে। আরবদেশের লোক সম্মতি জানাইতে হইলে মাথা নাড়ে; কিন্তু মস্তক উন্নত করিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ইটালীর অধিবাসীরা তর্জনী ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি বুকের উপর সমান্তরালভাবে হস্ত সঞ্চালন দ্বারা অসম্মতি জানাইয়া থাকে।

আমেরিকার লোক প্রথমে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা কেবল জাতি ও নাম বাচক বিশেষ্য পদগুলি প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু কালক্রমে এই প্রণালীর ভাষা যখন উন্নত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা ইহার সাহায্যে সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদ প্রভৃতিও সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে শিখিল। পরিশেষে অঙ্গভঙ্গীর
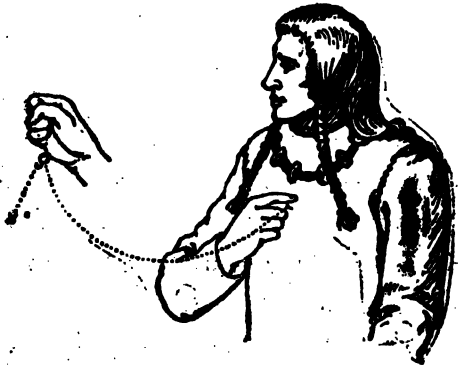
সাহায্যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। চিত্রলিপির ন্যায় তাহাদের অঙ্গভঙ্গীর ভিতর নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্নের অবতারণা করা হইল।

ডেকোটা আমেরিকানেরা সাঙ্কেতিক অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে "আমি বাড়ী যাইতেছি" এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। যখন তাহারা তর্জ্জনী প্রসারিত করিয়া বুকের পাশে নিয়া যায়, তখনই "আমি" এবং কতকটা প্রসারিত করিয়া তর্জনীকে স্কন্ধদেশে—উত্তোলন করিলেই "যাইতেছি"—ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ পায়। তৎপর মুষ্টি বদ্ধ করিয়া হাত সহসা নীচের দিকে নিয়া গেলেই "বাড়ী" বুঝাইয়া থাকে।

বিভিন্ন দেশে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার সাঙ্কেতিক অঙ্গভঙ্গী মূলক ভাষা প্রচলিত থাকায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে বা বুঝিতে অনেক সময় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় এই জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ভাষার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এমন এক প্রকার ভাষা আছে—যাহাতে শব্দের পূর্ব্বে বা পরে অন্য কোন শব্দাংশ বা প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদি কোন কিছু যোগ করিবার বিধি নাই। ইহাতে কোন শব্দ রূপান্তরিত হয় না। বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থানুসারে অর্থ বুঝিয়া লইতে হয়:—যথা চীনদেশের ভাষা। ইহাতে টা (ta) শব্দ কোন স্থানে মহৎ, কোন স্থানে 'মহত্ব,' কোন স্থানে "মহৎরূপে" অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু কোথাও টা শব্দ রূপান্তরিত হয় না।

আর একপ্রকার ভাষা আছে, ইহাতে শব্দের সহিত কৃৎ তদ্ধিৎ—প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যয়াদি যোগ করা যাইতে পারে। যথা তুর্কি স্থানের ভাষা। টার্কি ভাষায় আরকান্ (দড়ি); আরকানলার দড়িগুলি।

আমাদের বাঙ্গলা ভাষা অনেকটা এইরূপ।

শব্দ ও ধাতুর সহিত বিভক্তি ইত্যাদি যোগ করিলে ইহারা রূপান্তরিত হয়, এইরূপ একপ্রকার ভাষাও প্রচলিত আছে; যথা—সংস্কৃত, আরবী ইত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন—প্রথমোক্ত এক শব্দাংশ মূলক ভাষাই সর্ব্বাগ্রে প্রচলিত ছিল। পরে ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া শেষোক্ত প্রকারের ভাষায় পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক এসম্বন্ধে অধিক আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

অঙ্গভঙ্গী ব্যতীত মনের ভাব প্রকাশের জন্য আরও অনেক সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেলওয়ে ষ্টেশনে আমরা দেখিতে পাই লাল নীল প্রভৃতি নানারঙ্গের নিশান হাতে লইয়া দুই একজন লোক দাঁড়াই থাকে। তাহারা মুখে কিছুই বলে না—কেবল, নিশান উপরে তুলিয়া

ঝুলাইতে থাকে, তাহাতেই ড্রাইভার বুঝিতে পারে, এখানে থামান দরকার। ইহাকেও একপ্রকার সাংকেতিক ভাষা বলা যায়। জগতের অনেক সুসভ্য দেশেও এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাষার প্রচলন আছে। আমেরিকার অনেক লোক এখনও অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুর আগমন বার্ত্তা অথবা মৃগয়ায় পশু বধের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ক্রীড়াক্ষেত্রে এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে বংশীধ্বনি দ্বারা আদেশ জ্ঞাপন করা হয়। ইহাও সাঙ্কেতিক ভাষা বিশেষ।

ভাষার সাহায্যে লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা অতি উৎকৃষ্ট উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে অক্ষরের সাহায্যে যেরূপ লিখিয়া থাকি, মানব, সৃষ্টির আদিতেই সেইরূপ লিখিতে পারে নাই। মানুষ অতি প্রাচীনকালে নানাপ্রকার চিত্রাদি আঁকিয়া অথবা বৃক্ষস্কন্ধে স্মৃতিমূলক চিহ্ন খোদাই করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিত। পরে অক্ষরাদির আবিষ্কার হওয়ায় বর্ত্তমান লিখন পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ কাষ্ঠখণ্ডে অথবা গো মহিষের শৃঙ্গে খাজ কাটিয়া তাহাদের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বলীর স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করিত। অস্টা[illegible] [illegible]স্কিমো, ইয়াকুট, ও আফ্রিকার নিগ্রো, লেওটিয়ান প্রভৃত অনেক জাতিই এই উপায় অবলম্বনে তাহাদের প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির স্মৃতি রক্ষা করে। একটি লেওটিয়ান পল্লীগ্রামে এইরূপ একটা খাজকাটা শৃঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস—চীনদেশের ওয়াংহো নদীর তীরে যাহারা বাস করিত, তাহারাই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ খাজকাটা চিহ্নের ব্যবহার করিয়াছিল এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কোন কিছু বলিবার উপায় এখন নাই। হিসাব মনে রাখিবার জন্য এখনও কুলি প্রভৃতি অশিক্ষিত লোককে চক্ দ্বারা এইরূপ খাজকাটা চিহ্নের ব্যবহার করিতে দেখা যায়। শুনিয়াছি রণজিৎসিংহ একটি খাজকাটা যষ্টির সাহায্যেই নাকি সমস্ত রাজ্যের হিসাব রাখিতেন।

রেড ইণ্ডিয়ানদের টটেম লিপি এক প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা বিশেষ। তাহারা বাড়ী ঘর অস্ত্রশস্ত্র গৃহপালিত পশু, এমন কি শরীরের উপর পর্য্যন্ত পারিবারিক ও জাতীয় একটি বিশেষ চিহ্ন খোদাই করিয়া রাখে। ইহা হইতেই নাকি "ট্রেডমার্ক" কথারও সৃষ্টি হইয়াছে।

ফ্রান্সের দক্ষিণে প্রস্তরে খোদিত ভাষা জ্ঞাপক এক প্রকার লাল চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে ইহাদিগকে অক্ষক্রীড়ার সংখ্যা জ্ঞাপক চিহ্ন বলিয়া মনে করেন।

এস্কিমোদের চিত্র লিপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কারণ এই অসম্পূর্ণ চিত্রলিপি হইতেই পরিণামে সুচারু চিত্রলিপির উদ্ভব হইয়াছিল। এস্কিমোরা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

একটী এস্কিমো গল্প।

এই ১২টি চিত্রের সাহায্যে সুন্দর একটি শিকারের গল্প বলিয়া যাইতেছে। ১ম চিত্র যিনি গল্প বলিতেছেন তাহাকে বুঝাইতেছে, তাহার প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত "আমি" ও বাম হস্ত "যাইতেছি" ক্রিয়া জ্ঞাপক। ২য় চিত্র নৌকা, ৩য় চিত্র একরাত্রি নিদ্রা, ৪র্থ কোন দ্বীপের পর্ণ কুটীর, ৫ম চিত্র আমি আরও দূরে যাইতেছি, ৬ষ্ঠ চিত্র অন্তর্দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছি ৭ম চিত্র, দুই রাত্রি যাপন করিয়াছি, ৮ম চিত্র বর্শাদ্বারা শিকার, ৯ম চিত্র সিল, ১০ম চিত্র ধণুদ্বারা শিকার, ১১শ চিত্র নৌকাযোগে প্রত্যাবর্ত্তন, ১২শ চিত্র শিবিরের কুটীরে প্রত্যাগমন জ্ঞাপন করিতেছে। এইরূপে তাহারা গান করে ও অন্যান্য অনেক গল্প বলিয়া থাকে। তাহাদের বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। তাহারা ইহার সাহায্যে আবেদন নিবেদন পর্য্যন্ত করিতে পারে।
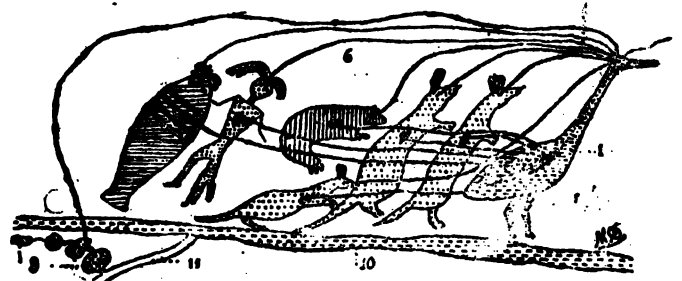
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকট আবেদন পত্র।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চিপওয়ে আমেরিকানগণ যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেন্টের নিকট যে চিত্র লিপির সাহায্যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি উপরে প্রদত্ত হইল।

চিত্রে ১—৭নং পর্য্যন্ত আবেদন কারিগণ; ৮নং একটি হ্রদ, যাহার জন্য দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। ১০নং

লেইক সুপিরিয়র, ১১নং রাজপথ। তাহারা এই চিত্রলিপি দ্বারা (৮নং) হ্রদটি অধিকার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। গাছের বাকলের উপর ছবি আঁকিয়া তাহারা তাহাদের এই আবেদন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নিকট পাঠাইয়াছে। বক ও অন্যান্য প্রাণী আবেদনকারিগণের পূর্ব্ব পুরুষদিগের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলে যে একান্তে একই উদ্দেশ্যে এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে—এই ভাবটি ব্যক্ত করিবার জন্য সকলের চক্ষুই এক একটি রেখা দ্বারা বকের বা প্রথম আবেদন কারীর চক্ষুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবেদনকারিগণের ঐক্য ভাবও কতগুলি রেখা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে আবেদন কারিগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ বা মতানৈক্য নাই। বকের মাথা হইতে একটি রেখা প্রেসিডেন্টের অভিমুখে উর্দ্ধদিকে; আর একটি রেখা যে হ্রদগুলির উপর দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাদের বরাবর নিম্নদিকে টানা হইয়াছে। এই চিত্রলিপি মানুষের মনের একটি বিশেষভাব বেশ পরিস্ফুট রূপেই প্রকাশ করিতেছে।

আমেরিকার অনেক স্থানে এইরূপ সাঙ্কেতিক চিত্র লিপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরও কতকগুলি চিত্রলিপির নমুনা দেওয়া হইল।
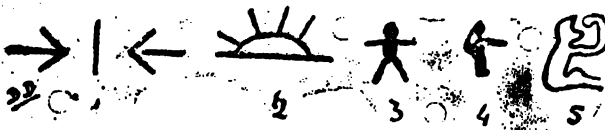
চীনের (১) আধুনিক ও (২) প্রাচীন লিপি।

১নং চিত্র পরস্পর বিপরীতদিকে অঙ্কিত দুইটি বাণ দ্বারা "যুদ্ধ," ২নং চিত্র উদীয়মান সূর্য্যদ্বারা প্রাতঃকাল," ৩নং চিত্র, হস্ত প্রসারিত করিয়া "কিছুই নয়" ৪নং ও ৫নং চিত্র মুখের নিকট হস্ত তুলিয়া "আহার" জ্ঞাপন করিতেছে।

মিশর ও মেক্সিকোর লোকেরাও ঠিক এইরূপ চিত্রলিপির সাহায্যেই "আহারের" ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। প্রাচীন মিশরীয়, কেলদীয় ও চৈনিক চিত্রলিপি ও সঙ্কেতলিপি হইতে অনেকেই অনুমান করা যায় যে ঐ চিত্র লিপি হইতেই ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অনুমানের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য নিম্নে চীনের বর্ত্তমান ও প্রাচীন চিত্রলিপির নমুনা প্রদত্ত হইল।

旦 口 山 木 犬 馬 人

1 2 3 4 5 6 7

১ম চিত্র—প্রাতঃকাল, ২য় চিত্র চন্দ্র, ৩য় চিত্র পর্ব্বত, ৪র্থ চিত্র বৃক্ষ, ৫ম চিত্র কুকুর, ৬ষ্ঠ চিত্র অশ্ব ৭ম চিত্র মানুষ।

বর্ত্তমান সাঙ্কেতিক লিখন (steography) ও তড়িৎ বার্ত্তা (telegraphy) ইত্যাদিও এইরূপ কোন সাঙ্কেতিক চিত্রমূলক বা ধ্বনিমূলক ভাষা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নির্ব্বাক অভিনয় (টেব্লো) ও ছায়া চিত্র (বায়স্কোপ) প্রভৃতির কথা চিন্তা করিলে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তাহারাও প্রাচীন ইঙ্গিত ভাষার এক প্রকার আদর্শ।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

গোলক ঠাকুরের ঘোড়া।

গ্রামের মধ্যে গোলক ঠাকুর ছিলেন নিতান্ত নিরীহ ও ফুর্তির ব্রাহ্মণ। সংসারে তাহার আত্মীয়স্বজনের অভাব না থাকিলেও একজন দূর সম্পর্কীয়া বিধবা ভগিনী ব্যতীত এই খেয়ালাতুর নিরীহ ব্রাহ্মণের সহিত আত্মীয়তা বজায় রাখিবার জন্য আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

সত্যভামারও ত্রিকুলে কেহ ছিলনা। একবার অষ্টমীর স্নানে যাইয়া বিধবা সত্যভামা রোগাক্রান্ত হইলে গোলকের আপ্রাণ যত্নে সে রক্ষা পায়। সেই হইতে নিরাশ্রয়া সত্যভামা গোলকের আশ্রিতা। সত্যভামাকে গোলক অনাদর করিত না কিন্তু খুব আদরও করিত না। গোলকের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের পোষ্য ছিল—তাহার বাহন রাসমণি ঘোটকী।

ব্রাহ্মণ যজমানে যাইয়া যাহা পাইতেন, তাহাই তাহার বিচিত্র খেয়াল রক্ষায় পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই আয় ব্যতীত কয়েক বিঘা পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তরও তাহার ভাগে পড়িয়াছিল, তাহাতেও যথেষ্ট ফসল ফলিত।

গোলকের সহোদর ভ্রাতা গোলককে পৃথক-অন্ন করিয়া দিলেও এবং তাহার অন্যান্য আত্মীয়েরা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা না করিলেও গোলক তাহাদিগকে দুঃখে দৈন্যে সাহায্য না করিয়া পারিত না।

গোলকের মিজাজ যেমন বুঝিত সত্যভামা, তেমন বুঝিত রাসমণি। রাসমণি বৃদ্ধ প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়া আপন ইচ্ছায় ধীরে ধীরে চলিত। তাহার এইরূপ মন্থর গতিতে গোলকের ধৈর্য্যে আঘাত লাগিত না। পথে মানুষ দেখিলে গোলক গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতেন; অবস্থা বুঝিয়া রাসমণিও মানুষ দেখিলেই দাঁড়াইত। রাসমণি গোলকের যজমান বাড়ি ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের গৃহ বেশ জানিত; সুতরাং যেদিকে সে যাইত, গোলক আপত্তি করিত না। রাসমণির ইচ্ছাকে গোলক বাধা দিতনা; মনে মনে ভাবিত—যাউক, রাসী যে দিকে যাইতে চায়, নাহয় একটু বিলম্ব হইবে।

যজমান বাড়ীর পথে কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ী থাকিলে, গোলক সেখানে উঠিত ও প্রয়োজনমত সেই আত্মীয়কে যথা সম্ভব সাহায্য করিত।

এক যজমান বাড়ীর পথে গোলকের এক মাসীর বাড়ী ছিল। গোলক যজমানে যাইতে আসিতে তথায় উঠিত সুতরাং রাসমণির সেই গৃহ পরিচিত ছিল। আজ রাসমণি সেই দিকেই চলিল এবং শেষে আসিয়া সেই বাড়ীতে দাঁড়াইল। মসতাত ভাইগুলির অবস্থা ভাল নয়। গোলক তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে প্রাপ্ত চাউল ডাইলের কিছু অংশ দিল। তারপর রাসীর পৃষ্ঠে চড়িল।

গোলক যে স্থানেই যাইতেন দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় গৃহে না আসিয়া উপায় ছিল না। সংসার বলিতে যাহা বুঝায়, গোলকের যদিও তাহা ছিল না। যদিও গোলক ছিলেন আজীবন কুমার এবং আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত, তথাপি তাহার সংসার ছিল বিরাট এবং সেই বিরাট সংসারে ছিল পোষ্য নানা শ্রেণীর।

সত্যভামা ও রাসমণি ব্যতীত তাহার আর পোষ্য ছিল—সোনাতনী গাভী, চৈতনী বকন, বোধাষাড়, টেন কুকুর মটক ছাগল, মনি বিড়াল, তৈতৈ হাঁস, বক্‌বকম পায়রা, গঙ্গাপ্রসাদময়না, রামরাম টীয়া, চন্দনীকোড়া… এইরূপ কতকিছু।

এই পোষ্যপুত্র দিন রাত যেমন গোলককে জ্বালাতন করিত, তেমনি তাহার অনসর প্রাণে অনন্ত সুখের প্রস্রবণ বহাইয়া দিত। খেয়াল বিভোর নিরীহ ব্রাহ্মণের ইহাই ছিল সংসার-সুখ।

সদ্য প্রসূতী সোণাতনী দুগ্ধ দিত বটে কিন্তু গোলক দুগ্ধের জন্য তাহার বৎসকে বাঁধিয়া রাখিতেন না। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল "কাকা বাছুর দুধ খাইতেছে …"

গোলক ধমক দিয়া তাহাকে সমঝাইয়া দিলেন—"বাছুর তাহার মার দুগ্ধ খাইলে তাহা বলিতে নাই; ইহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, অব্রাহ্মণের কাজ ..'

গোলক যজমান বাড়ী হইতে আসিতেছিলেন, রাসমণি প্রভুকে লইয়া আপনার স্বাভাবিক মন্থর গতিতে চলিতেছিল। গোলকের মস্তকে প্রায় অর্দ্ধমন চাউলের বস্তা। যজমান বাড়ীর প্রাপ্য বৃত্তি—চাউল, দাইল, কাপড়, তরি-তরকারী ইত্যাদি। বাহন বৎসল গোলক বাহনের উপর বোঝাটী চাপাইয়া নির্দ্দয়তার পরিচয় না দিয়া নিজের মাথায়ই তাহা চাপাইলেন; এবং তিনি নজে রাসমণির উপর খুব সন্তর্পণে চাপিয়া বসিলেন।

রাসমণি অতিরিক্ত বোঝার চাপে কষ্ট পাইবে—আহা কি সরল বিশ্বাস! কি মূক-বাৎসল্য!

গ্রামের নিতাই শীল সর্ভাঙ্ক পথে গড়াইয়া পড়িয়া গড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরদা মাথায় কি?"

নিতাইকে দেখিয়া রাসমণি দাঁড়াইল। গোলক ঠাকুর প্রশ্নের উত্তরে তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"ভাই রাসীর গর্ভ, তাই তাহার উপর আর চাউলের বোঝাটা চাপাইলাম না। আর কত দূরেরইবা পথ! নিজের মাথায়ই রাখিয়াছি।"

নিতাই বলিল - "আপনার মত ভাব ক জন ভাবে ঠাকুরদা…"

গোলক—'না ভাবিলে কি হয়, সেওতো মানুষ—শ্রী বন্ধু প্রাণীতো বটে।"

গোলকের ছিল, এমনই সরল প্রাণ,—এমনই তরল চিন্তা।

গোলকের দুঃখ দরদ বুঝিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। ইহার ফলে যত নিরুপায়ের আশ্রয় ছিল, গোলকের করুণদৃষ্টি ও অকিঞ্চিৎ দান। দান অকিঞ্চিৎ হইলেও তাহা মহৎ।

গোলকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এক ঝুলা কন্যা ছিল। পিতা মাতা কন্যাটিকে সংসারের দায় বলিয়াই মনে করিতেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া গোলকের প্রাণ কাঁদিল। গোলক এক দিন মেয়েটীকে মাতার নির্ম্মম নিগ্রহ হইতে মুক্তি দিয়া আনিয়া নিজের গৃহে স্থান দিলেন। ঝুনী সেই দিন হইতে গোলকের পরিজনের মধ্যে গণ্য হইল। ঝুনিকে যে গ্রহণ করিবে, গোলকের ভবিষ্যৎ ওয়ারিশ সেই হইবে—ব্রহ্মোত্তর যজমান তাহারই প্রাপ্য—গোলক চারিদিকে তাহাই প্রচার করিয়া দিলেন।

সত্যভামা গোলকের এইরূপ সাময়িক খেয়ালে আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করিলে গোলক অম্লান বদনে সত্যভামাকে তাহার এইরূপ খেয়ালের প্রশ্রয়েই যে সত্যভামারও আশ্রয় সম্ভব হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতেন।

রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে গোলকের সংসার আরম্ভ হইত। তখন হইতে তাহার কণ্ঠে—"রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ রাম রাম, পড় বাবা গঙ্গাপ্রসাদ! রাম রাম—পড়!" এই পাখীর পাঠ-মন্ত্র শুনা যাইত। সেই সময় হইতেই এই সকল গৃহ গ্রহদিগের আহার সংস্থানে ও আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকিয়া গোলক চারিদিকের ঝঞ্ঝাট মিটাইতেন। স্নিগ্ধ হস্তে গাভীকে খড় ও বিচালী, ময়নাকে ছাতু, টীয়াকে বুট, ছাগীকে ঘাস...ইত্যাদি—যাহার যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ও স্নান আহার সম্পন্ন করাইয়া অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন।

রাসীকে গা ধুইয়া দিয়া ঘাস দিয়া তাহার গাত্র আচড়াইয়া দিয়া মনে পরম প্রীতি অনুভব করিতেন। ইহার পর নিজে স্নান আহ্নিক করিয়া রাসীকে লইয়া পরম পুলকে যজমান বাড়ী যাইতেন অথবা কোথাও না যাইতে হইলে সেই চিড়িয়া বুাহে থাকিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতেন।

(২)

আজ গ্রামের হাট-বার। গোলক রাত্রি ৭টায় মস্ত বড় বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। বিধবা সত্যভামা বিকালে মাছ রাঁধিতে পারিবে না; সুতরাং আজ বিকালের মাছ নিজকেই রাঁধিয়া লইতে হইবে! সেই মাছের অংশ পাইবে তাহার মেনি বিড়াল, টেনি কুকুর, চন্দনী কোড়া, আর ভ্রাতুষ্পুত্রি ঝুনী।

মাছের নহরটা রান্নাঘরের বেড়ায় ঝুলান চুপ্ রীতে রাখিয়া গোলক বাহির হইতেই বারান্দার মধ্যে মাথার বোঝাটা ফেলিয়া দিয়া ডাকিলেন—"সত্য, জল দাও মাছের হাতটা ধুই..."

সত্যভামা জল লইয়া আসিয়া উঠানের এক কোণে যাইতে যাইতে বলিল—"দাদা রাসীকেতো দেখিতেছি না..."

গোলক চমকিয়া উঠিয়া বলিল—'কতক্ষণ।'

"তুমি বাজারে যাওয়ার পর হইতেই দেখি না।"

গোলক উচ্চৈস্বরে ডাকিল—"রাসী—রাসমণি—মা।"

উত্তর নাই।

"কি আশ্চর্য্য! আমি যাই সত্য, দেখি রাসী কোথায়। পাড়ার ছেলেরা যদি লইয়া গিয়া থাকে।..."

সত্য বলিল—"যাওতো একটা প্রদীপ লইয়া যাও—লেঠনের কুপীটা জ্বালাইয়া দেই অন্ধকার রাত্রি।"

'না—আর কি হবে যাবে কোথায়?" বলিয়া গোলক দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

"রাসী—রাসমণি—মা—"

ব্রাহ্মণের গলার শব্দ বহুদূর হইতে শোনা গেল।

গোলক গ্রামের বালকদিগের নিকট বাড়ী বাড়ী গিয়া রাসীর সংবাদ লইল; কেহই বলিল না—সে দিন তাহারা কেহ রাসীকে দেখিয়াছে।

মাঠ-ঘাট-বাট তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়াও যখন গোলক তাহার রাসীর উদ্দেশ পাইল না তখন সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। 'রাসী, মা কোথায় গেলে তুমি?'

অন্ধকার রাত্রে বাজারের এক পথিক সংবাদ দিল—"এক যাত্রার দলের কয়েকটা ছেলেকে একটা গদি বিহীন ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে সে দেখিয়াছে। সে দল হয়ত এতক্ষণে ৮।১০ মাইল গিয়াছে। সে দেখিয়াছে বাজারে আসিবার সময় সন্ধ্যার পূর্ব্বে। এখন রাত্রি প্রায় ৮টা।"

অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার ধৈর্য্য গোলকের হইল না। গোলক ছুটিয়া চলিল, পথিকের নির্দ্দেশ অনুসারে—যাত্রার দলের পশ্চাতে।

গোলক যাহাকে পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—"ওগো তোমরা আমার রাসীকে দেখিয়াছ? রাসী ঘোড়া—লাল রঙের ঘোড়া—শ্রীবিষ্ণু ঘুড়ী।"

গোলকের এইরূপ আকুল প্রশ্নের উত্তরে একব্যক্তি জানাইল—ঐ মহাজন বাড়ীর দল-দাম পচা আঁধা পুষ্করিণীতে একটা লাল ঘোড়া ঘাস খাইতে দেখিয়াছি; কিন্তু এখনও সেটা সেখানে আছে কিনা বলিতে পারি না।'

"ঘোড়া না ঘুড়ী ?"

"তা ঠিক বলিতে পারিনা।"

"কখন দেখিয়াছিলে ?

"ঠিক সন্ধ্যার সময়।"

গোলক দৌড়িল মহাজন বাড়ীর দিকে। সে পুষ্করিণী তাহার পরিচিত। বহু গো, ঘোড়া সেখানে চড়িয়া খায়, তাহা তাহার জানা ছিল। রাসীকে যাত্রার দলের ছোক্‌রা গণ কিছু দূরে লইয়া গিয়া যে দলপতির তাড়নায় ছাড়িয়া দিয়াছে—গোলকের মনে এ বিশ্বাস খুব প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। হায় রাসীকে দৌড়াইয়া পাপিষ্টেরা কি পরিশ্রান্তই না জানি করিয়াছে। এরূপ খাটুনির পর আহার না হইলে, মা আমার চলিবে কেমন করিয়া ?"

মহাজন বাড়ীর পুকুর অতি বিস্তৃত পুকুর এবং অতি প্রাচীন পুকুর। এখন তাহা পচা দাম দলে আচ্ছন্ন অতি সঙ্কটময় স্থান। তাহাতে পা স্খলিত হইয়া পড়িলে তেমন বল সম্পন্ন প্রাণীরও আর উদ্ধারের উপায় নাই। রাসীর চিন্তায় গোলকের সে বিপদের কথা ভাবিবার অবসর কোথায় ?

"রাসী—রাসমণি—মা আমার!" ডাকিয়া ডাকিয়া সেই বিস্তৃত পুকুরের পচা দলের উপর গোলক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় রাসমণি ?

* * * *

পরদিন প্রাতে মহাজন বাড়ীর লোক দেখিল দিঘীর একস্থানে গোলকের দেহখলিত অবস্থায় দামের মধ্যে অর্দ্ধ প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। শরীর যেন সাপের বিষে কাল হইয়া গিয়াছে। মৃত দেহ দেখিতে সেখানে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল।

কেহ বলিল—'ঠাকুরকে সাপে কাটিয়াছে।'

কেহ বলিল "ভূতে মারিয়াছেন"

কেহ বলিল—"যাহার মরণ যেখানে, নায় চড়িয়া যায় সে সেখানে।"

স্নেহের দান।

(২৭)

মাখন কয়েক দিনের জন্ত আসিয়াছিল সুতরাং সে আর অপেক্ষা করিতে পারে না। মণিরও আর বাড়ীতে মন টিকিতেছিল না। মাখনের সহিত মণিও কলিকাতা যাইয়া কিছু দিন থাকিয়া একটু মুক্তির শ্বাস ফেলিয়া আসিবে বলিয়া স্থির করিল।

মাখন আসিতেই সকল গোলযোগ একেবারে থামিয়া গিয়াছে দেখিয়া বড় কর্ত্রীর মনে মাখনের প্রতি আর পূর্ব্ব ভাব নাই, বরং তাহার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই জন্মিয়া গেল।

এইবার মাতা পুত্র উভয়ই তাহার উপর নির্ভর করিলেন। সেও দুই হিস্যার মত সামঞ্জস্য করিয়া ম্যানেজারকে 'কমন ম্যানেজার' নিযুক্ত করিয়া দিয়া দুই ষ্টেটের তহসিল একত্র করিয়া দিল। তারপর দুই বন্ধুতে একত্র যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিল।

মাখন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাটার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মণিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—যাঁহাকে একবার গুরু স্বীকার করা যায়, সে চোরই হউক আর যাই হউক ; তাঁহার দোষ দেখিবার অধিকার শিষ্যের নাই, শিষ্য, গুরুর গুণই দেখিবে। কাল উষা যাত্রাই যাত্রা, ভাল দিন আর নাই—চল, যাওয়ার পথে একবার স্বামীজীর দর্শনটা করিয়া যাই। আমি যে একেবারেহ তাহা হইতে বঞ্চিত রহিলাম।

মণি সরল ভাবে বলিল—"তাহার সম্মুখে গেলেই তাই আমার আর জ্ঞান থাকে না। কেমন যে মোহিনী শক্তি ওঁর। তবে যাওয়া উচিত। চল কাল যাই।"

মণি আপত্তি করিল না।

এক কথাতেই ঠিক হইয়া গেল। মাখন পঞ্জিকা হস্তে লইয়া তখনই মাসীমাকে খবর দিতে গেল।

এই কয় দিন মাখনের সহিত মাসীমার নিতান্ত কাজের কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা প্রায় হয় নাই, কনকের সহিত তো একেবারেই না।

কনক অবসর পাইলেই দাদার পায়ে ধরিয়া তাহার ত্রুটীর জন্য ক্ষমা চাহিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু এই পাঁচ দিনের মধ্যে

একবারও সে সেইরূপ সুযোগ পাইল না। অথচ মুখ ফুটিয়া সে মাখনকে একটু সময় করিতেও বলিতে পারিতেছিল না।

কনকের মন আঁইঠাই করিতেছিল। মাখন সময় সময় যখন নিতান্ত প্রয়োজনে ভিতরে আসিতেছিল, তখন ইচ্ছা করিয়াই সে তাহার দৃষ্টিকে নিতান্ত সংযত রাখিয়া চলিতেছিল। কনক মাখনের এই সাবধানতার প্রতিও লক্ষ্য করিয়াছে এবং তাহা ঘৃণা না ভাবিয়া অভিমানের প্রতিশোধ বলিয়াই মনে করিয়াছে। কনকের খুব বিশ্বাস যখন সে তেমন সুযোগ পাইবে, তখন সে মাখনের এই কৃত্রিম সাবধানতা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে। এই সুযোগের আশা তাহার দিন রাতের চিন্তা ও কল্পনাকে আপাততঃ সান্ত্বনা প্রদান করিতেছিল।

প্রাতে ৮টায় মাখন আসিয়া যখন বলিল—"মাসী মা এদিকে আর ভাল দিন হয় না, কাল ঊষা যাত্রা করিয়াই যাইতে হইবে।" তখন কনকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।

কনক তাহার কক্ষের জানালা খুলিয়া বসিয়া মাখনের আনীত নূতন উপহার পুস্তক গুলি উল্টাইয়া দেখিতেছিল। একখানা 'মীরা', একখানা উমা, একখানা সুভদ্রা, সীতা, সাবিত্রী—প্রায় এক আলমারী বই। দাদাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করিয়াও যে এই প্রীতি উপহার গুলি তার বিনিময়ে সে পাইয়াছে, তাহা ভাবিয়া তাহার নিজের প্রতি যেমন ঘৃণার ভাব আসিতেছিল দাদার, প্রতি তেমনি ভক্তি ও প্রীতিতে মন পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। এই পুস্তকগুলি সে মাখনের নিকট হইতে হাতে হাতে পাইবার সুযোগ নিজের ত্রুটীতেই হারাইয়াছে, সেজন্য কত যাতনা, কত বেদনা, কত অনুশোচনা এই কয়দিন তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে ও করিতেছে; কিন্তু এই ব্যথার ভিতরও আশা তাহার ছিল—যাহা তাহাকে সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত রাখিয়া ছিল।

হটাৎ এই সময় মাখনের ঊষা যাত্রার কথা শুনিয়া কনকের বুকের ভিতরের আত্মা যেন দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মাসীমা বলিলেন—"আচ্ছা বাবা, পরীক্ষা যখন নিকট তখনতো যাইতেই হইবে।"

তারপরই মাসীমা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজও কি মণির ওখানেই থাইবে?"

মাখন বলিল—"না, আজ এখনি গড়গড়ি যাইতে হইবে; রাত্রিতে আসিয়া তোমার হাতে খাইব। কাল ভোরে যাত্রা—পথে একবার স্বামীজীকে দেখিয়া যাইব। কি বল তুমি।"

"সাবধান বাবা, স্বামীজীর কিন্তু বশীকরণ, ভেড়া বানান মন্ত্র ও ডামুরা সাধনা আছে। মণিও যাইবে কি?"

"হাঁ, সেও যাইবে; তার যাওয়া উচিত। বরং পুর্ব্বেই এক দিন যাইয়া দেখিয়া আসা উচিত ছিল।"

মাসীমা বলিলেন—"অনেক মনের কথা আছিল মাখন, একবার যে বসিতেই অবসর পাইলে না......"

মাখন বলিল—"এবার আর হইল কৈ মাসী মা; এখনতো চলিলাম—গড়গড়ি। গড়গড়ির রাজেন্ বাবু মণিকে অল্প সুদে টাকা দিয়া তার সাবেক ও হালের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতেছেন। লেখাপড়া আরম্ভ হইয়াছে, প্রাতেই; আমরা গেলেই দস্তখত হইবে। উপস্থিত বৈঠকেই ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ হইবে। তারপর সেখানেই আজ থাকিতে হইবে এবং আসিতে রাত হইবে। কাল দলিল রেজেষ্টরী করিয়া দিয়া রূপগঞ্জ হইতেই চলিয়া যাইব। অদৃষ্টে সাধু দর্শন থাকিলে তাহাও এই সুযোগে হইয়া যাইবে।"

মাখন তাড়াতাড়ি কাপড় লইয়া চলিয়া গেল। মাখন চলিয়া গেলে কনক টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এবার কনকের রাগ তাহার মার উপর। কেন ততক্ষণ সে স্থানে থাকিয়া তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিবার সুযোগ তাহাকে দিলেন না। মা যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটু এদিকে সেদিকে যাইতেন, তবে সে নিজ অভিমান জল করিয়া দিয়া তাহার পদে আত্ম নিবেদন জানাইতে পারিত।

কনক বসিয়া রহিল রাত্রির জন্য। আজ সে যেমন করিয়াই হয় মাখনকে ধরা দিবে। মাখনের মনের কালিমা চক্ষু জলে ধুইয়া দিবে।

* * * *

গড়গড়ির অভ্যর্থনায় ও বিদায় সম্ভাষণে এরূপ বরাদ্দ হইয়াছিল যে অতিথিরা প্রচুর ইচ্ছা সত্ত্বেও রাত্রিতে আসিয়া গৃহে আহার করিতে পারিলেন না শেষ রাত্রিতে আসিয়া মাখন মাসীমার নিকট ও মণি তাহার মার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল মাত্র।

ঊষার কোলে মণিবাবুর জুড়ী গাড়ী দুই বন্ধুকে লইয়া রূপগঞ্জ চলিয়া গেল।

ভোরে নিদ্রাভঙ্গের পর যখন কনক শুনিল মাখন অতি প্রত্যুষে চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার সেই সুযোগের আশা আর কোন সান্ত্বনাই তাহাকে দিতে পারিল না। লাজ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কনক কাঁদিয়া উপাধান ভাসাইল। মা মেয়ের অবস্থা প্রথম ভাবেন নাই,—এমন দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন; শেষে অবস্থা বুঝিয়া চিন্তিত হইলেন।

সৌরভ
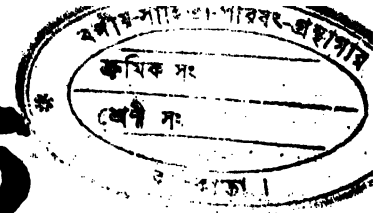
দ্বাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ | পঞ্চম সংখ্যা।

উপন্যাস ও অশ্লীলতা।

উপন্যাসে অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়া কোন কোন আধুনিক লেখক প্রকারান্তরে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন, এই একটা অভিযোগের কথা শুনা যাইতেছে। এই সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায়ও বাদানুবাদ চলিতেছে। এক পক্ষ বলিতেছেন—শিল্পী শ্লীলতা অশ্লীলতার কোন ধার ধারেন না; সমাজের ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, পাপ পুণ্য এই সকল তাঁহার বিচারের বিষয় নহে। কলা সৌন্দর্য্যের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হইলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অপর পক্ষ বলিতেছেন—সাহিত্যে অশ্লীলতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বাস্তবিক এই দুই মতই ভ্রান্ত। অশ্লীল চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত করিলেই সেই উপন্যাস অপাঠ্য হইবে, এই মত আমরা সমর্থন করি না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগের গ্রন্থে আমরা অনেক অশ্লীল চিত্র দেখিতে পাই। তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ লোকে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছেন। রামায়ণে অশ্লীলতা, মহাভারতে অশ্লীলতা, শ্রীমদ্ভাগবতে অশ্লীলতা; তন্ত্র ও পুরাণে অশ্লীলতা; জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের পুস্তকের পাতায় পাতায় অশ্লীলতা। তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ অতিশয় ভক্তির সহিত সকলে পাঠ করিয়া থাকে। অশ্লীলতার কথা কাহারও মনেই উদয় হয় না। সুতরাং কোন গ্রন্থে অশ্লীল কথা থাকিলেই তাহা অপাঠ্য হয় না।

সৌন্দর্য্য কাব্য ও উপন্যাসের প্রধান উপাদান, এই কথা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু সৌন্দর্য্য জিনিসটা কি তৎসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা যে কাব্য ও উপন্যাসে শুধু পুণ্যের মহিমাময় চিত্রই অঙ্কিত করিতে হইবে; কবির কলা কৌশল কেবল ধর্ম্মপরায়ণ নর ও সতীসাধ্বী নারী চরিত্র অঙ্কণে নিয়োজিত হইবে; কবির সৃষ্টিতে পাপের ছায়াও প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা একটা মস্ত ভুল ধারণা। জীবনের অভিব্যক্তিই কাব্য-উপন্যাসের উদ্দেশ্য। পুণ্যাত্মার জীবনেরও বিকাশ আছে, পাপীর জীবনেরও বিকাশ আছে। উহাদের জীবনের গতি বিভিন্নদিকে তাহা সত্য কিন্তু উভয়েরই ক্রম বিকাশের একটী ধারা আছে। এই ক্রমবিকাশের ধারা কাব্য ও উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উপাদান। পাপীর জীবনের বিকাশেও সৌন্দর্য্য আছে, পুণ্যাত্মার জীবনের বিকাশেও সৌন্দর্য্য আছে। পাপ পাপ বলিয়াই সুন্দর। আর পুণ্য, পুণ্য বলিয়াই সুন্দর। শিল্পকলা হিসাবে পাপীর জীবনেও মাধুর্য্যের অভাব নাই। সতীর পাতিব্রত্যে যেমন সৌন্দর্য্য, অসতীর পূতিগন্ধময় জীবনেও তেমনি সৌন্দর্য্য আছে। শস্যশ্যামল প্রান্তরের কমনীয় দৃশ্যে যেমন মাধুর্য্য, বালুকাময় মরুভূমির রুক্ষ প্রকৃতিতেও তেমনি মাধুর্য্য। জড় প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি উভয়ই অপার মাধুর্য্যের অনন্ত উৎস। সেই মাধুর্য্য বিকাশেই শিল্পীর কলা-কৌশলের পরিচয়।

পাপ ও পুণ্যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে কি কোন পার্থক্য নাই? অবশ্যই আছে। এই বৈষম্য চিরকালই থাকিবে। নতুবা সমাজের অস্তিত্বই থাকিবে না। পাপ ও পুণ্যের মধ্যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে যে বৈষম্য চরিত্রাঙ্কন দ্বারা তাহা প্রস্ফুটিত করিয়া তোলাই কবির প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনেই কবির কৃতিত্ব। এইখানেই কবি-প্রতিভার অগ্নিপরীক্ষা এবং কলা-সৌন্দর্য্যের পূর্ণ সার্থকতা।

আর্ট বা কলা-কৌশল বিকাশ কাব্য ও উপন্যাসের এক মাত্র লক্ষ্য নহে। লোক শিক্ষা প্রদানই কাব্য ও উপন্যাসের

রম উদ্দেশ্য। কলা-কৌশল সেই [illegible] মাত্র। সুতরাং কলা-কৌশল [illegible] লোক-শিক্ষার প্রতিকূল হওয়া অনুচিত। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক Dr. Max Nordau লিখিয়াছেন—"The work of art is not its own aim; but it has a specially organic and social task. It is subj ct to the moral law; it must obey this; it has claim to esteem only if it is morally beautiful and ideal."

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি Tolstoi প্রমুখ মনীষীগণও এই মতাবলম্বী।

যে কলা-সৌন্দর্য্য নীতির বিরোধী তাহা সমাজেরও বিরোধী, যেহেতু নীতিকে বাদ দিয়া সমাজ টিকিতে পারে না। সমাজের পক্ষে যাহা অহিতকর, তাহা কলার হিসাবেও শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার অযোগ্য। কিন্তু পাপের চিত্র অঙ্কিত করিলেই তাহা কুৎসিত হয় এবং সেই চিত্র দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, এই কথা কেহ মনে করিবেন না। টলষ্টয় বর্ত্তমান যুগের একজন ঋষিতুল্য পুরুষ। তিনি Art for Art's sake এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহার প্রণীত Resurrection ও Anna Karenina দুইখানি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। Resurrection উপন্যাসে টলষ্টয় বেশ্যাজীবনের অনাবৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার আদ্যন্ত পাপের ঘৃণিত পূতিগন্ধময় বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তথাপি Resurrection সুনীতি মূলক গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। কারেনিন্ (Karenin) উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী; এনা (Anna) তাহার পত্নী। বিবাহের পর তাহাদের একটী পুত্র জন্মিল। কোন কিছুর অভাব নাই। এমন সুখের সংসার, ইহা সত্ত্বেও এনা (Anna), ভ্রন্স্কী (Vronsky) নামক এক যুবকের গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হইল। পতির গৃহে প্রেমিক প্রেমিকার নিত্য ব্যভিচার চলিতে লাগিল। পতি কারেনিনের ইহা জানিতে বাকি রহিল না। গুপ্ত প্রেমের ফলে পতি গৃহেই এনার একটী কন্যা জন্মিল। ইহার পরও কারেনেনির গৃহে এনা-ভ্রন্স্কীর নিত্য পাপের বীভৎস অভিনয় চলিতে লাগিল। টলষ্টয় সেই সকল পাপ চিত্র তাঁহার চারু তুলিকায় সূক্ষ্ম ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তথাপি Anna Karenin একখানি সমাজের হিতকর উৎকৃষ্ট উপ-[illegible]হইতেছে। আমাদের সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানা উপন্যাসের কথা বলিলে আমার বক্তব্য বিষয়টী অনেকের নিকট আরও সুস্পষ্ট হইবে। কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর বঙ্কিমবাবুর দুইখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস। কৃষ্ণকান্তের উইলে কবি বিধবা রোহিণীর দুর্দ্দমনীয় লালসার নগ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রোহিণী প্রথমে তাহার অসামান্য রূপের জাল বিস্তার করিয়া গোবিন্দলালকে হস্তগত করিল, তারপর গোবিন্দলালকে ভুলাইয়া, নিজে সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গভীর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইল। তাহাতেও রোহিণীর অদম্য ভোগ লালসা চরিতার্থ হইল না। অতঃপর পাপীয়সী গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিয়া নিশাকরের প্রতি আসক্ত হইল। চন্দ্রশেখরে দেখিতে পাই শৈবলিনী প্রতাপের ভালবাসা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিল। প্রতাপ পর পুরুষ। প্রতাপের প্রতি বিবাহিতা শৈবলিনীর আসক্তি মানসিক ব্যভিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। রোহিণীর ও শৈবলিনীর চিত্র পাপের চিত্র। তথাপি এ পর্য্যন্ত বঙ্কিম চন্দ্রের বিরুদ্ধে কেহ এই অভিযোগ করে নাই যে তিনি পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন। সুতরাং পাপের চিত্র অঙ্কিত করিলেই সমাজে দুর্নীতির প্রভাব বৃদ্ধি হয়, এই কথা সত্য নহে। শ্রেষ্ঠ কবিগণ পাপের অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শনের জন্য পাপচিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। পাপের পথে সুখ নাই; কেবল জীবন ব্যাপী অসহ্য ক্লেশ, দুঃসহ মর্ম্মবেদনা, আর জ্বালাময়ী স্মৃতির তীব্র দংশন। এই সকল কথা লোককে বুঝাইয়া দেওয়াই পাপচিত্র অঙ্কনের প্রধান উদ্দেশ্য। যে এই চিত্র দেখিবে, সে-ই ভয়ে শিহরিয়া উঠিবে, পাপের প্রতি তাহার একান্ত ঘৃণা জন্মিবে; পাপ পথে অগ্রসর হইতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। কবি, রোহিণী, গোবিন্দলাল ও শৈবলিনীর পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের চিত্র দেখাইয়া পাঠক পাঠিকাগণকে প্রকারান্তরে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

উপন্যাসকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর উপন্যাস Realistic বা বাস্তবাত্মক আর এক শ্রেণীর উপন্যাস Idealistic বা ভাবাত্মক। Realistic ঔপন্যাসিকগণ সামাজিক নীতি নিয়মের দোষ সংশোধন ও সমাজ

দেহের নানাবিধ ব্যাধির প্রতিকার করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণতঃ সমাজের পূতিগন্ধময় পাপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া লোকের সম্মুখে ধরেন, এবং অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন—"এই দেখ তোমার সমাজের কি অবস্থা!" সামাজিক ব্যাধির লক্ষণ গুলি উজ্জ্বল বর্ণে সুস্পষ্ট ভাবে চিত্রিত করিতে পারিলেই Realistic ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না। সামাজিক-দোষগুলির প্রতি জনসাধারণের আন্তরিক ঘৃণা জন্মাইতে পারিলেই তাহার চিত্র সফল হইল। Idealistic ঔপন্যাসিকগণ আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সমাজের সম্মুখে স্থাপন করেন। সেই আদর্শের এমনি মাধুর্য্য যে উহা দেখিলেই লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। সেই আদর্শের এমনি প্রভাব যে, কেহ যুক্তি চায় না, তর্ক করে না, অজ্ঞাতে লোক তাহার অনুসরণ করিতে ব্যাকুল হয়। সংসারে প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, এই সকল ঘটনার সমাবেশেই কবি তাঁহার আদর্শ চিত্র ফুটাইয়া তুলেন। কবির আদর্শ-চরিত্রগুলি সমাজেরই লোক। সুতরাং নরনারী সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে অনুপ্রাণিত হয়। এই অনুপ্রেরণা জন্মাইতে পারিলেই Idialistic ঔপন্যাসিকের চিত্র সফল হইল।

ঔপন্যাসিক ও সমাজ সংস্কারকের পথ এক নহে সত্য কিন্তু সমাজ সংস্কারকের যে উদ্দেশ্য ঔপন্যাসিকেরও সেই উদ্দেশ্য। কেবল কার্য্য-প্রণালী স্বতন্ত্র। সংস্কারকের ন্যায় সমাজে পাপের প্রভাব বিনষ্ট করিয়া পুণ্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করাই ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য। Realistic ঔপন্যাসিকগণ সাধারণতঃ তাহাদের অঙ্কিত চিত্রে পাপের শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া লোককে পাপ হইতে প্রতি নিবৃত্ত করেন, আর Idealistic ঔপন্যাসিকগণ পুণ্যের চিত্তাকর্ষক চিত্র সমাজের সম্মুখে ধরিয়া পুণ্যের পথে লোককে টানিয়া আনেন। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে Realisticগণ সমাজের অন্ধকার দিকটা চিত্রিত করেন। আর Idealisticগণ আলোকের দিকটা অঙ্কিত করিয়া লোকের সম্মুখে ধরেন। উভয়ের উদ্দেশ্যই লোক-শিক্ষা প্রদান।

আমাদের বক্তব্য, এই যে পাপের নগ্নচিত্র অঙ্কিত করিলেই দোষের কারণ হয় না, সামাজিক কদাচারের কলুষিত আলেখ্য দেখাইলেই অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। অথবা সুনীতিকে পদদলিত করা হয় না। পাপের নগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া যিনি পাপের প্রতি পাঠকের আন্তরিক ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জন্মাইতে পারিয়াছেন তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিব। তিনি প্রকৃত শিল্পী। কিন্তু যাহার অঙ্কিত চিত্রে লোকের মনে পাপাসক্তি জন্মায়, প্রবল ভোগের লালসা উদ্দীপ্ত করে তাহার প্রকৃত শিল্পী-প্রতিভা নাই। যাহার অঙ্কিত চিত্রে পাপ লোভনীয় হইয়া ফুটিয়া উঠে এবং লোকের মনকে মুগ্ধ করিয়া তোলে তাহার কলা কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে, বলিতে হইবে। এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, সমাজের পরম শত্রু। উহারা পাপের সাহায্য করে, দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, লোকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিনষ্ট করে।

"The artist who Complacently represents what is reprehensible, vicious, crimina', approves of it perhaps glorifies it differs not in kind but only in degree from the criminals who actually commits it"

Dr. Nordau.—Degeneration.

যে ব্যক্তি যে পাপের সহায়তা করে, আইন অনুসারে সে সেই পাপের জন্য অপরাধী বিবেচিত হয়। Dr. Nordau মতে যাহারা গ্রন্থ লিখিয়া ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতেছে, তাহারাও ব্যভিচারীর ন্যায় অপরাধী; কেবল এইমাত্র পার্থক্য যে উহাদের পাপের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

মিনতি।

অন্তরে বল দেহ, প্রাণে দেহ শকতি!
হৃদয়ে বীর্য্য দেহ, মনে দেহ ভকতি!
বাসনারে দহিয়া, পারে যেন এ হিয়া,
করিতে তোমার পূজা আরতি!
সকল বাঁধন মোর দূর করি' দাও গো!
ছিঁড়িয়া মোহেরি ডোর চরণে লুটাও গো!
তব প্রেম-বাঁধনে, বাঁধো মোরে যতনে,
চরণে তোমারি এই মিনতি!

শ্রী—

স্নেহের দান।

(২৮)

স্বামীজীর অবস্থা খুব ভাল নহে। জ্ঞান হইয়াছে, কথা বলিতে পারেন; কিন্তু নড়িবার শক্তি নাই। সাবরেজেষ্ট্রার প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্যগণের চেষ্টায় হাসপাতালের একটা পৃথক ঘরে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; রামকৃষ্ণ মণির অনুগ্রহে মুক্তি পাইয়া আসিয়া কতিপয় শিষ্য লইয়া স্বামীজীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছে।

মণি ও মাখন যাইয়া স্বামীজীর সম্মুখে দাঁড়াইল। স্বামীজী তাহাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। নিকটেই একটা চৌকি ছিল, মাখন তাহাতে উপবেশন করিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিতে লাগিল। মণি সেই অবস্থায় কতক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পৃথক একখানা নিম্ন আসনে উপবেশন করিল। মণিকে বসিবার দিবার জন্য রামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে একখানা চেয়ারের অনুসন্ধানে গিয়াছিল—চেয়ারখানা আনিয়া মণিকে তাহাতে উঠিয়া বসিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মণি স্বামীজী সম্বন্ধে কিরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কাহার সহিত কথা বলিবে, অথবা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিয়াই অবস্থা লক্ষ্য করিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া সেই সকলই ইতস্ততঃ চিন্তা করিতেছিল। তাহার আচরণটা যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য হীন হইয়া খুবই খাপছাড়া হইয়া উঠিতেছিল, তাহা সে নিজেই মনে মনে অনুভব করিতেছিল। ত্রুটী অনুভব করিয়াও কেমন তাহার চর্ব্বল স্বভাব—সম্মুখে আসিয়াও সে তাহা সংশোধন করিতে পারিতেছিলনা।

মাখন তাহার অবস্থা বুঝিয়াছিল। সে রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়া নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিল—"কেমন আছেন স্বামীজী আজ?"

"আজ কালকার চেয়ে অবস্থা ভাল। মাথার ও পিঠের আঘাতই এখন গুরুতর। ডাক্তার আজ বলিলেন, প্রাণের আশঙ্কা নাই; তবে সারিতে দিন লাগিবে।" বলিয়া রামকৃষ্ণ স্বামীজীর মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

মাখন উঠিয়া ঘুরিয়া গিয়া স্বামীজীর পৃষ্ঠদেশের আঘাতের স্থানটা দেখিতে চেষ্টা করিল। আঘাতের স্থান তখন ডাক্তারের সুদৃঢ় বেণ্ডেজের মধ্যে ঢাকা ছিল, মাখন অবস্থা না দেখিতে পারিলেও পৃষ্ঠদেশের প্রতি চাহিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে বিস্ময় দমন করিয়া আসিয় স্বামীজীর বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটা দেখিল; ক্রমে অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তাঁহার কেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত—শরীরের প্রায় সকল স্থান খুব আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় হাত বুলাইয়া দেখিয়া গেল; তারপর দীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয়ের সকল আবিলতা উড়াইয়া দিয়া স্বস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

স্বামীজী পুনরায় চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। এবার তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মাখনের মুখের উপর স্থাপিত হইল।

মাখন জিজ্ঞাসা করিল—"কথা বলিতে কষ্ট বোধ হয় কি?"

স্বামীজী চক্ষু আরো একটু বিস্ফারিত করিয়া সন্দেহের ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাখন?"

স্বামীজীর মুখে মাখনের নাম শুনিয়া মণি মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। মাখন বলিল—"আজ্ঞা হাঁ।"

স্বামীজী চারিদিকে যে পর্য্যন্ত পারিলেন, চক্ষু ফিরাইয়া দেখিয়া লইলেন—তারপর পুনরায় ডাকিলেন—"মাখন..."

মাখন বুঝিল, স্বামীজী কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অথচ বলিতে শঙ্কা বোধ করিতেছেন। সে মণিকে ইঙ্গিতে একটু সরিয়া যাইতে বলিল। মণি উঠিয়া গেল। ক্রমে ইঙ্গিত বুঝিয়া আরো দু একজন—যাহারা ছিলেন, তাহারাও বাহির হইয়া গেলেন।

স্বামীজী পুনরায় চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"মাখন, ভাই, আমার মান সম্মান সকলি এখন তোমার হাতে, ভাই..." স্বামীজী আর বলিতে পারিলেন না।

মাখন হামাগুড়ি দিয়া উপুর হইয়া স্বামীজীর মুখের কাছে পড়িয়া খুব ধীরে ধীরে বলিল—"মাখনকে তখন যেমনটী জানিতেন, মাখন এখনও ঠিক তেমনটীই আছে। আপনি সে বিষয়ে খুব নিশ্চিন্ত থাকুন। আর ইহাও মনে রাখিবেন, আপনিই আমার জীবনের উন্নতির মূল

কারণ। আমার দ্বারা কদাপি আপনার কেশাগ্র প্রমাণও অনিষ্ট হইবে না। আপনার নামটী পর্য্যন্ত আমার মুখে আসিবে না।"

স্বামীজী মাখনের হস্তখানা ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহা নিজ মস্তকে স্পর্শ করাইলেন।

মাখন বলিল—"আমার মুখের কথাকেই আপনি সত্য প্রতিজ্ঞা বলিয়া মনে করিবেন।"

স্বামীজী স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তোমার সহিত মণির পরিচয় ?"

মাখন—"তাঁহাদের সাহায্যেই আমি কলিকাতায় পড়িতে পারিয়াছিলাম।"...

স্বামীজী—"আমি তো তাহা জানি না।"

মাখন—"মণির কলিকাতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই আমার অন্ত ব্যবস্থা হয়; তাহার পর, তাহাদের ছোট তরফের সাহায্যে পাঠ চালাইবার সুবিধা হয়।

স্বামী—"কোন পরিচয়ে ?"

মাখন কি উত্তর দিবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া কহিল—"মণির বন্ধুত্ব সূত্র হইতেই পরিচয়..."

স্বামীজী বেশী কথা বলিতে পারিতে ছিলেন না; সংক্ষেপে কথা বলিতেছিলেন। ক্লান্ত হইয়া এইখানেই কথা শেষ করিতে চাহিলেন—কহিলেন—"আমি দুর্ব্বল বিপন্ন, আমাকে ক্ষমা করিও।"

মাখন বলিল—"কোন চিন্তা নাই, আমাদ্বারা আপনার ইষ্ট ব্যতীত কণামাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, জানিবেন। আপনি এখন আমার দুই একটা জিজ্ঞাসার উত্তর দিন—এই আমার প্রার্থনা।"

স্বামীজী—"কি, বল ?

মাখন—জ্যেঠা মহাশয় এখন কোথায় আছেন ?"

স্বামীজী—"পানায়—আমাদের বাড়ীতে।"

মাখন—"আপনার কথা বলিতে কষ্ট বোধ না হইলে আমাকে তাঁহাদের সকলের অবস্থাই একটু জানাইয়া দিন। আমি আজ পাঁচ বৎসর তাঁহাদের কোন খবরই পাই না; চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। আমি আজই কলিকাতা চলিয়া যাইব; সম্মুখে আমার এম, এ পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ করিয়াই জ্যেঠা মহাশয়ের খোজে পানায় যাইব।"

স্বামীজী ক্লান্তির সহিত বলিল—"পিসা মহাশয় কুমিল্লা জেলার এক স্কুলে চাকুরী লইয়া গিয়াছিলেন; আমরা পানায় থাকিতাম। তাহার বয়স অধিক হেতু অল্পদিন পরেই ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাকে কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দেয়। তারপর হইতে তিনি বাড়ীতেই আছেন। বন্ধু দা, কোথায় জানি না—ঘর জামাই বিবাহ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পিসীমা ভালই...এখনকার অবস্থা আমি আর কিছুই..."

স্বামীজী একেবারে অনেকগুলি কথা বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

কুসুমের সংবাদটী জানিবার জন্য মাখনের প্রাণের ভিতর একটা ভীষণ আগ্রহ তাহাকে সজোড়ে ধাক্কা দিতেছিল। মাখন সে ধাক্কা অতি সতর্কতার সহিত সহ্য করিয়া গেল।

মাখন জিজ্ঞাসা করিল—"মধু এখন..."

স্বামীজী ইঙ্গিতে বলিলেন—"জানি না।"

মাখন স্বামীজীর দুর্ব্বলতার ও অবসাদের ভাব লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেল।

মাখন বলিল—'এখন আমরা বিদায় হইব। মণির শরীর খুব পীড়িত; মনে সর্ব্বদাই সে খুব অশান্তি অনুভব করিতেছে। কিছু দিন আমার সঙ্গে কলিকাতা থাকিয়া একটু মন পরিবর্ত্তন করিয়া আসিবে। আমরা পুনরায় আসিয়া আপনার সহিত শীঘ্রই যোগদান করিব। ভগবান আপনার আরোগ্য বিধান করুন।"

স্বামীজী বলিলেন—"তুমি বি, এ পাশ করিয়াছ, এখানে আসিবে কেন ?"

মাখন—"জ্যেঠা মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইলে আর এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ? তবে আপনাকে দেখিতে আসিব। এখন, আপনার এই সঙ্কট অবস্থায় থাকিয়া গেলেই ভাল হইত; কিন্তু আমার পরীক্ষা নিকটে..."

স্বামীজী চারিদিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মণি..."

মাখন মণিকে ডাকিল। মণি আসিয়া স্বামীজীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি অসুখ বাবা ?"

মণি বলিল—"মনে বড়ই অশান্তি বোধ করিতেছি।

কিছুই ভাল লাগিতেছে না—তাই আপাততঃ কয়েক দিনের জন্য কলি...” মণির সকল কথা স্পষ্ট মুখ হইতে বাহির হইল না।

স্বামীজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্লান্তির সহিত বলিলেন—“তাহাই কর।”

মাখন উঠিয়া গিয়া মণির সহিত পরামর্শ করিল। তার’পর আসিয়া স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া বলিল—“তবে, এখন আমরা আসি; আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা বিশেষ ভাবেই হইবে; খরচ সমস্তই সরকার হইতে আসিবে। আমরা সাবরেজেষ্ট্রার বাবুর নিকট যাইতেছি—তাঁহার উপরই মণি সকল ভার দিয়া যাইবে। আপনি কোন চিন্তা করিবেননা?”

মণি কোন কথাই বলিতে পারিল না; যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার ন্যায় নত মস্তকে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাখনের পদানুসরণ করিল।

গাড়ীতে উঠিয়া মণি জিজ্ঞাসা করিল—“ওঁর সহিত তোমার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল?”

“এ প্রশ্ন অনাবশ্যক!”

খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের এইরূপ রূঢ় উত্তর মণির অশান্ত মনকে আরও অশান্ত ও অস্থির করিবে, মনে করিয়া মাখন বলিল—“স্বামীজী তোমার দীক্ষাগুরু, কিন্তু আমারও তিনি উন্নতির মূল। পূর্ব্বে দেখা হইলে পূর্ব্বেই পরিচয় হইত। আমি জানিতাম না যে তিনিই দীনানন্দ স্বামী! যাক্...”

মণি মাখনের শেষ ‘যাক্’ কথাটার ভাব মনে মনে অনুভব করিয়া এই কথা লইয়া আর তাহার নিকট কোন নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিল না। সুতরাং স্বামীজীর সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ও আলোচনার এস্থানেই আপাততঃ উপসংহার হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

“বউ কথা কও”।

বলার কথা নয়রে পাখী কবার কথা নয়,
আজীবনই সবার কারণ মোদের জন্ম হয়,
তুইত রে সেই বনের পাখী সদা থাকিস বনে,
মনের কথা খুলে কইনা ঘরের আপন জনে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

বৈদিক ভারতে সমরবিদ্যা।

আত্মরক্ষা ও উদর রক্ষার জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহা প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখেনা; জ্ঞানীর যেরূপ ক্ষুধা বোধ, অজ্ঞান শিশুরও তেমনি। কেহও বলিয়া দেয়না, শিখাইয়া দেয়না, তবু শিশু ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদিয়া উঠে, মাতা আসিয়া স্তন্যদানে অজ্ঞান শিশুকে শান্ত করেন। ঘোরতর উন্মাদ,—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই,—সেই উন্মাদেরও সুখ দুঃখ বোধ আছে, পিপাসা, বুভুক্ষা আছে। আততায়ী আসিয়া অসি বা যষ্টিদ্বারা আক্রমণ করিলে পাগল সভয়ে ছুটিয়া পলায়। শিশুকে ধমক দিলে শিশু আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠে। উদর রক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য এই যে ঝোঁক ইহা কখনও কালাকালের বিচার করেনা; সভ্যতা অসভ্যতার দ্বন্দ্ব জানেনা, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের যুগকে স্মরণ করেনা।

অতি প্রাচীনকালে,—যখন বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা এবং জ্ঞানের আলোক—সমস্ত দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই; কোন দেশে কত লোকের বসতি তাহা জানিবার উপায় ছিলনা, তাড়িত বিজ্ঞানের প্রভাব যখন সমস্ত দেশকে একসূত্রে সংবদ্ধ করে নাই; সেই প্রাচীন সময়ও তৎকালীন লোকের আত্মরক্ষা ও উদর রক্ষার প্রতি যত্নছিল। ঐ দুটিকে রক্ষা করিতে গিয়া সেই সময়ের লোকের মধ্যেও পরস্পর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত। সুখ-দুঃখ-সহানুভূতি, ক্ষুধা-পিপাসা প্রভৃতির তাড়নায় তাহাদেরও মনে আত্মসম্মান প্রবুদ্ধ ছিল। সেই আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সবল দুর্ব্বলের গ্রাস কাড়িয়া লইত, সবলে সবলে বলের পরীক্ষা হইত। যার লাঠি তার মাটি। সুর বা অসুরের ভেদ আর্য্য বা অনার্য্যের শ্রেণী বিভাগ, সেই কালেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমাজবন্ধন আসে, ধর্ম্মবন্ধন আসে, আইন কানুন, নিয়ম প্রণালী সকলই ক্রমে ক্রমে আসিতে থাকে।

সুরাসুরে অহিনকুল ভাব, সহজাত বৈরিতা। আর্য্যও অনার্য্য ঠিক সেইরূপ। কাহারও শারীরিক পরাক্রম অধিক, কোন দল বা মানসিক শক্তিতে শক্তিমান্। আত্মরক্ষার জন্য পরস্পর উভয় দলের মধ্যে শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন হইতে লাগিল। তাহারই ফলে সমর বিদ্যার

উপকরণ আবিষ্কৃত হইল। আত্ম ও পরবোধের সঙ্গে সঙ্গেই যে সভ্যতা এবং বিজ্ঞান প্রসারিত হয়, তাহা বুঝাযাইতে লাগিল। বর্ত্তমানযুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চার ন্যায় সেই সময়কার চর্চ্চা ততদূর উন্নতি লাভ না করিলেও ইতিহাস হিসাবে অতিপ্রাচীন কালের বিদ্যা আমাদের অবশ্য আলোচনীয়। যে সময়ের কোনও সঠিক দিন তারিখ অদ্য পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবেনা—সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাচীন যুগের যে সমস্ত কাহিনী বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখিত আছে, তাহা হইতে দেখাইতে চেষ্টাকরিব—আমাদের দেশের বিদ্যার অনুশীলন তখন কি প্রকারে, কোন ধারায় হইত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন জাতি সমূহের ইতিহাসে—ধর্ম্মগ্রন্থ ও জাতীয় জীবনে যুদ্ধবিদ্যার অনুশীলন প্রথা প্রায় একরূপ। যুদ্ধবিদ্যা বলিতে প্রধানতঃ ধনুবিদ্যা। তৎপর অসি (খড়্গ) শূল, বল্লম, অঙ্কুশ, গদা, বর্ম্ম, বাণ, তূণীর প্রভৃতি। তারপরে কিংবা তৎসঙ্গেই ঘোড়া, হাতী, রথ প্রভৃতিকে সংগ্রামের সহায়ক রূপে অবলম্বন। উত্তরকালে ঐ যুদ্ধবিদ্যাটি ধনুর্ব্বিদ্যারূপে স্থান পাইয়া আঠার প্রকার বিদ্যার মধ্যে অন্যতম—বিদ্যাস্থানীয় হইয়াছে। বিদ্যাকে প্রথমতঃ বেদের ষড়ঙ্গরূপে ছয়প্রকার ধরা হইত—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। পরে উহাদের সঙ্গে চারিবেদকেও বিদ্যারূপে ধরিয়া লইয়া এবং মীমাংসা, ন্যায় পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই চারিটি সহ—চতুর্দ্দশ বিদ্যা গণিত হয়। তাহারও পরে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব (সঙ্গীত বিদ্যা) ও অর্থশাসন (অর্থনীতি) সহ বিদ্যার সংখ্যা হয়—আঠার।

প্রস্তাবিত প্রবন্ধের বিষয়—ধনুর্ব্বিদ্যা বা সমর বিদ্যা। ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠমণ্ডল ৭৫সূক্তের ২য়ঋকে ধনুর জয়জয়কার দেখাযায়।

"ধন্বনাগা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপ কামং কৃনোতু ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম

অর্থাৎ, আমরা ধনুদ্বারা গোসকল জয়করিব, ধনুর সাহায্যে যুদ্ধ জয় করিব, ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত শত্রু বধ করিব। এই ধনু শত্রুর কামনা—জয়লাভেচ্ছা—নষ্ট করিয়া দিক, আমরা তাহাহইলে এই ধনুর সাহায্যে সমস্ত দিগ্‌দেশ জয় করিব।—এই মন্ত্রটি এবং ইত্যাকার অনেক মন্ত্রই অদ্য-পর্য্যন্তও বর্ণাশ্রমীদের প্রায় প্রত্যেক ক্রিয়া কাণ্ডে উচ্চা রত হয়। সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতায় অতি কমলোকেই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝে। গো সকলকে জয় করিবার ইঙ্গিতে গোজাতির প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা যে কতকাল যাবৎ তাহাও ঐ মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে একত্রই পঠিত হয়। সংস্কৃত ভাষা ও বেদবচনে অনভিজ্ঞতার দরুণ আমরা আর প্রাচীন কালীয় সদুপদেশের মর্য্যাদা রক্ষণে যত্নবান্ নহি। গোরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য আমরা উদাসীন। ধনুর্ব্বিদ্যা বা সংগ্রাম বিদ্যার অনুশীলনে আমরা পরতন্ত্র। তারপর দেখুন—

বক্ষ্যন্তীবেদা গণীগন্তিকর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা।
যোষেব শিংক্তে বিততাধি ধন্বঞ্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী॥

৬।৭৫।৩

ধনুতে সংলগ্ন জ্যা (ছিলা) সংগ্রাম সময়ে দুঃখের পারে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া অর্থাৎ যুদ্ধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইতে ইচ্ছুক হইয়া, প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই যেন ধনুর্দ্ধারী কাণের নিকটে আগমনকরে। পত্নী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথাকয়, জ্যা সেইরূপ বানকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে।—এই মন্ত্রে ধনু, ছিলা ও বাণের প্রসঙ্গে বেদের ভিতর হইতে বেশ একটু কবিত্বরসের আস্বাদনও লাভ হয়। ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া টান দিলে বাণটি যে সটান কাণের কাছে আসিয়া পটাং পটাং শব্দ করিবে ইহাও বুঝা যায়। এখন বাণের কথা—

সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যাদন্তো গোভিঃ সন্নদ্ধা পততি প্রসূতা।
যত্রানরঃ সংচ বিচদ্রবন্তি তত্রাস্মভ্যমিষবঃ শর্ম্ম যংসন্॥

৬।৭৫।১১

বাণ সুপর্ণ ধারণ করে—অর্থাৎ সুন্দর পাখীর পালক বাণে আছে, মৃগ উহার দন্ত—মৃগের শৃঙ্গদ্বারা বাণের শিরোভাগ প্রস্তুত হয়, উহা গো কর্ত্তৃক (গরুর স্নায়ুদ্বারা নির্ম্মিত ছিলা কর্ত্তৃক) সম্যকরূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয়। যেখানে নেতৃবর্গ (নরগণ) একত্র ও পৃথক রূপে—বিচরণ করে বাণসমূহ আমাদিগকে সেইস্থানে সুখদান করুন—আমরা যেন মনুষ্যপূর্ণ আবাসস্থানে সুখে—সচ্ছন্দে—কাল কাটাইতে পারি।

পরবর্ত্তী ঋক্‌টী উদ্ধৃত না করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইতেছে;—হে বাণ আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত কর, আমাদের

শরীর পাষাণের ন্যায় হউক (শত্রুদের বাণ যেন আমাদের দেহে প্রবিষ্ট না হয়) সোম আমাদের হইয়া এইকথা বলুন, অদিতি আমাদিগকে সুখদান করুন। ৬।৭৫।১২

এখন তূণীরের কথা ;—

বহ্বীনাং পিতা বহুরস্ত পুত্রশ্চিশ্চা কৃণোতি সমনাবগত্য।
ইষুধিঃ সংকাঃ পৃতনাশ্চসর্ব্বাঃ পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তিঃ প্রসূতঃ॥
৬।৭৫।৫

এই তূণীর বহুবাণের পিতা (পালনকর্ত্তা)—ইহাতে বহুবাণ রক্ষিত থাকে ; অনেক বাণ ইহার পুত্র। বাণ তুলিয়া লইবার সময় এই তূণীর চিশ্চা শব্দকরে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে সংবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধ কালে বাণ প্রসব পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য পরাজিত করে।

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্ম্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং সত্বা বর্মণো মহিমা পিপর্ত্তু।
৬ ৭৫।১

সমর উপস্থিত হইলে যোদ্ধা যখন বর্ম্ম পরিধান করিয়া গমন করে, তখন তাহার রূপ জীমূতের মত হয়—মেঘের মত গম্ভীর হয়। হে যোদ্ধা তুমি অবিদ্ধদেহ হইয়া জয় লাভ কর, তোমার এই বর্ম্ম আবরিত দেহে যেন শত্রুপক্ষের বাণ প্রবেশ না করে। বর্ম্মের মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তটি ঐ সংগ্রাম বিস্তার বিবরণে পরিপূর্ণ। ধনু, বাণ, তূণীর, বর্ম্ম, জ্যা, ইষুধি, অশ্ব, রশ্মি, রথ, সারথি, রথরক্ষক, প্রতোদ(চাবুক), কশা, হস্তঘ্ন (করত্রাণ) প্রভৃতির উল্লেখ ঐ মণ্ডলে পরিদৃষ্ট হয়। সারথি অশ্বের শরীরের কোন্ স্থানে কশাঘাত করিবে এবং সমর ক্ষেত্রে কিরূপে রথ পরিচালিত করিবে, তাহাও বর্ণিত আছে।

আ জংঘন্তি সাম্বেষাং জঘনা উপজিঘ্নতে।
অশ্বাজনি প্রচেতসো, বাশ্বন্ সমৎসু চোদয়। ৬।৭৫ ১৩

হে কশা (চাবুক !) প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন সারথিগণ তোমার দ্বারা অশ্বগণের সক্থিতে (স্কন্ধদেশে) আঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঘাত করে তুমি সংগ্রামে অশ্বদিগকে প্রেরণ কর।

সু-সারথি রথে অবস্থান করিয়া সম্মুখস্থিত অশ্বগণকে ইচ্ছানুরূপ স্থানে লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে। অতএব হে নেতৃবর্গ উহাদিগের মহিমা স্তব কর। ৬।৭৫।৫

বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান বলে অসাধ্য সাধন হয়, তৎকালে মন্ত্রবলে অলৌকিক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন হইত। সেই মন্ত্রশক্তি এখন গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায়।

যো নঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি।
দেবা স্তং সর্ব্বে ধূর্ব্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম্ম মমান্তরম্॥ ৬।৭৫।১৯

মন্ত্রই আমার বাণ নিবারণকারী বর্ম্ম—মন্ত্রবলে আমার যুদ্ধজয় অবশ্যম্ভাবী—। যে আমাদের প্রতি হৃষ্ট নহে বরং বিরুদ্ধভাবাপন্ন, যে দূরে থাকিয়া আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন —যে জিঘাংসু শত্রু, তাহাকে সমস্ত দেবতা হিংসা করুন, শাস্তি প্রদান করুন। —মন্ত্রবলে অস্ত্রের কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
গচ্ছামিত্রান্ প্রপদ্যস্ব মা মীষাং কংচনোচ্ছিষঃ। ৬।৭৫।১৬

হে বাণ তুমি মন্ত্রদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, অথচ হিংসাকুশল, তুমি বাণ হইতে বিসৃষ্ট হইয়া পতিত হও, গমন কর, শত্রু সৈন্যকে প্রাপ্ত হও, উহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দাও, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিবে না। —যে বাণ বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী, যাহার মুখ লৌহময় সুতীক্ষ্ণ পর্জ্জন্যকার্য্যভূত সেই ইষুদেবতাকে নমস্কার।

পর্জ্জন্যকার্য্যভূত শব্দের অর্থ দ্বিবিধ হইতে পারে, প্রথম অর্থ পর্জ্জন্য অর্থাৎ বর্ষাদেবের সহায়তায় যে শরগাছ জন্মে, তাহা হইতে উৎপন্ন বাণ, দ্বিতীয় অর্থ বাণদ্বারা শত্রুগণ নিহত হইলে যজমানগণের যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহাতে যথা কালে পর্জ্জন্য বা মেঘ বর্ষণ হয়, শস্য হয়, খাদ্য হয়। যেরূপ অর্থই হউক না কেন, সকল রকমেই বাণ আমাদের উপকারক। অতএব দেবতাস্বরূপ, তাদৃশ বাণকে নমস্কার।

ধনুর্ব্বিদ্যা বা যুদ্ধবিদ্যা আত্মরক্ষার উপায়—তাহাদের পক্ষে—যাহাদের শত্রু আছে। যাহারা নিঃসপত্ন—শত্রুহীন —তাহাদের পক্ষে শুধু বিদ্যাই আত্ম রক্ষার উপায়। বিদ্যা মানে জ্ঞান, জ্ঞানাৎ পরতরং নহি। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে—ইহা উপনিষদের বচন। বিদ্যাবলে অমৃতত্ব লাভ হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, আত্মসাক্ষাৎকার হয়। এসকল স্থলে আত্ম শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত ; আত্মরক্ষার অর্থও বিস্তৃত।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

রামায়ণে স্বয়ম্বর।

প্রাচীন ভারতে বিশেষতঃ রামায়ণের রচনাকালে ভারতে স্বয়ংবর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, সমবেত পণ্ডিত ও সুধী মণ্ডলীর সমক্ষে আজ আমি সেই বিষয়েরই আলোচনা করিব। আমার এই আলোচ্য বিষয়ের কোন একটী কথাতেও যদি কেহ কোন মতের অনৈক্য উপলব্ধি করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে লিখিয়া জানাইলে পরম উপকৃত হইব।

সীতা স্বয়ংবরা হইয়াছিলেন কি না, এই বিষয়টী লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাউক।

রামায়ণে সীতাকে 'স্বয়ংবরা' বলা হইয়াছে এবং রামায়ণের অন্যূনদশটী স্থানে 'স্বয়ংবর' শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাল্মীকির সীতা স্বয়ংবরা হন নাই; পরন্তু রামায়ণের একটী স্থানে স্বয়ংবর বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আদিকাণ্ডে ৩২ সর্গের একটী বর্ণনায় আছে—বায়ু কুশনাভ কন্যাগণের পাণি প্রার্থনা করিলে কন্যারা বায়ুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"মা ভূৎস কালো দুর্ম্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য সধর্ম্মেন স্বয়ংবর মুপাস্মহে॥ ২
পিতাহি প্রভুরস্মাকং দেবতং পরমঞ্চসঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা সনোভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ ২২।১।৩২

অর্থ—রে দুর্ব্বুদ্ধে জনকই আমাদিগের প্রভু ও পরম দেবতা, তিনি যাহার হস্তে আমাদিগকে সম্প্রদান করিবেন, তিনিই আমাদিগের পতি হইবেন। কাম বশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া আমাদিগের স্বয়ংবরা হইবার প্রবৃত্তি যেন কখনও উপস্থিত না হয়।

ইহাতে স্বয়ংবরের নিন্দাই সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের চিত্র যাহা মহাভারতের দ্রৌপদীর বিবাহে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও স্বয়ংবর বিবাহ নহে। সুপ্রাচীন ভারতে পুরুষের পক্ষেও 'পিতৃকৃত পত্নী' ব্যবস্থাই উত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ঋকবেদে অভিভাবক সম্মত বিবাহের সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তখন পিতা সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করিতেন, (১) পিতার স্থলে (পিতার অভাবে) ভ্রাতাও ভগিনীকে বহু ধনসহ সম্প্রদান করিতেন। (২)

বেদে যৌবন বিবাহ এবং বাল্য বিবাহ উভয় বিবাহেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীনতম সমাজে এইরূপ থাকাই স্বাভাবিক।

সমাজ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ স্থাপিত হইলে পর যৌবন বিবাহ সমাজে আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ আমরা পাই—শ্রৌত সূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র সমূহে। ধর্ম্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রকার— গৌতম, বসিষ্ঠ, বৌধায়ন, গোভিল, হিরণ্যকেশীন প্রভৃতি সকলেই বালিকা বা 'নগ্নিকা' বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। (৩)

রামায়ণ রচনারকাল—গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র রচনার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বৈদিককালের অনেক পরবর্ত্তী সময়। রামায়ণেও আমরা সীতাকে বালিকা বয়সেই বিবাহিতা হইতে দেখিতেছি। 'কন্যা', কুমারী বা নগ্নিকা বালিকাদের বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত থাকে, সেই সমাজে সেই নগ্নিকা বালিকাদের স্বইচ্ছায় পাত্র মনোনয়ন করিয়া বিবাহ করিবার যে স্বেচ্ছাচার স্বয়ংবর-বিবাহ-রীতি তাহা কখনই ব্যবস্থিত থাকিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের সমাজে স্বয়ংবরের সংস্কার এত বদ্ধমূল, যে দুএকখানা ধর্ম্মসূত্রের ব্যবস্থার দোহাই দিয়াই তাহা সাধারণের মন হইতে উন্মূলিত করিয়া দিবার উপায় নাই।

এরূপ স্থলে প্রতিকূল ও অনুকূল প্রমাণের উল্লেখ দ্বারা বিষয়টীর আলোচনা প্রয়োজন। এস্থলে তাহাই করা হইল।

ঋকবেদে পুরুষ নির্ব্বাচনের আভাস সূচক একটী ঋক্ আছে। ঐ ঋক্‌টীর প্রথমাংশ নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ সংগ্রহ সম্বন্ধীয়, শেষ অংশ ভদ্র মহিলাদের সম্বন্ধীয় বলিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনুমান করেন। তাঁহার কৃত শেষ অংশের অনুবাদ এইরূপ—

"যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সেই অনেক

(১) ঋকবেদে ৯।৪৬।২ ও ১০।৩৯।১৪ (২) ঋক ১।১০৯।২

(৩) গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১৮।২০-২৩; বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৭০; বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্র ৪।১।১১। গোভিল গৃহ্য সূত্র ৩।৪।৬; হিরণ্যকেশীন গৃহ্যসূত্র ১।৬।১৯।২

লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।" (ঋকবেদ ১০।২৭।১২)।"

ইহা আদিম সমাজের বয়স্থা স্ত্রীলোকের অবাধ যৌন সম্মিলন প্রথার একটী দৃষ্টান্ত। এই ঋক্‌টী মুইর সাহেব তাহার "Sanskrit Text Vol V. গ্রন্থে এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—Happy is the female who is handsome, she herself loves (or chooses) her friend among the people." এই অনুবাদ দিয়া মুইর স্বীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন—May we not infer from this passage that freedom of choice in the se'ection of their husbands was allowed, some times at least to women in those time"

মুইর সাহেবের অনুবাদের সাহায্য লইলে এই ঋকাংশকে মোটেই ভদ্র সমাজের রীতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তিনি সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রণয়ী সংগ্রহেরই আভাস দিয়াছেন। ইহা আদিম যুগের Metriarchal সমাজের পুরুষ সংগ্রহ প্রথার ভাব লইয়া অনূদিত। মহাভারতের ১২২ অধ্যায়ে (আদি পর্ব্বে) এই আদিম রীতির আভাস আছে। তাহা এইরূপ—"পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ অবারিতা ছিল; তখন তাহারা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বামীদিগের অনিবার্য্যা হইয়া সম্ভোগ সুখাভিলাষে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত. তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। যেহেতু ইহাই সেকালের ধর্ম্ম ছিল।"

বোধ হয় সেই রীতিরই আর একটু উন্নত ভাবের আভাস এই ঋকটীতে আছে। ঋক্ মন্ত্রগুলি এক সময়ে বা একযুগে রচিত হয় নাই। বৈদিকযুগের প্রথম ভাগেও যে আদিম মানব সমাজের (বয়স্থা স্ত্রীলোকের) এইরূপ অবাধ যৌন রীতি প্রচলিত না ছিল, তাহা মনে হয় না।

থাকিলেও এইরূপ স্বেচ্ছাচার পদ্ধতিকে মহাভারতে অঙ্কিত কোন স্বয়ংবরের বা কালিদাস বর্ণিত ইন্দুমতী স্বয়ংবরের তুল্য স্বয়ংবর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ঋক্‌বেদের আর একটী ঋক হইতে ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য অনুমান করেন, বৈদিকযুগে স্বয়ংবর প্রথা ছিল। ঋক্‌টীর অনুবাদ এইরূপ—"যেরূপ (যজমান যজ্ঞার্থ) কুশ বিস্তার করে), যেরূপ বায়ু মেঘকে (নানাদিকে প্রেরণ করে) সেইরূপ আমি নাসত্যদ্বয়কে (প্রচুর) স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি; তাঁহারা শত্রু সেনা পশ্চাৎ ফেলিয়া রথ দ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছাইয়া দিয়াছিলেন। (রমেশবাবুর অনুবাদ ১।১১৬।১)।

এই ঋক্‌টীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সায়নাচার্য্য অনুমান করেন, বিমদ নামক রাজর্ষি স্বয়ংবরে কন্যালাভ করিলে পর অন্যান্য রাজগণ পথে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। অশ্বিদ্বয় সেই সময় বিমদকে সহায়তা করেন এবং আপনাদিগের রথে বিমদের স্ত্রীকে বিমদের গৃহে পঁহুছাইয়া দেন।

রামায়ণে স্বয়ংবর শব্দটী প্রবিষ্ট হইয়াছে, যদিও রামায়ণের কোন কার্য্যেই তাহার প্রমাণ নাই। এস্থলে (বেদে) কিন্তু কার্য্যও নাই, "স্বয়ংবর" শব্দও নাই। সায়ন অনুমান করিতেছেন মাত্র।

যাস্ক সংগৃহীত বেদের নিঘণ্টুতে স্বয়ম্ব শব্দ নাই।

বেদের ব্রাহ্মণে বা সূত্রগুলিতে পর্য্যন্ত স্বয়ম্বর বিবাহের কথা নাই। স্মৃতির উল্লেখ পরে করিতেছি।

প্রাক্ বৈদিক যুগে সমাজ শৃঙ্খলা স্থাপনের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র যে হীন ভাব প্রচলিত ছিল, তাহা বৈদিক যুগের সংস্কারে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল সকল রীতিই যে সংস্কৃত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নহে। কোন কোন রীতি অপেক্ষাকৃত হীন ভাবেও সমাজে গৃহীত হইয়াছিল; ক্রমে কিন্তু তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

আদিম সমাজের লুপ্তহীন-ভাব পৈত্রিক গুরুতর ব্যাধির ন্যায় বহু পুরুষ পরেও কুসহচার্য্যের সুযোগে অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

আমাদের মনে হয়, বয়স্থা মেয়েদের নিজের বিচারে পাত্র মনোনয়নের স্বেচ্ছাচার প্রথা, বৈদিক যুগের প্রথম ভাগেই উঠিয়া গিয়াছিল। রামায়ণের যুগে বা কল্পসূত্রের যুগে তাহা ছিল না অতঃপর—রামায়ণ রচণার বহুকাল পরে, পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য চিন্তার সংশ্রবের ফলে খৃঃ পূঃ তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বা ইহারও পরবর্ত্তী কোন সময়ে এইভাব ভারতীয় সাহিত্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং ক্রমে পৌরাণিক অনুশাসনের প্রভাবে সমাজেও সেই প্রথা দুই এক স্থলে অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক যুগে সংযুক্তার স্বয়ম্বর ইহার দৃষ্টান্ত।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ কিনা, তাহার

আলোচনা প্রয়োজন। এস্থলে সংক্ষেপে তাহা করা গেল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামায়ণের বহুস্থানে 'স্বয়ম্বর' শব্দটার উল্লেখ থাকিলেও কাব্যের কোথাও ঐরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু যে সীতার বিবাহকে রামায়ণে পুনঃ পুনঃ 'স্বয়ম্বর' বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কোন অংশেই স্বয়ম্বর বিবাহ নহে। সীতা বীর্য্যশুল্কে গৃহীতা হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, রাম স্বীয় বীর্য্য পরীক্ষা দ্বারা জনককে সন্তুষ্ট করিলেও জনক দশরথের অনুমতি ব্যতীত কন্যাদানে স্বীকৃত হন নাই। আপনারা বাল্মীকির রামায়ণ খুলিয়া অবসর মতে তাহা লক্ষ্য করিবেন, এস্থলে আমি তাহার উল্লেখ দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিব না। আমার যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "রামায়ণের সমাজে" তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

রামায়ণে সীতা রামের "পিতৃকৃত দারা বলিয়া" স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে; যথা—

"প্রিয়াতু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি।" ২৬।১।৭৭

'স্বয়ংবর' কথা যদি বেদে নাই, ব্রাহ্মণে নাই, রামায়ণে নাই, শ্রৌত সূত্রে নাই, গৃহ্য সূত্রে নাই, তবে স্বয়ংবর কথা রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য গুলিতে আসিল কি প্রকারে?

আমাদের মনে হয়, বৈদেশিক ভাবের আদান প্রদানের সংশ্রবে আমরা এই বৈবাহিক রীতিটী প্রাপ্ত হইয়াছি। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে নানা বিষয়ে গ্রীক সমাজ ও গ্রীক সভ্যতার প্রভাব ভারতে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সময় গ্রীক সমাজের বহু রীতি-প্রথা ভারতীয় চিন্তার ভিতর প্রবেশ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল। এই সুযোগে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের স্বয়ংবর ভাবটী (choice of husband) ও আসিয়া আমাদের "পুরাণ" সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

কোন বৈদেশিক প্রাচীন সাহিত্যে কোন প্রথার উল্লেখ থাকিলেই যে সে প্রথা ভারতে থাকিতে পারিবে না, অথবা থাকিলে উহা সন্দেহ জনক বিবেচিত হইবে এবং ভারতকে সেই বৈদেশিক জাতীর নিকট ঐ বিষয়ে ঋণী বলিয়া মনে করিতে হইবে, এরূপ মত একদেশদর্শী। বৈদেশিক জাতীর প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় আমাদেরও সেইরূপ প্রাচীন সাহিত্যে যদি কোন বিষয়ের অনুরূপ উল্লেখ থাকে, আমরা তাহার গৌরবের দাবী কোন রূপেই ত্যাগ করিব না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে ধনুর্ভঙ্গ পণ, লক্ষ্য ভেদ পণ প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৈবাহিক পণ-রীতি গুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতীয় সুপ্রাচীন সাহিত্যের এইরূপ প্রথা গুলির অনুরূপ প্রথা, গ্রীক দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও আছে। যেমন আইডেনিসাস পণ করিয়াছিলেন—যে তাঁহার অমিত বিক্রম কুকুরটাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে, সেই তাঁহার কন্যা কোরিকে এই বীর্য্যশুল্কে ক্রয় করিতে পারিবে। Ulysses ও এইরূপ একটা বীর্য্যশুল্কের বিনিময়েই পেনিলোপীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন।

এইরূপ দুইটী সুপ্রাচীন জাতীর প্রাচীন ইতিকথায় বা সমাজ চিন্তায় যদি অনুরূপ ভাবের, উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে তাহাতে সাধারণের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও এইরূপ ভাব-সামঞ্জস্য অস্বাভাবিক নহে; মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মানব সমাজের অনুরূপ ভাবকে খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করেন।

রমায়ণের ধনুর্ভঙ্গ পণ খুব প্রাচীন প্রথারই পরিচায়ক। প্রাচীন গ্রীক চিন্তার ভিতরও অনুরূপ ভাব প্রবিষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে গ্রীকগণ প্রাচীন ভারতীয় প্রথারই অনুকরণ করিয়া তাহা নিজ জাতীয় বৈশিষ্টের সহিত মিশাইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থলে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট সস্ত্র-প্রীতি (ধনুর্ভঙ্গ); প্রতীচ্যের বৈশিষ্ট পশু-প্রীতি (কুকুর পরাজয়)।

এইরূপ স্থলে এই উভয় জাতির দাবীর বিচার চলিতে পারে। স্বয়ম্বর প্রথা সম্বন্ধীয় আমাদের দাবী কিন্তু তেমন বিচার সহ নহে। আমাদের তেমন কোন প্রাচীন সাহিত্যে এই কুপ্রথাটির উল্লেখ নাই, যেমন প্রাচীন সাহিত্যে গ্রীকদের এই প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গ্রীসের প্রাচীন কাহিনী লেখকেরা প্রাচীন গ্রীক সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারি, টিণ্ডোরাসের (Tindorus) ক্ষেত্রজ কন্যা হেলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর নর্ত্তকী ছিলেন। ইহার নর্ত্তন ভঙ্গি ও রূপ মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক

তাহাকে হরণ করে। অতঃপর হেলেনার ভ্রাতা হেলনাকে উদ্ধার করেন। তখন তাহার রূপের ও গুণের কথা শুনিয়া গ্রীসের রাজা ও রাজপুত্রেরা আসিয়া তাহার পাণি প্রার্থনা করিতে থাকেন। হেলেনার পিতা বিপন্ন হইয়া সমবেত রাজন্তগণকে এই স্বর্ত্তে সম্মত করেন যে হেলেনা নিজে যাহাকে ইচ্ছা করিয়া বরণ করিবে, তিনিই তাঁহার স্বামী হইবেন। এই ইচ্ছা-বরণ যিনি গ্রাহ্য না করিয়া বিরুদ্ধাচারী হইবেন, সমবেত রাজগণ হেলেনার স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন।

এইরূপ মীমাংসা হইলে রূপসী হেলানা তাহার পূর্ব্ব পরিচিত স্পার্টার রাজকুমার মেনিলাসকে পতিত্বে বরণ করেন।

ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই মনে হইবে যে—পূর্ব্বে কোন নায়কের সহিত পরিচয় না থাকিলে, কেবল তাহার উপস্থিতরূপ দেখিয়া বা নাম শুনিয়া যে বিবাহ, তাহা ভারতীয় আর্য্য শাস্ত্রের ও চিন্তার বিরোধী এবং সেই জন্য আদিম মানব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মনু অষ্টবিধ আর্য্য বিবাহ রীতির ভিতর এই বিজাতীয় স্বয়ংবর বিবাহকে গণ্য করেন নাই।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্র যুগে যুগে যে যুগ প্রভাব বক্ষে লইয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর্য্য সমাজে পাশ্চাত্য স্বয়ংবর প্রথা প্রবেশ করিলে, ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণও সমাজ ব্যবস্থার এই বিজাতীয় ভাবটিকে আপদ্ধ-ধর্ম্মের পর্য্যায়ে লইয়া স্মৃতির ব্যবস্থায়ও ইহার স্থান করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মনু অতঃপর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কন্যা ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিবে। ইহার পরও পিতামাতা সেই ঋতুমতী কন্যার বিবাহে উদাসীন থাকিলে, কন্যা নিজ পতিবরণ করিয়া লইবে, তাহাতে তাহার পাপ হইবেনা। (১) গৌতম প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিকারগণও তখন মনুর এই ব্যবস্থায় সায় দিয়াছিলেন। (২)

এই অবস্থা সমাজে সর্ব্বদাই ঘটিত। বিষ্ণু সংহিতায় এইরূপ কন্যাকে 'বৃষলী' বলা হইয়াছে। বিষ্ণু সংহিতাও এইবার বৃষলীর' পক্ষে এই আপদ ধর্ম্মই গ্রহণীয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলেন। (৩)

বৈদেশিক ভাব ও রীতির প্রভাব যে রক্ষণশীল আর্য্য সমাজের রীতি ও নীতির দৃঢ়তা অনেক ক্ষেত্রে শিথিল করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থের বহু বিষয়ের আলোচনাই লক্ষিত হইবে।

এইরূপ অবস্থায় আমরা যদি স্বয়ংবর রীতিকে গ্রীক choice of husband প্রথার অনুকরণে গৃহীত বৈদেশিক প্রথা বলিয়া সিদ্ধান্ত করি, তাহাতে আমাদের কোন অগৌরবের বিষয় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই বিজাতীয় ভাব ভারতীয় পুরাণ গুলিতেই সর্ব্বপ্রথম গৃহীত হইয়াছিল। তারপর মহাভারতে নানাভাবে নানা সংস্কারের সহিত গৃহীত হয়। এই সময়ই রামায়ণেও নিতান্ত অর্থ শূন্যভাবে 'স্বয়ংবর' কথাটাকে স্থানে স্থানে প্রবেশ করান হইয়াছিল।

আমার একবন্ধু প্রশ্ন তুলিয়াছেন—যদি রামায়ণে বা কোন প্রাচীন সাহিত্যে স্বয়ংবর নাই, তবে কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের ইতিহাস পাইলেন কোথায়?

রামায়ণে কেবল দশরথের পুত্রগণের আখ্যানই বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে অজের বা তাঁহার স্বয়ংবর সভায় পত্নী লাভের কথা নাই। পুরাণগুলির মধ্যে যে সকল পুরাণে রঘুবংশ সূর্য্যবংশ অথবা রামায়ণ-কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহার কোন পুরাণেই অজের স্ত্রী ইন্দুমতীর নামের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরাণ শব্দকোষে মান্ধাতার স্ত্রী ইন্দুমতী (কোন কোন মতে বিন্দুমতীর) নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন অবস্থায় কালিদাসের সৃষ্টি যে তাঁহার স্ব কপোল কল্পিত, তাহা মনে করা ব্যতীত উপায় নাই।

সীতার বিবাহ স্বয়ংবর বিবাহ নহে; পূর্ব্বোক্ত কুশনাভের কন্যাগণ সম্বন্ধীয় গল্পটীও প্রক্ষিপ্ত।

স্বয়ংবর প্রথা ভারতে প্রচলিত হইলে, ভারতীয় সমাজে তখন যে বিরোধী দল সৃষ্টি হইয়াছিল, কুশনাভের কন্যাগণের মুখে সেই দলেরই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে—মনে করা অসমীচীন হইবে না।*

(১) মনুসংহিতা ৮।৯০ (২) গৌতম সংহিতা ১৮ অধ্যায়

(৩) বিষ্ণুসংহিতা ২৪।৪০-৪১। বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে (১৭।৬৭-৬৮) এবং বৌধায়নসূত্রেও (৪।১।১৪) এই মত গৃহীত হইয়াছে।

* সম্প্রস্থ গ্রন্থ "রামায়ণের সমাজ" হইতে গৌরীপুর প্রথম পূর্ণিমা সম্মিলনে পাঠের জন্য লিখিত এবং কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্মিলনে পঠিত।

আলু।

(বিলাতি বা গোল আলু)

বাঙ্গলার তরিতরকারী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আলুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। যদিও আলুর আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষে নহে, তথাপি ইহা ভারতে দীর্ঘ কালাবধি এতই সুপ্রচলিত এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে যে ইহার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। আজকাল আলু বলিতেই আমরা বিলাতী আলু বা গোলআলু বুঝিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে আরও বহুপ্রকার কন্দজাতীয় সবজী আলু নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে গোল-আলুই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং সকল সময়েই সহজ প্রাপ্য বলিয়া সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

সম্প্রতি কোন কোন আধুনিক খাদ্যতত্ত্বজ্ঞ অধিক পরিমাণে বিলাতী আলু ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা উহার সুযৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান। অন্ন যেরূপ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য (staple food), আয়ার্লণ্ডে আলুও তদ্রূপ। অথচ আইরিশগণ বাঙ্গালী অপেক্ষা সুস্থ, সবল এবং দীর্ঘজীবী। সুতরাং আলুর বিরুদ্ধ-যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ অস্বাভাবিক নহে। তবে আমরা সাধারণতঃ অন্ন হইতেই প্রচুর পরিমাণ শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য প্রাপ্ত হই বলিয়া অধিক পরিমাণ আলু ব্যবহার না করিলেও চলে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে তরিতরকারীর যেরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে প্রধানতঃ আলুর উপরই নির্ভর না করিলে আর আমাদের চলিতেছে না;—অন্ততঃ যতদিন আমরা অন্যান্য তরকারী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে না পারিব, ততদিন আলুর ব্যবহার পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইবে না। বিশেষতঃ কৃষি হিসাবে আলুর চাষ অতি লাভজনক। সুতরাং তাহাতে উদাসীন হইলে চলিবে না।

এই সকল বিষয়ে কৃষি বিষয়ক বিবিধ মাসিক-পত্র ও গ্রন্থে পূর্ব্বাপর যে সকল আলোচনা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তদপেক্ষা নূতন কোন তথ্য আমরা প্রদান করিতে পারিব কিনা বলিতে পারিনা। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে এই সকল আয়কর কৃষি সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা একদিকে দেশের জন সাধারণের মনোযোগ বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করার নিশ্চয়ই একটা সার্থকতা আছে। বিশেষতঃ এইরূপ আলোচনা দ্বারা যদি অন্ততঃ একশত পাঠকেরও চিত্ত উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের কৃষিকার্য্যে জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়, তবে তাহাও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। অবশ্য আমরা যথাসাধ্য নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করিব, কিন্তু সর্ব্বত্রই নূতন কিছু বলিবার মত হয়তো যুটিবে না। এতদ্দ্বারা অভিজ্ঞ পাঠকের কোন উপকার না হইতে পারে, কিন্তু বহু অনভিজ্ঞ পাঠকের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে মনে করিয়া অভিজ্ঞ পাঠকগণ লেখকের এই ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আলু এ দেশের সবজী নহে। ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রথম এদেশে আনীত হয়। আলুর আবাদ এতদ্দেশীয় জলবায়ুর বিশেষ উপযোগী বলিয়া এদেশে ইহার চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে বহুল পরিমাণে প্রযুক্ত হইতেছে জন্য আলু এক্ষণে এতদ্দেশীয় সবজীরূপেই পরিণত হইয়াছে, ইহার জন্মস্থানের কথা আর অনেকেরই মনে উদিত হয় না।

সাধারণ কৃষির উপযোগী প্রায় সকল রকম জমীতেই আলুর চাষ হইতে পারে। তবে দো-আঁশ মাটীই আলুর চাষের উপযোগী, তন্মধ্যে আবার হাল্‌কা দোআঁশ মাটীই বিশেষ প্রশস্ত, কঠিন দো-আঁশ মৃত্তিকাও সারসংযোগে হাল্‌কা দো-আঁশে পরিণত হইতে পারে। পক্ষান্তরে জমীতে বালির ভাগ বেশী থাকিলে তৎসঙ্গে এঁটাল বা কর্দ্দমাক্ত মাটী আবশ্যক মত মিশাইয়া দো-আঁশ করিয়া লইতে পারা যায়।

আলুর পক্ষে পলি মাটী বিশেষ উপকারী। নৈসর্গিক উপায়ে জলজ উদ্ভিজ্জাদি পচিয়া ইহার সৃষ্টি হয়। নদী খাল বিল বা পুষ্করিণী বর্ষান্তে শুষ্ক হইলে উহার তালায় যে মাটী পাওয়া যায় তাহাকেই পলিমাটী বলে।

বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আলুর জমী নির্ব্বাচন করিতে হয়। নদী বিল বা পুকুরের নিকটবর্ত্তী উচ্চ ভূমিই আলুর

চাষের পক্ষে সমধিক প্রশস্ত; কারণ, সময় সময় আলুক্ষেতে জল সেচন প্রয়োজন হয়; ক্ষেত জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে তজ্জন্য আর স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়না এবং শ্রমেরও অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকে। নিম্নভূমিতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইবার সম্ভাবনা, এবং জল দাঁড়াইলে আলু পচিয়া যাইবার খুব আশঙ্কা—তজ্জন্যই উচ্চভূমি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক।

ক্ষেত্রে অবাধ আলোক এবং প্রচুর সূর্য্যোত্তাপ না লাগিলে আলুর পরিপুষ্টি হয়না; সুতরাং আলুর চাষের পক্ষে ছায়াযুক্ত ভূমি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলেই সাধারণতঃ বর্ষাশেষে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে আলুর চাষ আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং আউস্ ধান বা পাটের জমিতে আলুর আবাদ করিলে তজ্জন্য আর স্বতন্ত্র জমী নির্ব্বাচন করিতে হয় না। কারণ ধান ও পাটের মূল পত্র প্রভৃতি পচিয়া জমীতে যে উদ্ভিজ্জ-সারের সৃষ্টি হয় তদ্দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে আলুর প্রচুর ফলন হইয়া থাকে।

আলুর জমী গভীর রূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। ৮।১০ বার চাষ করিয়া জমীতে প্রয়োজনানুরূপ সার দিতে হইবে। সাধারণতঃ বিঘাপ্রতি একশত মণ পুরাতন গোবর-সার ও পনের মণ ছাই আলুর পক্ষে উপযুক্ত সার। পরীক্ষায় এই সার হইতেই অধিক ফসল পাওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ এই সার সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই সহজ লভ্য। আলুর চাষে সারের পরিমাণ কিছু বেশী লাগিলেও উহা শুধু আলুর পরিপোষণেই সম্পুর্ণ রূপে ব্যয়িত হয় না; কতকাংশ জমীতে থাকিয়া যায় এবং তদ্দ্বারা পরবর্ত্তী ফসলেরও যথেষ্ট হিত সাধিত হয়। গোবর সার খুব পচা এবং পুরাতন হওয়া আবশ্যক। নতুবা গাছে পোকা ধরে এবং গোবরের তেজে গাছের ক্ষতি হয়।

গভীর রূপে কর্ষিত জমীতে উক্ত সার ছড়াইয়া দিয়া পর্য্যায় ক্রমে আরও চাষ এবং মই দিয়া উহা মাটীর সঙ্গে উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া দিবে। পুনঃ পুনঃ চাষ দ্বারা জমীর মৃত্তিকা ধূলিবৎ সূক্ষ্ম করা আবশ্যক। এবিষয়ে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রবাদ বচনও সাক্ষ্য দিয়া থাকে; যথা—

"মূলার ভূঁই তুলা, আলুর ভূঁই ধূলা"

ফলতঃ আলুর জমীর মৃত্তিকা ধুলার ন্যায় সূক্ষ্ম হইলে যে ফলন্ বেশী হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আলু রোপণ প্রণালী আজকাল বঙ্গীয় অধিকাংশ কৃষক কুলেরই অবিদিত নহে। ক্ষেত্রে প্রতি দুইহাত অন্তর সমান্তরাল ভাবে রেখা টানিয়া প্রত্যেক রেখায় ৬ইঞ্চি চওড়া ও ৬ইঞ্চি গভীর নালা কাটিবে। ঐ নালার মাটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা নালার অর্দ্ধাংশ (অর্থাৎ ৩ইঞ্চি) পূর্ণ করিবে। তৎপর প্রতি একফুট অন্তর এক একটী বীজ-আলু বসাইয়া অবশিষ্ট মাটী দ্বারা নালাটী পূর্ণ করিবে। কিন্তু এই প্রণালীতে আলু রোপণ করিবার অব্যবহিত পরেই সহসা অধিক বৃষ্টি হইলে বীজ-আলু পচিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তজ্জন্য নিম্নোক্ত প্রণালীতে আলু রোপণই অনেকে ভাল মনে করেন।

জমীতে প্রায় সারে তিন ফুট অন্তর পূর্ব্ববৎ সমান্তরাল ভাবে রেখা টানিয়া ঐ রেখার উপর দিয়া ৬ইঞ্চি গভীর ও ৬ইঞ্চি পরিসর করিয়া মাটী উত্তম রূপে কোদলাইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে এবং তাহার উপরে প্রতি এক ফুট অন্তর এক একটী বীজ-আলু বসাইয়া দুই পার্শ্বের মাটী উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উহা ঢাকিয়া দিবে। দৃষ্টি রাখিবে, যেন বীজ আলুর উপরে তিন ইঞ্চির অধিক মাটী না পড়ে। আলু রোপণ করিয়াই উহার লাইনের উভয় পার্শ্বে সামান্য গভীর নালা করিয়া দিবে, যেন হঠাৎ বৃষ্টি হইলে ঐ নালা দিয়া সহজেই জল বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আলুর কেয়ারীর মৃত্তিকার সঙ্গে করাতের গুঁড়া ও নারিকেলের ছিব্ড়া ঢেঁকীতে কুটিয়া তাহার সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশাইয়া দিলে ঐ মাটী অত্যন্ত হালুকা হয় এবং তাহাতে আলুর আকার বৃহৎ হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট আলু উৎপাদনের সফলতা অনেক পরিমাণে বীজ আলুর উৎকর্ষতা ও বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। যে জাতীয় আলুর আবাদ করিতেহইবে তাহার বীজ সেই আলুর জন্মস্থান হইতে সংগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। নানা কারণে এতদ্দেশের বীজ-আলু ক্রমশঃ অবনতি গ্রস্ত হইতেছে এবং তজ্জন্য আলু ফসলেরও অবনতি ঘটিতেছে।

সুস্থ ও পরিপুষ্ট মাঝারী আকারের আলুই বীজের পক্ষে

প্রশস্ত। ছোট বীজ-আলু হইতে ফসল ছোট হয় এবং বড় বীজ-আলু অধিক ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। তবে বড় বীজ-আলু খণ্ড খণ্ড করিয়াও রোপণ করা যাইতে পারে। খণ্ডাকারে আলু রোপণ করিতে হইলে প্রতি খণ্ডে যাহাতে অন্ততঃ দুই তিনটী করিয়া সুস্থ চোখ্ বা অঙ্কুর থাকে, তীক্ষ্ণধার ছুরীর সাহায্যে সেইরূপ ভাবে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। অথচ খণ্ডগুলি যেন বেশী পাতলা না হয়। প্রত্যেক খণ্ডের কর্ত্তিত প্রান্ত টাট্‌কা গোবর অথবা ছাই দিয়া মুছিয়া দিলে উহা পচিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকেনা। এইরূপ খণ্ডাকারে আলু রোপণ করিলেও ফলন অপ্রচুর হয়না।

ইউরোপ এবং আমেরিকার কোন কোন স্থলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলুগাছ হইতে বীজ এবং সেই বীজ হইতে চারা উৎপাদন করা হয়। কিন্তু উহা এতদ্দেশের জলবায়ুর উপযোগী নহে।

রোপণের কয়েক দিন পরে আলুর অঙ্কুরগুলি চারায় পরিণত হইয়া দুই তিন ইঞ্চি বড় হইয়া উঠিলে রেড়ীর খৈলের সঙ্গে মাটী এবং অতি সামান্য পরিমাণ তুঁতেরগুড়া মিশাইয়া ধুলার ন্যায় চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা চারার গোড়া ঢাকিয়া দিবে। এই সারে আলু গাছের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং রেড়ীর খৈলের তীব্র গন্ধে এবং তৎসহ তুঁতের মিশ্রণ ফলে উই কিম্বা অন্য কোন কীট চারার অনিষ্ট করিতে পারেনা এবং আলুগাছে ও ফসলে ছত্রক রোগ জন্মেনা। গাছের গোড়ায় ঝুল (গৃহ ধুম) কিম্বা অভাবে ভূষা কালি প্রয়োগ করিলেও নানাবিধ পোকার উপদ্রব নিবারিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে শোলাপোকার উপদ্রব হইলে উহাদিগকে ক্ষেত হইতে বাছিয়া বাহির করিয়া মারিয়া ফেলিবে এবং তৎপর আগুণ দিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। আলুক্ষেত্রে এরূপ বহুবিধ কীটের উপদ্রব হয় এবং তাহার ফলে ক্ষেত্রে 'ধ্বসা' প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। এই ধ্বসা রোগ অতি সংক্রামক! কোন আলুগাছের পাতা ঝলসাইয়া গিয়াছে দেখিলেই তাহাতে দোক্তা পাতা ভিজান জল অথবা কেরোসিন * মিশ্রিত জলের পিচকারি দিতে হইবে। প্রথমে যে গাছটাতে এই ভয়ঙ্কর রোগ দেখাদেয় তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া আগুণে পোড়াইয়া ফেলিবে। ক্ষেত্রে এরূপ ধ্বসারোগ লক্ষিত হইলে বোর্দো মিকশ্চার (Bordeaux mixture) নামক আরক ব্যবহার করিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। উহা জলের সঙ্গে চূণ ও তুঁতের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। নিম্নে উহার প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল।

বোর্দ্দো মিকৃশ্চার—দশ মণ জলে এই আরক প্রস্তুতের জন্য ছয়সের তুঁতে ও চারিসের তাজা কলি বা পাথুরে চুন (Unslaked lime) আবশ্যক। প্রথমে ছয়সের তুঁতে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একখানা ছালায় বা চটে বাঁধিয়া একটী মাটীর বা কাঠের পাত্রে পাঁচমণ ঠাণ্ডা জলে ঝুলাইয়া রাখিবে। ইহাতে সমস্ত তুঁতে জলে গুলিয়া যাইবে। এদিকে অপর একটী ঐরূপ পাত্রে চারিসের পাথুরে চূণ লইয়া তাহাতে অল্প অল্প জল দিয়া * ফুটাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। চূণগুলি গুঁড়া হইয়া গেলে তাহাতে অবশিষ্ট পাঁচমণ জল ঢালিয়া দিয়া উহা ঠাণ্ডা হইতে দিবে। ঠাণ্ডা হইলে এই চুন ছাঁকিয়া পূর্ব্বোক্ত তুঁতের জলে ঢালিয়া দিবে এবং অনবরত নাড়িতে থাকিবে। প্রথমে সমস্ত তরল পদার্থটী নীলবর্ণ দেখাইবে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিলে পাত্রের নীচে নীলাভ ঘন পদার্থ সঞ্চিত হইয়া উপরের অংশ জলের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে। এই নির্ম্মল তরল পদার্থই বোর্দো মিকশ্চার (Bordeaux mixture) একখানা পরিষ্কার ইস্পাতের ছুরী ঐ আরকে ডুবাইলে যতক্ষণ তাহার গায়ে লাল তাম্রবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আরকে ঐরূপে আরও চূণ মিশাইতে হইবে। আরক প্রস্তুত হইলে উহা আস্তে আস্তে স্বতন্ত্র একটী পূর্ব্ববৎ মৃৎ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে ঢালিয়া লইবে। সকালে এবং বৈকালে যখন সূর্য্যোত্তাপ না থাকে, তখন এই আরক পিচ্‌কারির সাহায্যে দিবসে দুইবার আলুগাছে সিঞ্চন করিতে হইবে। একবার ব্যবহারের জন্য সাধারণতঃ প্রতি বিঘায় পাঁচমণ আরক প্রয়োজন হয়।

আলুক্ষেতে ধ্বসা রোগের প্রবল আক্রমণ হইলে কখন কখন এই আরক ব্যবহারও নিষ্ফল হয়। সেরূপ হইলে

* নয়ভাগ জলে একভাগ কেরোসিন মিশাইবে। প্রয়োজন হইলে কেরোসিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এমন কি তিন ভাগ জলে একভাগ কেরোসিন মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহার করা যায়। লেখক।

* বাতাসে ফুটান চূণ দ্বারা আরক প্রস্তুত করিলে তাহা গাছের পক্ষে অনিষ্টকর হয়। লেখক।

ঐ জমী দুই তিন বৎসরের জন্য পতিত রাখিয়া উহা হইতে দূরবর্ত্তী স্থা ন নূতন জমী নির্ব্বাচন করিতে হয়।

আলুগাছ দুই তিন ইঞ্চি বড় হইলেই ক্ষেত নিড়াইয়া আগাছা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অবস্থা বিবেচনায় আবশ্যক মত ৮।১০ দিন কিম্বা ১৫দিন পর পরই ক্ষেত্রে জল সেচন করিবে। গাছের গোড়ার মাটী শক্ত হইয়া গেলে উহা অতি সাবধানে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয় বার গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়ার সময়ও তৎসঙ্গে পূর্ব্ববৎ খৈল সার দেওয়া আবশ্যক।

গাছ মরিতে আরম্ভ করিলেই আলু তুলিতে হয়। গাছ মরিবার পরে হঠাৎ বৃষ্টি হইলে আলু পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অপরিপক্কাবস্থায় তুলিলে আলু অধিক দিন ভাল থাকে না এবং তাহা বীজরূপে ও ব্যবহৃত হইতে পারে না। আলু তুলিয়া অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল তাহাতে সূর্য্যোত্তাপ লাগাইবে। তৎপর উষ্ণ জলে পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া পুনরায় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে এবং উহা হইতে রুগ্ন পচা এবং কদাকার আলুগুলি পৃথক করিয়া ফেলিবে।

বীজের জন্য পুষ্ট ও পরিপক্ক মাঝারী আকারের আলু বাছিয়া লইয়া শুষ্ক বালির উপর স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিবে যেন পরস্পর গায়ে গায়ে না লাগে। বীজের জন্য রক্ষিত আলুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কোন আলু পচিয়া গেলে বা রুগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা বাছিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে।

টাটকা গোবর বা ছাই জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা আলু ধৌত করিয়া শুকাইয়া রাখিলে আলু অধিক দিন ভাল থাকে এবং সেই আলু বীজরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

কেহ কেহ অল্প গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) মিশ্রিত জলে বা কেরোসিন মিশ্রিত জলে আলু ধুইয়া রাখিতে বলেন। আমরা প্রথমটী পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই; দ্বিতীয় প্রণালীতে আলু বিস্বাদ হয় এবং তাহার উৎপাদিকা শক্তিও কতকটা নষ্ট হয়। যাহা হউক, এ সকল ব্যয় সাপেক্ষ পরীক্ষা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী নহে বলিয়া আমরা আপাততঃ এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

দুর্দ্দিনের দেবতা।

আজ আকাশে ডঙ্কা বাজায় দর্পহারী শঙ্করে!
তাণ্ডবে তার বন্যা জাগে, দণ্ডধারী দণ্ড্ করে!
উদ্ধত তার সর্প ফোঁসে বিদ্যুতের ঐ স্পন্দনে!
দর্দ্দুরেরা অন্ধকারে মাতুল শিবের বন্দনে!
পাগ্‌লা ভোলার ইঙ্গিতে মোর পাগ্‌লা হলো নন্দিত!
হে মহানট, শম্ভু! এস—কর্‌ছি অভিনন্দিত! (১)

হিন্দু তোমার মূর্ত্তি গড়ি' নিত্য পূজে মন্দিরে!
শ্মশানবাসী! নও তো তুমি অট্টালিকায় বন্দী রে!
চা'ল্-কলাতে পাষাণ পূজি' ভুল্‌লো তোমার রুদ্রতা!
তাইতো হলো জীবন্মৃত, কর্‌লো বরণ ক্ষুদ্রতা!
শক্তি হোলো শক্তি হীনা, আজ্‌কে ভীষণ লাঞ্ছিত!
হে ত্রিশূলী! গর্জ্জে, ও ঠো! বীর্য্য বিলাও বাঞ্ছিত! (২)

বজ্জাতেরা বেইজ্জতি কর্‌ছে এখন নির্ভয়ে!
আর কতকাল এমনি করে' রইবে তুমি সব সয়ে?
কুকুর পাঁঠা মা চেনেনা, নইলে কি আজ এইদেখি!
গর্ভ ধারণ কর্‌লো যারা খড়্গ ধারণ কর্‌বে কি?
পাপ-অসুরের বংশ নাশি' ধ্বংস কর দুর্ম্মতি!
বিরূপাক্ষ! চক্ষু ম্যালো। পোড়াও নারীর দুর্গতি! (৩)

হিন্দু মরে' ভূত না হ'লে কাঁপ্‌ত জগৎ হুঙ্কারে!
গগণ ভুবন কর্‌ত মুখর লাখ ধনুকের টঙ্কারে!
কুলের বধূ ধর্ষিত আজ!—সইত কি তা' চোখ বুজে?
লুণ্ঠিত বৌ আন্‌ত কেড়ে,' চল্‌ত ভবে কাল বুঝে'!
সতীর পূজা কর্‌ত সুখে রাখ্‌ত কুলের গণ্ডীতে!—
আজ, পিনাকী! শৃঙ্গ ফুঁকি' জাগাও হিন্দু পণ্ডিতে! (৪)

নির্য্যাতিতা হয় পতিতা—বিধান দিল কোন ভূতে?
তাহার টুঁটি ধর্‌তে টিপে ছুটে আসুক যমদূতে!
শত্রু দেখে' শাস্ত্র নেড়ে' কর্‌ছে সমাজ বিট্‌লামি!
বীর্য্য যদি থাক্‌ত দেহে কর্‌ত কি এই আর্য্যামি?
হিন্দু কি আর জাগ্‌বে কভু আবার প্রাচীন গৌরবে!
ধূর্জ্জটি! আজ জাগাও জগৎ তোমার বিরাট্ তাণ্ডবে! (৫)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

দর্প চূর্ণ।

নিকলা, গণ্ড গ্রাম হইলেও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাস তাহাতে অতি সামান্যই ছিল। দুইঘর ব্রাহ্মণ ব্যতীত উচ্চবর্ণের কোন গৃহস্থই তথায় ছিল না; আর ছিল, পাঁচ ঘর গোপ, একঘর নাপিত, ৪।৫ ঘর নমঃশূদ্র, দুই ঘর কুমার, এতদ্ব্যতীত বাকী সমস্তই মুসলমান।

ব্রাহ্মণ ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য ও রামনাথ ভট্টাচার্য্য দূরগ্রামে যজমান যজাইয়া ও পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া কোন মতে কায়ক্লেশে দিন যাপন করেন। দরিদ্র হইলেও ইঁহাদিগকে সকলেই মান্য করিত। ইঁহারাও সেই সম্মানে হিন্দু মুসলমান সকলের উপর, কারণে অকারণে প্রভুত্ব দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ইংরেজ শাসনের আদম সুমারী ইংরেজ রাজনীতির নাকি একটা বড় ভীষণ চাল। ইহা সমাজে বিপ্লব সৃষ্টির যে একটা প্রধান অস্ত্র, গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলায় তাহা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইয়াছে।

গোপ সমাজের মধ্যে গ্রামের রামজয় গোপ ধনবান।

নিম্নসমাজে প্রতি দশ বৎসরে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত হয়, আদম সুমারী উপলক্ষে তাহা আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। সেবারের এই আদম সুমারীতে রামজয় যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া নিজকে ক্ষত্রিয়শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া নামের পশ্চাতে গোপের স্থলে 'ঘোষ' লিখাইয়া লইল।

রামজয়ের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ব্রজনাথ বা রামনাথ বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই।

সৎশূদ্র রামজয়, ক্ষত্রিয় হইয়া যদি নিজকে উন্নত মনে করে, করুক; ব্রাহ্মণতো আর হইবে না। তবে আর আপত্তি কি?

গ্রামের এই মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সমাজ, গোপ সমাজের উপাধি পরিবর্ত্তনের দিকে এইরূপে উদাসিনতা দেখাইয়াই চলিলেন। ঘোষদের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সাক্ষাৎ হইলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পূর্ব্বভাব বজায় রাখিয়াই গোপদিগকে সম্ভাষণ করিতেন। প্রণাম করিবার জন্য ধূলি ধূসরিত পদ সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া, নিতান্ত ঔদাস্য ভাবে পিঁড়ি টানিয়া বসিতে বলিতেন; সময় সময় বা কলিকাটী মাটীতে ফেলিয়া দিয়া তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেও আদেশ করিতেন।

এরূপ আদেশ যে সর্ব্বদাই প্রতিপালিত হইত, অথবা একেবারেই হইত না, তাহা নহে। পূর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের নিকট যাহা আশা করা যায়, নব্য শিক্ষিত উন্নতিশীল যুবকদিগের নিকট সে রূপ প্রত্যাশা অবশ্যই করা যাইতে পারেনা।

বৃদ্ধ রামজয় কচিৎ কদাচিৎ যদি ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে আইসে ভট্টাচার্য্যদিগকে প্রণাম করে, কিন্তু এখন আর পিঁড়ি টানিয়া বসে না; দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াই চলিয়া যায়।

রামজয়ের পুত্র নরহরির মেজাজ কিন্তু তেমন নয়; সে প্রণাম করিবে দূরে থাক, সমান আসনে উপবেশন করিতেও ইতস্ততঃ করেনা।

একদিন নরহরি একটা যাত্রার দিন দেখাইতে আসিয়া ব্রজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিল—"ঠাকুর একটা খুব ভাল দিন করিয়া দিন দেখি; খুব ভাল যেন হয়..."

ভট্টাচার্য্য, নরহরির প্রণাম পাইবার প্রত্যাশায় পা বাড়াইবার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে তামাক টানিতে ছিলেন। নরহরি তাঁহার পদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়াই ধা করিয়া যাইয়া তাঁহার সহিত চৌকিতেই বসিয়া পড়িল এবং বসিয়া বসিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত শিশ দিতে লাগিল।

ভট্টাচার্য্য গোপ যুবকের এই বেয়াদবি নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া রাগে গড় গড় করিতে লাগিলেন; এই সময় পাঁচকড়ি কুমারকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার রাগ প্রকাশের সুযোগ ঘটিল। ভট্টাচার্য্য পাঁচকড়িকে ডাকিয়া নরহরিকে ঘাড়ে ধরিয়া তুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

নরহরিও গর্জ্জিয়া উঠিয়া ব্রহ্মবধের অভিনয় করিতে উদ্যত হইল। সে আস্তিন গোটাইয়া মাথার সুবিন্যস্ত কেশ দামের উপর সন্তর্পণে দুইহাত বুলাইয়া ভট্টাচার্য্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"কোন শালার ক্ষমতা কত দেখি?"

নরহরির উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ভট্টাচার্য্য ভয় খাইয়া নীরব হইলেন। পাঁচকড়ি নরহরিকে ধরিয়া প্রবোধ দিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

নরহরি ভট্টাচার্য্যকে এই অপমানের প্রতিশোধ ব্যাপারে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সাবধান থাকিতে বারংবার শাসাইয়া গেল।

(২)

ভট্টাচার্য্যদিগের এইরূপ বাড়াবাড়ি ব্যবহার রামজয় লক্ষ্য করিত; তাহার নিকট এখন এইরূপ ব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আজ নরহরির প্রতি এইরূপ অপমান জনক ব্যবহারে রামজয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং সমগ্র গোপ শক্তিকে এই সুযোগে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইবার অবসর পাইল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর রামজয় ঘোষের গৃহে দেশের বড় ঘোষের গোষ্ঠি সমবেত হইয়া বহু পরামর্শের পর এই মন্তব্য ধার্য্য করিল যে ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্যের কুমারী কন্যা সুশীলাকে ছলে বলে কৌশলে বা অর্থে যে প্রকারেই হয়, নরহরির সহিত বিবাহ করাইতে হইবে—তারপর যাহা হয় হইবে। অর্থ কিসের জন্য, যদি তাহা উচ্চ সম্মান ও গৌরব রক্ষার নিদান না হয়? দশ হাজার টাকা ইহার জন্য পণ রহিল। অগ্রে পণ্ডিত সমাজ হইতে একটা পাতি প্রয়োজন, তারপর অন্যান্য আনুসঙ্গিক সাহায্য সংগ্রহ।

ব্রজভট্টাচার্য্যের কিশোরী কন্যা সুশীলার সৌন্দর্য্যরাশি কিছুদিন যাবত নরহরির চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল; সে জন্য সে উপলক্ষ পাইলেই সময় নাই, অসময় নাই, ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে দৌড়াইয়া যাইত। ভট্টাচার্য্যের পুকুর পাড়, নরহরির তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্যের পুকুরে কোন দিন কেহকে কোন মাছ ধরিতে কেহ দেখে নাই, অথচ নরহরি এই পুকুরে নিত্য বসিয়া ডাঁশ পোকার অসহ্য দংশন সহ্য করিত। এতদিন নরহরির বোধ হয় চক্ষের তৃপ্তি সাধনই আকাঙ্ক্ষা ছিল; আজ অপমানের অবসরে আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। সৌন্দর্য্য ভোগ পীপাসু উচ্ছৃঙ্খল যুবক, কুসঙ্গীগণের মন্ত্রনায় ও উত্তেজনায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—একমাত্র এই উপায়েই এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে।

নরহরি, অনুরূপ উচ্ছৃঙ্খল কুসংসর্গীদিগের সমবায়ে এইরূপ ভীষণ সিদ্ধান্ত সমাজের দ্বারা অনুমোদন করাইতে সমর্থ হইয়া প্রকৃতই যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ রামজয় যুবক সমাজের সহিত আপততঃ একমত হইয়া হাঁ হাঁ করিল বটে কিন্তু এরূপ একটা অন্যায় কার্য্য যে নিশ্চয় করিতে হইবে, অথবা উত্তেজনা থামিয়া গেলে যে গোপ সমাজের সকলে এরূপ কার্য্যের অনুমোদন করিবে, এরূপ ধারণা তাহার মোটেই ছিল না।

সমাজ ঐক্যমতাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। উপস্থিত ঘটনায় তাহা হইয়াছে; এখন ভট্টাচার্য্যদিগকে কোন প্রকারে সায়েস্তা করিয়া গোপ সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উপায় হইলেই—রামজয় তাহা যথেষ্ট মনে করে।

(৩)

এই ঘটনার পর দিন সকাল বেলায় ব্রজ ভট্টাচার্য্য তাঁহার পুকুর পাড়ে বসিয়া তামাক টানিতে ছিলেন; এই সময় যদু ঘোষ আসিয়া হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল—"ঠাকুর প্রাতঃ প্রণাম! রামজয় ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব—আপনার মেয়েটী তাঁহাকে দিতে হইবে; আপনি বিবাহের পণ যাহা চাহিবেন, তাহাই তিনি দিতে প্রস্তুত।"

যদুর এই অপমান সূচক উক্তিতে ভট্টাচার্য্য ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে ধৈর্য্য হারাইতে ছিলেন না, নিরুপায় ভাবে চারিদিকে চাহিতেছিলেন, আর ফোঁফাইতে ছিলেন।

যদু যষ্ঠি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শিশ দিতে দিতে ভট্টাচার্য্যের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল, নিকটে কেহ নাই দেখিয়া বলিল—"ঠাকুর ফোঁফাইলে কি হইবে; রামজয় ঘোষ যখন পুত্রের জন্য মেয়ে পছন্দ করিয়াছেন, তখন মেয়ে আর রাখিতে পারিবেন না; নগদ কি চান, তাই গিয়া এখন ঘরে বসিয়া পরামর্শ করুন। মেয়েটী সুখে থাকিবে। চিন্তা করুন; আমি পুনরায় আসিব। জাত যাইবে না, পণ্ডিত সমাজের পাতি লইয়াই শুভ কার্য্য হইবে। এখন আসি, নিবেদন ইতি।"

যদু আরো অনেক কথা বলিতে আসিয়াছিল। ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া ও নিজের বেয়াদবি, মাত্রা অতিক্রম করিতেছে—লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতই ভয় পাইয়া গেল। সে সংক্ষেপে তাহার শেষ মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেল।

সংস্কারাবদ্ধ হিন্দু আজও ব্রাহ্মণকে কটু কথা বলিয়া নিজকে নিরাপদ ভাবিতে পারে না। যুগযুগান্তরের সংস্কার ও অভ্যাস মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় উন্মূলিত হইবে কেমন করিয়া?

(৪)

যদু চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্যের ক্রোধ পড়িয়া গিয়া তাঁহার মধ্যে একটা অজানিত ভীতিরভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। যদুর ঔদ্ধত্যের কথা যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই এইরূপ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য যুবকদের যে অকরণীয় কিছু থাকিতে পারে না, তাহাই যেন পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে হইতে লাগিল এবং তাহা মনে করিয়া তিনি ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য, গৃহিণীর উপদেশ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না, কোন নূতন বিষয়ের নূতন চিন্তাও করিতেন না। সুতরাং এই অচিন্তনীয় ব্যাপারের সংবাদ তিনি তখনই গৃহিণীকে যাইয়া বলিলেন। তিনি নরহরির বেয়াদপির ঘটনা হইতে যদু ঘোষের বেপরোয়া উক্তি—সকলি অবিকল গৃহিণীর নিকট কন্যার অগোচরে বিবৃত করিয়া কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু হইলেন।

গৃহিণী অবস্থা চিন্তা করিয়া জ্ঞাতি রাম ভট্টাচার্য্যকে ও নিতাই নমশুদ্র, গতি শীল, দুর্ল্লভ কুমার প্রভৃতি ২।৪ জন ভক্তিশীল অনুগত ব্যক্তিকে ডাকিয়া লইয়া পরামর্শ করিতে উপদেশ দিলেন। ভট্টাচার্য্য তাহাই করিলেন।

ভট্টাচার্য্যের ভিতর বাড়ীতেই সকলে আসিয়া উপবিষ্ট হইল। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী নানাছন্দে মুখবন্ধের সহিত বিষয়টী উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট বিবৃত করিয়া ইহার প্রতিকার প্রার্থী হইলেন! ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর মুখে সকল কথা শুনিয়া রাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন "রামজয়ের বাড়াবাড়ী দেখা দিয়াছে; দাদা, ভগবান আছেন, চন্দ্র সূর্য্য আছেন, এ মগের মুল্লুক নয়। তবু দেখ দেখি গতি, হারামজাদা ছোকরার কি বেয়াদপি কথা?"

গতি শীল বলিল—"যদুর কথা বলিবেন না ঠাকুর দাদা, এর কথায় যদি কাজ হইত, তবে দুনিয়ায় আর মানুষ টিকিতে পারিত না।...তবে এরূপ বেলেহাজ কথার প্রতিবিধান অবশ্য দরকার...করিতেই হইবে।"

দুর্ল্লভ বলিল—"যদুর কথার কোন মূল্য নাই—রামজয় ঘোষও তেমন লোক নয়, সে জন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন; তবে এরূপ বেয়াদপের শিক্ষা দরকার—ঘোষেরারও বাড়াবাড়ি কমাইতে হইবে। এখন যেন তারা মানুষকে আর মানুষ বলিয়াই মনে করে না..."

এইরূপ আলোচনার পর সকলেই যদুর বেয়াদপিকে নিন্দা করিয়া তাহার প্রতিকার প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিল; আর যদুর এইরূপ ভয়ের কথায় যে মোটেই কোন ভয়ের কারণ নাই, তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া একে একে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্যকে সকলেই যুক্তি-তর্ক দ্বারা সাহস দিলেও তাঁহার মন হইতে কিছুতেই অপমানের ভয় তিরোহিত হইল না। তিনি কেবলি ভাবিতে লাগিলেন—যে উচ্ছৃঙ্খল যুবক পিতৃ তুল্য বৃদ্ধকে—পিতৃ নমস্য ব্রাহ্মণকে এমন ধারায় অপমান সূচক এতগুলি কথা বলিতে অনুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, তাহার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। কুলে কলঙ্ক একবার স্পর্শ করিলে—"ভগবান তুমি কি নাই" ভট্টাচার্য্য ভগবানের নাম লইয়া পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

ব্রজ ভট্টাচার্য্য বিকালে ২।৪ জন লোক লইয়া বসিয়া যদু ঘোষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদু আর আসিল না। যদু আসিল না দেখিয়া যদুর বাচালতাকে পাগলামি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া সকলেই একে একে প্রস্থান করিল।

(৫)

বিকাল বেলায় যদু ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়াছে; তাঁহাকে একাকী ধরিবার সুযোগ পায় নাই, তাই সাক্ষাৎ করে নাই। রাত্রিতে সে সুযোগ ঘটিবে বুঝিয়া আসিয়া ভট্টাচার্য্যের শয়ন ঘরের সম্মুখে যাইয়া ডাকিল—"ভট্চাজ মহাশয় আছেন কি?"

যদুর স্বর শুনিয়া ভট্টাচার্য্য কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল। ব্রাহ্মণীকে চুপি চুপি কথা বলিতে যাইয়াও বারংবার ঢুক গিলিতে লাগিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি ব্রাহ্মণী ভট্টাচার্য্যের অবস্থা বুঝিয়া নিজেই উত্তর করিলেন—"কে?"

উত্তর—"আমি, যদু ঘোষ।"

প্রশ্ন—"কি চাও, তুমি?"

উত্তর—"প্রাতে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহার উত্তর চাই।"

ব্রাহ্মণী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"কাল দিনে আসিও ; আজ...

উত্তর হইল—"আর উত্তর শুনিতে আসিব না, মেয়ে লইতেই আসিব ; প্রস্তুত থাকিবেন।"

যদু ঘোষের উত্তরে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়েই ভয় পাইলেন। ব্রাহ্মণী দরজার ফাঁক দিয়া যদুর অন্তর্ধাণ লক্ষ্য করিয়া, তখন তখনই সুশীলাকে রাম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন। এবং ভট্টাচার্য্যকে অনতি বিলম্বে গ্রামের চৌকিদার মাছু সেককে লইয়া আসিতে পাঠাইলেন।

ভট্টাচার্য্যের ব্যাকুল অনুরোধে পড়িয়া মাছু চৌকিদার সারা রাত তাঁহার গৃহে পাহারা দিল। কিন্তু সেও যদু ঘোষের কোন দুরভিসন্ধির আভাস পাইল না।

ভোরে মাছু ছেলাম জানাইয়া বিদায় হইবার সময় বলিল—"এরূপ অসম্ভব ঘটনা কি সম্ভব হইতে পারে ঠাকুর কর্ত্তা! আল্লা কি তাহা সহ্য করিতে পারেন ? আপনারা যে হিন্দুর দেবতা।"

(৬)

গোপ সভার পরেই গোপ যুবকেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল—ব্রজু ভট্টাচার্য্য যদি প্রচুর অর্থ লোভেও বশীভূত না হয়, তাহাকে ভয় দেখাইতে হইবে ; ভয়ে ভীত হইয়া সে যদি তাহার মেয়েকে স্থানান্তরিত করিতে লইয়া যায়, তখন বল ক্রমে ও অর্থ ব্যয়ে কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে। মেয়েকে দূরবর্ত্তী কোন স্থানে নিয়া কিছু দিন রাখিতে হইবে, অবশেষে নরহরির সহিত যথা রীত তাহাকে বিবাহ করাইতে হইবে। ইহাতে যে অর্থের দরকার, তাহা সমাজের চিরস্থায়ী উন্নতির জন্য করিতেই হইবে।

ভট্টাচার্য্যকে ভীত করিয়া অথবা অর্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া এই কার্য্য উদ্ধারের ভার পড়িয়াছিল যদুর উপর। যদু এই কয়দিন ধরিয়া তাহার সেই কর্ত্তব্যেরই মহলা দিতে ছিল।

যদু, ভট্টাচার্য্যেরগতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিয়াছিল। এবং আরোও যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা প্রাণপণে করিতেছিল।

ভট্টাচার্য্য এবং ভট্টাচার্য্য গৃহিণীও সাবধানতা অবলম্বন করিতে ক্রটী করিতেছিলেন না। সুশীলাকে একেবারেই ঘরের বাহির হইতে দিতে ছিলেন না।

(৭)

ইতি মধ্যেই একদিন ঘোষ বাড়ীতে ঢুলের বাজনা বাজিয়া উঠিল। লোকে শুনিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও জানিলেন—নরহরির বিবাহ এবং সে বিবাহ করিবে ব্রাহ্মণের মেয়ে।

ব্রজু ভট্টাচার্য্য যখন এই সংবাদ নিশ্চিত ভাবে অবগত হইলেন, তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। জ্ঞাতি ভ্রাতা রাম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে সুশীলাকে রাখিয়া তিনি সেই দিনই থানার দারোগার নিকট শান্তি রক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন।

সে দিন ছিল থানার চৌকিদারের হাজিরার তারিখ। দারোগা গ্রামের চৌকিদার মাছুকে ডাকিয়া গ্রামের হাল-খবর অবগত হইলেন। মাছু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অলীক ভাবনার কথা সরল ভাবে নিবেদন করিয়া দারোগার সম্মুখেও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাঁহার সেই ভাবনা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতে ক্রটী করিল না এবং এই উপলক্ষে মাছু দারোগার নিকট তাহার নিজের অভিজ্ঞতার প্রমাণ স্বরূপ সেদিনকার শান্তিভঙ্গ আশঙ্কায় সারা রাত্রি পাহারা দিবার কথাও নিবেদন করিল।

মাছুর সাক্ষ্য শুনিয়া দারোগাও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রচুর অভয় বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন।

ভট্টাচার্য্যের ভীত হৃদয় সান্ত্বনায় সুস্থ হইল না ; তিনি নিরুপায় ভাবে দারোগাকে পুনঃ পুনঃ প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করিলেন। দারোগা জবাব দিলেন—"শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কার কোন কারন নাই হেতু আমি এইরূপ এজাহার গ্রহণ করিতে পারি না ; তথাপি আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াই আপনার কথা লিখিয়া রাখিয়া চৌকিদারেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম। চৌকিদার আপনার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—বলিয়া দিলাম ; ইহার অধিক বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। তেমন কোন ঘটনা ঘটিলে চৌকিদারকে সংবাদ দিবেন, চৌকিদার থানায় এজাহার করিবে ; তখন যথা রীতি তাহার তদন্ত হইবে।"

ভট্টাচার্য্য বাড়ী ফিরিবার পথেই শুনিলেন—ঘোষের

বাড়ী হইতে আজই লোকজন যাইয়া তাঁহার ঘর হইতে জোড় করিয়া তাহার কন্তাকে লইয়া যাইবে।

ঘোষ পাড়ারই একটা লোক ভট্টাচার্য্যকে একা পাইয়া তাঁহার কানে কানে এই কথাটা শুনাইয়া দিল। শুনিয়া ভট্টাচার্য্য রাগে ঘৃণায় ও অপমানে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় হইয়া পড়িলেন।

কোন মতে অসার দেহটাকে যেন টানিয়া লইয়া তিনি গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণীর অবস্থা দেখিয়া তিনি আরো অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্যকে যেমন পথে একজন স্পষ্ট ভাষার সকল কথা শুনাইয়া দিয়াছে, ব্রাহ্মণীকেও সেইরূপ ঘোষ পাড়ার একজন স্ত্রীলোক আসিয়া স্পষ্ট ভাষায় হিতোপদেশ দিয়া গিয়াছে—"ওগো যদি জাত কুল রাখিতে চাও, তবে মেয়েকে আজই, এখনি তাহার মামাব বাড়ী পাঠাইয়া দাও। তোমার মেয়েকে আজ কাড়িয়া লইয়া গিয়া যদু ঘোষ বিবাহ করিবে। নরহরিও ব্রাহ্মণের মেয়ে বিবাহ করিবে। দুই বিবাহই আজ এক সঙ্গে হইবে।"

ভট্টাচার্য্য ঘরে আসিলে ব্রাহ্মণী আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহাকে আরো অস্থির করিয়া তুলিলেন। তিনি ঘোষ পাড়ার সেই দূতী স্ত্রীলোকের ভাষারই বলিলেন—"ও গো তুমি যদি জাত কুল বাঁচাইতে চাও, মেয়েকে এখনি যাইয়া তাহার মামার বাড়ী রাখিয়া আইস—তারপর আমাদের কুলে কপালে যাহা থাকে—হইবে।"

ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণীকে স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন তুমি এই সময় অস্থির হইয়া গোল করিও না, বিপদে অস্থির হইলে বিপদ ফুরায় না, বরং বাড়িয়াই যায়। ভগবান দয়াময়—অগতির গতি—বিপদ ভঞ্জন। বিপদ অনিবার্য্য হইলে কোথাও গিয়া নিস্তারনাই। ভগবানই বিপদ, ভগবানই সম্পদ; মান অপমান সকলেরই ব্যবস্থাপক তিনি। এখন কোথাও পাঠাইবার আর সময় নাই।

ব্রাহ্মণী চীৎকার করিয়া বলিলেন -"ওগো এরূপ কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার সময় এখন নয়। লোক জন দেখ..."

ব্রজু ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে আসিয়াছেন জানিয়া রাম ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও নানামুখে নানা কথা শুনিয়াছিলেন; ক্রমে আরো দুই এক জন অনুগত লোক আসিল।

ব্রজনাথ বলিলেন—"উপায় কি? আজ আমাকে অপমান করিবে, কাল তোমাকে অপমান করিবে, পরশু ইহাকে করিবে—এরকি প্রতিবিধান নাই?"

রাম ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"থানাওয়ালা কি কোন প্রতিকার করিল না?"

ব্রজু ভট্টাচার্য্য নিরাশভাবে বলিলেন—'না, কিছুই না; দারোগা টাকা খাইয়াছে। এখন তাই অগতির গতি ভগবান। তিনি ব্যতীত আর গতি নাই। যদি থাকে, তোমরা কর—আমার আর শরীরে বল, মাথায় বুদ্ধি নাই..."

সকলেই নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন। নিতাই নমঃশুদ্রও আসিয়াছিল। সে বলল—"ঠাকুর কর্ত্তা, আপনি যদি আমার সঙ্গে—কালুর বাড়ী পর্য্যন্ত যান..."

ব্রজু ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"নিতাই, কালুকে আমি সেদিন অপমান করিয়া দিয়াছি; আজ আমি তাহার বাড়ীতে যাইয়া তাহার সাহায্য চাহিব?"

রাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"তাহার সাহায্য লইলে যদি জাত-কুল-মান রক্ষা হয়—আপত্তি কি? বিপদে সবই করা যায় দাদা!"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"করিতেই হইবে। গলায় কাঁটা ঠেকিলে বিড়ালের পায় ধরিতে হয়। আজ রাত্রে যদি জাত যায়, কাল প্রাতে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া?"

ব্রজু ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"কালু সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে গোয়ালদিগের পক্ষেই যাইবে,—রামজয়ের যে সে টাকাও খায়ে..."

রাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"বিপদের সময় বিপরীত বুদ্ধি ভাল নয় দাদা—রাত্রিতে যে কি অবস্থা হইতে পারে আর রাত পোহাইলে যে তেমন অবস্থায় মুখ দেখাইবে কেমনে, তোমার এখনও সে ভাবনা নাই। কালু শক্তিমান, সে যদি এখন অপমানের প্রতিশোধ লইয়াও জাত রাখে—তবু রক্ষা। কালু না হইলেও রাত্রির জন্ত বাড়ীতে মানুষ রাখিতে হইবে, চৌকিদারকে সংবাদ দিতে হইবে। বিপদে সাবধান হওয়াই..."

ভট্টাচার্য্য বলিলেন "তবে চল। সন্ধ্যা হইয়াছে তুমি

ইহাদিগকে লইয়া বাড়ীতেই থাক, আমরা যাই।"

বলিয়া ব্রজু ভট্টাচার্য্য রাম ভট্টাচার্য্যকে ও আর দুজনকে বাড়ীর পাহারায় রাখিয়া কেবল নিতাইকে লইয়াই কালুর উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন।

(৮)

ভট্টাচার্য্য বিপদে 'মধুসূদন' স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন, আর থাকিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্যের গুপ্তমন্ত্র ভগবানের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে—এ বিশ্বাস ক্রমে যেন তাঁহাকে আর সান্ত্বনা দিতে পারিতেছিল না। সান্ত্বনার জন্য তিনি ডাকিলেন—"ভগবান তুমি কি নাই? প্রভো! আমি যে ত্রিসন্ধ্যায় তোমার নাম লইয়া থাকি..." ভট্টাচার্য্যের মুখে আর কথা ফুটিল না—চক্ষের জলে গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

অন্ধকার পথ যখন ব্রজু ভট্টাচার্য্য নিতাইকে লইয়া গিয়া কালুকে ডাকিলেন, তখন কালু ব্যস্তভাবে আসিয়া ভট্টাচার্য্যকে ছেলাম করিয়া তাড়াতাড়ি একখানা বেতের আসন আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিল।

ভট্টাচার্য্য দাঁড়াইয়া থাকিয়াই হতাশ ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"কালু, সে দিনের কথা ভুলিয়া যাও বাবা, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি; জাত যায় আমার..."

ভট্টাচার্য্যের মুখে আর কথা ফুটিল না। হৃদয় পঞ্জর যেন তাঁহার এই ক'টি কথার আঘাতেই ভাঙ্গিয়া গিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

কালু দাঁতে জিহ্বা কাটিয়া বলিল—"আল্লা-রছুল! ঠাকুর কর্ত্তা, আমরা ছোট লোক, মান অপমানের কথা মনে রাখিয়া চলিলে কি আমাদের চলে? বসুন আপনি—আপনার বিপদের কথা যে আমি একেবারে জানি না, তাহা নয়, এই কতক্ষণ হইল ঘোষের লোকও আসিয়াছিল—সকল কথাই শুনিয়াছি ও জানি..."

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আমার যে জাত যায় কালু! আমি তোমার আশ্রয় চাই। আমার জাত রাখ, তুমি আমার ধর্ম্মের পুত্র। আমার পুত্র থাকিলে সে তোমারই মত হইত...আমার অপরাধ ভুলিয়া যাও।"

নিতাই বলিল—"কালু ভাই, আমরা থাকিতে বামুনের মেয়েকে গোয়ালে জোড় করিয়া নিয়া জাত মারিবে—ইহা আমরা চক্ষের সামনে দেখিব?"

কালু ও নিতাই উভয়েই প্রথম যৌবনে লাঠির জোড়ে চলিত। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালু দা সম্বল করিয়া ঘরামীর কার্য্যে ও নিতাই হাল চাষ করিয়া গৃহস্থি কার্য্যে পরিবার প্রতিপালন করিতেছে। হইলেও এই উভয়েরই প্রাচীন নাম-ডাক এখনও যথেষ্ট আছে। লোক বিপদে পড়িয়া শরণ লইলে, উভয়েই প্রাণপণে সেই বিপন্নকে সাহায্য করিয়া থাকে।

ভট্টাচার্য্য যখন কালুকে ধর্ম্মের পুত্র বলিয়া তাহার হস্তে মান সম্মানের ভার ন্যস্ত করিয়া দিলেন, তখন কালু তাঁহার রক্ষার জন্য কি করিতে পারে, তাহাই সে নীরবে চিন্তা করিতে ছিল। কালুক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল—"ঠাকুর কর্ত্তা আপনি এখনই বাড়ীতে ফিরিয়া যান। নিতাই ভাইও যাও। আপনারা গিয়া এখন বাড়ীতেই খুব সাবধানে থাকেন। আমিও একটু পরে আসিতেছি। যদি একান্তই আমি যাইতে না পারি—আমার লোক যাইবে, একটা ঘর ছাড়িয়া দিবেন .."

কালুর কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের ভয় ও বিভিষিকা বাড়িয়া চলিল ব্যতীত কমিল না। শীঘ্রই যে তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন—এ কথা তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই চিন্তা করিতেছিলেন। কালুর এই কথায় এবং 'যদি একান্তই যাইতে না পারি' কথায় ভয় বাড়িয়া গেল। তিনি উন্মাদের ন্যায় কালুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন—'বাবা কালু, তুমি ফাঁকি দিয়া এড়াইতে চাও, তবে আমার উপায় কি হইবে"

সেদিন পুকুর ঘাটে স্নান করিয়া উঠিয়া কালুর ছায়া—মাড়াইয়া যে ভট্টাচার্য্য কালুকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছিলেন এবং পুনরায় স্নান করিয়া শুচী হইয়াছিলেন, আজ বিপদে পড়িয়া সেই ভট্টাচার্য্যই কালুর হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কালু নত হইয়া পড়িয়া বলিল—"তোবা, তোবা, কর্ত্তা যখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়াছেন, তখন যে প্রকারে হয়, আমি ধর্ম্মের কাজ করিব। আপনি বাড়ীতে যান আমি, আপনার জন্যই লোক তালাসে যাইতেছি। আপনি এই অসময়

আমাকে ছুইলেন, আপনি গিয়া গোছল করিতে করিতে—আমি লোক লইয়া ফিরিব। সময় নষ্ট করিবেন না।”

(৯)

ঘোষের বাড়ীর উৎসব-আনন্দ পূর্ণ মাত্রায় চলিয়াছে। নরহরি বিবাহ করিবে ব্রাহ্মণের মেয়ে। ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ কন্যা গ্রহণের এই প্রতিলোম-বিধি নাকি রামজয় ঘোষ বড়লাট সাহেবের আইন সভার শঙ্কর-বিবাহ-পাণ্ডুলিপির আলোচনা হইতে তন্নতন্ন করিয়া খুজিয়া বাহির করিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের দ্বারা তামার পাতে লিখাইয়া আনিয়াছে। এই স্মার্ত্ত-লিপি গ্রহণ করিতে নাকি তাহার হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। এই কথা আজ নানা ভঙ্গিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতার আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। কিন্তু পাত্রি যে কোথায়, অথবা কন্যা পক্ষ যে কোথাকার, তাহা কেহ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে না। যাহা হউক যাহার যাহা খুসি, সে তাহাই বলিয়া তাহার নিজ কল্পনার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

আজ রাত্রিতে ব্রজু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ব্রাহ্মণীর যে মনের অবস্থা কিরূপ, ভুক্তভোগী ব্যতীত তাহা অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই।

শেষ রাত্রিতে বিবাহের লগ্ন। গভীর রাত্রে অদূরে কন্যা আগমনের বাদ্যভাণ্ডের তুমুল কোলাহল শোনা যাইতেছিল। ক্রমে তাহা নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে গ্রামের মাঠে আসিয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময় যদু ঘোষ লাঠিয়াল দল লইয়া আসিয়া ব্রজু ভট্টাচার্য্যের শয়ন ঘরের একেবার বারান্দায় উঠিয়া ডাকিল—“ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মঙ্গল চান তো এই বেলা মেয়েটাকে বাহির করিয়া দিন—এই আপনার পণের টাকা নগদ তোড়ায় তোড়ায় রাখিয়া দিতেছি। গণিতে হইবে না। যদি এখনও আপত্তি করেন, জোড় করিয়া লইব, বেইজ্জত হইবেন। দেখিলেন তো, থানার দারোগাও শেষ রক্ষা করিতে পারিলনা; কালু লাঠিয়ালও আসিল না; নিতাই চাঁড়ালও রহিল না; চেষ্টাতো সকল দিকেই করিলেন। এখন এই টাকা লইয়া বুড়া বুড়িতে বৃন্দাবনের পাড়ি জমান।”

কথা শেষ করিয়া যদুঘোষ টাকার তোড়া কয়টা সশব্দে দরজার চৌকাঠের উপর রাখিয়াদিল। টাকার শব্দের যে প্রলোভন আছে, মানুষ তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। তাই অনেক সময়, এই শব্দ, অনেক অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়।

মুহূর্ত্ত পরেই ধীরে ধীরে ঘরের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য যেন উপস্থিত অবশ্যম্ভাবী অপমান, লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনাকে সেই তোড়ার শব্দের বিনিময়েই বরণ করিয়া লওয়া ব্যতীত অন্য উপায় দেখিলেন না।

ধীরে ধীরে বালিকা আসিয়া যদু ঘোষের সম্মুখে দাঁড়াইল। দ্বারেই পাল্কী প্রস্তুত ছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা ভীষণ কার্য নীরবে, সংঘটিত হইয়া গেল।

বাড়ীর সম্মুখেই বোর্ডের রাস্তার উপর তখন ইংরাজী বাদ্য বাজিতে ছিল। অতি নীরবে, অতিধীরে যাইয়া এই পাল্কীখানাও সেই শোভা যাত্রায় মিশিয়া গেল।

(১০)

আনন্দের পর নিরানন্দ—ইহাই ভগবানের অবশ্যম্ভাবী বিধান। বিবাহের পর দিনই ঘোষ বাড়ীতে হাহাকার উঠিল। নরহরি ও যদুর নামে ভীষণ অভিযোগে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে—সংবাদ পাইয়া উভয়েই নরহরির নববধু লইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছে। নববধুর নামেও সার্চ-ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।

এই ভীষণ উৎসবের এই অতি ভীষণ পরিনামে দেশের লোক ভগবানের দিকে চাহিয়া মঙ্গল ময়ের মঙ্গল বিধানের প্রতি সাশ্রু নেত্রে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

ক্রমে দেশময় মোকদ্দমার কথা রাষ্ট্র হইল।

ব্রজু ভট্টাচার্য্য অপমান ও অত্যাচারের ভয়ে সেই ভীষণ রাত্রিতে স্ত্রী ও কন্যা লইয়া জ্ঞাতি রামভট্টাচার্যের গৃহে আশ্রয় লইয়া তাঁহার নিজ গৃহ কালু সেকের প্রেরিত জলিল সেক নামক এক মুসলমানকে তাহার স্ত্রী পুত্র ও কন্যা সহ প্রহরী স্বরূপ থাকিতে দিয়াছিলেন। জলিলের দরখাস্তে প্রকাশ—“রাত্রি দেড় প্রহর থাকিতে যদু গোপ বিস্তর লাঠিয়াল সহ আসিয়া ঐ ঘরের দরজা ও বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করতঃ তাহার তের চোদ্দ বৎসরের কন্যা মেহেরুণকে জোড় করিয়া লইয়া গিয়া সেই রাত্রিতেই বালিকার অভিভাবকগণের সম্মতির বিরুদ্ধে নরহরি গোপের সহিত বিবাহ দিয়াছ।” * * *

নালিসের বিবরণ অবগত হইয়া যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাসী

লোক, তাহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ভগবান অবশ্যই আছেন। ব্রাহ্মণের ত্রি-সন্ধ্যায় আহ্নিক মন্ত্র যে সাক্ষাৎ অগ্নি!"

* * * *

রামজয় ঘোষ মোকদ্দমা সামলাইতে গিয়া সেই দশ হাজার টাকাই খরচ করিল। সেই অজস্র ব্যয়ের বিনিময়ে রামজয়ের যে সম্বন্ধ লাভ হইল, তাহাই তাহার আভিজাত্যের আস্পর্দ্ধাকে যুগযুগান্তের জন্য অতল গভীরে ফেলিয়া রাখিল।

বামনাই।

ম'রে গেছে নদীয়ার নামজাদা স্মার্ত্ত—
বাঁচাইয়া স্বজাতীর ষোল আনা স্বার্থ!
অতি বড় মইটারে বঁটি পেতে, তুচ্ছে,
করিলেন দুটি ভাগ মুণ্ডে ও পুচ্ছে।
মুণ্ডের ভাগে হ'লো বামুনের জন্ম;
বাকী যত সবি ল্যাজ—সবি তারা শূদ্র!
শূদ্রের ক্ষুদ্রতা অতিশয় ঘৃণ্য,
সেটা যে বুঝিতে নারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন।
কারো জলে চলে নাকি তাঁহাদের রান্না,
কারো জলে স্নান চলে, কারো জলে নান্না!
কাহারো পরশে নাকি ব্রত হয় ভঙ্গ;
কারো ছায়া মাড়াইলে শুচি হীন অঙ্গ!
হেঁশেলে বিড়াল চলু, ঘরে কাক কুকুর;
কারো চেয়ে অন্ত্যজে ঘৃণা করে ঠকুর!
সমাজের হাল ধরে ব্রাহ্মণ ধন্য;
হিন্দু বলিতে যেন তাঁহারাই গণ্য!
আর যত আছে সব চলে যাক্‌ গোল্লায়;
তা'দেরে টানিয়া নিক পাদ্রী ও মোল্লায়!
সব গিয়ে টি'কে থাক বামুনের বামনাই;
শেষকালে দেখি যেন হিন্দুর নাম নাই।

শূদ্রক।

গ্রন্থ সমালোচনা।

"কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ" ও "কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ-পরিশিষ্ট" বা "নব্যন্যায়ের পরিভাষা ব্যাখ্যা।"

উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য প্রণীত "কুসুমাঞ্জলি" ন্যায় শাস্ত্রের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তর্কতীর্থ মহাশয় কুসুমাঞ্জলির সংস্কৃত পদ্য কারিকার এই সুপ্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ন্যায়শাস্ত্র পাঠার্থীদিগের এক প্রধান অভাব মোচন করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গভাষায় দর্শনশাস্ত্রালোচনাকারীদের মহোপকার হইবে, এবং চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থীরাও বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আস্তিক হিন্দুগণ এই গ্রন্থে পঞ্চ নিরীশ্বর বা নাস্তিক মতের খণ্ডন পাঠ করিয়া পুলকিত হইবেন। মহামনীষী হরিদাস তর্কাচার্য্য কুসুমাঞ্জলির মূল কারিকা কণ্ঠস্থ করিয়া মিথিলা হইতে বাঙ্গলায় আনয়ন করেন, তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালায় উক্ত গ্রন্থ ছিল না। আজ তর্কতীর্থ মহাশয় তর্কাচার্য্য মহাশয়ের মতই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। যে গ্রন্থ শুধু সংস্কৃতজ্ঞ কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা আজ সর্ব্বসাধারণের দ্বারদেশে উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতের দর্শনশাস্ত্র অপূর্ব্ব সামগ্রী। আমরা আশা করি তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই অশেষ শ্রমসাধ্য গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠক সমাজে আদর প্রাপ্ত হইবে। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উত্তম। মূল্য প্রথম খানা ২॥০ টাকা ছাত্রগণের পক্ষে ২৲। দ্বিতীয় খানা ॥০ আনা মাত্র।

সাহিত্য সংবাদ।

গত ৬ই বৈশাখ পূর্ণিমা রজনীতে গৌরীপুরে সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের আহ্বানে গৌরীপুর ১ম পূর্ণিমা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। গৌরীপুরের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রবাবু "ভারতীর আরতি" কবিতায় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাসগুপ্ত ভিষগ শাস্ত্রীর "উপেক্ষিত, না অপেক্ষিত" ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের "রামায়ণ স্বয়ংবর" প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং সভাপতি মহাশয় এইরূপ সম্মিলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আগামী ৫ঠা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় দ্বিতীয় পূর্ণিমা সম্মিলন হইবে; এবং অতঃপর প্রতি মাসেই হইবে।

সৌরভ—
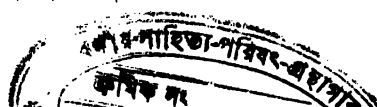
স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

সৌরভ প্রেস।

সৌরভ
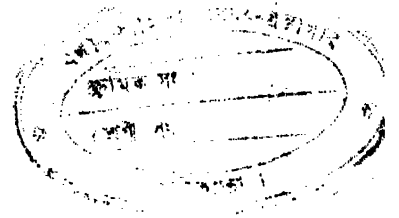
দ্বাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩৩১ | ষষ্ঠ সংখ্যা।

যুক্তরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা।

মার্কিন দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই রাজ্য গুলিকে ষ্টেট বলা হয়। প্রত্যেক রাজ্যেরই সেলফ্ গভর্ণমেণ্ট বা স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার আছে। এই সব গুলি রাজ্য, একত্রে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যুক্তরাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছে। সকলের উপরে একজন প্রেসিডেণ্ট বা কর্ত্তা আছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়; ওয়াসিংটনে থাকিয়া তিনি মার্কিন জাতির জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং মার্কিন রাজ্যের বিভিন্ন ষ্টেট সমূহ প্রেসিডেণ্টে কেন্দ্রীভূত। এই কেন্দ্র সংস্থিত প্রেসিডেণ্ট সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্টকে ফেড়ারেল রিপাবলিক বলা হইয়া থাকে। ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য তথায় একটী কংগ্রেস আছে। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিভূগণ এই কংগ্রেসের সভ্য। কংগ্রেসে যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হয় প্রেসিডেণ্ট তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান থাকেন। এই কেন্দ্রাভিলাষী গভর্ণমেণ্টকেই প্রজাতন্ত্র শাসন পদ্ধতি বলা হইয়া থাকে।

যুক্তরাজ্যের শিক্ষা প্রণালীকে মার্কিন জাতির জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি বলিতে পারা যায় না। কেননা এই শিক্ষা পদ্ধতি মার্কিন রাজ্যের মূল গভর্ণমেণ্ট অর্থাৎ কংগ্রেস বা প্রেসিডেণ্টের অধীন নহে। প্রেসিডেণ্ট বা কংগ্রেস শিক্ষাবিধান বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা বা হস্তক্ষেপ করেন না। যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্রই শিক্ষা ব্যাপারে স্থানীয় বিশিষ্টতার প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন ষ্টেটের শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন বিশিষ্টতা থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যেরও অভাব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতেছে যে যুক্তরাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে খাটি সাহেব মহলে শিক্ষা পদ্ধতি এক প্রকার এবং দক্ষিণদিকে আদিম অধিবাসী ও নিগ্রোর সংখ্যা বেশী থাকায় তথায়ই অন্যপ্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা। আবার দক্ষিণ পশ্চিমে মেকসিকোর কাছে স্পেনিয়ার্ড গণের প্রতিপত্তি বেশী; তথায়ই আবার তৃতীয় প্রকারের শিক্ষা পদ্ধতি দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমানে মার্কিন দেশ শিক্ষাদান বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় জাতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ এ বিষয়ে মার্কিনদেশের নিকট ঋণী।

কি করিয়া মার্কিন জাতি এত দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তথায় প্রত্যেক দেশই নিজেদের শাসনাধীন। সুতরাং প্রত্যেক ষ্টেটই নিজের দরকার আনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কোন্ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে সহজে কার্য্যকরি হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন ষ্টেটে নূতন নূতন প্রণালী অবলম্বন করা হইতেছে। কিন্তু বড় স্কেলে তাহা চলেনা, বলিয়াই ইউরোপীয় দেশ সমূহ এই প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক বিভিন্ন পদ্ধতির পরীক্ষা করিয়া কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। কারণ কোন একটী পরীক্ষা কার্য্য অবলম্বন করিয়া যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা না যায়, তবে ক্ষতি অত্যন্ত অধিক হইবে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্থানে এই পরীক্ষাকার্য্য চালাইয়া অকৃতকার্য্য হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ নাই। অথচ এই পরীক্ষাদ্বারা কোন্ প্রণালী ভাল এবং কোন্ প্রণালী মন্দ, তাহা অতি সহজেই ধরিতে পারা যায়।

মার্কিন রাজ্যের শিক্ষা ব্যাপারের বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষ।

(১) ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমেরিকার ষ্টেট সমূহ পরস্পর পরস্পর হইতে স্বাধীন।

সর্ব্বোপরি একজন প্রেসিডেণ্ট আছেন। কংগ্রেস যে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন প্রেসিডেণ্ট দেখিবেন যেন তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। ইহাই আমেরিকার ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের কার্য্য পদ্ধতি। মার্কিন রাজ্যের শিক্ষা ব্যাপারে ফেডারেল গবর্ণমেণ্টেরও অনেক সাহায্য করিতে হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস বিধিবদ্ধ করেন যে প্রত্যেক ষ্টেটের এক ষোড়শাংশ ভূমি বা এক আনা দেশের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য পৃথক রাখা হইবে। এই সংরক্ষিত স্থান সমূহের মূল্য ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড হইবে। ইহা ব্যতীত কৃষি কলেজের জন্য ১০,০০০,০০০, ষ্টার্লিংএরও অধিক মূলধন সংরক্ষিত হইয়াছে। তাহার আয় দ্বারা মার্কিন রাজ্যের কৃষি কলেজ সমূহ পরিচালিত হইয়া থাকে।

যুক্তরাজ্যের কোন কোন স্থানে—যেমন আলাস্কা, পোর্টোরিকো, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতিতে—আদিম অধিবাসী কিম্বা নিগ্রোর সংখ্যা বেশী। এই সকল স্থানের শিক্ষার ভার জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বা ফেডারেল রিপাবলিকের হাতে ন্যস্ত

(২ বোরো অব এডুকেশন বা শিক্ষা সমিতি। ওয়াসিংটন নামক স্থানে প্রেসিডেণ্ট বাস করেন। প্রতি বৎসর ঐ স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস মহাসভার ব্যবস্থানুসারে একটি শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শিক্ষা বিভাগ বা বোরো একজন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত আছে। রিপোর্ট, মন্তব্য, সার্কুলার, এবং পুস্তিকা প্রণয়ন দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুমোদিত শিক্ষা প্রণালী সমূহ প্রচার করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। শিক্ষা ব্যাপার সংক্রান্ত সমুদায় তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের বিভিন্ন ষ্টেট সমূহের শিক্ষার প্রসার ও অবগা লোক সম্বন্ধে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই এডুকেশন বোরো প্রথমতঃ স্থাপিত হইয়াছিল। যাহাতে মার্কিন রাজ্যের বিভিন্ন ষ্টেটের স্কুল ও কলেজ সমূহের গঠন, পরিচালন ও শিক্ষাদান প্রণালী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যাহাতে মার্কিন জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি লাভ করিতে পারেন তাহার প্রতি এই সমিতি বা কমিটির বিশেষ দৃষ্টি আছে।

(৩) ষ্টেট—শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন ষ্টেটের মতামত ও শিক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন। তবে মোটের উপর প্রত্যেক ষ্টেটই নিজেদের দরকার অনুযায়ী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। এবং নিজ নিজ ষ্টেটের অন্তর্গত কাউণ্টি জিলা, বা নগরের উপরই শিক্ষা ব্যাপার সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ষ্টেটই কয়েকটী কাউণ্টি বা জেলাতে বিভক্ত, প্রত্যেক জেলাতেই তত্রস্থ সমুদয় অধিবাসীদের জন্য প্রাথমিক ও গ্রামার স্কুল রাখিতে হয়। ঐ সকল স্কুলের ছেলেদিগকে বেতন দিতে হয় না। ষ্টেটের ব্যয়েতেই এই সকল স্কুল পরিচালিত হয় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষই পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন ষ্টেটের সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যবিধান, সংযম শিক্ষা ও ব্যায়াম বাধ্যতা মূলক পাঠ্যতাকিকার অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

প্রত্যেক ষ্টেটেই আবার একটী করিয়া এডুকেশন বোর্ড আছে। এই বোর্ড ষ্টেটের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ ও স্কুল কলেজ হইতে নির্ব্বাচিত সভ্যগণ দ্বারায় গঠিত। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ষ্টেটেই একজন করিয়া পাবলিক্ ইন্‌স্ট্রাকসনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন।

কোন কোন ষ্টেটে শিক্ষা স্থানীয় আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। কিন্তু অন্যত্র বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন নাই। এবং এই শেষোক্ত স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে শিক্ষার প্রতি সাধারণের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা বেশ আছে। বোধ করি এই জন্যই শিক্ষা তথায় বাধ্যতা মূলক করিবার দরকার হয় নাই। যে সকল ষ্টেটে বাধ্যতা মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তথায় প্রত্যেক ছাত্রকেই ৮ হইতে ১৪ অথবা ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে পাঠ করিতে হয়। যদি ইতিমধ্যেই কোন ছেলে সন্তোষ জনক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, তবে দরকার হইলে সে ১৬ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই পড়া ক্ষান্ত দিবার অনুমতি পাইতে পারে।

(৪) স্থানীয়—কর্ত্তৃপক্ষ।

(ক) কাউণ্টি—প্রত্যেক ষ্টেটেই কয়েকটী কাউণ্টিতে বিভক্ত। প্রত্যেক কাউণ্টিতে একটী করিয়া কাউণ্টি শিক্ষাবোর্ড ও একজন কাউণ্টি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন।

(খ) ডিষ্ট্রিক্ট—কোন কোন ষ্টেট আবার কাউণ্টি

হইতেও ছোট ছোট স্কুলে বিভক্ত হইয়াছে। এ গুলিকে ডিষ্ট্রিক্ট অথবা টাউন সিপ বলে। যে সকল টাউনে অধিবাসী সংখ্যা ৪ হাজারের উপর, সেই সকল টাউনই স্বতন্ত্র একটী শিক্ষা কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

(গ) বড় বড় সহরে লোকেল বোর্ডকে বোর্ড অব এডুকেশন এবং ডিষ্ট্রিক্ট লোকেল বোর্ডকে স্কুল ট্রাষ্টি বা স্কুল ডিরেক্টার নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণের ভোটের দ্বারাই এই সকল বোর্ডের নির্ব্বাচন ও গঠন হইয়া থাকে। যাহারা টেক্স দিয়া থাকেন, তাহারাই ভোট দিতে পারেন। স্কুল বোর্ডের ইলেক্‌সানে স্ত্রীলোকেরও ভোট দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এবং তাঁহারাও স্কুলবোর্ডের মেম্বার বা সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

শিক্ষক নিযুক্ত করণ, স্কুল গৃহের নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানীয় স্কুল সমুহের সাধারণ তত্বাবধান ক্রিয়া, বাধ্যতামূলক উপস্থিতির প্রথা প্রবর্ত্তন প্রভৃতি স্কুল বোর্ডের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে।

এক কথায় বলিতে গেলে স্কুল বোর্ডের সীমানার অন্তর্গত সমুদয়স্কুলের তত্বাবধান, পরিদর্শন, ও শিক্ষা ব্যাপারের যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনার ভার শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে বোর্ড আয় ব্যয় সংক্রান্ত তাবৎ বিষয় নিজের হাতে রাখিয়া কার্য্যকরী শক্তি ও বিচার ক্ষমতা সুপারিণ্টেণ্ডের উপরই ন্যস্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই সর্ব্বে সর্ব্বা।

কিরূপে বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সমতা রক্ষা হয়।

(১) বোর্ডো অব এডুকেশন বা শিক্ষাসমিতির প্ররোচনা।

(২) জাতিয় শিক্ষক সমিতি—শিক্ষাদান ও শিক্ষা-প্রণালীর উন্নতিবিধান করিয়া সর্ব্বপ্রকারে মার্কিন জাতিকে জগতে শীর্ষস্থান প্রদান করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের প্রফেসার পর্য্যন্ত যাহারাই শিক্ষাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বা শিক্ষাদান কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাহারা সকলেই এই সমিতির সভ্য। বৎসরে একবার করিয়া এই সমিতির অধিবেশন হয়। ২৫০০০ হইতে ৪০০০ শিক্ষক উক্ত সমিতিতে প্রতি সন যোগদান করিয়া থাকেন।

(৩) স্কুল পরিদর্শন—মার্কিন রাজ্যে ইহা একটী সুপরিচিত প্রথ। অপরাপর স্কুলে কিরূপ কার্য্য প্রণালী চলিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য প্রত্যেক বৎসরেই এডুকেশন বোর্ড শিক্ষকগণকে নিকটবর্ত্তী স্কুল সমুহ পরিদর্শন করিবার জন্য ২।১ দিনের সময় দিয়া থাকেন।

(৪) প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতি—প্রত্যেক ষ্টেটেই শিক্ষকগণের একটী করিয়া সমিতি আছে। প্রত্যেক স্কুল-ডিষ্ট্রিক্টেও এইপ্রকার সমিতি থাকিতে পারে। বৎসরে একবার করিয়া এই সমিতি বসে এবং ৭।৮ দিন উক্ত সমিতির অধিবেশনের কার্য্য চলে। যখন শিক্ষকগণের এই সমিতির অধিবেশন হয়, তখন স্কুল সমুহ বন্ধ হইয়া যায়। কেননা সকল শিক্ষককেই এই অধিবেশনে যোগদান করিতে হয়।

পাবলিক স্কুল—যে সকল স্কুলে পাঠ করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের ছেলে পেলে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে, আমেরিকায় তাহাদিগকেই পাবলিক স্কুল বলা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্কুল প্রাইভেট না হইলেও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য নহে। কারণ তাহাতে শিক্ষা বাধ্যতামুলক নহে।

গ্রাম্য ও নাগরীয় ভেদে এই পাবলিক স্কুল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যুক্তরাজ্যে ২৫৮০০টী পাবলিক স্কুল আছে। এই পাবলিক স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ৮ হইতে ১৪ বা ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের শিক্ষায় ৮০০০০০০০ আট কোটী পাউণ্ড প্রতি বর্ষে ব্যয়িত হয়। এই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক। এই জন্যই এই সকল স্কুলকে পাবলিক স্কুল বলা হইয়া থাকে।

গ্রাম্য স্কুল - গ্রাম্য স্কুল সমুহ সুশৃঙ্খলরূপে গঠিত নহে এবং তাহাতে বিশেষ সুব্যবস্থাও নাই। ইহাদের অনেক গুলিই পুরাতন রীতি অনুসারে শীতকালে মাত্র ৭০।৮০ দিনের জন্য বসিয়া থাকে। স্থায়ী শিক্ষকের অভাব বশতঃ এই সকল স্কুলে তাৎকালিক উপায়ে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। জাতীয় শিক্ষক সমিতি এই সকল স্কুলের ২।৪টী একত্র করিয়া নূতন স্কুল স্থাপনের এবং মটোরগাড়ী বা অন্য কোন যানের সাহায্যে ছাত্র গণের যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

নাগরীয় স্কুল এই সকল স্কুলের প্রত্যেকটী আটটী গ্রেডে বিভক্ত। প্রথম ৪ গ্রেড বা শ্রেণীকে প্রাথমিক গ্রেড

এবং শেষের চারিটী গ্রামার গ্রেড্ বলা হয়।

কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল - কিণ্ডার গার্ডেন স্কুলে পাঠ করিয়া পাবলিক স্কুলের গ্রামার গ্রেডে যাওয়া যায়। কিন্তু অনেক ষ্টেটেই কিণ্ডারগার্টেন স্কুলকে পাবলিক স্কুলের অংশ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

সংযুক্ত বিদ্যালয়—যুক্তরাজ্যের অনেক স্থলে, বিশেষতঃ মধ্য ও পশ্চিম প্রদেশের স্কুল সমূহে সাধারণতঃ ছেলে ও মেয়েদিগকে একত্রে এক শ্রেণীতে বসাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের বিশেষতঃ পুরাতন সহর সমূহে মেয়েদের স্কুল ছেলেদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৎসরে ৭০ হইতে ১৯০ দিন স্কুল বসিয়া থাকে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ করা হইয়া থাকে।

স্কুলের সময়—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা হইতে ১২টা এবং অপরাহ্ণ ১½টা হইতে ৩½টা পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য চলিয়া থাকে। বড় ২ সহরে দৈনিক দুইদল করিয়া ছাত্র উপস্থিত হয়। একদলকে প্রাতে ৮½ হইতে ১২½ টা পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় দলকে ১ হইতে ৪½টা পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যয়ন করিতে হয়। সম্ভবতঃ আমেরিকার এই প্রথাই জাপান অবলম্বন করিয়াছে।

স্কুল গৃহ—সমূহ সুচিন্তিত প্রণালীতে গঠিত এবং দেখিতে বড় জমকাল। সুপ্রশস্থ বারেন্দার দুই ধারেই পাঠগৃহের সারি। জাপান এবং জর্ম্মনিতেও এই প্রকার স্কুলগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্কুলেই একটী করিয়া হল আছে। তথায় স্কুলের সমুদয় ছাত্র একত্রে সমবেত হইতে পারে। অনেক স্কুলে এই এসেম্ব্লিহল দেখিতে অনেকটা অপেরা হাউস বা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের ন্যায়। ঘরের চারিদিকেই দেয়ালে সংলগ্ন ব্লাক বোর্ড বা ওয়াল বোর্ড সজ্জিত রহিয়াছে। বায়ু চলাচলের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। শীত প্রধান জায়গায় ঘরের বাহির হইতে ভিতরে বায়ু প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়। আবশ্যক হইলে এই বায়ু ষ্টিমের সাহায্যে উত্তপ্ত করিবার ও বন্দোবস্ত আছে।

খেলার মাঠ—মার্কিন রাজ্যের বড় বড় সহরের স্কুলগৃহে খেলার মাঠের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তৎপরিবর্ত্তে অনেক স্কুলে রুফ গার্ডেন বা ছাদের উপর কৃত্রিম বাগানের বন্দোবস্ত আছে।

সংযম ও শাসন এ সম্বন্ধে আমেরিকার প্রাথমিক বা পাবলিক স্কুলে নূতন প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। আত্ম-শাসন ওআত্মসংযমের ক্ষমতা বিশেষভাবে জাগাইয়া দিবার জন্য তথায় ছেলেদিগকে বেশ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক প্রাথমিক স্কুলে ছেলেদের একটী সঙ্ঘ বা সমিতি আছে। তাহারা নিজেরাই নিজেদের শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে বেশ শৃঙ্খলার সহিত স্কুলের কার্য্য চলিয়া থাকে।

পলাতক ছেলেদিগকে বয়োজ্যেষ্ঠ ও দায়িত্ব জ্ঞানপূর্ণ মনিটারগণ সতর্ক দৃষ্টিতে রাখিয়া থাকে। পলাতক ছাত্র পুলিশের হাতে পড়িলে পুলিশ তাহাকে আনিয়া স্কুলে হাজির করে। শাস্তি না দিয়া তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। এইরূপে তাহার স্কুলের ভয় অপনীত করা হয়। স্কুলের হেড মাষ্টারকে প্রিন্সিপাল বলা হইয়া থাকে।

শাস্তি—যাহারা স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকে, তাহা-দিগকে প্রত্যেক রাত্রে প্রিন্সিপালের নিকট এই মর্ম্মে একখানা রিপোর্ট দিতে হয় যে সারাদিন সে ভাল ব্যবহার করিয়াছে। প্রিন্সিপাল অনেক সময় তাহার সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট স্বরূপ, এই রিপোর্টে শিক্ষকের দস্তখত চাহিয়া থাকেন।

বিশেষ অপরাধ করিলে অপরাধীকে অপরাপর ছাত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেওয়া হয় না; এবং ছাত্রগণও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলে না। শারীরিক শাস্তি কদাচিৎ দেওয়া হইয়া থাকে।

পাঠ্য তালিকা—লিখন, পঠন, বানানশিক্ষা, ব্যাকরণ, লেটিন, ফ্রেঞ্চ ও জারমেন ভাষা, যুক্তরাজ্যের ইতিহাস, গণিত, আদব শিক্ষা, চরিত্র গঠন, প্রকৃতি পাঠ, বিজ্ঞান, ভূগোল, হস্তের কাজ, সীবন শিক্ষা, পাক প্রণালী, অঙ্কন বা চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত সাধনা, ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয় প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত।

কোন মাসের কোন সপ্তাহে কি কি বিষয় পড়াইতে হইবে শিক্ষকগণ বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার একটী তালিকা পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কোন প্রণালীতে পাঠ দেওয়া হইবে, তাহাও উক্ত তালিকায় লিপবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

শিক্ষাদানের সাধারণ প্রণালী—কোন একটি পাঠ্য পুস্তক (টেকসট্ বুক) হইতে শিক্ষক ছাত্রগণকে কতকটা

পড়া বা কাজ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন। পরদিন ছাত্রকে শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া সে যাহা যাহা নোট করিল ও জানিতে পারিল, তাহাই তাঁহাকে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রকেই এইভাবে পাঠ দিতে হয়। ছাত্র তাহার পাঠদান কার্য্য সমাপ্ত করিলে ক্লাশের অপরাপর বালকগণ তাহার সমালোচনা করিতে পারে। শিক্ষক যেন এই ব্যাপারে ডিবেটিং ক্লাবের নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তিনি দেখিবেন, ছাত্রগণ যেন কোন প্রকার নিয়মভঙ্গ বা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কাজ না করে। এই প্রণালীতে ছাত্র নিজেই গবেষকের স্থান অধিকার করে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে পুস্তক হইতে ছাত্রের তথ্য সংগ্রহ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত আত্ম নির্ভরতা, আত্ম সহায়তা, ও বিচার ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পাবলিক লাইব্রেরী—যুক্তরাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরীর সঙ্গে পাবলিক (প্রাথমিক) স্কুলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই পাবলিক লাইব্রেরীর বিশেষ বিভাগে যুবক বৃন্দের ও বালকগণের পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক ১০।১৫ সেট্ করিয়া রাখা হয়; ঐ সকল পুস্তক আবশ্যক মত বিভিন্ন স্কুলে প্রেরিত হইয়া থাকে।

প্রমোশন—শিক্ষকগণ প্রিন্সিপালের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রমোশন নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। সহরের স্কুল সমূহে ষাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রমোশনের ব্যবস্থা আছে।

মার্কিন রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলে প্রমোশনের একটু বিশেষত্ব আছে। মনে করুন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ভূগোলের জন্য ষষ্ঠশ্রেণীতে প্রমোশন পাইল। কিন্তু ইতিহাসে সে নিতান্ত কাঁচা বলিয়া ইতিহাসের প্রমোসন পাইল না; মার্কিন রাজ্য এইরূপ প্রমোশনের প্রচলন বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমোশন পাওয়ার পর ঐ ছেলেকে পরবর্ত্তী বৎসরে ষষ্ঠশ্রেণীর পাঠ্য ভূগোল পড়িতে হইবে। কিন্তু পাঠের বেলায় তাহাকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রের সঙ্গে একত্রে পাঠ করিতে হইবে। সাধারণ ছাত্রের পক্ষে এরূপ নিয়ম অতি উত্তম। আমাদের বাঙ্গলা দেশের স্কুল সমূহেও এই নিয়ম থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থের অপব্যবহার না হইয়া বরং সুব্যবহারই হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রামায়ণী কথার প্রচার।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণ কথার উল্লেখ বা প্রচার প্রথম মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের বন পর্ব্বে ২৭৩ হইতে ২৯০ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই চৌদ্দটী অধ্যায়ে রামায়ণের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে রামের জন্ম হইতে বনবাস কালের পর রামের সিংহাসন আরোহন পর্য্যন্ত ঘটনাবলী আছে। ইহাতেও উত্তরকাণ্ডের কোন কথা নাই।

মহাভারতে রামায়ণী কথাকে পুরাণ ইতিহাস বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। যথা—

"শৃণু রাজন্ যথা বৃত্ত মিতিহাসং পুরাতণম্"। ৩।২৭৩।৬

মহাভারতকার এই প্রাচীন গীত যে প্রাচীন কবি বাল্মীকির রচিত তাহারও উল্লেখ দ্রোণ পর্ব্বে করিয়াছেন।

"অপিচায়ং পুরাগীতঃ শ্লোকো বাল্মীকি না ভুবি।"

মহাভারতের পর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ ঋষি রামকে আত্মজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। ইহা বৈরাগ্য প্রকরণ, মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ—প্রভৃতি ছয়টী প্রকরণে বিভক্ত। ধর্ম্ম উপদেশ ছলে বহু উপাখ্যানও এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে; এই সঙ্গে ইক্ষ্বাকু-মনু সংবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্রন্থখানা রামায়ণ নহে; রাম সম্পর্কীত ধর্ম্ম দর্শন গ্রন্থ। ইহার রচনকাল ও মূল রামায়ণের অনেক পরবর্ত্তী।

এই স্থলে বৌদ্ধ সাহিত্যের কয়েকখানা গ্রন্থের আলোচনা করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক গ্রন্থে রামায়ণ কথার আভাস আছে; তন্মধ্যে "লঙ্কাবতার সূত্র," "দশরথ জাতক," "মহাবিভাষা" প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। লঙ্কাবতার সূত্রে রামের কোন কথা নাই। না থাকিলেও রামের সম সাময়িক বীর লঙ্কাধিপতি রাবণের কথা আছে। রাবণ বৌদ্ধ সাহিত্যে কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ এই গ্রন্থে প্রয়োজন হেতু, এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

'লঙ্কাবতার সূত্রে' রাবণকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং তিনি যে বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের একটী প্রবন্ধ হইতে লঙ্কাবতার সূত্রের বিবরণ গৃহীত হইল।

এক সময় ভগবান বুদ্ধ লঙ্কানগরীর সমুদ্র তীরবর্ত্তী মলয় শিখরে বিহার করিতেছিলেন; লঙ্কাধিপ রাবণ ভগবানের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে লঙ্কার অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে আসিলেন।

রাবণ শুক ও সারণ নামক অমাত্যদ্বয় ও নিজ পরিবার সহ পুষ্পক রথে বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

রাবণ বলিলেন—"এই লঙ্কাপুরী দিব্যরত্নে ভূষিত; ইন্দ্র নীলমণি দ্বারা উদ্ভাষিত। আমরা যক্ষ রক্ষগণ এখানে বাস করিতেছি। কুম্ভকর্ণ প্রমুখ রাক্ষসগণ মহাযান ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। অতএব, হে মুণে, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া জিন পুত্রগণের সহিত গমন করুন। আমি বুদ্ধগণের ও জিন পুত্রগণের আজ্ঞাকারী..."

বুদ্ধদেব রাবণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া জিনপুত্রগণ সহ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় ভগবান জিনপুত্রগণের সহ পূজা গ্রহণ করিয়া "প্রত্যাত্মগতিগোচর ধর্ম্ম" ব্যাখ্যা করিলেন।

দশানন (দশমুণ্ড নহে) বুদ্ধের সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং বুদ্ধ ধর্ম্ম এবং সংঘের আশ্রয় লইলেন।

রাবণ বুদ্ধের নিকট ১০৮টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ সেই প্রশ্ন গুলির উত্তর দিয়াছিলেন। প্রশ্ন গুলির মধ্যে দর্শন বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সকল বিষয়ই ছিল।

বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থকে পরম ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ভগবান বুদ্ধ রাবণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই 'লঙ্কাবতার সূত্র' বিরচিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ৪৪৩, ৫১৩ ও ৭০৪ অব্দে চীন ভাষায় পুনঃ পুনঃ অনুদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মত শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডিত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন। *

এই লঙ্কাবতার সূত্রের আলোচনায় এমন ধারণাও যদি পাঠকের মনে জন্মিয়া থাকে, যে বৌদ্ধযুগের ভারতীয় জনগণও ভারত মহাসাগরের বক্ষস্থিত লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে যে একজন নরপতি ছিল, তাহার কথা জানিত, বা শুনিয়াছিল, তবেই এস্থলে এই পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সার্থক হইল, মনে করিব।

"দশরথ-জাতক" রামায়ণ সম্পর্কীত দ্বিতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ। জাতক গুলি বুদ্ধের মুখে প্রকাশিত—তাহার পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী বলিয়া প্রচারিত। বুদ্ধ যে পূর্ব্ব জন্মে দশরথের পুত্র রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দশরথ জাতকের গল্পটী দ্বারা তাহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। রামায়ণের গল্পের সহিত এই জাতকেরই গল্পের অনেক স্থলেই ঐক্য নাই। গল্পটী নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

বারানসীর রাজা দশরথের ষোল হাজার পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যিনি রাজ মহিষী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল,—দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। তাহাদের নাম ছিল যথাক্রমে—রাম, লক্ষণ ও সীতা। জ্যেষ্ঠ রাম সুপণ্ডিত ছিলেন, সেজন্য লোকে তাঁহাকে রাম পণ্ডিত বলিত।

হটাৎ একদিন রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী পুত্র কন্যাদিগকে মাতৃহীন করিয়া চলিয়া গেলেন; রাজা দুঃখিত অন্তরে তাঁহার অন্তেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া অন্য এক রাণীকে মহিষী মনোনীত করিলেন।

নূতন মহিষী রাজাকে খুব বাধ্য করিলেন। রাজা তাঁহার আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে, রাণী বলিলেন—"যদি আমাকে ভালই বাস, বেশ; আমার বর আমার প্রয়োজন মত চাহিয়া লইব। তখন অস্বীকার করবে না তো?

রাজা বলিলেন—"সে কি হয়? নিশ্চয় দিব।"

কিছু দিন পরে এই মহিষীর পুত্র ভরত একটু বড় হইলে, রাণী রাজার নিকট তাঁহার অঙ্গীকৃত বরটী চাহিলেন।

রাণী বলিলেন—"তুমি যদি আমাকে ভালইবাস, আমার ছেলে ভরতকে রাজা করিয়া দাও।"

রাজা দশরথ শুনিয়া ভয়ানক রাগ করিলেন। কিছুতেই এরূপ বর দেওয়া যাইতে পারে না। আমার উপযুক্ত পুত্র

* মধ্যভারত ১৩০৭।

রাম পণ্ডিত বর্ত্তমান থাকিতে আমি অন্য কাহাকেও রাজা করিতে পারিব না। রাজার মনের অবস্থা বুঝিয়া রাণী সে যাত্রা নীরব হইয়া রহিলেন। কিছু দিন এইরূপে চলিল।

আর একদিন যখনই রাজা রাণীর সহিত ভালবাসা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, অবস্থা বুঝিয়া রাণী তাহার বরটী পুনরায় প্রার্থনা করিল। রাজা এবার কিছুই বলিলেন না; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিলেন—"বিমাতার সংসার, উপায় কি?"

রাজা দৈবজ্ঞ ডাকিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরমায়ু আর মাত্র বার বৎসর। তিনি বিমাতার চক্রান্ত হইতে ছেলে দুটাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে এবং এই বার বৎসর পরে আসিয়া পিতৃ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিতে উপদেশ দিলেন।

পিতৃ উপদেশে রাম লক্ষ্মণ বনে চলিলেন। ভ্রাতাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ভগ্নি সীতাও কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। অবশেষে তিনি ভাতৃদ্বয়ের অনুগমন করিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ পুত্রশোকে কিছু অগ্রেই মরিয়া গেলেন।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া রাণী বলিলেন—"এখন আমার পুত্রই রাজা।"

পাত্রমিত্রগণ বলিলেন—"তাহা কেমন করিয়া হয়; জ্যেষ্ঠাধিকারী বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠের সিংহাসনে অধিকার হইতে পারে না।"

ভরত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি বলিলেন—"তাহাই হইবে, দাদাকেই খুঁজিয়া আনিতে হইবে।"

ভরত পৌরজন লইয়া জ্যেষ্ঠ রাম পণ্ডিতকে আনয়ন করিতে বনে গেলেন। রাম আসিলেন না; তিনি বলিলেন পিতৃ আদেশ—দ্বাদশবর্ষ পরে রাজধানীতে যাইতে; এখনও যে তাহার তিন বৎসর বাকী। তুমি লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া যাও; আমি পিতৃ আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিব না।

ভরত বলিলেন—"আমরা তবে কাহার মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিব?"

রাম বলিলেন "কেন? তোমার।"

ভরত স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাম স্বীয় পাদুকা যুগল দেখাইয়া বলিলেন—"লইয়া যাও, আমার এই পাদুকাদ্বয়।"

ভরত, লক্ষ্মণ, সীতা ও পাদুকাদ্বয় সহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজসিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করিয়া সেই পাদুকার ইঙ্গিতে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিন বৎসর পরে রাম কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া সহোদরা ভগ্নি সীতাকে বিবাহ করিলেন এবং উভয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এইরূপে রাম ষোল হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব গল্পটী শেষ করিয়া বলিলেন—"এই রামই আমি, দশরথ আমার পিতা শুদ্ধোধন, সীতা আমার পত্নী গোপা, আর ভরত আমার শিষ্য আনন্দ।"

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক যুগে রামায়ণ কথা কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা দশরথজাতক পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। জাতকগুলি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে রচিত হইয়াছিল। মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই করা যাইতে পারে যে—যে আকারেই হউক—বৌদ্ধযুগে ঐ সময়ের লোক রামায়ণের ঘটনা জানিতেন।

এই জাতকটী দ্বারা আর একটী ঐতিহাসিকতত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে এই যে, শাক্যদিগের মধ্যে সহোদরা বিবাহ অভিনব ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইত না। *

সীতা হরণের কথা এই জাতকে নাই; থাকিলে বোধ হয় "লঙ্কাবতার সূত্রের" বিবরণ পণ্ড হইয়া যায়।

অযোধ্যার নাম এই জাতকে নাই; তখন বারানসী শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিচিত। অযোধ্যা এই যুগ হইতে সাকেত নামে পরিচিত।

ইহা বুদ্ধদেবের বাণী বলিয়া কথিত হইলেও তাঁহার বহু পরবর্ত্তী শিষ্যগণের রচনা—এই বলিয়াই আমরা কাহাকেও

---

* 'মহাবংশ' লঙ্কা বা সিংহলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস। এই গ্রন্থেও বাঙ্গালার রাজা সিংহবাহু যে তাঁহার সহোদরা ভগিনী সিবলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আছে। এই ভ্রাতার ঔরষে ও ভগ্নীর গর্ভে বিজয় সিংহের জন্ম। বিজয়ের কনিষ্ঠ সুমিত্র। মহাবংশ ভ্রাতা ভগ্নির এই যৌন সম্বন্ধকে অভিনবত্বে বিশ্লেষিত করে নাই। মহাবংশে লঙ্কা, সিংহল ও তাম্রপনী (তম্বপন্নি—পালি) এক দ্বীপ বলা হইয়াছে।

ইহা অবিশ্বাস করিতে বলি না ; বিশ্বাস করিতেও বলি না। ইহার দুই একটী বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি মাত্র।

দশরথ জাতকে বুদ্ধের মুখে রাম লক্ষ্মণকে সহোদর বলা হইয়াছে। রামায়ণে এই সম্পর্ক—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

রামায়ণ যদি কাব্যই হয়, তবে মহাকবি লক্ষ্মণকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা করিয়া এই কাব্যের কি উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন ?

বালকাণ্ডের ১৮শ সর্গটীতে রাম লক্ষ্মণাদির জন্ম বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়টী যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা "রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত রচনা" অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইল। এই সর্গের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া বিচার করিলে রামায়ণে পাওয়া যাইবে—লক্ষ্মণ রামের সহোদর ভ্রাতা, এবং কৈশল্যার আত্মজ। যথা—

লক্ষ্মণের শক্তি-শেলে রাম বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।

তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ। ১৪।৬।০২

পণ্ডিতেরা এইরূপ উক্তিকে যথার্থ প্রয়োগ মনে না করিয়া উপলক্ষণ বলিয়া মনে করেন কেন

অন্যত্র—কদা প্রাণী সহস্রাণি রাজমার্গে মমাত্মজৌ।

লাজৈরবকিরিষ্যন্তি প্রবিশন্তা রিন্দ মৌ॥ ১৩।২।৪২

কৈশল্যার এই উক্তিকেই বা অগ্রাহ্য করি কেন ?

সীতাও যে রামের সহোদরা ভগিনী এইরূপ তর্ককেই বা কুতর্ক বলিবার হেতু কি ?

ঋকবেদে যম ও যমী এই সহোদর ভ্রাতা ভগিনীর যৌনভাবের উল্লেখ আছে ; ইহার পর বৌদ্ধ সাহিত্যের এই উল্লেখ—এই উভয় যুগের মধ্যের অবস্থা বহু পরবর্ত্তী যুগের প্রক্ষিপ্ত কাব্যের উপর নির্ভর না করিয়া চিন্তা করিতে আপত্তি কি ?

বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবিভাষায় রামায়ণের কথা আছে—তাহার আলোচনা পরে করিব।

পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীভাগবত ও বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণে অল্পবিস্তর রামায়ণ সম্পর্কীত কথা আছে।

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে রামায়ণ কথা আছে। মূল রামায়ণের পশ্চাতে যে উত্তরকাণ্ড যোজিত আছে, তাহাতে রামের সহিত কুশীলবের যুদ্ধ নাই। এই পুস্তকে বিকৃত ভাবে তাহা আছে। কৃত্তিবাস পাতাল খণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই লবকুশের যুদ্ধ লিখিয়াছিলেন। পাতাল খণ্ডে রাম সম্পর্কীত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বাল্মীকির রামায়ণেতো নাইই, উত্তরকাণ্ডেও নাই ; কৃত্তিবাস পণ্ডিতও তাহা গ্রহণ করেন নাই।

বিষ্ণুপুরাণ ১ম ভাগের, ৪র্থ অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে সূর্য্য বংশের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

ভাগবত পুরাণের বা শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রামায়ণ কথা আছে। এই পুরাণে ও কুশ-লবের কথা আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে রামোপাখ্যান ও কুশ বংশ বিবরণ আছে।

গরুড়পুরাণের ১৪৭ অধ্যায়ে রামায়ণ কথা বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণের ১৫৪-১৫৭ অধ্যায়ে রাম কথা আছে।

স্কন্দপুরাণের তৃতীয় খণ্ডে রাম চরিত বিবৃত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণের ২৭ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ কথা ও ২৩৮ হইতে ২৪২ অধ্যায়ে রামোক্ত নীতি কথিত হইয়াছে।

বায়ুপুরাণের ৮৮ অধ্যায়ে ইক্ষ্বাকু বংশের বিবরণ আছে।

মৎস্যপুরাণে ১২শ অধ্যায়ে সূর্য্য বংশের কথার সহিত রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির নাম আছে। রামের দুর্গা পূজার কথাও এই পুরাণে আছে। এই পুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে কোন কোন স্থানে দুর্গাপূজাও হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে ও শিব পুরাণের ধর্ম্ম সংহিতা খণ্ডের ৬০-৬২ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশের কথা আছে।

দেবী ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২৮ হইতে ৩০শ এবং ৭ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ-কথা বিবৃত হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের পূর্ব্ব খণ্ডে ১৮শ অধ্যায় হইতে বিস্তৃতভাবে রামায়ণ কথার আলোচনা হইয়াছে। রামের দুর্গাপূজার বিবরণ এই পুরাণে আছে এবং এই পুরাণ অনুসারেও বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলে শারদীয় পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পুরাণের ৩০শ অধ্যায়ে

(পূর্ব্বখণ্ড) "বাল্মীকি কর্ত্তৃক ব্যাসের প্রতি মহাভারত রচনার উপদেশও" আছে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ প্রভৃতি ব্যতীত দেবীপুরাণ, বৃহ নন্দীকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতির বিধান অনুসারেও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে শারদীয় পূজা হইয়া থাকে।

এই পুরাণগুলি মহাভারত রচয়িতা ব্যাসের নামে পরিচিত। ব্যাসদেবের নামে একখানা রামায়ণও প্রচারিত আছে, তাহার নাম অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই অধ্যাত্ম রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলেই আর্য রামায়ণের মত রক্ষিত হয় নাই। যেমন রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস স্থলে এই পুস্তকে বার বৎসরের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অন্তর্গত রামায়ণ কথা; সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত এবং ৪০০০ শ্লোকে রচিত। কলির জীবকে রামায়ণ শুনাইবার জন্য ব্যাসদেব এই প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। রাম-কথা ব্যতীত ইহাতে কর্ম্মকাণ্ড, ভক্তিযোগ, ধর্ম্মনীতি ও রাজ-নীতির আলোচনার সহিত রাম-গীতা নামেও কয়েকটী সর্গ আছে।

অধ্যাত্ম রামায়ণের সহিত অগ্নিবেশ্য রামায়ণ, বোধায়ণ রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণ গুলির নাম ও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। এই সকল গুলিতেই রামায়ণ কথা বিবৃত হইয়াছে।

এগুলির মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণে একটু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উল্লেখ এস্থলে করা হইল—এই জন্য যে এই ক্ষুদ্র রামায়ণ খানাও বাল্মীকির রচনা বলিয়াই প্রচারিত। ইহার বর্ণিত ঘটনাবলীও উত্তরকাণ্ডের ন্যায়। কবি নাকি উত্তরকাণ্ড লিখিয়াও সীতার মহিমা শেষ করিতে পারেন নাই, তাই পরিশিষ্ট স্বরূপ অদ্ভুত উত্তরকাণ্ড নামক এই অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়া সীতার অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী প্রচার করিয়াছেন।

অদ্ভুত রামায়ণ সপ্তবিংশতি সর্গেও—১৩৪১ শ্লোকে রচিত; নিম্নে সংক্ষেপে ইহার পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষের শ্রীমতী নামে পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। নারদ ও পর্ব্বত উভয়েই তাহার পাণি প্রার্থী হন। বিষ্ণুর চক্রে অবশেষে ইহারা নিরাশ হন। ইহাদের ক্রোধে বিষ্ণুর অধোগতি হয়। বিষ্ণু আসিয়া অযোধ্যার দশরথের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। সীতা জন্ম গ্রহণ করিলেন মন্দোদরীর গর্ভে। মন্দোদরী সীতাকে কুরুক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিলে কুরুক্ষেত্র-তীর্থক্ষেত্র-কর্ষণ-যজ্ঞ কালে রাজা জনক তাহাকে প্রাপ্ত হন। অতঃপর রাম সীতার বিবাহ হয়।

ইহার পরের ঘটনা অতি সংক্ষেপে রাম সীতার বনগমন, সীতা হরণ ও রাবণ বধ। এই পুস্তকের আর একটা বিশেষত্ব এই—সীতা হারাইয়া রাম হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ কালে তাহার নিকট আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যযোগ, উপনিষদ ধর্ম্ম (যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গীতা ব্যাখ্যার ন্যায়) ইত্যাদি অনেক ধর্ম্ম কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর অদ্ভুত ঘটনা দশস্কন্ধ রাবণের ভ্রাতা সহস্র স্কন্ধ রাবণ বধের বিবরণ। রাম সীতা বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে এক দিন সীতা সকলের সমক্ষে সহস্র স্কন্ধ রাবণের বিবরণ বলেন। তখন রাম সসৈন্যে সেই সহস্র স্কন্ধ রাবণকে বধার্থ পুস্কর যাত্রা করেন। রাম এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে, সীতা কালিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহস্র স্কন্ধ রাবণকে বধ করেন ও রামকে মুক্ত করিয়া আনয়ন করেন।

বাবুইয়ের বাসা।

(১)

পথে ছুটে' যেতে দেখি পড়ে' আছে বাবুইয়ের বাসা;
কাল রাতে মহা ঝড়ে গাছ থেকে পড়েছে খসিয়া;
হয়তো তখনো ছিল ছোট পাখী বাসাতে বসিয়া!
জানিত না অচিরাৎ বাসা সহ উড়ে' যাবে আশা!
না জানি ভূমিতে পড়ি' কি ভীষণ পাইয়াছে ঠাসা!
আঘাতে হয় তো দেহ একেবারে গিয়াছে পিষিয়া!
ব্যথা-ভরা সুর তার আছে আজো বাতাসে মিশিয়া!
দিকে দিকে শুনি তাই বাবুইয়ের সকরুণ ভাষা!
পাখীর বাসাটি নাশি' প্রকৃতির তামাসাটা একি!
প্রাসাদ উড়াতে নারি' রাগ ঝাড়ে যেথায় সেথায়,
বাবুই পাখীর ওই ছিঁড়ে'-পড়া নীড়খানি দেখি',
তাই আজ কাঁদিতেছে সারা প্রাণ সমবেদনায়।

চারি ক্রোশ দূর থেকে তাই বাসা এনেছি বাসায়;
নিরীহকে পিষে মারে, প্রকৃতিও ঘোর অবিবেকী!

(২)

পুঁজী-পাটা নাহি যার ঘরে যার নাহিরে তণ্ডুল!
অবিচারী প্রকৃতির তার প্রতি একি অত্যাচার।
বিটপীর উচ্চ শাখে বেঁধেছিল কুলায় তাহার,
পাকা ধানে মই দিয়া কারো কাজ করেনি ভণ্ডুল!
তবু ঘোর অত্যাচারে প্রাণ তার হয়েছে আকুল!
চড়ুইয়ের মত সে তো ধারিত না প্রাসাদের ধার!
পরমুখাপেক্ষী নহে, পরগ্রহ কোথা ছিল কার!
তবু ক্রুদ্ধ-সুনির্ম্মিত খাসা বাসা হইল নির্ম্মূল!
জগতে যে সোজা বেশী, তার বোঝা বাড়িছে কেবল;
দুর্ব্বলের প্রতি শুধু সবলের শাসন ভীষণ!
সবাই শক্তের ভক্ত, অশক্তের ক্রন্দন সম্বল!
বিপরীত বিধি শুধু বিশ্ব মাঝে করি বিলোকন!
"বিধাতা" কথার কথা! ভুঞ্জে জীব শুধু কর্ম্মফল!
ভাগ্য সে হাতের মুঠে; স্তব-স্তুতি বৃথা স্বস্ত্যয়ন।

২০শে বৈশাখ, ১৩৩১

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বেগুণ।

এতদ্দেশজাত তরিতরকারীর মধ্যে বেগুণ অতি উপাদেয়। যদিও অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্তই বেগুণের উৎকৃষ্ট সময় তথাপি বারমাসই এদেশে অল্প বিস্তর বেগুণ পাওয়া যায়। বৎসরের কোন সময়ের বেগুণই একেবারে অখাদ্য নয়। শিক্ষিত লোকের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইলে অসময়ের বেগুণেরও স্বাদ এবং আকৃতির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে মনে করি।

বেগুণের গুণ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কতকগুলি ভ্রান্ত সংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন, বেগুণ বিশেষ উপকারীতো নয়ই বরং চুলকনা, পাঁচড়া বা অন্যান্য চর্ম্মরোগের পক্ষে অতি অহিতকর। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিপরীত বর্ণনাই দেখিতে পাই এবং আমাদের চিরন্তন প্রথা তাহার বিপরীত সাক্ষ্যই দিয়া থাকে। এ দেশে বসন্তকালে খোস, পাঁচড়া, চুলকনা, ঘাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আবার সেই সময়ে এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই উচ্ছে, করলা, কাঁচা মুগডাইল ও নিম-বেগুণ খাওয়ার পদ্ধতি রহিয়াছে। যদি বেগুণ রক্ত দুষ্টিকারক হইত তবে সেকালের জ্ঞান বৃদ্ধগণ কখনই নিমের সহিত বেগুণ খাওয়ার বিধান করিতেন না। আমরা দ্রব্যগুণাভিধানে দেখিতে পাই, বেগুন অগ্নিজনক, অরুচি, কাস ও বায়ু নাশক, শুক্র ও শোণিত বৃদ্ধিকারক। কচি বেগুণ কফ ও বায়ু নাশক। বারমেসে বেগুণ রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক এবং ত্রিদোষ নাশক। কেবল পাকা বেগুণ ক্ষারযুক্ত ও পিত্ত বর্দ্ধক। বোধ হয় পাকা বেগুণের অপকারিতার অপবাদই বেগুণ মাত্রের উপর আরোপিত হইয়াছে। যাহা হউক, আশা করি অতঃপর ঝাল, ঝোল, অম্বল, চচ্চড়ি, ভাজা, শুকতা প্রভৃতি বহু প্রকার ব্যঞ্জনে নিত্য ব্যবহার্য্য এই হিতকর এবং সুস্বাদু তরকারীটির বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইয়া ইহার প্রতি গুণগ্রাহী মাত্রেরই একটু কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে। আমরা আরও আশা করি, শিক্ষিত পাঠক মণ্ডলী ইহার চাষে মনোযোগী হইলে ক্রমে ইহার বিশেষ প্রকার উন্নতি সাধিত হইবে।

বেগুণের লাটিন নাম সোলেনাম মেলোঞ্জিনা (Solanam Melongena); ইংরেজী নাম ব্রিঞ্জেল (Brinjal), এগ্ প্ল্যাণ্ট্ (Egg plant), অবারজিন্ (Aubergine)। ইহা সোলেনেসি (Solanacea) পর্য্যায়ভুক্ত।

বেগুণ এদেশেরই অধিবাসী—ভারতবর্ষই ইহার জন্ম স্থান। এদেশে ইহা সাধারণ উদ্ভিজ্জ বলিয়া পরিচিত। বেগুণ যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতেই বেগুণের চাষ ক্রমশঃ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

অতিশয় শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত জগতের প্রায় সকল দেশেই বেগুণের আবাদ করা যাইতে পারে। শীতাধিক্য প্রযুক্ত ইয়োরোপের বহু স্থলেই বেগুণ জন্মান যায় না। তবে আজকাল ইংলণ্ডে এবং আরও কোন কোন স্থলে Hot House বা বাষ্পোত্তাপে উষ্ণ কাঁচগৃহে রকমারি

হিসাবে সখ করিয়া কিছু কিছু রোপন করা হয়। কিন্তু এরূপ অস্বাভাবিক উপায়ে উৎপন্ন বেগুণ আকারে ও স্বাদে অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমেরিকার বহু স্থলেই বেগুণের রীতিমত চাষ হয়। আমেরিকার উদ্যান তত্ত্ববিদ্‌গণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বেগুণের কয়েকটি সঙ্কর জাতিরও সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সুস্বাদু বেগুণ জন্মে আমাদেরই একরূপ ঘরের কোণে—জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত কুরুয়া, দেওয়ানগঞ্জ ও ইছলামপুর প্রভৃতি গ্রামে। আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বেগুণ লেণ্ড্রেথ-ও (Lendreth's thornless large round purple) ময়মনসিংহের বেগুণের নিকট আকারে এবং গুণে পরাজিত। আমেরিকায় কিরূপ হয় জানি না; তথা হইতে আনীত বীজ এদেশে লাগাইয়া আমাদের এই অভিজ্ঞতাই জন্মিয়াছে। কাশী রাজনগরের প্রসিদ্ধ বেগুণ খাইয়াছি; তাহা আকারে মন্দ নয়, কিন্তু স্বাদে জামালপুরের বেগুণ অপেক্ষা অনেক হীন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রূপান্তরিত হইলেও উহা যে এদেশের বেগুণেরই বংশধর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই ময়মনসিংহের বেগুণের তুল্য সুবৃহৎ এবং সুস্বাদু বেগুণ দেখা দূরের কথা, পৃথিবীর আর কুত্রাপি জন্মে বলিয়া শুনা যায় না।

বেগুণের জমি।

সারযুক্ত হাল্‌কা দো-আঁশ মৃত্তিকাই বেগুণ চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। পলি মিশ্রিত চর ভূমিতে বেগুণের ফলনও ভাল হয় এবং আকারেও বৃহৎ হইয়া থাকে। বেগুণ চাষের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমির প্রয়োজন। কারণ বর্ষাকালে যে জমীতে জল দাঁড়ায়, তাহা বেগুণ চাষের অনুপযোগী। নির্বাচিত ভূমির চারিদিক খোলা হওয়া আবশ্যক। অবাধ বায়ু সঞ্চালন এবং দিনে অন্ততঃ ৭।৮ ঘণ্টা সূর্য্যোত্তাপ বেগুণ ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। কাদা-মাটিতে বেগুণ লাগাইলে উহার ফল ছোট হয় বটে, কিন্তু খাইতে অতি সুস্বাদু হইয়া থাকে। যে মৃত্তিকায় বালির ভাগ বেশী থাকে, তাহার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ পলিমাটি মিশাইয়া উহাকে বেগুণ চাষের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। বিল বা বৃহৎ জলাশয়ের তীরবর্ত্তী ভূমিও বেগুণ ক্ষেতের পক্ষে প্রশস্ত।

জমি প্রস্তুত।

বেগুণের জমি নির্ব্বাচিত হইলে প্রথমেই উহাকে অতিরিক্ত জল নিকাশের জন্য একদিকে ঢালু করিয়া জমিটিকে সমতল করিয়া লইতে হয়। তৎপর ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলেই উহা গভীররূপে কোদ্‌লাইয়া রাখিবে। ক্ষেতের ডেলাগুলি শুষ্ক হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া দিবে। ক্ষেতের মাটিতে ঘাসের শিকড়, খোলা, সুড়্‌কি কিম্বা অন্য কোন আবর্জ্জনা যাহা থাকে এই সময়ে তাহা বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

চৈত্রমাসে বেগুণের জমিতে সার দিতে হয়। সার জমির উপরিভাগে ছিটাইয়া দিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই বেগুণ ক্ষেতে কমপক্ষে তিন চারি বার চাষ ও মই দিলেই সার মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়—জমিও প্রস্তুত শেষ হয়। কারণ, বৈশাখ মাসের বৃষ্টিতে সার গলিয়া যায়। তখন তাহাতে চাষ ও মই দিলে উহা মাটির সঙ্গে সহজে মিশ্রিত হয়।

পুরাতন গোবর সারই বেগুণ ক্ষেতের পক্ষে সহজ লভ্য এবং উৎকৃষ্ট সার।

বেগুণের জমী প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই চারা উৎপাদনের 'হাফর' ও প্রস্তুত করিতে হয়। জমির পার্শ্বে বা স্বতন্ত্র কোন সুবিধাজনক স্থানে ৪।৫ হাত চতুষ্কোণ স্থান কোপাইয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে উইমাটি (বল্মীক-মৃত্তিকা) এবং অল্প সার ছড়াইয়া দিবে এবং পুনঃ পুনঃ কোদলাইয়া ডেলাগুলি চূর্ণ করিবে। খোলা, আবর্জ্জনা, সুড়্‌কি, আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিবে। বীজ হইতে চারা উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত এই জমিটুকুকেই 'হাফর' বলে। হাফরের মৃত্তিকায় অধিক সার মিশ্রিত করিলে উৎপাদিত চারা অত্যন্ত লম্বা হইয়া পড়ে; সেই অবস্থায় উহা জমীতে লাগাইলে গাছ ভাল হয় না। চারা মধ্যম আকারের এবং শক্ত হওয়া আবশ্যক।

হাফর প্রস্তুত হইলে বেগুণের বীজগুলি ৬।৭ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপর বপন করিবে; এরূপ করিলে বীজ অল্প সময়ে অঙ্কুরিত হয়। বীজ ভাল হইলে এক আউন্স বা অর্দ্ধছটাক বীজ হইতে প্রায় দুই হাজার চারা উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই দুই হাজার চারার সবল ও সতেজ

রোপনের উপযুক্ত সতেজ এবং সুস্থ হয় না; কতক আবার নানাকারণে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং একবিঘা জমীর জন্য দেড় হইতে দুই আউন্স বীজ হাফরে বপন করিলে যে চারা জন্মিবে, তাহা হইতে নিজের জমীর জন্য চারা রাখিয়া অবশিষ্ট চারা বিক্রয় করিলেও কিছু লাভবান হওয়া যায়। এক বিঘার জমীর জন্য ১৬৮১টি চারার প্রয়োজন ক্ষেত্রের রোপিত চারার মধ্যে নানা কারণে কতক চারা মরিয়া যাইতে পারে কিম্বা পোকায় কাটিয়া ফেলিতে পারে; তজ্জন্য আনুমানিক কতকগুলি চারা হাফরে রাখিয়া তদতিরিক্ত চারা বিক্রয় করাই কর্ত্তব্য।

বীজ অঙ্কুরিত হইতে সাধারণতঃ দুই হইতে তিন সপ্তাহ লাগে। বীজ বপন করিয়া তাহার উপর ২।৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া ধূলার ন্যায় চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা আল্‌গা ভাবে ঢাকিয়া দিয়া তাহার উপর পাতলা ভাবে বিচালী বিছাইয়া দিবে। বীজ বপনের পরদিন হইতে প্রত্যহ বৈকালে এই বিচালীর উপর অল্প অল্প জল ছড়াইয়া দিবে।

পিঁপড়া, উঁই প্রভৃতি বেগুণ-বীজের পরম শত্রু। ইহাদের কবল হইতে বীজ রক্ষা করিতে হইলে হাফরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। হলুদের গুঁড়া, কেরোসিন বা ফিনাইল হাফরের চারিদিকে দিলে ইহাদিগের উৎপাত দমন হয়। কখন কখনও ইহাতেও উহাদের উৎপাত হ্রাস হয় না—তখন উহাদিগকে মারিয়া ফেলাই আবশ্যক হইয়া পড়ে।

হাফর—দিনের বেলায়—বেলা দশটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত প্রখর সূর্য্যকিরণ হইতে চারা রক্ষা করিবার জন্য হাফরের উপর পাতলা খড়ের চালা বাঁধিয়া ছায়া করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে, যথেষ্ট সূর্য্যোত্তাপ না পাইলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। বৈকালে তিনটা হইতে পরদিন সকাল দশটা পর্য্যন্ত হাফর আবরণ হীন রাখিলে আবশ্যক পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ এবং রাত্রির শৈত্য ও আর্দ্রতা বীজগুলিকে সহজে অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। ইহাতে চারাগুলিও সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বলবান হইয়া উঠে। চারাগুলি ৮ হইতে ১২ অঙ্গুলি লম্বা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রখর রৌদ্র এবং অতিবৃষ্টি হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য হাফরের উপরে আবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য। দেড় মাসেই চারাগুলি ক্ষেত্রে রোপণের উপযুক্ত বড় হয়।

খনা বলিয়াছেন—বৎসরের মধ্যে চৈত্র ও বৈশাখ মাস বাদ দিয়া বাকী দশটি মাসেই বেগুন রোপন করিবে। আমাদের দেশের গৃহস্থগণ যাঁহারা সম্বৎসরের তরিতরকারীটা নিজের বাড়ীর 'আনাচে কানাচে' জন্মাইয়া লইবার শুভ-ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে খনার মতই সমীচীন।

বেগুণ বিক্রয় করিবার জন্য বেগুণ ক্ষেত করিতে হইলে আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসেই বেগুণের চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে আষাঢ় মাসই প্রশস্ত কাল। আষাঢ় মাসের চারা ভাদ্র মাসের শেষভাগ হইতেই ফল প্রদান করে এবং ক্রমরোপণের ফলে ভাদ্রমাস হইতে অগ্রাহায়ণ মাস পর্য্যন্ত বেগুণ বিক্রয় করা চলে।

আমাদের ময়মনসিংহে সাধারণতঃ চারিপ্রকার বেগুণের চারা হয়,—'আউসে,' 'আমনে,' 'চৈতে' ও 'বারমেসে'। ইহাদের চারা যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও মাঘ মাসে রোপণ করা হয়। বর্ষার কয়েক মাসেই বেগুণ লাগাইয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া সতর্ক যত্ন লইলে বেগুণের ফলন বেশী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে "চৈতে" বেগুণের চারা রোপণ করিলে চৈত্রমাসে ফসল পাওয়া যায়। এই বেগুণের গাছ ছোট হয়, কিন্তু উপযুক্ত যত্ন লইলে এই গাছের প্রত্যেক ডালে ঝোপা ঝোপা বেগুণ ধরে। ইহাকে এদেশে 'আমঝুড়ি', 'ঝুমকা' এবং কলিকাতা অঞ্চলে 'কুলীবেগুণ' বলে।

আশি হাত দীর্ঘ ও আশি হাত প্রস্থ এক বিঘা জমির ৩ফুট অন্তর গর্ত্ত করিয়া ১৬৮১টি চারা রোপন করা যায়। যাঁহার একখানা মাত্র বেগুণ ক্ষেত, তাঁহার পক্ষে পরবর্ত্তী প্রত্যেক মাসে চারা রোপণের জন্য ঐ গর্ত্ত মাঝে মাঝে কতকগুলি খালি রাখিয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য। অগ্রে গর্ত্তগুলি সার মিশ্রিত মাটী দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে চারা রোপণ করিতে হয়। বসাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকটি চারার মূলে ছাই মাখাইয়া বসাইলে কীটের উপদ্রব কম হয়।

চারা রোপণের পর সেইদিন তাহাতে প্রচুর জল দেওয়া আবশ্যক। পরদিবস সকাল বেলায় কলার খোলার টুকরা দ্বারা চারাগুলিকে ঢাকিয়া দিতে হইবে, নতুবা সূর্য্যোত্তাপে উহারা মরিয়া যাইতে বা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনাবৃত রাখিয়া সমস্ত রাত্রি শৈত্য ও হিম লাগাইতে হইবে। এইরূপ সাত আটদিন যত্ন করিলেই উহা বাঁচিয়া যাইবে। রোপণের পরে বৃষ্টি না হইলে চারাগাছে আবশ্যক মত জল দেওয়া কর্ত্তব্য ; কারণ বেগুনের ক্ষেত সর্ব্বদা সরস থাকিলে উহার ফলও ভাল হয় এবং আস্বাদও মিষ্ট হইয়া থাকে। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ের বেগুণেই অধিক পরিমাণে জল সেচন আবশ্যক হয়।

চারাগুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে সাবধানে গোড়ার মাটি আল্‌গা করিয়া দুই সারির মধ্যস্থান হইতে মাটি তুলিয়া চারার গোড়া এক বা দুই ইঞ্চি পরিমাণ ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। এবং রোপণের পর চারাগুলি একহাত বড় হইলেই উহার মূলডালা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। ইহাতে বেগুণ গাছ বলবান ও ঝাড়ালো হয়। তৎপর মাঝে মাঝে আবশ্যক মত আগাছা নিড়াইয়া দিলেই চলে।

বেগুণ গাছে ফল ধরিলেই তাহার গোড়ায় তরল সার * ব্যবহার করিলে বেগুণ আকারে বৃহৎ ও উহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ব্যবহার করিলে গাছ সতেজ হয় বটে, কিন্তু ফল ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিপীলিকা বেগুন-বীজের পরম শত্রু ; উহারা বেগুণ গাছেরও কম শত্রু নয়। অনেক সময় গাছের অতিশয় কোমলাংশ ভক্ষণ করিয়া ইহারা গাছটিকে নির্জীব করিয়া অবশেষে ধ্বংস সাধন করে। গাছ আক্রান্ত হইলে যেরূপেই হউক ইহাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন বিশেষ প্রকার কীট ও শোলাপোকা দ্বারাও বেগুণ গাছ মাঝে মাঝে আক্রান্ত হয় এরূপ হইলে গাছের উপরে ছাই বা হরিদ্রা গোলা ছিটাইয়া দিলে ফল পাওয়া যায়। গন্ধকের ধূম লাগাইলেও কীটের উপদ্রব নিবারিত হয়। কোনরূপ কীটদ্বারা কোন গাছের সকল অংশ আক্রান্ত হইলে গাছটিকে সমূলে উৎপাটন করিয়া পোড়াইয়া ফেলান কর্ত্তব্য। বেগুণ গাছেও মাঝে মাঝে 'ছাতা' (fungus) রোগ দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী আলু শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা এই রোগের পরিচয় দিয়াছি। 'ছাতা' রোগ সংক্রামক ; সুতরাং এই রোগাক্রান্ত গাছটিও সমূলে তুলিয়া নষ্ট করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অন্যান্য গাছের ন্যায় বেগুণ গাছেও অতিরিক্ত সার দিলে গাছের পাতা এবং ডালপালা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিক তেজস্বী গাছে ফল কম হয়। সেরূপ হইলে, গাছে ১০।১২টি সতেজ ডালপালা রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ধারাল ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং ক্ষতস্থানে টাট্‌কা গোবরের সহিত এঁটেল মাটি মিশাইয়া লেপ দিতে হইবে। এরূপ করিলে বেগুণ গাছ অধিক লম্বা না হইয়া মধ্যমাকৃতি এবং ঝাড়াল হয়। এই উপায়ে বেগুণ সুন্দর এবং আকারে বড় হইয়া থাকে।

বেগুণের আকর এবং ওজন বৃদ্ধি করিতে হইলে বেগুণ ফল ধরিবার পর গাছের প্রত্যেক ডালে একটি করিয়া সুস্থ ও বড় ফল রাখিয়া অবশিষ্ট সকল ফল ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহাতে ২।৩ সের ওজনের বেগুণ হইতে পারে বটে, কিন্তু একটি সুস্থ গাছেও ১০।১২টির অধিক ফল পাওয়া যায় না।

আমরা নিম্নে এদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন জাতীয় কয়েক প্রকার বেগুণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটী তালিকা দিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন, ইহার সকল প্রকার বেগুণের চাষই আমাদের দেশে হইতে পারে।

দেশীয় বেগুণ।

১। **'কুরুয়া'**—জামালপুরের অন্তর্গত কুরুয়া গ্রাম ইহার জন্মভূমি। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বেগুণ এবং দৃশ্যে ও স্বাদে উৎকৃষ্ট।

২। **জামালপুরী গোল বেগুণ**—এই বেগুণকে সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোক্ত বেগুণেরই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। এই বেগুণের কোন কোন জাতির গাছে ও পাতায় কাঁটা থাকে। ওজন একপোয়া হইতে একসের।

৩। **জামালপুরী সবুজ বেগুণ**—গোলাকার এবং সবুজ রং বিশিষ্ট ; ফলের নিম্নভাগ

* একভাগ টাট্‌কা গোবর অথবা ছাগল বা ভেড়ার বিষ্ঠা দশভাগ জলে গুলিয়া ঐ মিশ্রিত জল স্থির হইলে উপর হইতে কেবল জলটা ঢালিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। হাঁস বা কবুতরের বিষ্ঠায়ও তরল সার প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু তাহাতে জলের পরিমাণ বেশী দিতে হয়। একভাগ হাঁস বা কবুতরের বিষ্ঠায় পনের ভাগ জলে গুলিতে হয়। কারণ এই বিষ্ঠা বেশী তেজস্কর।

শ্বেতাভ। ওজন এক পোয়ার অধিক হয় না। গাছ লম্বা হয় এবং গাছে ও পাতায় কাঁটা হয়। আস্বাদ পূর্ব্বোক্ত দুই জাতির ন্যায় সুমিষ্ট নহে।

শিঙ্গা বেগুন—এই বেগুণের বেগুণী এবং সবুজ, এই দুই প্রকার রং বিশিষ্ট দুইটি জাতি আছে। গাছ ৪।৫ ফিট্ উচ্চ হয়। ফলের অগ্রভাগ শৃঙ্গবৎ বক্র; ওজন কম বেশ একপোয়া। গাছে ও পাতায় কাঁটা আছে।

৫। লম্বা বেগুণ—ইহা ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা, শসার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। এই বেগুণও বেগুণী এবং সবুজ দুই জাতীয়। গাছে ও পাতায় কাঁটা।

৬। পাটনা—ইহা লম্বা এবং গোলাকার দুই রকমের হয়। ফল বেশ বড় এবং বেগুণী রংঙ্গের। এই সুস্বাদু বেগুণের নিম্নলিখিত কয়েকটি জাতি আছে।:—

(১) মাণিক—কাল এবং গোল, ওজন একপোয়া। (২) গোরভণ্ট—ফল ক্ষুদ্র এবং কাল। (৩) বারমাসিয়া—কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার, বারমাস ফলে (৪) বালারিতি—ফল শ্বেতবর্ণ ও বর্ত্তুলাকার। (৫) ভাটীন—ফল বর্ত্তুলকার। গাছে ও পাতায় কাঁটা আছে।

৭। কুলী বেগুণ—সাদা এবং কাল ক্ষুদ্র বেগুণ, ডিম্বের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। গাছ ছোট, গাছেও পাতায় কাঁটা আছে। ইহার গাছ দুই বৎসর জীবিত থাকে। বেগুণের আস্বাদ ভাল নয়।

৮। গৌরী কাজল—ফল গোলাকার মধ্যাকৃতি শ্বেত ও কাজলের রংয়ের সমাবেশে দেখিতে সুন্দর, খাইতেও মিষ্ট। গাছ তিন হইতে চার ফুট লম্বা হয়।

৯। রামঝুমকী—বারমাস ফলে এবং ৫।৭ বৎসর জীবিত থাকে। ছোট ছোট পাতায় অসংখ্য কাঁটা হয়। ফল ফিকে বেগুণী রং বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র। ইহার কয়েকটি গাছ গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিলে তাঁহাকে আর দৈনিক বেগুণ কিনিতে হয় না। ফল সুস্বাদু।

১০। মুক্তকেশী বৃহৎ কাল রংয়ের লম্বা বেগুণ। ইহা 'আউস' বেগুণ। বেগুণী রং বিশিষ্ট ইহার আর একটি জাতি আছে। আস্বাদ মন্দ নয়।

১১ মাকড়া—ফল বৃহৎ ও গোলাকার এবং শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট। আস্বাদ ভাল নয়।

বিদেশীয় বেগুণ।

১২। লেণ্ডেথের কাঁটাহীন বেগুণ—ইহা বৃহৎ, গোলাকার এবং গাঢ় বেগুণী রং বিশিষ্ট। গাছ খুব বড় হয়। চারিমাসে ইহার ফল হইয়া থাকে। জন্মস্থান আমেরিকা।

১৩। নিউইয়র্ক ইম্প্রুভড্—বেগুণী রং বিশিষ্ট বৃহৎ গোল বেগুণ। জন্মস্থান আমেরিকা।

১৪। স্কারলেট্—ইউরোপীয় বেগুণ। গাঢ় লাল রংয়ের সুদৃশ্য এবং অখাদ্য ও ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট।

১৫। ব্ল্যাক্ বিউটি—আমেরিকা জাত বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ বেগুণ।

১৬। হোয়াইট্—ইউরোপীয় ক্ষুদ্র সাদা বেগুণ। অখাদ্য।

১৭। লব্ হোয়াইট্ চায়না—লম্বা ও সাদা চীন দেশীয় বেগুণ।

১৮। লং হোয়াইট্—ইউরোপীয় সাদা বেগুণ। খাইতে মন্দ নয়।

১৯। লার্জ্জ রাউণ্ড ব্ল্যাক্—কণ্টকহীন, কৃষ্ণবর্ণ, বৃহৎ ও সুস্বাদু। আমেরিকা জাত বেগুণ।

২০। আর্লি লং পার্প্‌ল্—আমেরিকা জন্ম স্থান। সর্ব্বত্র জন্মে। ফল গাঢ় বেগুণী ও লম্বা।

২১। আর্লি পার্প্‌ল্—ইউরোপ জাত বেগুণী রং বিশিষ্ট। সুখাদ্য নহে।

২২। নিউ ইয়র্ক্ পার্প্‌ল্—আমেরিকা জাত বেগুণী রংয়ের বেগুণ। তত সুখাদ্য নহে।

২৩। জায়েণ্ট্ ইম্প্রুভড্ হোয়াইট্—জন্ম স্থান আমেরিকা। ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের বৃহৎ বেগুণ।

২৪। ফর্‌টুকু সাইনলেস্ ইম্প্রুভড্ নিউ ইয়র্ক—আমেরিকা জাত কণ্টকহীন বৃহৎ বেগুণ। খাইতে অতি সুস্বাদু।

২৫। বুষ্টো বেগুণ—বেগুণী রংয়ের বৃহৎ কণ্টকহীন বেগুণ। ইহাও আমেরিকা জাত। খাইতে সুমিষ্ট।

২৬। নিউ জার্সি ইম্প্রুভড্ লার্জ্জ পার্প্‌ল্—আমেরিকার নিউ জার্সি ইহার জন্ম স্থান। কণ্টকহীন সুস্বাদু বেগুণ। ফল বৃহৎ এবং বেগুণী বর্ণ বিশিষ্ট।

বীজের জন্য গাছের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুগঠন এবং সুস্থ বেগুণ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। বীজের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেগুণ পাকিলে উহা গাছ হইতে ছিঁড়িয়া বীজ বাহির করিতে হয়। তৎপর ঐ বীজ ধুইয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। বীজ শিশিতে ছিপি আঁটিয়া রাখিতে হইবে যেন তাহাতে বায়ু প্রবেশ না করিতে পারে। যদি বীজের পরিমাণের তুলনায় শিশি বড় হয়, তবে পরিষ্কার তুলা দ্বারা শিশির শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

বিশ্ব জননী।

আজ, মেঘের আঁচল দুলায়ে মৃদুল পবনে,
জননী মোদের এসেছে অরুণ-বরণী!
বিহগ বিহগী ঘোষিল গগনে গগনে,
আগমনী মা'র ধ্বনিয়া নিখিল অবনী!

ওই চপল আলোতে খচিত চকিত আকাশে,
অমল ধবল বদন-কমল বিকাশে;
অধর-প্রান্তে শুভ্র রুচির কি হাসে,
হাসিছে দিবস রজনী!

আজ, আলোকে পুলকে প্লাবিয়া দ্যুলোক ভূলোকে,
অমৃত ধারায় বিশ্ব ভাসায়ে দিল কে!
নিখিল হৃদয়ে বিলায়ে বিমল মাধুরী,
এসেছে মোদের জননী!

শ্রী—

জল।

"সুলতানি, পানি, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

রমজান চৈত্রমাসের প্রখর রৌদ্রে অনেকক্ষণ মাঠে চাষের কাজ করিয়া তৃষ্ণার্থ হইয়া বাড়ী ফিরিল। সে ঘরে প্রবেশ না করিয়া পিপাসার তাড়নায় বাহির হইতেই কন্যা সুলতানীর নিকট জল চাহিল। সুলতানী যেন পিতার রুক্ষ কণ্ঠস্বর শুনিয়া একটু ভীত হইল। সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল,—"বাবা ঘরেতো পানি নেই।"

উত্তর শুনিয়া রমজান ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল; কি বলিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। পরে রাগ একটু সামলাইয়া বলিল,—"বলিস্ কি? তেষ্টায় যে বুকের ছাতি ফেটে গেল। কেন? এতক্ষণ কি করেছিস্?"

রমজানের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সুলতানী ভয়ে আড়ষ্ট হইল। কেন যে এক বিন্দু জলও ঘরে নাই, সে কথাটা সুলতানী তখন আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর রমজান সুলতানীকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "সুলতানি, সাড়া দিস্ না কেন। কি হয়েছে? পানি না থাকেত আমায় ভাত দিস্..."

সুলতানী তখনও নিরুত্তর। সে কি বলিবে? যাহা করে নাই, তাহার জন্য এখন আর ভাবিয়া কি করিবে। এ দিকে সে ভয়ে উত্তর করিতে পারিতেছিল না। তাহার পিতার রুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে সে তাহার নিজের সবল অপারগতাকেই যেন অপরাধ বলিয়া মনে করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল শেষে সে অনন্যোপায় হইয়া করুণ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"বাবা, ঘরে যে কিছুই নেই, কোখেকে তোমায় ভাত।"

রমজান আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ক্রোধ ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিল। সে সজোরে সুলতানীর গালে চপেটাঘাত করিল। রোগজীর্ণ সুলতানীর শুষ্ক দেহ এই নিদারুণ আঘাতের বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

সুলতানী মাটির উপর মূর্চ্ছিত প্রায় পড়িয়াছে, দেখিয়া রমজান আর বিশেষ কিছু বলিল না। সে ক্রোধে খস্ খস্ করিতে করিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কলসীর তলায় পানীয় জল কিছু আছে কিনা অনুসন্ধান করিল এবং সেগুলি একেবারে শূন্য দেখিয়া জলের আশায় প্রতিবেশীর বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে রমজান জলপান করিয়া প্রতিবেশীর নিকট শুনিল, রমজান চাষের কাজে যাইতে না যাইতেই ম্যালেরিয়ার সহিত সুলতানীর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। সে সংগ্রাম নূতন নহে, বহুদিন হইতেই তাহার সহিত যুদ্ধ

ম্যালেরিয়ার এইরূপ সংঘর্ষ চলিতেছিল। ইহার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; কখনও একদিন কখনও বা তিন চারি দিন অন্তর ম্যালেরিয়া সুলতানীর ঘাড়ে চাপিয়া বসে। যেদিন জ্বরে প্রবল আক্রমণ হয় সেদিন সুলতানী ঘরকন্নার কাজ রীতিমত করিয়া উঠিতে পারে না। এই ম্যালেরিয়ার দরুণই সুলতানী আজ পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বিলে যাইয়া জল তুলিয়া আনিতে পারে নাই।

ঘরে যে চাউল নাই, সে কথাও যখন রমজান পান্তা খাইয়া বাহির হইয়া যায়, তখন বলিতে পারে নাই।

এই মাত্র জ্বরের বিরাম হওয়ায় সুলতানী একটু উঠিয়া বসিয়াছে; আর তার একটু পরেই রমজান আসিয়া জল চাহিল। রমজান ভাবিয়াছিল, অন্যদিন চাষের কাজে চলিয়া গেলে সুলতানী যেমন ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করে,—শাকা৷ যাহা কছু পারে, তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে, প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে যাইয়া বিল হইতে জল তুলিয়া আনে, আজও ঠিক সেইরূপেই সুলতানী গৃহস্থালীর সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কারণ রমজানের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর হইতেই সুলতানী প্রত্যহ এইরূপে ঘরকন্নার কাজ করিয়া আসিতেছে।

বলা বাহুল্য, কন্যা সুলতানী ব্যতীত রমজানের সংসারে আর কেহই ছিল না।

এতক্ষণে রমজান বুঝিল, মাতৃহীনা সুলতানীর প্রতি সে বড়ই নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছে। রমজান কন্যার প্রতি এই নৃশংস আচরণের কথা যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার মনে অনুতাপের মাত্রা ততই ঘনীভূত হইতে লাগিল। অতীতের বহু দুঃখময় স্মৃতি তাহার প্রাণে ঘা দিতে সুরু করিল। সুলতানীর মা মৃত্যুকালে রমজানকে বলিয়াছিল, "আমার মরণ হ'ল, না খেয়ে, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার সুলতানী যাতে করে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়, তাই করো।"

রমজান ভাবিয়া দেখিল, আজ সে স্ত্রীর মরণকালের কাতর অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। অভাগিনী সুলতানী বাস্তবিকই অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। আজ রমজান নিজে একবার আহার করিয়াছে কিন্তু সুলতানী এখনও কিছুই খায় নাই। কারণ সে প্রত্যহ ম্যালেরিয়ার আগমন প্রতীক্ষায় শরীরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটু বেশী বেলা না হইলে আহার করেন আজ আহারের পূর্ব্বেই ম্যালেরিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল। সুতরাং তাহার আহার করিবার আর অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার উপর ঘরে চাউলও নাই। কাজেই স্ত্রীর মর্ম্মভেদী অনুরোধ আজ বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। অতীতের সেই দুঃখবিজরিত স্মৃতি যেন রমজানকে পাগল করিয়া তুলিল। রমজান কতক্ষণ নীরবে বসিয়া ভা'বল। তারপর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "আজ হ'তে সুলতানী যাতে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়, তাই করব। সুলতানী, বলে ঘরে চাল নেই; যাই, দেখি কিছু চাল সংগ্রহ করা যায় কিনা।"

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া রিক্তহস্ত রমজান ধারে চাউল সংগ্রহ করিবার জন্য এপাড়া সেপাড়া ঘু'রল; কিন্তু চাউল মিলিল না। নিরুপায় রমজান অবশেষে কোন প্রতিবেশীর নিকট হইতে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এক আনার পয়সা ধার করিল এবং তদ্দ্বারা তিন মাইল দূরবর্ত্তী বাজারে চাউল ক্রয় করিতে গেল। কারণ এই বাজারই তাহাদের গ্রাম হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী।

(২)

চৈত্র মাস। বৃষ্টি নাই। গ্রামের দীঘি পুষ্করিণী সব জলশূন্য। এমন কি গভীর কূপ খনন করিলেও পানীয় জল পাওয়া যায় না। জলের এমনি অভাব। রমজানের গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে মাঠের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিল। ভূমিকম্পের কৃপায় সেই বিলের মাঝখানটা একটু গভীর হইয়া যাওয়ায় সেখানে কিছু জল আছে। ইহার চারিদিক জলজ আগাছায় পরিপূর্ণ। কোথাও আগাছা পচিয়া বিকট দুর্গন্ধ হইয়াছে। ইহার সকলদিকেই আগাছার নীচে ভয়ঙ্কর কাদা। কাদার মধ্যে পা ফেলিলেই উরু পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকিয়া যায়। একবার কাদার অন্তঃস্থলে পদযুগল প্রবেশ করিলে টানিয়া বাহির করা নেহাত সোজা নহে। এই আটাল কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়াই বিলের মাঝে পৌঁছিতে হয়। সেখানে জলের বর্ণ মসি কৃষ্ণ। যেন কালির সঙ্গে জল মিশাইয়া মন্থন করিয়া ঘোল তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে। স্থান একটু গভীর বলিয়া কলসী ডুবাইয়া নেকরা দ্বারা ছাকিয়া জল

তুলিতে সুবিধা হয়; সেই জন্ত জলাভাবে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের লোক এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই বিল হইতে জল নিতে আইসে।

সুলতানী ইতিমধ্যে সুস্থ হইয়া কলসী কক্ষে অতি ধীরে ধীরে কোন প্রকারে রোগ জীর্ণ দেহের ভার বহন করিয়া সেই বিল হইতে জল আনিতে চলিল। জল না আনিয়া উপায় নাই, কেন না রান্নাতো করিতে হইবে। চাউল লইয়া হয়ত ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত পিতা এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে। এসব কথা মনে মনে চিন্তা করিয়াই সুলতানী এই দুর্ব্বল দেহে এতদূর হইতে জল তুলিয়া আনিতে সাহসী হইয়াছে।

অন্তদিন সুলতানী প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে জল তুলিতে যায়। অসময় হওয়ায় আজ তাহার সঙ্গিনী জুটিল না। সে মাঠের মধ্য দিয়া মৃদু মন্দ পদক্ষেপে একাকিনী পথ চলিতে লাগিল। আজ যেন তাহার পথ ফুরায় না।

পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে সুখ দুঃখের কত স্মৃতি জাগিতেছে। চির দুঃখিনী মার সঙ্গে গ্রীষ্মে রৌদ্রে পুড়িয়া, বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া কুঁড়ে ঘরে বাস; দারুণ শীতে সকলে একখানা ছেঁড়া কাঁথার তলে কাঁপিয়া রাত্রি কাটান; অনাহারে মার মৃত্যু, ম্যালেরিয়ায় ছোট ভাইটির অকাল মৃত্যু,—ইত্যাদি আরও কতশত অতীতের দুঃখময় স্মৃতির বোঝা হৃদয়ে বহন করিয়া—সুলতানী বিলের দিকে চলিল।

একেতো রমজান মাঠে চাষের কাজ করিয়া পূর্ব্বেই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, তার উপর আবার বাজার পর্য্যন্ত এই তিন মাইল পথ তাড়াতাড়ি পরিভ্রমণ। কাজেই রমজান বাজারে পৌছিয়াই একটু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তথাপি সুলতানীর কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া, চাউলের দোকানে মাত্র এক ছিলিম তামাক খাইয়া দ্রুতপদে চাউল লইয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইল। পথে সে ভাবিল—নিশ্চয় সুলতানী ইতিমধ্যে সুস্থ হইয়াছে। হয়ত, সুলতানী জল তুলিয়া রান্নার জন্ত সমস্ত প্রস্তুত করিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে। আর যদি সুলতানী, তাহার দুর্ব্যবহারের জন্ত দুঃখিত হইয়া বা রাগ করিয়া একান্তই রান্না করিতে না চায়, —ছেলে মানুষতো—তবে সে নিজেই রান্না করিয়া সুলতানীর পাশে বসিয়া সুলতানীকে খাওয়াইবে। তারপর সে নিজে আহার করিবে। তাহা হইলেই সুলতানী খুসী হইবে, তাহার মনের ময়লা কাটিয়া যাইবে।

রমজান এই আশায় বুক বাঁধিয়া যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে ইতস্ততঃ তাকাইয়া দেখিল, গৃহে কেহ নাই; গৃহশূন্য, দ্বার রুদ্ধ। রমজান আকুল প্রাণে ডাকিল, "সুলতানি, সুলতানি।" কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। সে আবার স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ডাকিল "সুলতানি সুলতানি, মা আমার, তুমি কি আমার সঙ্গে রাগ ক'রেছ? আমি যে চা'ল নিয়ে এসেছি! রান্না ক'রে তোমায় খাওয়াব।" এবারও সাড়াশব্দ নাই।

রমজান দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চাউলগুলি একটা মাটির ভাণ্ডে রাখিয়া দিল; তারপর চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া সুলতানীর অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সুলতানীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রমজানের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বেশী করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত লাগিল এই জন্য যে—সে তাহাকে বিনা অপরাধে মারিয়াছে। পরে হঠাৎ চোখে পড়িল, একটা জলের কলসী ঘরে নাই। তখন রমজানের বুঝিতে বাকী রহিল না, যে সুলতানী জলের জন্য বিলে গিয়াছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া রমজান আশ্বস্তচিত্তে তাহার সংগৃহীত তামাকটুকু কলিকায় পুরিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে বসিয়া গেল।

সে অন্য বাড়ী হইতে আগুন আনিয়া তামাক খাইল; বিশ্রাম করিল; তথাপি সুলতানী আসিতেছেনা দেখিয়া তাহার মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আর গৃহে বসিয়া থাকিতে পারিল না। প্রতিবেশীদের বাড়ী যাইয়া সুলতানী কাহার সঙ্গে গিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না। বলিতে না পারিবার কারণও ছিল; সুলতানী যখন বিলের ঘাটে জল আনিতে যায়, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। সে সময়ে গ্রামের লোক রৌদ্রভয়ে আপন কুঁড়েঘরে বিশ্রাম-সুখে রত ছিল।

প্রতিবেশীদের নিকট সুলতানীর কোন সংবাদ না পাইয়া রমজান আরও চিন্তিত হইয়া পড়িল। রোগা দুর্ব্বল মেয়ে, এতদূর একাকিনী জল আনিতে গিয়াছে, এখনও ফিরিল না—এগুলি চিন্তার কথা বটে। রমজানের মনে আরও কত আশঙ্কার উদয় হইল—বিলের পথে সহসা ম্যালেরিয়ায়

আক্রান্ত হইয়া সুলতানী কোথাও পড়িয়া রহে নাই তো? এ সব চিন্তায় রমজানের চিত্ত চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি পাইল। সে আর নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিল না। আকুল প্রাণে সুলতানীর অনুসন্ধানে বিলের দিকে ছুটিয়া চলিল। মাঠের পথে কিছু দূর যাইয়াই, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত রমজান আকুল নয়নে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল, সুলতানী আসে কিনা। এমনি ভাবে পথের চারি পাশে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমজান পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু পথে কোথাও সুলতানীকে সে দেখিতে পাইল না।

সকলে যে ঘাট হইতে জল আনে সুলতানী সেই দূরবর্ত্তী ঘাটে যায় নাই। সে ঘাট দূর হইলেও বহু লোকের যাতায়াতের দরুণ তথায় কাদা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু সেস্থানেও জলে অনেক দূরে না নামিলে কলসী জলে ডুবাইয়া পূর্ণ করা যায় না। সুলতানী এত দূরে যাইলে দেড়ি হইবে মনে করিয়া নিকটে এক নূতন পথে সহজে জল তুলিতে গিয়াছিল। সেখানে তাহার পা কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া যাওয়ায় দুর্ব্বল বালিকা আর কিছুতেই জলপূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া উঠিতে পারিল না। এ অবস্থায় কর্দ্দমে অনেকক্ষণ থাকায় তাহার শরীর অবশ হইয়া পড়িল। পরে সংজ্ঞা হারাইয়া কাদার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

রমজান বিলের পাড়ে দাঁড়াইয়া প্রথমে মেয়েকে দেখিতে পাইল না। তারপর অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল;—তখন সে দেখিল, তাহারই সুলতানী যেন তাহার নির্দ্দয় ব্যবহারের উপর অভিমান করিয়া সেই সিক্ত ভূমির উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে।

রমজান উন্মাদের ন্যায় দৌড়াইয়া গিয়া তাহার প্রাণের প্রাণ সুলতানীর মূর্চ্ছিত দেহ কাদা হইতে টানিয়া বক্ষে তুলিয়া লইল। তাহার বাঁধন হারা অশ্রুরাশি সুলতানীর মূর্চ্ছা মলিন মুখখানি সিক্ত করিয়া দিল। কন্যার এই শোচনীয় অবস্থা যে কেবল পিতার অবিবেচনার ফলেই ঘটিয়াছে তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া পিতৃহৃদয় বিরাট হাহাকারে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

খোদার'পরে খোদ্‌কারী।

ওগো আমার সাত পুরুষের
স্থাপন করা বিগ্রহ!
তোমায় ছুঁলে কেন আমার
এত খানি নিগ্রহ?

ইচ্ছে করে সাজাই তোমায়
তুলসী মেখে চন্দনে;
মন্দিরেতে মগ্ন থাকি
ভোগ আরতি বন্দনে।

পরশ যদি করি ভুলে,
অগ্নি চাহ অভিষেক!
পতিত পাবন হয়ে তুমি
এমন ধারা অবিবেক?

মাইনে করা মূর্খ বামুন,
নিষ্ঠা নাহি অন্তরে;
করছে তোমার নিত্য-পূজা
বেজায় ঝুট মন্তরে!

বামুন বাড়ী 'ভাত বেন্নুনে
তাদের পাকেই ভোগ সয়ে।
আমার বাড়ী 'চাল কলা' ভোগ,
প্রসাদ পেলেই রোগ ধরে!

এম্নি পাকা জেতের বিচার,
তবু তোমার নিগ্রহ;
বামুন নাহি প্রণাম করে
বাজে জাতের বিগ্রহ!

সমাজ নিয়ে করুক তারা
পরের ধনে পোদ্দারী!
ভগবানের জাতের বিচার?
খোদার'পরে খোদ্‌কারী?

শূদ্রক।

স্নেহের দান।

তৃতীয় খণ্ড।

১

কলিকাতা আসিয়া মাখন ও মণি একখানা পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিল।

রাজধানীর কোলাহল মণিকে শান্তি দিতে পারিতে ছিল না।

মণির মনের অবস্থা বুঝিয়া মাখন বলিল—পরীক্ষাটা শেষ হইয়া যাউক, তারপর একটা নূতন ব্যবস্থা করা যাইবে। তোমার গ্রীন বোটটা আনাইয়া একবার পল্লি গ্রামের দৃশ্য দেখা যাইবে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থান গুলির অবস্থা দেখিয়া আসিব; আমার জ্যেঠা মহাশয়েরও অনুসন্ধান করিব। এখন কয়েক দিন বিকালে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা শুনিয়া আইস।"

মণি মাখনের এই প্রস্তাবে সায় দিয়া চলিল।

ব্রহ্ম সমাজের বক্তৃতা মণির বেশ উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে মাখনের পরীক্ষাও শেষ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে মাখন মাসীমা বা কনকের কোন চিঠি পায় নাই; সেও পঁহুছতত্ব ব্যতীত আর কোনও পত্র লেখে নাই।

পূর্ব্ব আয়োজন মত গোয়ালন্দে আসিয়া গ্রীনবোট অপেক্ষা করিতেছিল। পরীক্ষা শেষ হইলে তাহারা কলিকাতার বাসা উঠাইয়া দিয়া জল ভ্রমণে যাত্রা করিল। সঙ্গে রহিল তাহাদের একমাত্র ভৃত্য কটকী ব্রাহ্মণ যুবক মাধবী। মাধবী ঠাকুর-চাকর উভয়ের কার্য্যই সমাধানে তৎপর।

গ্রীনবোট পদ্মা বাহিয়া মধুমতীতে পড়িল। দুই দিন মধুমতীতে চলিয়া বোট মধুমতীর একটী ক্ষুদ্র শাখায় প্রবেশ করিল। এই স্থান হইতেই তাহারা যেন গ্রাম্য প্রকৃতির মধুর আহ্বান অনুভব করিতে লাগিল।

ভাদ্রের উচ্ছল তরঙ্গে পদ্মা ও মধুমতীর ভীষণ অশান্ত ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। যে নিজে অশান্ত, সে পরকে শান্তি বা সান্ত্বনা দান করিতে পারে না। পদ্মা বা মধুমতীর অশান্ত প্রকৃতিও সেই জন্য এই উভয় যুবকের মনে শান্তি প্রদান করিতে পারে নাই। ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সলকা আজ উভয়ের মনেই সান্ত্বনা প্রদান করিল।

গ্রাম্য নদী সলকাও তখন কূলে কূলে বর্ষার প্লাবন লইয়া চলিয়া ছিল। তাহার দুই তীরে বনরাজী দুই দিক হইতে যেন আসিয়া স্কন্ধ মিলাইয়া সলকার গতি পথকে কুঞ্জ পথে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপ ছায়া শীতল কুঞ্জ পথে জল ভ্রমণ করিতে পারিয়া মণির মনে শান্তি আসিয়াছিল। সে সারাদিন মুগ্ধনেত্রে এই শান্তিময় প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিয়া কাটাইল।

কিন্তু এই বন-প্রকৃতিও তাহাদিগের মনে অবিচ্ছিন্ন শান্তি দান করিতে পারিল না। ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেশকে অস্থি-কঙ্কালময় করিয়া ফেলিয়াছিল।

পর দিন প্রাতে উঠিয়া মণি এমনি এক দৃশ্য দেখিল যাহাতে সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

অপ্রশস্ত নদীর দুইতীর হইতে কঙ্কালসার অর্দ্ধ উলঙ্গ মনুষ্য গুলি যেন শ্মশানের ভূত প্রেতের মত সর্ব্ব-গ্রাসী বদন ব্যাদন করিয়া আসিয়া তাহাদের বোট গিলিয়া খাইতে চাহিল।

ঠিক এই দৃশ্যই মণি একাদশীর রাত্রে, স্বামীজীকে রূপগঞ্জে রাখিয়া আসিয়া -স্বপ্নে দেখিয়াছিল।

মণি সেই স্বপ্নের দৃশ্যটী এখানে প্রত্যক্ষ দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—'কে বলিবে স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র?'

গ্রীনবোট দেখিয়া উভয় তীর হইতেই অগণিত কঙ্কাল-সার ও শত গ্রন্থিযুক্ত অর্দ্ধ উলঙ্গ পল্লিবাসী নৌকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়া ছিল; যেদিক দিয়া সুবিধা হইতে ছিল, লোক জলে নামিয়া হাত বাড়াইয়া—চীৎকার করিয়া ভিক্ষা চাহিতে ছিল। লোকে মনে করিয়াছিল,—সরকার হইতে যে কাপড় ও চাউল বিতরণের জন্য 'খয়রাত খানা' স্থাপনের কথা তাহারা শুনিয়াছিল—এতদিনে বুঝিবা তাহাই হইবে। হায় আমাদের অবস্থা না দেখিয়া, না বুঝিয়া সরকার বাহাদুরের বোট কোথায় যাইতেছে?

অবস্থা দেখিয়া মণি মাখনকে বলিল—"মাখন, সকলকেই কিছু কিছু দাও।"

মাখন তাহাই করিল। যতদূর সম্ভব পথে পথে সাহায্য করিয়াই চলিল।

মাখন মণিকে বলিল—"দান মানুষকে চিরদিনের জন্য

রক্ষা করিতে পারে না; মানুষকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার উপায় নির্দ্ধারণই এখন আমাদের প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষ যখন আমাদের চির সহচর, ভিক্ষা তখন তাহার একমাত্র প্রতিকার হওয়া উচিত নহে।'

মণি বলিল—"সেরূপ প্রতিকারের উপায় কি, তোমার মনে হয়?"

মাখন—'সে আমারও যা মনে হইবে, তোমারও তাই মনে হইবে। প্রথম দারিদ্র্যের উপায় নির্দ্ধারণ করা, তারপর তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা।'

মণি বলিল—"সেটাতো বক্তৃতার কথা—বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিলেতো সুবিধাই হয়; কিন্তু সেটা বাঁধার উপায় কি?"

মাখন বলিল—"এই লোকগুলিতো অবশ্যই কোন জমিদারের প্রজা। সেই জমিদার যদি ইহাদের রক্ত শোষণ করিয়াই দ্বিতলে ত্রিতলে বসিয়া পাখার বাতাস উপভোগ করিবার মত নিশ্চিন্ততা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তবে ইহাদের নিদানকালে সেই সঞ্চিত শক্তির কিছু কিছু তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করাও বিধেয়; দান করিয়া নয়—পুনঃ গ্রহণের সর্ত্ত রাখিয়া..."

মণি হাসিয়া বলিল—"কার্য্যতঃ কি করা যাইতে পারে, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাও দেখি, তারপর সেরূপ করা যাইতে পারে কিনা দেখা যাইবে—স্কিম ধরিয়া..."

মাখন বলিল—"মনে কর, তুমি একজন লক্ষ টাকা আয়ের জমিদার। প্রজার খাজানাই তোমার মনের এবং শক্তির উপকরণ—ইহা সুনিশ্চয়। এ অবস্থায় তুমি যদি তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থ হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য টাকা প্রতি একটী পয়সাও রাখিয়া দাও, পনর হাজার টাকা জমিবে বৎসরে সে তহবিলে। প্রজার নিদানকালে—তাহা দ্বারাই তুমি যথেষ্ট উপকার তাহাদের করিতে পার—সকল প্রজাইতো আর নিঃস্ব নহে..."

মণি বলিল—"এরূপ সাহায্যতো প্রতি জমিদারই করিতেছেন; আমরাও কি করি না? প্রজার নিকট আমাদেরও বিস্তর টাকা ধারে খাটিতেছে..."

মাখন—"তোমরা যে এমন কর, তাহা নিজ স্বার্থে; প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য নহে।"

মণি—"সকল জমিদারই এইরূপ চিন্তা করিয়া টাকা লগ্নি করে না। প্রজা রক্ষাও অনেকের উদ্দেশ্য..."

মাখন—"তাহা হইলে এই সময়ে এই লোকগুলি এরূপ ভাবে হাহাকার করিত না..."

মণি "সকল জমিদার তালুকদারই যে খুব স্বচ্ছল অবস্থায় আছে বা জমিদার হইলেই যে সে খুব নিশ্চিন্ত এ চিন্তা একদেশদর্শী..."

দুই বন্ধু যখন এইরূপ তর্কে নিবিষ্ট ছিল, তখন বোট্ আসিয়া পানারের ঘাটে লাগিল।

(২)

কেবল মাত্র সার্ট গায়ে এবং চটিজুতা পায়ে দিয়াই মাখন ও মণি তীরে অবতরণ করিল।

সম্মুখেই একটী প্লীহাযকৃত গ্রস্ত বালিকাকে পাইয়া মাখন তাহার নিকট তাহাদের উদ্দিষ্ট স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিল।

বালিকাটী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সম্মুখের একখানা জীর্ণ কুটীর দেখাইয়া বলিল—"এই বাড়ী,' তারপরই হাত দুখানা বাড়াইয়া মেয়েটী করুণ কণ্ঠে বলিল—"একটা পয়সা দেও বাবু, আমি দুইদিন যাবৎ কিছু খাই না...তোমার পায়ে ধরি..." মাখন মেয়েটীর হাতে একটী পয়সা ফেলিয়া দিল। সে তখন মণিকে ধরিল; মনিও তাহাই করিল। তারপর উভয়ে বালিকার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া সেই দিকে চলিল।

মাখন সেই জীর্ণ গৃহের সম্মুখে যাইয়া বাহির হইতেই চুপি দিয়া দেখিল—ঘরে কেহ নাই। একটা জীর্ণ চৌকির উপর একখানা জীর্ণ মাদুর আস্তির্ণ। ঘরের এক ধারে মাছ ধরিবার একটী জাল, ২।৩টী চাই; বেড়ায় ঝুলান একটী মাতলা—এইরূপ অতি সামান্য সামান্য কয়েকটা আসবাব পত্র লইয়া শত ছিদ্র ঘরখানা যেন কোন মতে জীর্ণ অস্থির উপর দেহ ভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃষ্টির জল পড়িয়া ঘরের মধ্যে অসংখ্য গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে।

মাখন ও মণি সেই স্থানে খানিক অপেক্ষা করিল; কোন বয়স্থ লোককে দেখিতে পাইল না। অগত্যা মাখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই ঘরের ভিতরের দিকের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—"বাড়ীতে কে আছেন?'

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অনোন্যপায় হইয়া মাখন ভিতর বাড়ীরদিকেই অগ্রসর হইল। মণি বাহিরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

পূর্ণিমা-সম্মিলন।

(ময়মনসিংহ গৌরীপুরের পূর্ণিমা-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।)

পূর্ণিমা-সম্মিলন, আমাদের অন্তর্নিহিত বহুদিনের একটী মানসী কল্পনারই বাস্তবরূপ। যাঁহারা ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; আর বাণীর প্রিয় সেবকগণ, যাঁহার এই নব-অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হইয়া আমাদের মর্ম্মলীন আকাঙ্খাটি সফল ও সার্থক করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সর্ব্বসাধারণকে আমরা এই অনুষ্ঠানে এখনও আমন্ত্রণ করি নাই। আমরা চাই, ধনে ও বিদ্যায় যাঁহারা সমাজের প্রাণস্বরূপ তাঁহাদেরই অন্তরে একটি ভাবের একতা স্থাপন করিতে। ভাব কর্ম্মে প্রকাশিত হইলে সর্ব্বসাধারণই লাভবান হইবেন, কিন্তু কর্ম্মের পূর্ব্বে ভাব এবং চিন্তার আদান প্রদান প্রয়োজনীয়। স্বাধীন চিন্তা ও ভাবের এই যে সংযোগ, তাহারই বাহ্য প্রকাশরূপে এই সম্মিলন গড়িয়া উঠিয়াছে।

কোন্ প্রসঙ্গ লইয়া আমরা সম্মিলিত হইব, তাহা একটি প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু এ সম্মিলনের নামকরণ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বেই সে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন;- এ সম্মিলনের কোনও বিশিষ্ট উদ্দেশ্য তাঁহারা গোড়া হইতেই নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই।

আমাদের জীবনের ক্ষেত্র ব্যাপক,—তাহার বিভাগ বিচিত্র। আমাদের সমষ্টিগত জীবন বিভিন্নমুখী গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। সমষ্টিরই সংযোগে যখন সম্মিলনের সৃষ্টি তখন জীবনের এই বিবিধও স্বতন্ত্র গতি অনুসরণ করিয়াই সকল আলোচনা চলিবে। কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না।

আমাদের জীবন-তটিনী নানামুখী হইয়া বহিলেও তাহার উৎস এক এবং সনাতন। একই মহাশক্তির অনাদি ও অনন্ত প্রবাহ শত সহস্র ধারায় বিচ্ছিন্ন হইয়া বিচিত্র জীবন পথে বহুভঙ্গিম তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

শক্তির উৎস অন্তররাজ্যে—তাহার অসংখ্য প্রকাশভঙ্গি বহির্জ্জগতে। ব্যষ্টিজীবনে যেমন, সমষ্টি জীবনেও তেমনি, আমরা অন্তর ও বাহির উভয় লইয়াই গঠিত। বাহিরের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা ব্যষ্টিগত জীবনে সম্ভব হইলেও সমষ্টি জীবনে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই সার্থকতা অন্তরে। অন্তরের উৎসেই উপনীত হইতে হইবে—উৎসস্বরূপ হইতে হইবে—কোনো সমষ্টি জীবনে সে আশা সুদূরারোহিণী সন্দেহ নাই, তবু সে আদর্শই সমষ্টিকেও স্বীকার করিতে হইবে। বাহিরকেও অন্তরেরই সহায় স্বরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অবতার পুরুষগণের সকল উপদেশ ও শাস্ত্রকার গণের সকল বিধানের ইহাই উদ্দেশ্য। এই আদর্শেই সকল ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্মকেই তাই আমরা সকল আলোচনার প্রাণস্বরূপে বরণ করিয়া লইতে চাই—ধর্ম্ম রহিবে সকল প্রসঙ্গের মূলে—ধর্ম্মের আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখিয়াই সকল বিষয় আলোচিত হইবে।

ধর্ম্ম হইতে কর্ম্মকে ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র করিয়া দেখে নাই। হৃষীকেশকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া মানস ও ইন্দ্রিয়ে সকল কর্ম্ম সম্পাদনই সমষ্টিগত জীবনের আদর্শ। কর্ম্মের ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। সুস্থ ও সবল জাতি জীবনে সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, শিল্পকলা, রাজনীতি, কৃষি বাণিজ্য, সকল বিষয়েই বিচিত্র কর্ম্মসৃষ্টি সম্ভবপর।

ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচীন ভারতের ও কর্ম্মপ্রাণ প্রাচীন গ্রীসের সর্ব্বতোমুখী দুইটি বিভিন্ন প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিসামর্থ্য আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই। আর কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে, এরূপ সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মসৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না।

হেলেনিক্ শিক্ষা ও সভ্যতা, সকল বলদৃপ্ত ইউরোপীয় জাতিই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ তাহারাই জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। কিন্তু হায়! ভারতবর্ষ আজ সঙ্কুচিত, সন্ত্রস্ত, বিশ্বের পদতলে বিদলিত। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আজ এক সুদূর সুবর্ণময় অতীতের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বাংলাদেশ যখন প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আদর্শগুলির নব আকার দান করিয়া ধীরে ধীরে এক নূতন শিক্ষা দীক্ষা ও নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতেছিল, ভারতীয় সভ্যতার সকল ঐশ্বর্য্যই তখন বিলুপ্ত প্রায়; বাংলা ভারতের প্রাচীন সমৃদ্ধির অতি অল্পই পাইয়াছে। রাষ্ট্রগত স্বাধীনতাও সে সহজেই হারাইয়াছিল। তবু সে তার সরস শ্যামল, স্নিগ্ধসমীর হিল্লোলিত বক্ষে এক শান্তিময়, স্বচ্ছন্দ, ও নিরুদ্বিগ্ন পল্লী-

জীবন গড়িয়া তুলিতেছিল। হিন্দুস্থানের ভাগ্যাকাশ যখন ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, ভীষণ সমর নির্ঘোষে ও দারুণ অস্ত্রঝঞ্জনিয়ে যখন তাহা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, বাংলার স্বচ্ছ সুনীল আকাশের তলে, বিহগকূজিত, মলয় সমীরিত, কাননে, প্রান্তরে ও পল্লীভবনে, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ললিত পদাবলী বাংলার দ্রবীভূত হৃদয়টাকে যেন উৎসারিত করিতেছিল।

বাস্তবিকই বাংলা প্রকৃতির বরপুত্র। অন্নপূর্ণার বিশাল ভাণ্ডার তাহার জন্য চিরদিনই উন্মুক্ত। বাংলার বিশালকায়া তটিনী গুলি অবিরাম প্রবাহে, অজস্র সলিল বিলাইয়া, তাহার শ্যামল ক্ষেত্র ও প্রান্তরগুলি সিক্ত ও উর্ব্বর করিয়া রথিয়াছে। বাংলার মাটির সরসতা, বিটপীনিচয়ের সুশ্যাম সজীবতা, নানা বিহঙ্গের কলকূজন ও অফুরন্ত শস্যপুষ্প ফল সম্ভার বাঙ্গালীর প্রাণ প্রচুর জীবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ ও প্রকৃতির সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যভোগে সমর্থ করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালীর স্নিগ্ধ সরস হৃদয়ে সুমধুর ভাববৃত্তিগুলি সহজেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তার ক্ষিপ্র বুদ্ধি ও প্রকৃতি দত্ত ধীশক্তির পরিচয় চিরদিনই আমরা পাইয়াছি। তাহার স্বতস্ফূর্ত্ত অধ্যাত্ম-বৃত্তিও চিন্ময়ী প্রকৃতিরই লীলা বিলাস।

বাঙ্গালীর প্রতিভা, নব নব সৃষ্টির উৎস। কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে শিল্প কলায়, সর্ব্বত্রই তার প্রতিভা গতানু গতিকতা পরিহার করিয়া এক সনাতন আদর্শেরই নব-কলেবর দান করিয়াছে। অন্ন চিন্তায় তাহাকে বিব্রত হইতে হয় নাই—তাই তাহার অন্তঃকরণ ও অবাধে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে।

কালের খরস্রোতে বাঙ্গালীর অন্তর্জ্জীবনে ও বহির্জ্জীবনে যদিও একটা বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, তথাপি শক্তিধর বাঙ্গালী সকল বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার জীবন ধর্ম্মকে সফল ও সার্থক করিতে পারিবে এ বিশ্বাস আমরা হারাইতে পারি নাই।

কালচক্রের অবিরত ঘূর্ণণে বাঙ্গালী জাতি তাহার স্বাভাবিক সম্বৃত্তিগুলি অনেকাংশেই হারাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই—তাহার স্বচ্ছ সরল জীবনস্রোত নানা কুটিল গতির ভিতর দিয়া, নানা বাধা অতিক্রম করিয়াই চলিতেছে—নানা আবিলতা আসিয়া ইহাকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। বিবিধ জটিল সমস্যার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিগুলি ভ্রূকুটি কুটীল লোচনে বাঙ্গালীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। জীবন ধারণ করাই আজ বাঙ্গালীর এক গুরুতর সমস্যা। যে বাংলা নিখিল ভারতের শস্য ভাণ্ডার—সেই বাংলার অধিবাসিগণ আজ অন্নাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে। স্বাবলম্বন হারাইয়া আজ বাঙ্গালী লজ্জানিবারণেও পরমুখা-পেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার বয়ন বিদ্যার সে অপূর্ব্ব কৌশল আজ স্বপ্নের মত অলীক বলিয়াই প্রতীয়মান। তারপর নদী মাতৃক উর্ব্বর দেশে জন্মিয়া আমরা ভূমির প্রতি অবহেলা করিয়া দাসত্বলব্ধ বিত্তের জন্যই হাত পাতি-য়াছি। ভুলিয়া গিয়াছি যে যথার্থ সেবায় বাংলার মাটি সুবর্ণময় ফল প্রসব করিতে পারে। বৈদেশিক সংঘাতে বর্ণাশ্রমের সহজ সুন্দর ব্যবস্থাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তাই অর্থ সমস্যার সমাধানে আজ জাতি জর্জ্জরিত।

শুধু তাহাই নহে, যে বাংলা একদিন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যেরই প্রতিমূর্ত্তি ছিল, আজ তাহা সকল শোভা সম্পদ হারাইয়া ব্যাধি-বীজেরই আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লী ছাড়িয়া ভদ্রমণ্ডলী দলে দলে সহরের দিকে প্রধাবিত হইতেছেন। ধনীর সকল অর্থ সৌখীন নাগরিক জীবনের বহিড়ারম্বরেই ব্যয়িত হইতেছে। পল্লীর প্রতি ভবন, আজ তাই শ্রীহীন, মঙ্গলশঙ্খ তাহাতে নিঃস্বনিত হয় না। বাংলার পল্লী, ফলফুলে শোভিত কাননের পরিবর্ত্তে ম্যালেরিয়া-বীজ-বাহী জলাশয় ও জঙ্গলেই পরিপূর্ণ।

অন্তরের দিক্ দিয়াও আমরা বহুদিন বিদেশেরই মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। স্বধর্ম্ম, জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা, সকলই কুসংস্কার বোধে তুচ্ছ করিয়া পাশ্চাত্যের জড় বুদ্ধিরই অনুসরণ করিতে ছিলাম। পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান-রাজ্য যাহা দান, করিয়াছে, তাহারও সার্থকতা আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু জাতীয় চরিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে—নহিলে আমরা স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া পড়িব। পাশ্চাত্যের যে দান তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে, সনাতন আদর্শেরই অনুগত করিয়া। পাশ্চাত্য এক বিরাট্ কর্ম্মযন্ত্র দান করিয়াছে—সে যন্ত্রের সকল কলাকৌশলই বাঙ্গালী আয়ত্ত করিতেছে—কিন্তু তাহার প্রয়োগ করিতে হইলে অগ্রে যন্ত্রীকে চিনিতে হইবে। বাংলার সাধনা ও শিক্ষাদীক্ষাকে

তাই সর্ব্বাগ্রে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তারপর পরের অন্ধ অনুকরণ নয়, পরন্তু আপনারই সমুজ্জ্বল সংবিতালোকে আমাদের জাতীয় চরিত্র, স্বাস্থ্য, অন্নসংস্থান ও পল্লী সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীই বাংলার বিস্লিষ্ট ও শতবিভক্ত জাতীয় জীবন সুসংহত ও সুগঠিত করিয়া তুলিবে। এই পল্লীর গঠন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্য দিয়া আরম্ভ হইবে।

কর্ম্মের পূর্ব্বে চাই ভাব। আমরা ভাবুকের আকাশ-কুসুম কল্পনাকে নিন্দা করি—কিন্তু ভাব ব্যতিরেকে কর্ম্মের সৃষ্টি ও অসম্ভব। ভাবুক স্থাপন করিতেছেন—একটি উজ্জ্বল আদর্শ। কর্ম্মী সেই আদর্শটিকেই অল্পে অল্পে বাস্তবরূপে প্রকটিত করিতেছেন। ভাবের উচ্ছ্বাসে অবশ্য কোনো সৃষ্টিই কার্য্যকরী ও সফল হয় না, তাই সুমহৎ আদর্শটিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বদর্শী বুদ্ধি শক্তিরই পরিচালন আবশ্যক। এই ভাব ও বুদ্ধির পরিচালন ও আদান প্রদানের জন্যই আমরা এই ক্ষুদ্র সম্মিলনটি গঠন করিয়াছি। সম্মিলন-সভায় প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়া সাময়িক চিত্ত বিনোদন করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের এই সম্মিলন নিস্ফল ও নিরর্থকই হইয়া দাঁড়াইবে। যাহা আদর্শরূপে নির্ণয় করিব ও সেই আদর্শে উপনীত হইবার যে পন্থা নির্দ্ধারণ করিব, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যক্তিগত যথাসাধ্য প্রয়াস আমরা চাই।

পরিশেষে নিবেদন করি, যে আমাদের কর্ম্ম, চিন্তা ও ভাবের মূল লক্ষ্য থাকা চাই—বাঙ্গালীর স্বধর্ম্মকেই প্রকটিত করা। বাঙ্গালীর শক্তি ও ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে পরম পুরুষার্থের পথে একদিন যাত্রা করিয়াছিল, সেই মহাপন্থা অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালীর নবজীবনের জয়যাত্রা প্রারব্ধ হইবে।

বাংলার সহজ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বাঙ্গালী জীবনে যে দিব্য মন্দাকিনীর স্রোত বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন—অক্ষয়, অমৃত সেই সুধা-ধারাই নব বাঙ্গালীর জীবন এক অমৃত রসায়নে সঞ্জীবিত রাখিবে।

সেই সুধা স্রোতে অবগাহন করিবার জন্য দেশে নীরব সাধকেরই সৃষ্টি আবশ্যক। সম্মিলন, সভা, সমিতি সাধনার ক্ষেত্র নহে। তবে একটি দিব্য আদর্শ যাহাতে সমাজের সর্ব্ব সাধারণে সঞ্চারিত হইয়া যায়, তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্মিলনের মধ্য দিয়াই আমরা এক উর্দ্ধমুখী চিন্তা প্রবাহের সৃষ্টি করিতে চাই। পূর্ণিমা-সম্মিলন যাহাতে কেবল মানুষের ঐহিক জীবনেরই পরিপুষ্টি বিধান করে, সেই প্রসঙ্গেই আমরা তৃপ্ত নহি—অন্তর্জীবনের বিশাল বিস্তারে যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিহিত আছে, সেই উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিবার যত কিছু নিগূঢ় কৌশল বাঙ্গালী তার আপন স্বভাবের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের একটা পিপাসা জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের এ ক্ষুদ্র সম্মিলন সফল হইবে।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

৺ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

জন্ম—২৯ জুন, ১৮৬৪; মৃত্যু—২৫ মে, ১৯২৪।

কর্ম্ম যোগের মহান্ যোগী বিরাট ছেলে বাংলা মার;
বিরাট্ ছিল দেহের গড়ন, বিরাট ছিল কর্ম্ম তাঁর।
বিরাট ছিল জ্ঞানের ভাঁড়ার, বিরাট ছিল বিদ্যা-বল।
বিরাট ছিল তেজস্বিতা বিরাট ছিল কাযের ফল।
বাংলা দেশের ব্যাঘ্র ছিল, নির্ভীকতার দীপ্তরূপ;
হুঙ্কারে যাঁর শঙ্কা পেয়ে ল্যাজ গুটায়ে সিংহ চুপ।
শিক্ষা-ব্রতের দীক্ষা যাঁহার ছড়িয়ে গেছে বঙ্গ মাঝ;
বঙ্গবাণীর শীর্ষে ঝলে গৌরবেরি রত্ন-তাজ।
দেশের তরে দশের তরে, জীবন ব্যাপি করলে রণ;
যশের তরে কেউ দেখিনি করতে তারে আকিঞ্চন।
ভারত-মাতার মুকুট মণি, বাংলা মা'র সে বুকের ধন,
রে মহাকাল, ছিনিয়ে নেওয়ার কোন্ ছিল তোর প্রয়োজন?
নিঃশেষে যে নিস্ব ক'রে বিশ্বে দিলি হাহাকার!
ভাংলি যেমন নিঠুর-হাতে গড়তে কিরে পারবি আর?

শ্রীগিরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

উপেক্ষিত পল্লী-কবি।

দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে কত যে মূল্যবান সম্পদের অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ প্রতিভা লোক চক্ষুর অন্তরালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, আমরা তাহার সংবাদ রাখিবার অবকাশ প্রাপ্ত হই না। জানি না এই সকল প্রতিভা বিকাশ প্রাপ্তির সুযোগে কত সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া উঠিত, অপরিচিত পল্লী-সাহিত্য সেবী দীন চন্দ্রকুমার দে সৌরভ সম্পাদক কেদার বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া আজ পুনর্জ্জীবিত ও গৌরবান্বিত। চন্দ্রকুমার দের মত আরো কত মূল্যবান জীবন দুঃখের কঠোরতায় নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে, কে তাহাদের সংবাদ রাখে?

কবি গোলোকচন্দ্র মজুমদার রামগোপালপুরে বাস করেন। বহুকাল পূর্ব্বে (১৩০৩ সনে) যখন আমরা ভবানীপুর বামাসুন্দরী স্কুলে পড়িতাম, তখন এই কবির কবিতা কুসুমে আমাদের শ্রীপঞ্চমী উৎসব আনন্দময় হইয়া উঠিত। তারপর আর এই কবির সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই। ৬৬ বৎসর বয়সের এই প্রাচীন কবি অন্ন বস্ত্রের কষ্ট সহিতে সহিতে আজ বিকৃত মস্তিষ্ক ও অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় জরাগ্রস্ত। কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া এই উপেক্ষিত পল্লী কবিকে সম্মিলনে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

গোলক মজুমদার মহাশয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম গোপীনাথ মজুমদার। পূর্ব্ব নিবাস নওপাড়া। ইঁহার পিতামহ আপন মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আইসেন। তদবধি ইঁহারা রামগোপালপুরের অন্তর্গত বলুহা বাস করিতেছেন। গোলোকচন্দ্র বড়হিত গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া তাঁহার পত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখনো গোলোকচন্দ্রের কবি প্রতিভা অশেষ ধৈর্য্য ধরিয়া কত না যাতনা সহিয়া "দুর্য্যোধন বধ কাব্য" রচনায় ব্যাপৃত ছিল। তখনো তাঁহার "কবিতা মুকুর" তৃতীয় খণ্ড রচিত হইতেছিল। তারপর আর পারিল না। ভাতের দুঃখ জগতের সবার চাইতে সেরা। গোলোকচন্দ্র রামগোপালপুরের চাকরীতে যে সামান্য কিছু পাইতেন;—তাহা পাওয়ার যোগ্যতাও আর তাঁহার রহিল না। মস্তিষ্কে বিকৃতি আসিল। নাবালক পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ অতঃপর বিদ্যালয়ের সংশ্রব ছাড়িয়া পিতার সেবায় আত্ম নিয়োগ করিতে বাধ্য হইল। এখনো জ্ঞানেন্দ্রনাথ অনন্যকর্ম্মা হইয়া পিতার সেবায় নিরত রহিয়াছে। কতনা কষ্টে সামান্য উপার্জ্জন করিয়া দিন কাটাইতেছে। তাহার মুখে নিজ দুঃখ দুর্দ্দশার করুণ কাহিনী শুনিলে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

গোলোকচন্দ্র একাধারে কবি ও চিত্র শিল্পী। স্থানীয় রাজবাটীর উৎসবের অঙ্গন এই কবির হাতে চিত্রিত হইত। সে অঙ্গরাগ যে একান্ত মনোহর ও সুরুচিসঙ্গত হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রকিশোর বড় ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন,—তাঁহার গৃহে উৎসবের সীমা ছিল না, গোলোকচন্দ্র সেই উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন। নাটকের দৃশ্যপট অঙ্কনে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালায় সেই প্রতিভা অকালে শুকাইয়া গিয়াছে। বড় দুঃখে কবি বলিয়াছিলেন—

"দারিদ্র্য দোষ গুণ রাশি-নাশী।"

রামগোপালপুরের কুমার বাহাদুরেরা একটু দৃষ্টিপাত করিলেই এই দরিদ্র কবির শেষ কয়েকটা দিন সুখে কাটিয়া যাইতে পারে। কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ যখন ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন, তখন ভরসা হয়, তিনি ইহার জন্য কিছু করিবেন। কবির পুত্র আজ সাহায্য প্রার্থী। জন সাধারণ যদি এই বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সাহায্য করেন, তাহা নিতান্ত অপব্যয় হইবে না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সংবাদ।

বাঙ্গালার দৃপ্তসিংহ, ভারতের উজ্জ্বল রত্ন, মনীষার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর ইহ জগতে নাই। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার, পাটনা সহরে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। স্বদেশ প্রেমিক স্যার আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই স্যার মুখোপাধ্যায়ও চলিয়া গেলেন। মানুষ অমর নহে কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে বড় দুঃসময়ে বাঙ্গলার আকাশ হইতে ইন্দ্র-চন্দ্র পাত হইয়া গেল। দেশের এ ক্ষতি আর পূরণ হইবে না। ভগবান ইঁহাদের স্বর্গীয় আত্মার শান্তি বিধান করুন।
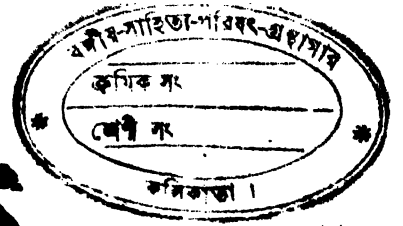
দ্বাদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩৩১ সপ্তম সংখ্যা।

উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেম।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ সাহিত্যে যত পুস্তক মুদ্রিত হয় বোধ হয় তাহার পনর আনাই উপন্যাস। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার পাঠক পাঠিকাগণ উপন্যাস পড়িতেই অধিক ভালবাসেন। যে জিনিষের চাহিদা আছে, সেই জিনিসেরই আমদানী অধিক হয়—ইহা সাধারণ নিয়ম। অনেক সময়ে সুচতুর ব্যবসায়ীরা লোকের মনে নিত্য নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়া খরিদ্দার জুটাইয়া থাকে। এ দেশের জন সাধারণ পূর্ব্বে চা পান করিত না। চা-ব্যবসায়ীরা বিনা মূল্যে অথবা অল্প মূল্যে চা খাওয়াইয়া অনেক লোককে চা পান অভ্যাস করাইয়াছে; এখন তাহাদিগের চা ছাড়া চলে না। মদের দোকান যত বাড়িতেছে মাতালের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালার নর-নারীর উপন্যাস পাঠের নেশাটাও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টার ফল কিনা তাহা সুধীজন বিচার করিয়া দেখিবেন। কিন্তু বাঙ্গালার পাঠক পাঠিকাগণ যে অতিশয় উপন্যাস প্রিয় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আধুনিক সময়ে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় গ্রন্থ সরবরাহ কার্য্যও demand and supply এর নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকে। এই যে প্রতি বৎসর অজ্ঞাত ও অখ্যাত লেকাদিগের শত শত উপন্যাস বিচিত্র সুন্দর আবরণে সজ্জিত হইয়া পুস্তকের দোকানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে উহাদিগেরও খরিদ্দার জুটিতেছে। যাঁহারা প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্যের আলোচনা করিতেন, জীর্ণ গ্রন্থ ও ভগ্ন স্তূপ উদ্ঘাটন করিয়া যাঁহারা নীরস ঐতিহাসিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন অথবা আইনের কূট সমস্যায় যাহাদিগের ললাট কুঞ্চিত হইত, তাঁহারাও এখন উপন্যাস রচনা করিতেছেন। উপন্যাসের অধিক বিক্রয় না হইলে বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদিগের কঠোর সাধনা অর্জ্জিত জ্ঞান উপেক্ষা করিয়া এই ক্ষেত্রে আসিতেন না। যাহা হউক উপন্যাস যখন অধিকাংশ নরনারীই অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন তখন উপন্যাস পাঠে যাহাতে তাহাদিগের রুচি বিকৃত না হয়, হৃদয়ে কলুষিত ভাব প্রবেশ করিতে না পারে এবং পাপের প্রতি স্পৃহা না জন্মে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ভগবান মানুষের হৃদয়ে কতগুলি বৃত্তি দিয়াছেন; উহা-দিগকে আমরা ষড়রিপু বলি। এই মনোবৃত্তিগুলিও মানুষের হিতের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে সংযত রাখিলেই কল্যাণ সাধিত হয়, আর সংযমের সীমা অতিক্রম করিলেই উহারা অশেষ অকল্যাণের কারণ হয়। এই মানসিক বৃত্তি গুলিকে পরিচালিত করিবার জন্য ভগবান্ মানুষকে বিচার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। উদ্ভিদ যেমন মাটী হইতে রস সংগ্রহ করিয়া আবহাওয়ার প্রভাবে আপনি বৰ্দ্ধিত ও পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় মানুষের জীবনের গতি তদ্রূপ নহে। ইতর প্রাণীর ন্যায় স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়াও মানুষ আত্মবিকাশ করে না। মানুষ বুদ্ধিবলে ভাল মন্দ, হিতাহিত বিচার করিতে পারে। সুতরাং মানুষ নিজ নিজ মনোবৃত্তি সকলকে স্বাধীন ইচ্ছা বলে আত্মবশ করিয়া জীবনের অভিব্যক্তির অনুকূল করিতে সমর্থ হয়। যাহার বিচার শক্তি নাই, তাহার ধর্ম্মও নাই, অধর্ম্মও নাই, পাপও নাই, পুণ্যও নাই। মানুষের বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা

...ছে বলিয়াই তাহাকে তাহার কৃত কার্য্যের জন্ত দায়ী করা হয়।

মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলনের সামঞ্জস্যই পুণ্য, আর আতিশয্যই পাপ। পুণ্য চিরসুখের আধার, আর পাপ চির দুঃখের নিদান। মানুষের বিবেক বা বিচার শক্তির সহিত চিত্তবৃত্তির যে নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে ইহাই 'সু' ও 'কু' র,—পাপ ও পুণ্যের সংগ্রাম। ইহাই মানব হৃদয়ে দেবাসুরের বা রাম-রাবণের যুদ্ধ।

কাম প্রবৃত্তি সকল জীবেই স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল। ইহা ভগবানের অভিপ্রেত। এই বৃত্তির চরিতার্থতায় জীবের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহাতে সৃষ্টিধারা অক্ষুন্ন রহিয়াছে। কামপ্রবৃত্তির ধ্বংস সাধন করিলে জীব জগত বিলুপ্ত হইত। মানুষের অসামান্য জ্ঞান গরিমা এবং বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটিত না! কিন্তু কাম সংযমের সীমা অতিক্রম করিলে উহা মানুষের সকল সদ্গুণ রাশির ধ্বংস সাধন করে। কামের ন্যায় মনুষ্যত্ব বিকাশের এইরূপ প্রবল শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। মানুষ ইহা বুঝিয়াও কামবৃত্তি চরিতার্থের জন্ত পাগল হইতেছে। ইতর প্রাণীরা ক্ষুধার্থ না হইলে আহার করেনা, তৃষ্ণাতুর না হইলে জলপান করে না এবং বংশ রক্ষার প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত কখনও যৌন-সম্মিলনে প্রবৃত্ত হয় না। দেহ-রক্ষা অপেক্ষা রসনার তৃপ্তির জন্তই সভ্যজাতির মানুষ পান আহারে অধিকতর অর্থ ও সময় ব্যয় করে। বংশ রক্ষা অপেক্ষা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্তই তাহারা সারা বৎসর সমভাবে কাম বৃত্তির অনুশীলন করে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সম্পর্কে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ পশু অপেক্ষা ও অধম।

এই যে মানুষের প্রবল ভোগ স্পৃহা, রক্ত মাংসের অদম্য ক্ষুধা, ইহা আধুনিক ধর্ম্ম-হীন সভ্যতার ফল। ইতর প্রাণীদিগের কথা বলিয়াছি। অসভ্য জাতির লোকেরাও ইন্দ্রিয়াসক্তি বিষয়ে সভ্য জাতির লোক হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহারা সর্ব্বদা তীব্র জীবন সংগ্রামে বিব্রত থাকায়, উদরান্নের চিন্তায় অধীর হইয়া দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ইন্দ্রিয় লালসা তাহাদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পায় না। ধনবৃদ্ধির সহিত বিলাসিতাও বৃদ্ধি পায়, ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। সভ্য দেশের নরনারীগণ নিত্য নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া কামানলে ইন্ধন প্রদান করিতেছে। "থিয়েটার," "সিনেমা" "বল" প্রভৃতি ভোগের উপকরণ ইন্দ্রিয় লালসাকে সতেজ রাখিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উপন্যাস লেখকগণ নরনারীর হৃদয়ে কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতে যতটা সফলতা লাভ করিয়াছে তেমন আর কেহই পারে নাই। জগতের অমর কবি ও ঔপন্যাসিকগণ ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়, পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি প্রদর্শনের জন্ত জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই সকল চিত্তাকর্ষক চিত্রাবলী দেখিয়া জন-সাধারণ মুগ্ধ হইয়াছে এবং ধর্ম্ম জীবন লাভের জন্ত পাঠক পাঠিকাগণের মনে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়াছে। আধুনিক লেখকগণের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; ধর্ম্মভাব তাহাদিগের নিকট মানসিক দুর্ব্বলতার ফল ;—পাপ ও পুণ্য অশিক্ষিত গোঁড়া লোকের কল্পনা মাত্র। ইহাদের মতে ভোগ আয়তন দেহের সেবাই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক লেখকগণ উপন্যাসের সাহায্যে এইমতই প্রচার করিতেছেন। ইহার ফলে সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। নর-নারী মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

স্ত্রী পুরুষের সম্মিলনের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। যে দিন সমাজে বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই দিন হইতেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বিবাহের পবিত্র ভিত্তির উপরই সমাজের বিরাট সৌধ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যতদিন মানুষের মধ্যে ইতর প্রাণীর ন্যায় যদৃচ্ছা যৌন-সম্মিলন (spontaneus intercourse) প্রচলিতছিল ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। পশু ও মানুষে তখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। যেদিন নরনারী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইল সেই দিন হইতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সূচনা হইল। বিবাহিত জীবনের পবিত্র দায়িত্বকে যে দিন নরনারী বরণ করিয়া লইল সেই দিন চির উন্নতির পথ তাহাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। সে দিন স্বর্গ হইতে ভগবান মানব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ এই পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিকূল মনে করিয়া উহা ছিন্ন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফলও

হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ নরনারী এখন বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজি নহেন। ইহার বিষময় ফল এখনই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইয়ুরোপে, নরওয়ের সুপ্রসিদ্ধ লেখক Ibsen সর্ব্বপ্রথম বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেন। তাঁহার 'A doll's House' নামক বিখ্যাত নাটকে বিবাহ প্রথা যে নারীর আত্ম বিকাশের প্রতিকূল, তিনি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিবাহটা পুতুল খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্ত্রী, স্বামীর সাধের খেলানা,—ভোগের সামগ্রী মাত্র। স্বামী, যদৃচ্ছা স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনানুসারে পরিচালিত করে। বিবাহিত নারী তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা পরিস্ফুট করিতে পারেনা। Ibsen স্ত্রীরদিক হইতে বিবাহের এই অসুবিধা গুলি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আবার সুইডেনবাসী আর একজন নাটককার Strindberg পুরুষের পক্ষে বিবাহ প্রথা কিরূপ অনিষ্টজনক ও উন্নতির প্রতিকূল তাহা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। Strindberg বলেন পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাহাকে সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়। স্ত্রী স্বামীর আত্ম-বিকাশের পক্ষে নানা বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। "The woman enslaves him and forces him to make all kinds of sacrifices for her pleasure." বিবাহিত নারী পুরুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং তাহার সুখের জন্য পুরুষকে নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করে—সংক্ষেপে ইহাই Strindberg এর মত। Ibsen বলিয়াছেন—বিবাহ প্রথা নারীর ব্যাক্তিত্ব বিকাশের প্রতিকূল; আর Strindberg বলিতেছেন—বিবাহ প্রথা পুরুষের আত্মোন্নতির বিঘ্নজনক। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সময়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Bernard Shaw তাঁহার প্রণীত Man and Superman নামক গ্রন্থে প্রকারান্তরে বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহারা সকলেই বিবাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিবাহরূপ পবিত্র যজ্ঞে নরনারী উভয়কেই স্বীয় স্বীয় স্বার্থ আহুতি দিতে হয়। আত্ম ত্যাগই বিবাহের ভিত্তি। জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য, বৃহত্তর স্বার্থ ও সুখের জন্য স্ত্রী-পুরুষ এই ত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করে। বিবাহ প্রথা উঠিয়া গেলে আবার ইতর প্রাণীর ন্যায় যদৃচ্ছা যৌন সঙ্গম আরম্ভ হইবে। বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া যদি নরনারী সংযম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তাহা হইলে মানুষের বংশ লোপ পাইবে। মানুষের অস্তিত্ব যদি পৃথিবী হইতে মুছিয়া যায়, তবে এই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যর্থ হইবে। কিন্তু যে দেশে বিলাসিতার স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, ধর্ম্ম বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া আদৃত হইতেছে, সেই দেশে নরনারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন অসম্ভব। বাস্তবিক পাশ্চাত্য দেশের নরনারীগণ বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হওয়ায় তথায় দিন দিন পাপের স্রোত বৃদ্ধি পাইতেছে। "One of the most damaging facts in the vital statistics of Europe is that the lowest proportion of illegetinate births is found in illiterate regions suoh as Russia, Ireland and Brittany ; while in countries where elementory education is common the proportion of illegitimate children is high. For instance, in the Scandinavian and Germanic lands, *where the literature of the mordern revolt against the duties of marriage began and spread sometimes one child in every ten is born out of wedlock*"

Harmsworth Populor Science. Vol I.

ইয়ুরোপের যে সকল দেশে শিক্ষা বিস্তার হয় নাই, সেই সকল প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে অল্প সংখ্যক জারজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আর যে সকল দেশ শিক্ষায় অধিকতর উন্নত, তথায় জারজ সন্তানের সংখ্যাও অধিক। নরওয়ে, সুইডেন ও জর্ম্মাণী প্রভৃতি যে সকল দেশের সাহিত্যে দাম্পত্য জীবনের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছে ঐ সকল দেশের আদমসুমারীতে দেখিতে পাওয়া যায় প্রতি দশজনের মধ্যে একজন জারজ সন্তান জন্মে। ইহার উপর আর টিকা টিপ্পনি অনাবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা ধনে ও জ্ঞানে সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয়। তথায়ও ধর্ম্ম এবং নীতিহীন শিক্ষার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। খৃষ্টান জাতিরা উচিত

বসিতে ভারতবর্ষের বহু-বিবাহ প্রথার নিন্দা করেন। ভারতবর্ষে বহু বিবাহ সামাজিক অবস্থার ফল। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই বোধ হয় এদেশে এক সময়ে বহু-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের পর সুসভ্য ইংলণ্ড ফ্রান্সে জন সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বহু বিবাহ প্রবর্ত্তনের অনুকুলে অনেক চিন্তাশীল লোক মত দিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সুসভ্য ইয়ুরোপ এবং বিশেষভাবে আমেরিকার অধিবাসীগণ প্রকারান্তরে বহু পত্নীক (Polygamy) ও বহু পতিক (Polyandry) বিবাহের সুখ উপভোগ করিতেছে। খৃষ্টান জাতিদিগের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা (Divorce) প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশের ভোগ লালসা পরায়ণ নরনারীগণ এখন সাময়িক বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। যখন ইচ্ছা হয় তখনই তাহারা আইনের সাহায্যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া আবার নূতন বিবাহ করেন। এইরূপে তথাকার যুবকযুবতীগণ মধুলোলুপ প্রজাপতির ন্যায় নিত্য নূতন ফুলের মধু পান করিতেছে—"The marriage and divorce system at worst is its promiscuity ; in its more usual and moderate form it is reversion to polygamy in the ancient Christian sense of the word" Popular Science. Vol I.

আমেরিকায় প্রতি বৎসরে গড়ে ১,৩৩০০০টী বিবাহ বিচ্ছেদ হইতেছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের নেভাডা ষ্টেটে প্রতি ৩টী বিবাহের মধ্যে দুইটী ছিন্ন হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় গড়ে শতকরা ৫৫টী বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ইংলণ্ডের বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। এই শ্রেণীর মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বিলাতে আদালতের সংখ্যাও বাড়াইতে হইয়াছে। অস্বাভাবিক কাম প্রবণতা হেতু পাশ্চাত্য দেশে দাম্পত্য প্রেম মন্দীভূত হইয়াছে; আপাত মধুর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আশায় তথাকার নরনারী বিবাহিত জীবনের পবিত্র সুখ শান্তিকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বিদায় দিয়াছে। বিবাহের প্রতি নরনারীর অশ্রদ্ধা হওয়ায় নানা কৃত্রিম উপায়ে তাহারা সন্তান জনন রুদ্ধ করিতেছে। ইহার ফলে সভ্য দেশের জন সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ভোগ বিলাস পরায়ণ যুবক যুবতী দিগের সহবাস হইতে যে সকল সন্তান জন্মিতেছে তাহারাও উপযুক্ত যত্ন ও শিক্ষার অভাবে পশুত্ব লাভ করিতেছে। "The children of the marriage and divorce-system, there are hundreds of thousands of them now in the United States are worse off than the foundling. They grow up usualy without the moral training that even a whaif obtains in an institution."

জনক-জননী যত্ন না করিলে সন্তান সচরাচর মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। স্বার্থপর জনক জননীগণ স্বীয় সন্তানদিগকে স্নেহ ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত করায় আমেরিকার বালক বালিকাগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছে না। তথাকার দূরদর্শী ব্যক্তিগণ আশঙ্কা করিতেছেন যে আর তাঁহাদের দেশে প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিবেন না।

পাশ্চাত্য দেশে দাম্পত্য জীবনের প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হওয়ায় তথাকার নরনারীর ভীষণ নৈতিক অধঃপতন ঘটিতেছে। সুবিখ্যাত সমাজ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত Westermarck লিখিয়াছেন—"It is proved that, in the cities of Europe, prostitution increases as the number of marriage decreases. It has also been established, thanks to the statistical investigation of Engel and others, that the fewer the marriage contracts in a year the greater is the rates of illegetimate births."

History of Human Marriage.

ইয়ুরোপে বিবাহের সংখ্যা কমিলেই লোকের ব্যভিচার বৃদ্ধি পায় এবং অধিক সংখ্যক জারজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে দাম্পত্য জীবনের প্রতি নরনারীর অশ্রদ্ধা বাড়িয়াছে বটে কিন্তু ইন্দ্রিয় লালসা কমে নাই। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় লালসা বৃদ্ধি হওয়ার দরুণই এখন আর তথাকার অধিবাসীরা বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ বা এক স্ত্রীতে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। বিবাহের সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে পাশ্চাত্য দেশে পাপের স্রোত প্রবলতর হইয়াছে। নানা ঘৃণিত ব্যাধির ভয়াবহ বিস্তৃতির কারণ বিবাহে অশ্রদ্ধা। সুবিখ্যাত চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদ সার উইলিয়ম অস্লার (Sir William Osler) ১৯১৫

খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন যে,—ইংলণ্ডের ৬০ হাজার লোক এই ঘৃণিত ব্যাধিতে জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। সার আর্চ্চডেন রীড্ বলিয়াছেন, ইংলেণ্ড স্কটলণ্ডে ও ওয়েলসের প্রতি দুইজন লোকের একজন না একজন ঐ শ্রেণীর কোন রোগে আক্রান্ত এবং এমন গৃহস্থ নাই যাহাদের বাড়ীর একজনও ঐ রোগগ্রস্ত নহে। পাপের কি ভীষণ চিত্র! নির্ম্মমহৃদয়া প্রকৃতির কি কঠোর শাস্তি!

আমরা পাশ্চাত্য দেশের এই বিভীষিকাময় পাপ চিত্র পাঠক পাঠিকাদিগের সম্মুখে ধরিলাম কেন? আমাদের দেশেরও কোন কোন উপন্যাস লেখক পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে তাহাদিগের গ্রন্থে দাম্পত্য জীবনকে অবজ্ঞাত ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। ইহারা Ibsen, Bernard shaw প্রভৃতির নজির দেখাইয়া বলিতেছেন—বিবাহ প্রথা নরনারীর বৈশিষ্ট্য বিকাশের প্রতিকূল। এই সকল Ibsenএর প্রশিষ্যগণ পাশ্চাত্য দেশের সমাজ বিপ্লবকারী ভাব সকল প্রচার করিয়া তরুণ যুবক-যুবতী দিগের রুচি বিকৃত করিয়া দিতেছেন।

দাম্পত্য জীবনে সুখ নাই;—পরিণয়হীন অবাধ প্রেমই সকল সুখের অধার, ইহাই এই সকল লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা' ও 'সতীত্বের গৌরব প্রদর্শন করাকে এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকগণ 'গোঁড়ামী মনে করেন। ব্যভিচারিণী বিবাহিতা নারীই ইহাদের উপন্যাসের নায়িকার আসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাইয়াছে। নির্লজ্জা অসতীর মোহময় চরিত্রাঙ্কন না করিলে ইহাদের শিল্পকলা ফুটে না। একজন আধুনিক ফরাসী সমালোচক দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—এখন কোন উপন্যাসে সতী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিলে কেহ তাহা পাঠ করিতে চায় না। কিন্তু যে উপন্যাসে অসতীর চরিত্র রসাল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, উহার কাটতি সবচেয়ে অধিক। পঞ্চাশ বৎসরের সুখময় বিবাহিত জীবনের কাহিনী পত্রিকায় পাঠাইলে বিজ্ঞাপন স্বরূপে তাহার মূল্য দিতে হয়। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমায় অসতী নারীদিগের যে পাপাভিনয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তাহা বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও সম্পাদকগণ ধারাবাহিকরূপে প্রতিদিন সংবাদ পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। এই সকল অশ্লীল বৃত্তান্ত পাঠ করিবার জন্য বহু নরনারী উদগ্রীব হইয়া থাকে।" ইহা রুচি বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতিশয় পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশেও সাহিত্যের ভিতর দিয়া এইরূপ কুরুচির প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। ইয়ুরোপের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যেও দোকানদারী (comercialism) আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বত্রই তরুণ বয়স্ক যুবক যুবতীরা কামোদ্দীপক উপন্যাস পড়িতে পছন্দ করে। আমাদের দেশের কতগুলি স্বার্থপর, চতুর লোক মানব হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া অশ্লীলতা পূর্ণ কদর্য্য উপন্যাস প্রচার করিতেছে। অসতী স্ত্রী, চরিত্রহীনা বিধবা এবং কামরূপী বেশ্যা এখন উপন্যাসের নায়িকার স্থান অধিকার করিয়াছে। উপন্যাসে আর সতী সাধ্বীর স্থান নাই। পাপাসক্তা রমণীগণের ঘৃণিত পুতিগন্ধময় জীবনের কাহিনী মনোহর উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করিয়া লেখকগণ সমাজের সম্মুখে ধরিতেছে। পাপের মূর্ত্তি স্বভাবতঃ চিত্তহারিণী। উহাকে যদি অধিকতর মোহিনী বেশে সাজাইয়া নরনারীর সম্মুখে ধরা যায়, তবে তাহাদিগের আত্মবিস্মৃতি হওয়াই স্বভাবিক। পাপের প্রতি জন সাধারণের ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়াই পাপ চিত্রাঙ্কণের উদ্দেশ্য। পুণ্যকে উজ্জলতর মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত করিবার জন্যই পুণ্যের পাশে পাপের চিত্র প্রদত্ত হয়। পাপকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য যে ব্যক্তি উপন্যাস রচনা করে সে অতি অধম লেখক। সে সমাজ দ্রোহী; মানব জাতির পরম শত্রু।

আমরা আবার বলিতেছি দাম্পত্য প্রেমই সমাজের ভিত্তি। দাম্পত্য প্রেমই নরনারীর সুখের অফুরন্ত উৎস। পাশ্চাত্য দেশের নরনারীগণ দাম্পত্য জীবনের আদর্শ উপেক্ষা করিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতেছে। তাহারা বিলাসিতার বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে, অতৃপ্ত বাসনার অনলে জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। যেদিন ভারতবাসী দাম্পত্য জীবনের পবিত্র আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইবে সেই দিন এ দেশের নরনারীরও সেইরূপ শোচনীয় দশা ঘটিবে। যতদিন আমরা দাম্পত্য জীবনকে পুণ্যের পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত রাখিতে পারিব, ততদিন সংসারের শত জালা-যন্ত্রণা ও অভাবের তীব্র দংশন কিছুতেই আমাদিগকে কাতর করিতে পারিবে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

রামায়ণী কথার প্রচার।

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখিত গ্রন্থগুলি—খুব প্রাচীন নহে। এগুলি খৃষ্টোত্তর যুগে-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকালে, বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে হিন্দুর ধর্ম্ম-গ্রন্থের ইহাই প্রচার-যুগ। এই সময় রামায়ণের যেমন এইরূপ বিবিধ সংস্করণ হইয়াছিল, বহু টীকাকারের সাহায্যে মূল রামায়ণও এই সময় ভারতবর্ষ ময় প্রচারিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগে এক রামায়ণের টীকা গ্রন্থই প্রচারিত হইয়াছিল ৩৭৫০০শত। এই উক্তির সত্যতা প্রমাণের এখন আর কোন উপায় নাই। কিন্তু রামায়ণ যে ভারতের পল্লিতে পল্লিতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই গল্প কথা আশ্রয় করিয়া যে সংস্কৃত ভাষার সম্পদ প্রভুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

কাব্য যুগে রামায়ণী কথা আশ্রয় করিয়া কবি ভাস "অভিষেক" নাটক, কালিদাস "রঘুবংশ," ভবভূতি "মহাবীর চরিত" ও "উত্তররাম চরিত" লিখিয়াছিলেন। "মহা-নাটক" "অনর্ঘ রাঘব," "রামরসায়ন" প্রভৃতি আধুনিক কাব্যগ্রন্থ গুলিও রামায়ণের গল্লাংস লইয়াই রচিত।

যে সকল টীকাকার টীকা লিখিয়া রামায়ণ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানা টীকার সহিত তাঁহাদের কয়েকটী নাম অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে মাত্র। অতঃপর তাহাও হয়ত থাকিবে না।

এগুলিই এখন সেই সাড়ে সাইত্রিশ হাজার টীকার ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন। 'বিশ্বকোষ' হইতে টীকাগুলির নাম উদ্ধৃত হইল।

(১) ঈশ্বর দীক্ষিত কৃত টীকা। (২) উমা মহেশ্বর কৃত টীকা। (৩) কতক টীকা। (৪) গোবিন্দরাজ কৃত তিলক টীকা। (৫) চতুরর্থ দীপিকা। (৬) ত্র্যম্বক কৃত ধর্ম্মকূট। (৭) দেবরাম ভট্টকৃত টীকা। (৮) নাগেশ রচিত টীকা। (৯) নৃসিংহ টীকা। (১০) মহেশ্বর তীর্থ কৃত রামায়ণ তত্ত্ব দীপ। (১১) রামানন্দ তীর্থ কৃত রামায়ণ তিলক ব্যাখ্যা। (১২) রামানুজ কৃত রামায়ণ তিলক ব্যাখ্যা। (১৩) রামাশ্রমাচার্য্য কৃত টীকা। (১৪) রামায়ণ বিরোধ পরিহার। (১৫) রামায়ণ তাৎপর্য্য বিরোধ রঞ্জিনী।" (১৬) রামায়ণ সেতু। (১৭) বরদারাজ কৃত বিবেক তিলক। (১৮) বাল্মীকি হৃদয় টীকা। (১৯) বিদ্যানাথ কৃত টীকা। (২০) বিদ্বন্মনোরমা টীকা। (২১) বিমলবোধ টীকা। (২২) বিশ্বনাথ কৃত বাল্মীকি তাৎপর্য্য তারিণী। (২৩) শিবরাম সন্ন্যাসী কৃত টীকা। (২৪) শৃঙ্গার সুধাকর। (২৫) সর্ব্বজ্ঞের টীকা। (২৬) সুবোধিনী। (২৭) হয়গ্রীব শাস্ত্রী বিরচিত রামায়ণ সপ্তবিধ। (২৮) হরিপণ্ডিত কৃত রামায়ণী টীকা। (২৯) লোকনাথের মনোরমা টীকা।

দশ-অবতার কল্পনার যুগে রাম এবং বুদ্ধ, অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছিলেন। এই সময় এবং তাহার পরে রামকে বিষ্ণুরূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রাম সম্পর্কে কতগুলি উপনিষদও প্রচারিত হইয়াছিল। উপনিষদগুলির মধ্যে রামোপনিষদ, শ্রীরাম পূর্ব্ব তাপনিয়োপনিষৎ, শ্রীরামোত্তর তাপনিয়োপনিষৎ, রামরহস্যোপনিষৎ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। "মুক্তিক উপনিষদে" রাম হনুমানকে মুক্তির উপায় বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল, সে সকলের মধ্যে বৌদ্ধ গ্রন্থ "লঙ্কাবতার সূত্র" ও "দশরথ জাতক" ব্যতীত আর সকল গুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; সুতরাং এ গুলির প্রচার তৎকালীন ভারতীয় শিক্ষিত সমাজেই আবদ্ধ ছিল; প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদিগের পক্ষে তাহা পাঠের বা আলোচনার বিষয় ছিল না।

ক্রমে তাহা সাধারণের ও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। প্রাদেশিক জনগণের সুবিধার জন্য ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ কথা রচিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এবং এইরূপে ভারতের অসংখ্য প্রাদেশিক ভাষায় অসংখ্য অসংখ্য রামায়ণ রচিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক কবিগণ কর্ত্তৃক, প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এই রামায়ণ গুলি যে মূল রামায়ণের অনুবাদরূপেই প্রচারিত হইয়াছিল বা অনুসরণে লিখিত হইয়াছিল, তাহা নহে। এগুলি প্রাদেশিক সমাজের ভাব ও চিন্তার প্রভাব লইয়া রচিত হইয়াছিল। রামসীতার মূল

কাহিনীও অনেক প্রাদেশিক কবি অনুসরণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যে এইরূপ কত রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত সংখ্যা অবগত হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময় মহারাষ্ট্র ভাষায় ৮ খানা, তেলেগু ভাষায় ৫ খানা, তামিল ভাষায় ১২ খানা, উৎকল ভাষায় ৬ খানা, হিন্দি ভাষায় ১১ খানা এবং বঙ্গ ভাষায় ২৫ খানা রামায়ণ পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে। ইহা যে ভারতীয় ভাষা সমূহের মোট তালিকা নহে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক লেখকের রামায়ণের সংখ্যাও যে এই সামান্য কয়েকখানা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আসামী ভাষায় রচিত 'অনন্ত রামায়ণ' স্ববিসেনের জৈন রামায়ণ ও দ্রাবিড় দেশের দ্রাবিড় রামায়ণ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দ্রাবিড়ী রামায়ণের গল্পটীর সহিত বাল্মীকি রামায়ণের গল্পের বিশেষ ঐক্য নাই। এই রামায়ণের বর্ণিত বিষয়ের ভিতরও দশরথ জাতকের ন্যায় কোন প্রচ্ছন্ন সত্য নিহিত আছে কি না, ঐতিহাসিকগণের আলোচনার জন্য, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

১। সূর্য্য বংশের রাজা সগর দক্ষিণ দেশে দিগ্বিজয়ে গিয়া দ্রাবিড়ের এক রাজা জীমূতবাহনের মনোনীত এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে লইয়া আইসেন। এই ঘটনায় জীমূতবাহন নিজকে অপমানিত বোধ করিয়া—নিজে শক্তি হীন বিধায়—লঙ্কার রাজা প্রবল শক্তি ভীমের শরণাগত হন। ভীমের কোন পুত্র সন্তান ছিল না; তিনি জীমূতবাহনকে পুত্ররূপে স্থান দিয়া এবং নিজ রাক্ষসকুলে বিবাহ করাইয়া লঙ্কা ও পাতাল লঙ্কার অধিপতি করিয়া দিলেন।

২। জীমূতবাহনের বংশে ধবলকীর্ত্তি লঙ্কার রাজা হন। তাঁহার শ্যালক শ্রীকণ্ঠকুমার পাতাল লঙ্কার উত্তরে বানর দ্বীপের কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁহার ধ্বজাতে বানর মূর্ত্তি চিহ্নিত করেন। শ্রীকণ্ঠের বংশে বজ্রকণ্ঠ, ইন্দ্রায়ুধ, অমরপ্রভু ও কপিকেতু জন্ম গ্রহণ করেন। অমরপ্রভু লঙ্কার এক রাজ কন্যাকে বিবাহ করেন। কপিকেতুর দুই পুত্রের নাম কিষ্কিন্ধ্যা ও অন্ধ্রক। তাহারা সংবাদ পাইলেন, বিজয়ার্থ পর্ব্বতে আদিত্য নগরের রাজকন্যা মন্দ্রমালী স্বয়ম্বরা হইবেন। কিষ্কিন্ধ্যা ও অন্ধ্রক স্বয়ম্বর সভায় গেলেন। সভাতে বিদ্যাধর দেশের রাজা অশনী বেগের পুত্র বিজয় এবং লঙ্কার রাজকুমার সুকেশও উপস্থিত ছিলেন। কন্যা মন্দ্রমালী কিষ্কিন্ধ্যাকে বরণ করেন। বিজয় অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া কিষ্কিন্ধ্যাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধে অন্ধ্রকের হস্তে বিজয় নিহত হইলে কিষ্কিন্ধ্যা কন্যা লইয়া চলিয়া গেলেন। বিজয়ের পিতা পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। লঙ্কার রাজা সুকেশ কিষ্কিন্ধ্যার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে অশনীবেগের জয় হইল; বিদ্যাধর রাজ্য, লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিষ্কিন্ধ্যা, অন্ধ্রক ও সুকেশ রাজ্য হারাইয়া পাতাল লঙ্কায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মধু পর্ব্বতের উপর একটী ছোট নগর স্থাপন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা স্বীয় পুত্র ঋক্ষরজ ও সূর্য্যরজকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

৩। পাতাল লঙ্কাতে সুকেশের মালী সুমালী ও মাল্যবন্ত নামে তিন পুত্র হইয়াছিল; তাহারা অশনিবেগের পৌত্র (সহস্রার পুত্র) ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন এবং ইন্দ্রের রাজধানী দখল করিতে গিয়া পুনরায় পরাজিত হইয়া পাতাল লঙ্কাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন।

৪। পাতাল লঙ্কায় বাস কালে সুমালী-পৌত্র (রত্নশ্রবার পুত্র) রাবণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাবণ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পিতামহের রাজ্য অধিকার করিলেন এবং কিষ্কিন্ধ্যা জয় করিয়া ঋক্ষরজ ও সূর্য্যরজকে তাঁহাদের পিতৃরাজ্যে বসাইলেন। সূর্য্যরজের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বালী ও সুগ্রীব রাজা হইলেন। রাবণ, বালী ও সুগ্রীবের ভগিনীকে বিবাহ করিতে চাহিলে বালী সম্মতি দিতে পারিলেন না, তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন; সুগ্রীব রাবণের নিকট ভগিনী সম্প্রদান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

৫। একবার সুগ্রীবের সহিত তাহার স্ত্রী সুতারার মনোবাদ হয়; সুগ্রীব রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; ইত্যবসরে এক মায়াধারী সুগ্রীব আসিয়া সিংহাসন ও সুতারাকে অধিকার করিয়া বসে; কেহই তাহাকে চিনিতে পারে নাই। সুগ্রীব নিরুপায় হইয়া হনুবর দেশের রাজা পবন পুত্র হনুমানের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগি-

লেন। এই সময় কোশল দেশের সূর্য্যবংশীয় রাজা রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় অপহৃতা পত্নী সীতার অনুসন্ধান করিতে করিতে বনে আসিয়াছিলেন। হনুমানের চেষ্টায় রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হয়। রাম সুগ্রীবকে চিহ্নিত রাখিবার জন্য তাহার গলায় এক মালা গাঁথিয়া দেন এবং মালাহীন মায়াধারী সুগ্রীবকে নিহত করেন। সুগ্রীব বিপদ মুক্ত হইয়া সীতা অন্বেষণে চারিদিকে চর নিযুক্ত করেন।

সুগ্রীবের চরেরা জটায়ুর নিকট হইতে অবগত হন যে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; জটায়ু প্রাণ পণে যুদ্ধ করিয়া সীতাকে রাখিতে পারেন নাই, পরন্তু আহত হইয়াছেন। সংবাদ পাইয়া সুগ্রীব হনুমানকে দূত রূপে নিযুক্ত করিলেন; কেন না, হনুমান রাবণের আত্মীয়; এতদ্ব্যতীত তিনি মহা পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, ও বাগ্মী। রাবণ হয়ত বা তাঁহার উপদেশ ও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। রাবণ কিন্তু হনুমানের সম্মান রক্ষা করিলেন না। তখন হনুমান রামের অভিজ্ঞান সীতাকে দিয়া সীতার অভিজ্ঞান আনিয়া রামকে দিলেন। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। সুগ্রীবের চেষ্টায় দ্রাবিড় দেশের রাজারা সসৈন্য রামের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

দ্রাবিড় সৈন্যদিগকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে লঙ্কায় যাইতে পথে সমুদ্র শাসিত বেলান্ধপুর, সুবেল শাসিত সুবেলাচল, হংসদ্বীপের রাজা বিপবদনের রাজ্য প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের ফল মূল রামায়ণের মতই হইয়াছিল।

ইহাই দ্রাবিড় রামায়ণের মূল বিবরণ। *

জৈনাচার্য্য রবিসেন রচিত জৈন রামায়ণের গল্পটীও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। তাহাও উদ্ধৃত হইল।

জৈন মতে তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব হইতে ইক্ষ্বাকু বংশের উৎপত্তি। এই বংশের অরণ্য রাজার পুত্র দশরথের কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সুপ্রভা নামে তিন পত্নীছিল। একদিন নারদমুনি রাজা দশরথ ও রাজা জনককে জানাইলেন যে লঙ্কার রাবণ জ্যোতির্ব্বিদের সাহায্যে গণনা করিয়া অবগত হইয়াছেন, আপনাদের উভয়ের পুত্র ও কন্যা তাহার মৃত্যুর কারণ। সুতরাং রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ আপনাদিগের শিরচ্ছেদ করিতে কৃত সঙ্কল্প; আপনারা আত্মরক্ষা করুন।

নারদের কথা শুনিয়া দশরথ ও জনক অজ্ঞাত বাসে চলিলেন। এদিকে, তাঁহারা পীড়িত বলিয়া রাজ্যে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হইল। এবং তাহাদের স্ব স্ব শয্যায় দুইটী কুশ পুত্তলিকা রাখিয়া দেওয়া হইল বিভীষণের প্রেরিত চর, গোপনে এই কুশ পুত্তলিকাদ্বয়কেই হত্যা করিয়া গেল। রাবণের ভীতি দূর হইল।

দশরথ অজ্ঞাত বাসে থাকা কালে "কৌতুক মঙ্গল নগরের রাজা সুমতীর কন্যা কেকয়ীকে স্বয়ম্বর সভায় গ্রহণ করিলেন। কেকয়ী মহাভারতের সুভদ্রার ন্যায় সুকৌশলে রথ পরিচালন করিয়া অন্যান্য রাজাদিগের হাত হইতে দশরথকে নিরাপদে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিলে দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কেকয়ী বলিলেন "বর সময়ে লইব, এখন নয়।"

অতঃপর দশরথের চারি পত্নীর গর্ভে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও জনক পত্নী বিদেহার গর্ভে সীতা জন্ম গ্রহণ করিলেন। রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল।

এইবার দশরথ সংসরাশ্রম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে ভরত ও পিতার সহিত যাইবে স্থির করিল। পতি-পুত্র হারাইবার আশঙ্কায় কেকয়ী এইবার পতির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন—"ভরতকে রাজা করা হউক!"

বর প্রদত্ত হইল। ভরত রাজা হইল দেখিয়া রাম বনে চলিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অনুসরণ করিলেন।

রাম লক্ষ্মণের দেশত্যাগে তাহাদের মাতৃদ্বয় দিবারাত্রি অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই নিরানন্দ কেকয়ীর নিকট মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হইল না। তিনি ভরতকে লইয়া রাম লক্ষ্মণ সীতাকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন।

---

* প্রবাসীর (২০শ ভাগ) হইতে গৃহীত। প্রবন্ধ লেখক এই বিবরণে উল্লিখিত স্থানগুলির নিজ অভিজ্ঞতা মূলক নির্দ্দেশ প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে তাহা হইতে ২।১টি স্থানের কথা উদ্ধৃত করা গেল।

কিষ্কিন্ধ্যা—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তুঙ্গাভদ্রা নদীর তীরস্থ অনাগুণ্ডিই প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা।

বিদ্যাধর দেশ—বোম্বে প্রেসিডেন্সির ধারবার, রত্নগিরিও কোলহাপুর প্রাচীন বিদ্যাধর দেশ।

পাতাল লঙ্কা—কুমারী হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত (আধুনিক কুর্গ, ত্রিবাঙ্কুর, কানাড়া জেলা)।

গোকর্ণ—গোয়ার দক্ষিণে সমুদ্র তীরে।

হনুবর—গোয়া হইতে ৭৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে, শবরবতী নদী তীরে।

কেকয়ী রামকে বক্ষে ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন, অনেক ক্রটী স্বীকার করিলেন, কিন্তু রাম কিছুতেই ফিরিলেন না।

রাম লক্ষ্মণ সীতা দণ্ডকপর্ব্বতের সন্নিকটে অবস্থান কালে রামের হস্তে তপস্যা নিরত শম্বুকের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়! এই ঘটনা লইয়া শম্বুকের পিতা খরদূষণের সহিত ও মাতুল রাবণের সহিত রামের বিবাদ আরম্ভ হয়।

ইহার পর রাবণ সীতা হরণ করেন ও সীতাকে ফুল্ল-গিরির উপর অশোকমালিনী বাপিকার নিকট, অশোক বৃক্ষের তলে রাখিবার ব্যবস্থা করেন।

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের স্ত্রী সুতারার সহিত সাহস-পতি নামক এক বিদ্যাধরের আসক্তি ছিল। একদিন সাহস পতি সুগ্রীবের বেশে সুতারার নিকট অবস্থান কালে সুগ্রীব আসিয়া উপস্থিত হইলে কে সুগ্রীব—এই লইয়া বিষম বিবাদ আরম্ভ হইল। সুগ্রীব তখন নিরুপায় হইয়া পত্নী-হারা রামের শরণাপন্ন হইল; রাম সাহসপতিকে বধ করিয়া সুগ্রীবের উপকার করিলেন। কৃতজ্ঞ সুগ্রীব স্বীয় জামতা হনুমানকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়া রামের ঋণ পরিশোধ করিলেন।

হনুমান অশোক বনে যাইয়া সীতাকে দেখিয়া আসিল, আসিবার সময় পদাঘাতে লঙ্কার শোভা সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া আসিল।

যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। বিভীষণ ভ্রাতাকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া রামের পক্ষে স-সৈন্য যোগদান করিলেন।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে হনুমান দ্রোণমেঘ রাজার কন্যা বিশল্যার স্নানের জল ঔষধরূপে আনিতে গেলে বিশল্যা স্বয়ংই আসিয়া লক্ষ্মণকে আরোগ্য করিলেন। পরিশেষে লক্ষ্মণের বাণে রাবণ হত হইল।

লঙ্কায়ই রামের রাজ্যাভিষেক হইল। এই স্থানে রাম আরো কতগুলি বিবাহ করিলেন। তারপর বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইয়া রাম লক্ষ্মণ সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

রাম, লক্ষ্মণকে নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার অভিষেক করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে লক্ষ্মণ অস্বীকার করেন সুতরাং রামই রাজা হন। ভরত সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। শত্রুঘ্ন মথুরা জয় করিয়া মথুরার রাজা হন।

ইহার পর সীতার বনবাস। এই বনবাসের কারণ উত্তরকাণ্ডের মত হইলেও গল্পাংশে উহার সহিত ঐক্য নাই।

সীতার অপবাদ শুনিয়া রাম কৃতান্তবক্ত্র নামক সেনা-পতিকে ডাকিয়া সীতাকে সিংহবনে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। সিংহবন হইতে পুণ্ডরীক পুরাধিপতি বজ্রজঙ্ঘ সীতাকে ভগিনী সম্বোধনে লইয়া গিয়া নিজ অন্তঃপুরে সসম্মানে রক্ষা করেন। পুণ্ডরীকপুরে সীতার অনঙ্গলবণ ও মদনাঙ্কুশ নামে দুই যমজ কুমার জন্ম গ্রহণ করে।

কুমারদ্বয় নারদের চক্রান্তে অযোধ্যা পতির সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে সীতা নিষেধ করেন এবং শেষ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। শুনিয়া কুমারদ্বয় বলিল—"যে আমাদের নিরপরাধিনী মাতাকে বনে নির্ব্বাসিত করিতে পারে, তাঁহাকে তাহার প্রতিশোধ দিতেই হইবে।"

নারদ সীতাকে বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই মা! আমি শেষ রক্ষা করিব।"

পিতা পুত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সীতা ও নারদ বিমানে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাম-লক্ষ্মণের পরাজয় আসন্ন দেখিয়া লক্ষ্মণ সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। চক্র ফিরিয়া আসিল। অবস্থা বুঝিয়া নারদ ভূতলে নামিয়া বালকদ্বয়ের সহিত রাম লক্ষ্মণের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

ইহার পর সীতা অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া অযোধ্যায় গৃহীত হইলেন। অতঃপর লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রাম উন্মত্ত হইয়া সতী স্কন্ধে মহাদেবের ন্যায় দেশেদেশে ঘুরিলেন।

শেষ রামচন্দ্র মাঙ্গি তুর্কী পর্ব্বতে কোটী জিলায় মুক্তি লাভ করিলেন।

এই জৈন রামায়ণ—জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক জৈন "পদ্ম-পুরাণ" নামেও প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন—এই গ্রন্থ ৮ম বিক্রম সংবতে রচিত হইয়াছিল। *

রামচরিত সম্বন্ধে আর একখানা জৈন গ্রন্থ আছে; তাহার নাম 'পউম চরিঅং।' পাউম চরিঅং অপভ্রংশ ভাষায়

* ভারতবর্ষ ১৩৩০। ১৩৩০ সালের চৈত্র সংখ্যা "মানসী" পত্রিকায় এইরূপ আর এক খানা জৈনরামায়ণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রাদেশিক রামায়ণ গুলির ন্যায় জৈনরামায়ণ গুলিতেও প্রাদেশিক কবিদিগের স্বাধীন চিন্তার ফলে একে অন্যে এইরূপ বহু প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে।

রচিত। জৈন শাস্ত্রমতে রামের নাম—পদ্ম। পদ্মের কথা এই অর্থে পদ্মপুরাণ অথবা অপভ্রংশ ভাষার পউম চরিঅং।

তুলসী দাস বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় আর্য রামায়ণের সহিত এই প্রাদেশিক রামায়ণ গুলিরও বিস্তর পার্থক্য আছে। বাহুল্য ভয়ে সেই পার্থক্যের উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

স্বামী অনন্ত রামায়ণের প্রথমাংশ আধ্যাত্ম রামায়ণের ও শেষ অংশ বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণে লিখিত।

বর্ষা নিশায়।

আজি ঘোর বরষায়, নিবিড় নিশায়,
হে মোর দেবতা! রয়েছি জাগিয়া,
তব আগমন মাগিয়া!
ঝরিছে বাদর ঝর-ঝর রবে,
বহিছে পবন ভীম ভৈরবে,
কি ঘোর যামিনী! চমকে দামিনী
কালো জলদের কোলে!
আঁধার করিয়া দিক দিগন্ত,
গুরু গুরু রবে ওই দুরন্ত
পুঞ্জিত ঘন হাঁকিছে সঘন,
ঘন ঘোর কলরোলে!
ওগো মিলনের পাশে বাঁধিয়া সাহসে
বরষা-নিশীথে আসিবে, আমার
পরাণ মাঝারে পশিবে!
হাঁকিবে পবন, জাগিবে তুফান,
উল্লাস-রসে ভাসিবে পরাণ,
কালো দুটি চোখ থির অপলক
চেয়ে র'বে তোমা পানে!
অঙ্গে তোমার লাগিবে পরশ,
উথলিবে হৃদে বিপুল হরষ,
আনন্দ-ধারা অবিরল ধারে
ঝরিবে গো দু'নয়ানে!

শ্রী—

পটল বা পটোল।

পটোলের ল্যাটিন নাম Trichosanthes Djoica. (ট্রিচোসেনথেস ডায়ইকা)। ইংরেজীতে হিন্দী পরবল নামেরই অপভ্রংশ পলওল (Pulwal) বলাহয়। সংস্কৃতে ইহাকে বহুনামে অভিহিত করা হয়। যথা—কুলক, তিক্তক, পটু, পটুক, কর্কশদল, কুলজ, রাজিমান্, লতাফল, রাজফল, রাজপটোল, বরতিক্ত, অমৃতাফল, তিক্তভদ্রক, কটুফল, কর্কশচ্ছদ, প্রতীক, রাজের, রাজনামা, পাণ্ডুফল, পাণ্ডু, অমৃতফল, বীজগর্ভ, নাগফল, কুষ্ঠারি, কাসমর্দ্দন, পঞ্জর, রাজীফল, জ্যোৎস্না ও কচ্ছুঘ্নী। আয়ুর্ব্বেদে পটোলের গুণ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্তকফাপহ।
ফলং তস্য ত্রিদোষঘ্নং মূলং তস্যবিরেচকং॥"

অর্থাৎ পটোলপাতা বা পলতা পিত্তনাশক, পটোলের ডাঁটা ডগা বা লতা কফ নাশক, ফল ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ দোষ নষ্ট কারক এবং ইহার মূল সারক গুণ বিশিষ্ট, দ্রব্যগুণাবিধান বলেন,পটোল কটুতিক্ত রস-মধুর-উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, পাচক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, কণ্ডু, জ্বর, দাহ, কুষ্ঠ, কাস, ক্রিমি, রক্ত ও ত্রিদোষের উপকারক।

এরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ফল বা তরকারী অতি বিরল। অথচ অন্যান্য তরিতরকারীর ন্যায় ইহার উন্নতির জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। দিন দিন পটোলের অবনতিই ঘটতেছে; বীজবড়, ছাল পুরু ও শাস কোমলতাহীন হইতেছে, আমেরিকায় হইলে ইহার কত প্রকার শঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইত এবং পটোল বহুগুণ সুস্বাদু ও সুবৃহৎ আকার ধারণ করিত। যাক সে কথা।

বাঙ্গালা দেশে সাধারণতঃ ৩।৪ প্রকার পটোল পাওয়া যায়। তবে স্থান বিশেষে পটোলের আকৃতি ও প্রকৃতির ন্যূনাধিক পার্থক্য দেখাযায় এবং তজ্জন্য নামের পার্থক্য থাকিলেও জাতিগত পার্থক্য বিশেষ কিছু লক্ষিত হয়না। কলিকাতার ধানী, মাকড়া কাজলি, পাটনাই ও গোয়াল-ন্দের পটোল দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার পটোল ভাল। কিন্তু পটোল ওজন দরে বিক্রীত

হয় বলিয়া কচি পটোল বাজারে বড় একটা পাওয়া যায় না। পরিপক্ক পটোল ভক্ষণ করিয়া কোন্ পটোলের প্রকৃত আস্বাদ কিরূপ তাহা বিচার করাও দুরূহ। ময়মনসিংহে সাধারণতঃ দুই রকম পটোল দেখিয়াছি; এক রকম বারুজিবী-দের বরোজে জন্মায়, ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকার, কিন্তু সুখাদ্য। আর এক রকম পটোলের আমদানী হয়, তাহা ঢাকা জেলার চড়া অঞ্চল হইতে আইসে শুনিয়াছি। ইহা আকারে কিঞ্চিত বৃহৎ কিন্তু শাঁস তেমন কোমল ও সুস্বাদু নয়।

আমি আমার ক্ষুদ্র একখানি বরোজে পটুলের চাষ করিয়া দেখিয়াছি, একটু যত্ন লইলে এবং উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে পটোলের আকার বেশ বড় হয়, আস্বাদ ও ভালই হয়।

বঙ্গদেশে গোয়ালন্দ প্রভৃতি নদী পার্শ্বস্থ স্থানে পটোলের চাষ, ক্ষেত্রেই অধিকাংশ করা হয়। বগুড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, যশোহর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতভাবে ক্ষেত্রেই পটোল উৎপন্ন হয়। ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে বরোজেই পটোলের চাষ করা হয়। কেন এসব অঞ্চলে ক্ষেত্রে পটোলের চাষ করা হয় না, তাহা জানিনা। আমি ছোট একটি ক্ষেত্রে চাষ করিয়াছিলাম, প্রথম বৎসর আমার উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে ফলন ভাল হয় নাই। পর বৎসর একটু বেশী যত্ন-তদ্বির—করায় ফলন খুব ভাল না হইলেও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। বোধ হয় উপযুক্ত যত্ন করিলে ফলন আরও বৃদ্ধি করা যাইত। কিন্তু বিশেষ কারণে সেই স্থানটী অন্য কার্য্যে ব্যবহার করায় আর আমি পটোলের আবাদ করিতে পারি নাই। নিজে না দেখিলে লোক জনের হাতে কার্য্যের ভার দিয়া এসব কাজে উন্নতি করা যায়না, তাই আমি পটোল চাষের উন্নতি সাধন করিতে পারি নাই। যাঁহারা নিজে তত্ত্বাবধান করিতে পারেন, তাঁহারা ক্ষেত্রে পটোলের আবাদ করিয়া পরীক্ষার ফল পত্রিকায় প্রকাশ করিলে ভালহয়। আমার বিশ্বাস, যথাযোগ্য চেষ্টা করিলে ক্ষেত্রে পটোলের আবাদ এ অঞ্চলেও প্রচলন করা যাইতে পারিবে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পটোল-মূল বা সুপুষ্ট পুরাতন লতা রোপণ করিয়া পটোলের আবাদ করা হয়; বীজ বপন করিবার প্রথা নাই। কারণ এদেশে ফলের উৎকর্ষ সাধন জন্য শঙ্কর জাতি উন্নপন্ন করা হয় না; কিন্তু ফলের উন্নতি কল্পে শঙ্কর জনন হইলে একমাত্র বীজের সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্ভব পর নহে। এই কথাটা বিশেষ রূপে বলায় একটু উদ্দেশ্য আছে। সে দিন একখানা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে দেখিলাম, একজন লেখক ফল ও সবজী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, শশা গাছের সহিত লাউ গাছের জোড় কলম করিলে যে লাউ হইবে তাহা শশার আস্বাদ যুক্ত হইবে। ইহা তিনি কোন উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে পাইয়াছেন, না ইহা তাঁহার পরীক্ষার ফল—তাহা প্রবন্ধ পাঠে বুঝা গেলনা। আমি উদ্ভিদ্ শাস্ত্র যতদুর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তি সম্মত নহে বলিয়াই বুঝি। যাহা হউক, সে বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে; সুতরাং আমি এস্থলে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আর কিছু বলিবনা।

পটোলমূল দেড়হাত দুইহাত মৃত্তিকার নীচে যায়, এজন্ম দোআঁশ মাটীতেই পটোল ভাল হয়। নদীর পলি পড়া চর-ভূমিতে এই কারণে পটোল খুব ফলিতে দেখা যায়। পটোলের মাটী গভীরভাবে খনন করিলে মাটী বেশ হালকা হয় এবং মূলগুলি অনায়াসে বিস্তৃতি লাভ করিয়া প্রচুর পরিমাণে গাছের খাদ্য-রস সংগ্রহে সক্ষম হয়। সাধারণ ক্ষেতে—নালা, খাল পুকুর বা পাগায়ের পলিমাটী ব্যবহার করিলে পটোলের ফলন বৃদ্ধি পায়। উপর্য্যুপরি একস্থানে ৩।৪ বৎসরের বেশী পটোলের ফলন ভাল হয় না। কিন্তু ৩।৪ বৎসর অন্তর সমস্ত মূল তুলিয়া নূতন পলিমাটী ও কিঞ্চিৎ গোবর সার মিশাইয়া জমি ভালরূপে চাষ করিয়া লইলে পুনরায় সেই ক্ষেত্রে পটোল উৎপন্ন করা যায়। খাদ্যের অভাব বশতঃ ও মাটী চাপ বাঁধিয়া যায় বলিয়াই একস্থানে বহুদিন পটোল ভাল হয় না। সেই অভাবও অসুবিধা গুলি দূর হইলে পটোল না জন্মিবার কোন কারণ নাই। এ দেশের কৃষক সাধারণতঃ প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে বলিয়াই ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া দিলে সেস্থানে পুনঃ পুনঃ ফসল করিলেও ফসলের অবনতি ঘটিতে পারেনা।

যাহা হউক; যে সকল ক্ষেত্রে জল না দাঁড়ায় অথচ কখনই একেবারে শুষ্ক নীরস হইয়া না যায়, এরূপ উচ্চভূমিই

পটোল চাষের উপযুক্ত। পানের বরোজও এইরূপ ভূমিতেই করা হয়; তাই বরোজে পটোল ভাল হয়। বরং বেলে-মাটীতে যথেষ্ট সার ও পলিমাটী মিশাইয়া পটোল চাষ করা যাইতে পারে কিন্তু এঁটেল মাটীতে পটোল চাষ করা দুঃসাধ্য। তবে উদ্যোগী পুরুষের নিকট কিছুই অসাধ্য নহে। এঁটেল মাটিতেও পাতা-সার ও পরিমাণ মত বালি মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ গভীররূপে চাষ দিলে পটোল উৎপন্ন করা যায়। অবশ্য জমির এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধন বহুব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং ব্যবসায় হিসাবে ইহা কখনই লাভ জনক হইতে পারে না।

পটোল লাগাইবার উপযুক্ত সময় নির্ব্বাচন সম্বন্ধ এদেশে দুই রকম প্রথা প্রচলিত আছে খনার বচনে দেখা যায় "পটল বুনলে ফাল্গুনে ফল হয় দ্বিগুণে।" অন্যান্য ফসলের বেলায় কৃষকগণ খনার মতানুযায়ী কার্য্য করিলেও পটোলের বেলায় তাহারা বর্ষান্তে আশ্বিন, কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণে—ক্ষেত কতকটা শুষ্ক হইয়া মাটীতে "জো" আসিলেই (অর্থ্যাৎ যখন মাটীর কর্দ্দমাক্ত ভাব যাইবে অথচ জমি নীরস হইবেনা তখন) পটলের মূল বা পুষ্ট-লতা রোপণ করিয়া থাকে। খনার বচনের সারগর্ভতার প্রমাণ আমরা বহুস্থলেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। অথচ এস্থলে খনার বাক্যের কোন মূল্যই নাই—ইহা মনে করাই অন্যায়। কিন্তু তাহা হইলে কৃষকগণ আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পটোল রোপণ করে কেন? তাহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

খনার বচনে আমরা "বুনলে" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই বোনা শব্দটী বপন শব্দেরই অপভ্রংশ এবং কেবল বীজের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। চারা, মূল, লতা, পাতা, ডগা, ডাঁটা প্রভৃতি সম্বন্ধে রোপণ পোতা, লাগান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আমার মনে হয়, খনার যুগে পটোলের বীজ বপনের প্রথাই প্রচলিত ছিল, মূল রোপণের ব্যবস্থা পরবর্ত্তী যুগে পটল চাষের উৎকর্ষের পরিচায়ক।

খনার বচনে ফাল্গুনে পটোলের বীজ বপনের উপদেশ আছে, কিন্তু আজকাল কেহ তাহা পালন করে কিনা জানি না। আবরণের কঠিনতা হেতু বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রম বর্দ্ধনের পর ফলপ্রসূ হইতে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে পরিপুষ্ট মূল হইতে উৎপাদিত গাছে ফল ধরিতে তত দীর্ঘকালের আবশ্যক হয় না। বাজারে "আগাম" পটোল বাহির হইলে ক্রেতা তাহা অধিক মূল্যে ক্রয় করে। সুতরাং ইহা ব্যবসায় হিসাবেও অধিক লাভ জনক এবং তজ্জন্যই আশ্বিন কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে পটোলের সুস্থ এবং পরিপুষ্ট মূল রোপণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে ফাল্গুন চৈত্র মাসেই ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং চৈত্র বৈশাখমাস মধ্যেই পটোল খাদ্যোপযোগী হইয়া থাকে।

পটোলের ডগা ও মূল এই উভয় হইতেই গাছ হইতে পারে। ইহার মধ্যে ডগার চারা অপেক্ষা মূল হইতে উৎপন্ন চারাই ভাল। মূলের চারা সতেজ হয় এবং ফলনও বেশী হয়; কিন্তু ৩।৪ বৎসরের পুরাতন মূল হইতে উৎপন্ন চারা প্রায়ই ষাঁড়াইয়া যায়। অর্থাৎ গাছ অত্যধিক সতেজ হইয়া বিস্তর পত্র ধারণ করে, কিন্তু ফুল ও ফল অতি কম হয়। সুতরাং এক বৎসর বয়স্ক পটোলের মূল রোপণ করা আবশ্যক। মূল নির্ব্বাচন কালে আরও একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পটোলের দুই প্রকার গাছ হয়। উভয় প্রকার গাছেই পুষ্প ধারণ করে কিন্তু ফল একমাত্র স্ত্রী জাতি হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং মূল নির্ব্বাচন সময়ে স্ত্রী জাতির মূলই অধিকাংশ যাহাতে হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু পুংজাতীয় গাছ ক্ষেতে না থাকিলে স্ত্রী পুষ্পে পুংপুষ্পের পরাগ সম্মিলনের অভাবে উহা ফলপ্রসূ হইবেনা।

ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে তাহাতে সারি করিয়া ৪হাত অন্তর অন্তর জমির ভূমি হইতে একমুট উচ্চ এক একটি হাফর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ৪হাত ব্যবধানে ২।৩টি করিয়া মূল লাগাইতে হয়। এক বিঘা জমিতে সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৫সের মূল আবশ্যক হয়। রোপনের পর খড় বা বিচালী পাতলা ভাবে বিছাইয়া হাফর ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক, নতুবা অত্যধিক সূর্য্যোত্তাপে রোপিত মূলের প্রান্তভাগ শুষ্ক হইয়া যায়। হাফরের চতুর্দ্দিকে জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আশ্বিন মাসে মূল লাগাইলে পৌষ মাসের মধ্যেই গাছগুলি লতাইয়া উঠে। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজন মত হাফরে জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। পৌষ মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে পটোলের শিকড় কাটা না পড়ে, এরূপ হাল্কা ভাবে জমির মাটী কোদলাইয়া তাহা হইতে আগাছা

তুলিয়া ফেলিতে হইবে। গাছগুলি একটু বড় হইলেই খড় বিচালী বা বাঁশের শুক্‌নো পাতা দ্বারা হাফরটী ঢাকিয়া দিলে হাফর হইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল সরিয়া যায় অথচ গাছের গোড়া ঠাণ্ডা থাকে এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে গাছের পাতা ও ডগায় কাদা লাগিয়া উহা নষ্ট হইতে পারেনা। এইরূপে আবৃত হাফরে আগাছা প্রায় জন্মেনা এবং গাছের আঁকড়া গুলিও অবলম্বন পাইয়া সহজে লতাইয়া যাইবার সুযোগ পায়।

পটোল গাছে ফুল ধরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গাছের গোড়ায় রেড়ীর অথবা সরিষার খৈল-সার ব্যবহার করিলে ফলন ভাল হয়। রেড়ীর খৈল এতদ্দেশে সহজ-প্রাপ্য নহে, সুতরাং, সরিষার খৈল ২।৩ দিন মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া উহার তেজ কমিলে মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পটোল গাছের গোড়ায় দিতে হইবে, যেন প্রত্যেক গাছের গোড়ায় অন্ততঃ আধপোয়া খৈল পড়ে। ফল ধরিবার পরে গাছের গোড়ায় জলবৎ তরল গোবর-সার সপ্তাহে একবার ব্যবহার করিলেই ফল বৃহৎ এবং সুমিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রয়োজনানুসারে খৈল-সার বৎসরে ২।৩ বার ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। খৈল-সার ব্যতীত পটাশ, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি রাসায়নিক সার পটোলের পক্ষে হিতকর কিন্তু উহা ব্যবহার করা সাধারণের সহজ সাধ্য নহে। বিশেষতঃ উহার মাত্রাধিক্যে গাছের উপকার না হইয়া সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত পটোলের হাফরের দুই সারির মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাঁশের কঞ্চির ৪.৫ ফুট উচ্চ বেড়া করিয়া তাহাতে পটোলের লতা উঠাইয়া দিলে গাছ লতাইবার যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়েই প্রায় সমান ফসল পাওয়া যায়।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

হার জিত্। *

(পল্টু দাসের হিন্দী হইতে)

আমার সাথে ঝগ্‌ড়াতে কেউ জিত্‌তে নাহি পারে।
চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাকি, কাজেই সবে হারে॥

লাইকারগাস ও তাঁহার শিক্ষানীতি।

মনু যেমন হিন্দুদিগের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজ নীতির ব্যবস্থাপক; লাইকারগাসও তেমনি প্রাচীন গ্রীকদিগের রাজনীতি ও শিক্ষানীতির ব্যবস্থাপক ছিলেন। লাইকারগাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হোমার ও লাইকারগাস সমসাময়িক। ষ্ট্রেবোর মতে লাইকারগাসের আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ৯০০ অব্দ আবার কেহ বলেন, লাইকারগাস অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। (১)

প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া খৃঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। এত মতভেদের ভিতর হইতে লাইকারগাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ঠিক সময় নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া বড়ই কঠিন। লাইকারগাসের পিতার নাম ইউনোমাস (Eunomus)। (২) ইউনোমাসের দ্বিতীয়া পত্নী ডায়নাসার (Dianassa) গর্ভে লাইকারগাসের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা যখন স্পার্টার রাজা ছিলেন, তখন স্পার্টায় ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল; প্রজা দিগের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত। একদা ইউনোমাস প্রজাদিগের দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণ করিতে গিয়া গুরুতররূপে আহত হইলেন। এই আঘাতের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হইল। লাইকারগাসের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলিডেকটিন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিবার অল্পকাল পরেই তিনিও পিতার অনুসরণ করিলেন। কাজেই লাইকারগাস রাজা হইলেন। লাইকারগাস রাজা হইয়া শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃ জায়া অন্তঃস্বত্বা। তিনি ঘোষণা করিলেন "যদি রাণীর গর্ভে পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তবে সেই রাজ সিংহাসন অধিকার করিবে; রাজপুত্র ভূমিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাহার প্রতিনিধি হইয়া রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।"

তাঁহার ভ্রাতৃ জায়া রাণী মাতা—লাইকারগাসের ঘোষণা পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া একদিন অতি সঙ্গোপনে

(১) *Plutarch's life of Lycergus.*

(২) কেহ কেহ বলেন—লাইকার গাসের পিতার নাম প্রিটানিস (Prytanis)

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর, তবে আমি আমার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিয়াই তোমার পাটরাণী হইব। সহৃদয় লাইকারগাস রাণীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "তথাস্তু, কিন্তু আপনি গর্ভস্থ সন্তানটি ঔষধাদি প্রয়োগে নষ্ট করিতে পারিবেন না। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই আমি ইহাকে মারিবার আয়োজন করিব, আপনাকে সেজন্য ভাবিতে হইবে না।" এইরূপ সুকৌশলে সময় কাটাইয়া রাণীর গর্ভস্থিত সন্তান যাহাতে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, লাইকারগাস তাহাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু লাইকারগাস যে রাণীকে বিবাহ করিবেন না, একথা তাহাকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেওয়া হইল না। এদিকে রাণী মনে মনে ভাবিলেন, যদি কোন প্রকারে সন্তান প্রসব হইয়া যায়, তবেইত লাইকারগাসকে বিবাহ করিয়া স্পার্টার রাণী হইয়া আবার নবীন দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিতে পারিব। যখন এই ভাবী সুখের কল্পনায় রাণীর হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল, তখন একদিন সহসা প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। লাইকারগাস রাণীর প্রসব বেদনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই রাণীর নিকট লোক পাঠাইলেন। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল "যদি রাণী কন্যা প্রসব করেন তবে ধাত্রীদের হাতে সমর্পণ করিও, পুত্র হইলে, তৎক্ষণাৎ আমার নিকট নিয়া আসিবে।"

লাইকারগাস যখন ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত ভোজন করিতেছিলেন তখন রাণীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, তাঁহার প্রেরিত লোক অমনি নবজাত শিশুকে লাইকরগাসের নিকট আনিয়া হাজির করিল। লাইকারগাস তখনই শিশুটিকে হাতে লইয়া বলিলেন, "স্পার্টার অধিবাসিগণ, এই দেখুন, আপনাদের নবজাত রাজা"। তিনি তখনই তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া করিলাস (Charilaus) নামে অভিহিত করিলেন। লাইকারগাসের রাজত্ব শেষ হইল। তিনি মাত্র আটমাস রাজা ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিল। সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত; তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া সুখী হইত। কিন্তু রাণীর দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় রাণী তাহার পরম শত্রু হইলেন। রাণীর ভ্রাতা লিনিদাস (Leonidas) পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছিল। লিনিদাস লাইকারগাসের বিরুদ্ধে নানা কুকথা রটনা করিতে লাগিল। লিনিদাস একদিন প্রকাশ্য সভায় বলিল, "লাইকারগাস নিজেই রাজা হইবেন কিন্তু লোকের মন ভুলাইবার জন্য সম্প্রতি সাদ্যোজাত রাজকুমারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" লিনিদাসের বক্তৃতা শুনিয়া সর্ব্ব সাধারণের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্পার্টার বহুলোক লাইকারগাসের শত্রু হইয়া তাহার প্রাণনাশের উপক্রম করিল। লাইকারগাস প্রাণভয়ে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়া নানা দেশ পর্য্যটনে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। তিনি প্রথমে ক্রিট দ্বীপে বহুকাল বাস করিয়া তথাকার রাজনীতি ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ক্রিটের রাজনীতি ও সমাজনীতিই লাইকারগাস স্পার্টায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ক্রিট হইতে লাইকারগাস এশিয়ায় গমন করেন। তিনি এশিয়ার বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন এবং হোমারের কাব্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনিই নাকি হোমারের বীর রসাত্মক কাহিনী এশিয়া হইতে স্পার্টায় আনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। (১)

পাইথাগোরাস ও ডায়ওনিসাস (২) প্রভৃতির ন্যায় লাইকারগাস ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। জেনোফোণ ও এরিষ্টক্রেটিস বলেন যে লাইকারগাস ভারতে ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ভারতের অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও দার্শনিক পণ্ডিতের (Gymnosophists) সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি নাকি হিন্দু সমাজের কঠোর সংযম সাধনার আদর্শের সহিত গ্রীক সভ্যতা ও সাধনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গ্রীক্ সমাজে তাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মিশর প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি। প্লেটো, পাইথাগোরাস প্রভৃতি গ্রীসের বড় বড় দার্শনিকগণ মিশরে দীর্ঘকাল বাস করিয়া মিশরীয় সভ্যতা ও সাধনার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লাইকারগাস ও মিশরীয় আচার

(১) *Plutarch's life of Lycurgus.*

(২) *Grote's History of Greece Vol. P. 224.*

ব্যবহার, রীতিনীতি শিক্ষা করিবার জন্য মিশরের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। (১)

লাইকারগাস যখন এইরূপে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন তখন স্পার্টার অধিবাসিগণ তাহার অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন।

দেশের লোক তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন; দেশবাসীর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেশের শাসননীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিলেন।

আমরা আজ তাহার শিক্ষানীতির কথাই আলোচনা করিব।

লাইকারগাসের শিক্ষানীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—আদর্শ সৈন্য গঠন করা। তাহার কারণ, স্পার্টার চারিদিক তখন শত্রু বেষ্টিত ছিল। কে কখন আক্রমণ করিয়া স্পার্টা অধিকার করিয়া বসে, তাহার নিশ্চয়তা ছিলনা। তাই স্পার্টায় তখন সুশিক্ষিত সৈন্যের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

লাইকারগাস ব্যবস্থা করিলেন—

স্পার্টার অধিবাসীরা স্বীয় সন্তানকে যাহা ইচ্ছা তাহা শিক্ষা দিতে পারিবেন না। সন্তানের জন্ম হইলেই সন্তানকে লেস্‌কি (Lesche) নামক স্থানে প্রাচীন লোকদিগের সভায় নিয়া যাইতে হইবে। যদি সেই সভা পরীক্ষা করিয়া বলেন যে সন্তান সুস্থ, সবল; সে দেশের ও দশের কাজে লাগিবে, তবে পিতামাতা সেই সন্তান রক্ষা করিতে পারিবেন ও ভরণ পোষণের জন্য উপযুক্ত জমি পাইবেন। আর যদি পরীক্ষায় সন্তান বিকলাঙ্গ অথবা রোগা বলিয়া ধার্য্য হয়, তবে এপোথেটি (Apothetoe) নামক গভীর পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইত।

সাত বৎসর পর্য্যন্ত ধাত্রী এবং জননী উভয়েই সন্তানকে নানাপ্রকার শিক্ষা দিবেন। মাতা কখন সন্তানকে একাকী অন্ধকারে রাখিয়া নির্ভীকতা, শিক্ষা দিবে। আবার সময় সময় সন্তানকে যথেচ্ছ আহার প্রদানে ভোজন সংযম শিক্ষা দিবেন। শিশুর শরীর যাহাতে কষ্ট সহিষ্ণু হয় তজ্জন্য তাহাকে শীতে উন্মুক্ত গাত্রে ফেলিয়া রাখারও ব্যবস্থা ছিল।

জাপানেও নাকি বাল্যকাল হইতে যাহাতে সন্তানের হৃদয়ে বীরত্বের উন্মেষ হয়, তৎপ্রতি জনক জননীগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। শুনিয়াছি জাপানী জননীগণ অল্প বয়স্ক পুত্রগণকে নির্ভীকতা শিক্ষা দিবার জন্য সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারে শ্মশানে প্রেরণ করেন। আর আমাদের দেশে জননীগণ এমনি ভাবে পুত্রকে আদরের নন্দ দুলাল বা ননীর পুতুল করিয়া গড়িয়া তুলেন—যেন সে ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়। অভিমন্যুর দেশের আজ এই অবনতি!

স্পার্টার পিতামাতা সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিলেই স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে সেনানিবাসে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য ছিলেন। সেখানে থাকিয়া তাহারা রাজকীয় ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিত। যাহাদের বয়স বার বৎসরের কম তাহাদের মধ্যে যে চরিত্রবান ও সৎসাহসী বলিয়া গণ্য হইত, তাহাকেই ছোট ছাত্রগণের নেতা (Captain) ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইত। তাহারা সকলেই নেতার আদেশ ও উপদেশ মানিয়া চলিত। কেহ কোন অপরাধ করিলে নেতা তাহাকে শাস্তি দিতেন এবং নেতার শাস্তি সকলে শিরোধার্য্য করিয়া লইত। ছেলেদিগকে নেতার হাতে সমর্পণ করিলেও তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা ছিল। বার বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা বেশ চালাক চতুর তাহারাই প্রাচীনদিগের পরম প্রীতি ও স্নেহ ভাজন হইতেন।

ছাত্রগণ সরকারী সেনানিবাসে শয়ন করিত, একত্র এক টেবিলে বসিয়া সকলে আহার করিত, খাদ্যাহরণে পরস্পরকে সাহায্য করিত; একত্র শিকার করিত, ধর্ম্ম-মন্দিরে নৃত্যগীতে যোগদান করিত। অবশিষ্ট সময় তাহারা দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, অস্ত্র নিক্ষেপ, ঘুষাঘুষি কুস্তাকুস্তি ইত্যাদি শিক্ষা করিত।

৭ হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়া দেশ জননীর পূজায় নিযুক্ত হইত।

অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই তাহারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিত। দুই বৎসর অস্ত্রশস্ত্র পরিচালন ও রণ কৌশল শিক্ষায় কাটিয়া যাইত। তখন প্রতি দশ দিন অন্তর যুদ্ধ বিদ্যার একটা পরীক্ষা হইত। তারপর ২০ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া তাহাদের লব্ধ

(১) *Plutorchs life of Lycurgus.*

বিদ্যার পরীক্ষা প্রদান করিত। ইহার পর তাহারা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত। তখন তাহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও সেনানিবাসেই বাস করিতে পারিত, এবং ছাত্রদের সঙ্গে আহার-বিহার ও ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিত; প্রয়োজন হইলে সমরাঙ্গণে ও অবতীর্ণ হইত। (১) নাগরিক হইয়া তাহারা বিবাহ করিতে পারিত। তখন মাঝে মাঝে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইত বটে কিন্তু তাহাদিগকে আজীবন সেনানিবাসে থাকিয়াই দেশের ও দশের কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিতে হইত।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

শাওণ-ঘন-বাদল রেতে।

শাওণ-ঘন-বাদল রেতে
কোথায় যেতে কে ডাকে?
কইতে নারি, সইতে নারি,
রইতে নারি সে-ডাকে!
কাহার যেন মরম-মরা—
হা হা-করা কাহিনী;
উতল-হাওয়ায় মিশে গিয়ে
ভূতল ভরা বাহিনী!
অন্ধকারের বন্ধ কারায়
বন্দিনী কে রূপসী?
কাহার কাছে মুক্তি যা'চে—
যুগ-জনমের উপোসী?
হৃদয় কেন নিদয় হেন
তাহার পাশে ছুটিতে?
অবল কেন সবল বাহু
বাঁধন তা'রি টুটিতে?

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

বিনোদিনীর অদৃষ্ট।

(১)

"মা বলনা, বাবা কবে আসবে? এবার বাবা এলে আমিও বাবার সঙ্গে যাব। ও বাড়ীর ননী কেমন তার বাবার সঙ্গে সহরে থাকে, আমিও কেন থাক্‌বনা মা?"

ছেলের এ কথায় মাতা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ছেলেকে কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "যাবেইত বাবা, বড় হলে যেও।"

মায়ের আশ্বাস বাক্যে আনন্দিত হইয়া, বল হাতে লইয়া ছেলে সঙ্গীদের সাথে খেলিতে গেল।

ছেলের মা বিনোদিনী ভারাক্রান্তমনে সেইস্থানে বসিয়া আপন অদৃষ্টটা পূর্ব্বাপর ভাবিতে লাগিল।

(২)

বিনোদিনী জন্মিয়াছিল, যদিও বাঙ্গালারই কোন গরীব পরিবারের মধ্যে, কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়াছিল ধনী পরিবারে। স্বামী শচীন্দ্রনাথ অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান। তাহার পিতা গিরীন্দ্র রায় মৃত্যুকালে পৈতৃক সম্পত্তি ও নগদে অনেক বিষয় রাখিয়া যান বটে কিন্তু পুত্রকে বেশী উপযুক্ত রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কেননা মাতৃহীন পুত্র তাহার বড়ই আদরের ছিল। অধিক আদুরে ছেলেদের যে অবস্থা হয়, শ্রীমান শচীন্দ্রনাথও সেই শ্রেণীতে দাঁড়াইল। পুত্রের অবস্থা ভাবিয়া পিতা তাড়াতাড়ি, সুন্দরী ও বয়স্থা দেখিয়া গরীবের ঘরেই ছেলের বিবাহ করাইয়া ফেলিলেন। ভাবিলেন বধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুত্রের বিপথগামী মন অবশ্যই ফিরিবে।

বিনোদিনী শ্বশুরের সেবা শুশ্রূষা প্রাণপণ যত্নে করিয়াছে। বিপথগামি স্বামীর মনোরঞ্জনার্থও প্রাণান্তকর চেষ্টা এবং যত্ন করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই শচীন্দ্রনাথকে পথে আনিতে পারে নাই।

সহসা এই সময়ে গিরীন বাবুর জন্য পরলোকের পরোয়ানা আসিয়া হাজির হইল। মৃত্যুকালে তিনি পুত্রবধুকে বলিয়া গেলেন, "মা, তুমি আমার বংশের লক্ষ্মী, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুপুত্রের জননী হও। আমি এই ভিটা-বাড়ী তোমাকেই দিয়া গেলাম।"

---

(১) *Text book in the History of Education chap. III P. 75 Monroe.*

বিনোদিনী সাশ্রুলোচনে শ্বশুরের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুত্রকে বলিয়া গেলেন—"বাবা, আমি চলিলাম; তুমি আমার বংশের নাম রক্ষা করিও।"

পুত্রের উশৃঙ্খল স্বভাবের বিষয় জানিয়াও, পুত্রেরই হাতে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ি দিয়া গেলেন। অত্যধিক স্নেহান্ধতা বশতঃ পুত্রকে অভাবের মধ্যে ফেলিয়া টাকা কড়ি ও বিষয় সম্পত্তির অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে তাহার স্নেহশীল মন কিছুতেই সায় দিল না। কেবল ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বাস্তু ভিটাটুক পুত্রবধু বিনোদিনীর নামে, পৃথক করিয়া রাখিয়া গেলেন মাত্র।

শচীন্দ্রের উশৃঙ্খলতার পথে যে টুকু বাধা এতদিন ছিল, পিতার মৃত্যুতে তাহা সরিয়া গেল। অর্থ-বিত্ত সকলি এখন তাঁহার হাতে পড়ায় পাপের পথে সে ধাপের পর ধাপ দ্রুত গতিতে নামিতে লাগিল।

বিনোদিনী কি করিবে? শ্বশুরের অসুখে ও মৃত্যুতে শচীন্দ্রকে গৃহে পাইবার যে সুযোগ বিনোদিনী পাইয়াছিল, এই সুযোগে সে যতদূর পারিল—কাঁদিয়া, অনুনয় বিনয় করিয়া স্বামীকে সুধরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সে তাহার মোহ ভাঙ্গিতে পারিল না। বরং হিতে বিপরীত হইল; পিতা জীবিত থাকিতে শচীন্দ্র যাহাও পিতাকে দেখিতে দুই একবার গৃহে আসিত, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাও ছাড়িল।

স্বামীর এইরূপ অবহেলা পাইয়া প্রথম প্রথম বিনোদিনীর এমন ইচ্ছা হইত যে, সে বিষ খাইয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে তাহার এই দারুণ লাঞ্ছিত জীবন অবসান করিয়া দেয়; কিন্তু সে তাহা পারিল না।

শ্বশুরের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বিনোদিনীর একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রমুখ দেখিয়া বিনোদিনীর নিরাশ প্রাণে আশার আলোক-সঞ্চার হইল; খোকার চাঁদ মুখ দেখিয়া সে তাহার জীবনের সকল দৈন্য, সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল।

বিনোদিনী ভাবিল—এইবার নিশ্চয় স্বামীর মন ফিরিবে; আমাকে অবহেলা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কি এমন ননীর পুতুলকেও অবহেলা করিতে পারেন? কখনই না! নিশ্চয় তিনি খোকার সংবাদ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিবেন।

হায়, বিনোদিনীর দুরাশা! শচীন্দ্রের নিকট এ সংবাদ পঁহুছিলে, সে তাহার একটা প্রতি-উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করিল না। দিন গণিয়া বিনোদিনী ক্লান্ত হইয়া গেল, কিন্তু সে ক্লান্তি তাহাকে অবসন্ন করিতে পারিল না। যখনই সে নিরাশার কথা ভাবিত, তখনই সে তাহার বুকের ধনকে নিবিড় ভাবে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার অশান্ত মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিত।

খোকাকে বুকের মাঝে পাইলেই সে সান্ত্বনা পাইত—স্বামী নাই বা তাহাকে ভাল বাসিলেন; এই শিশুতো সেই স্বামীরই স্মৃতি? আর কোন কারণে না হইলেও কেবল এই শিশুর জন্যই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

বিনোদিনীর আঁধার জীবনে আলোর জ্যোতি আনিয়াছে এই শিশু, তাই সে আদর করিয়া পুত্রের নাম রাখিল—জ্যোতির্ম্ময়।

(৩)

স্কুল হইতে দৌড়িয়া আসিয়া জ্যোতির্ম্ময় তাহার মাকে গদগদ কণ্ঠে বলিল—"মা শুনেছ, আমি পরীক্ষায় সর্ব্বার উপরে হয়েছি—প্রথম হয়েছি"

"বাবা আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবি হও—তোমার ঠাকুর দাদার নাম বজায় রাখ..."

"বলিয়া মা ছেলেকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন।

মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া দুঃখিনীর ধন জ্যোতি বলিল—"মা আস্‌ছে বছরতো আমার শেষ পরীক্ষা, তারপর তো এখান থেকে আর পড়া চলবে না; তখন কি করবো মা?"

পুত্রের কথায় বিনোদিনীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। কিরূপে যে সে নিরাশ্রয় অবস্থায়ও তাহার এই সবে-ধন-নীলমণিকে এ পর্য্যন্ত মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

শচীন্দ্রের দেনার দায়ে তাহার সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হইয়া গিয়াছে, তবু তার নেসা ছুটে নাই। স্ত্রী বা পুত্রের খোঁজ সে রাখে না।

বিনোদিনীর নামে রক্ষিত এই বসত বাটী, আর তাহার খান কতক গহনাই বিনোদিনীর সম্বল। এই সামান্য সম্বলের উপর সাহস স্থাপন করিয়া, চড়কায় সুতা কাটিয়া, বাঁশ ও বেতের নানা রকম জিনিষ তৈয়ার করিয়া, তাঁতিদের

নূতন জামদানীর পাইড় বুনিয়া—নানা উপায়ে বিনোদিনী অতি সামান্য যাহা উপার্জ্জন করিতেছিল—তাহা দ্বারাই দুঃখে কষ্টে সে ছেলেটীকে মানুষ করিতেছিল।

গ্রামে কোন স্কুল ছিল না। গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটা এণ্ট্রেন্স স্কুল ছিল, সেই স্কুলে যাইয়া জ্যোতির্ম্ময় পড়িত। কত কষ্টে যে তাহার মা তাহার পড়া চালাইত—স্কুলের বেতন দিত, পুস্তকের মূল্য দিত, কাপড় চাদর যোগাইত—জ্যোতির্ম্ময় তাহা সময় সময় ভাবিত। অনেক দিন সে তাহার দুঃখিনী মায়ের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। সে অনেক অভাব সহ্য করিত, তথাপি মায়ের প্রাণে আঘাত দিবার মত কোন আবদারই করিত না।

বাল্যকালে জ্যোতির পিতার নিকট যাইবার, পিতার কথা বলিবার ও বলাইবার যে বাহানা ছিল; এখন আর তাহার তাহা নাই। মা তাহাকে সহজে যাহা দিতে পারেন, তাহা লইয়াই সে সুখী। স্কুলে যাইবার বেলা পূর্ব্ব দিনের বাশি ভাত এবং স্কুল হইতে আসিয়া দ্বিপ্রহরের ঠাণ্ডা ভাত তাহার নিকট অমৃত। অনেক দিন ইহাও যে তাহার ঘটে না—তাহা ভাবিয়াও সে দুঃখিত নহে।

(৪)

ইহার পর আরে এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। জ্যোতিকে এখন পরীক্ষার ফিস দাখিল করিতে হইবে। বিনোদিনীর চিন্তার অবধি নাই। গত রাত্রিতে চাউল অভাবে বিনোদিনীর অন্নাহার ঘটে নাই, প্রাতে চাউল সংগ্রহ করিয়া ১০টার পূর্ব্বেই ছেলেকে গরম ভাত খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াছে, তারপর নিজে খাইয়াছে। জ্যোতি এতটা জানিত না; কেবল চাউল যে ছিল না, তাহাই সে তাহার মায়ের একটা অনবধান কথায় জানিতে পারিয়াছিল।

জ্যোতি স্কুল হইতে আসিয়া মায়ের দেওয়া তেল ও নুন মাখানো চাল ভাজা খাইতেছিল। বিনোদিনী ছেলেকে আহারের দিয়া নিকটেই বসিয়া চড়কায় সুতা কাটিতেছিল।

জ্যোতি চাল চিবাইতে চিবাইতে জিজ্ঞাসা করিল—"চাল গুলি যে ভাজলে মা, কালকার উপায় কি? কাল কোথায় যাবে বল"?

ছেলের কথায় বিনোদিনীর বক্ষ পঞ্জর আন্দোলিত করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা চাপিয়া রাখিয়া বিনোদিনী বলিল—"না বাবা, কালকার জন্য ভাবতে হবে না আর···"বলিয়াই বিনোদিনী ছেলের জন্য জল আনিতে চলিয়া গেল।

জ্যোতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাইল, তারপর জলের গ্লাস নিঃশেষে পান করিয়া বলিল—"মা পরীক্ষার যে এখন ফিস দিতে হবে···কোথা হতে দেবে মা?" কথাটী শেষ করিয়া জ্যোতি চিন্তিত হইল হায় মার মনে না জানি কত গুরুতর চাপ দেওয়া হইল কত ভাবনার তুফান বহাইয়া দেওয়া গেল।

পুত্রের মনের ভাব বুঝিয়া মাতা ম্লান মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিলেন—"পাশ যখন হয়েছস ফিসতো দিতেই হবে—চিন্তা কি বাবা, দিব।"

"কোথা থেকে দিবে মা, কালই যে দরকার; আমাদের যে কিছুই নাই—আজকারই চাউল ছিল না···"

"যেমন করিয়া পারি, দিব; সে জন্য তোর কিছু চিন্তা নাই; কাল স্কুলে যাওয়ার সময়ই তুই নিয়ে যাস টাকা।"

পরীক্ষার ফিস সম্বন্ধে বিনোদিনী আজ কয়দিন হইতে চিন্তা করিতেছিল এবং সে কতকটা নিশ্চিন্তও হইতে পারিয়াছিল। ছেলেকে ভরসা দিয়া উৎসাহিত করিয়া বাহির করিয়া দিয়া বিনোদিনী সিন্দুক খুলিয়া বাক্স হইতে তাহার সোনার বালা বাহির করিল এবং তাহা লইয়া গিয়া প্রতিবাসী হারাধন স্বর্ণকারের স্ত্রীর নিকট বাঁধা রাখিয়া ছেলের জন্য টাকা আনিল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে গৃহ কর্ম্মে মনোযোগ দিল।

(৫)

দশ টাকা জলপানি লইয়া জ্যোতি এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছে। আজ দুঃখিনী বিনোদিনীর আনন্দের আর সীমা নাই। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্যোতিকে আদর করিত। সকলেই আসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। পাড়ার বর্ষিয়সী মেয়েরা বিনোদিনীকে উৎসাহিত করিয়া বলিতে লাগিল—"বউ তুমি রত্নগর্ভা। জ্যোতি যদি এখন তোমায় সুখের মুখ দেখায়···"

সেই দিন রাত্রিতে মায়ের বুকের কাছে শুইয়া জ্যোতি বলিল—"মা পাসতো হইলাম, এখন কি করব বল..."

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর কি করিতে ইচ্ছা হয় বাবা, শুনি?"

মায়ের মুখের পানে চাহিয়া জ্যোতি বলিল—"ইচ্ছাতো

কতই হয় মা। ইচ্ছা হইলেই কি কাজ করা যায়…"

মনের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া হাসিমুখে বিনোদিনী বলিল "শোন ছেলের পাকামো কথা। কি করিতে চাস তুই বল না?"

"চাকুরী করাই এখন দরকার; কি বল মা? তবে আমার বড় ইচ্ছা ছিল ডাক্তারী পড়তে।"

মা বলিলেন—"তাহাতেতো অনেক টাকার দরকার, এত টাকা কোথায় পাব বাছা! সে কি হবে?"

মায়ের উত্তরে জ্যোতির প্রফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল বটে কিন্তু তবু সে হাসিমুখে বলিল—"কাজ নাই মা, ডাক্তারী পড়ে, আমি চাকরীর খোজই করব।"

পুত্রের আকাঙ্ক্ষা-হত নিরাশ মলিন মুখের ছায়া মায়ের বুক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। বিনোদিনী কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন "দেখি বাবা, কি করলে সুবিধা হবে—একটু ভেবে চিন্তে দেখি। ডাক্তারী পড়ার যদি ইচ্ছা হয়, তাহাই পড়িস…এখন ঘুমা…"

পরদিন সারাদিন বিনোদিনী ভাবিল; ভাবিয়া স্থির করিল—ছেলের সৎ ইচ্ছায় আমি বাধা দিব না। কিন্তু ছেলেকে কোল ছাড়া করিয়া—বুক ছাড়া করিয়া আমি থাকিব কেমন করিয়া। এই ষোল বৎসর আমি যে জ্যোতিকে ছাড়া একরাতও ঘুমাই নাই—

ছেলেকে চক্ষের অন্তরালে পাঠাইবার কথা মনে হইলেই বিনোদিনীর বুক ফাটিয়া কান্না উঠিত।

রাত বিছানায় শুইয়া বিনোদিনী ছেলের মাথার চুল গুলি উস্কাইতে উস্কাইতে বলিল—"হারে জ্যোতি, তুই যে বিদেশে যেতে চাস আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি তো?"

"তোমাকে ছেড়ে থাকবো কেন মা। চাকরী যদি ভগবান মিলাইয়া দেন, তোমার সঙ্গে থাকিয়াই চাকুরী করিব…"

না বাছা, চাকুরীতে কাজ নাই, তুমি ডাক্তারীই পড়…"

মায়ের কথায় জ্যোতির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তবু সে মাকে বলিল—"খরচ চলিবে কোথা হইতে মা?"

হাসিয়া বিনোদিনী উত্তর করিল—"খরচ আমি যেমন করিয়া—সর্ব্বস্ব বেচিয়া যোগাইব, সে জন্য তোর চিন্তা কি? কিন্তু একটা ভাল থাকিবার স্থানতো চাই। সহরে আমাদের আত্মীয়-স্বগণ জানা শোনা—কেহই সেনাই"

জ্যোতি আনন্দ উৎফুল্ল বদনে বলিল—"আছে মা—জানা লোক আছে। ঢাকাতে আমাদের হেডমাষ্টার বাবুর ভাই থাকেন। হেডমাষ্টার বাবু আমাকে বড় ভালবাসেন, তিনি কালও আমাকে বলছিলেন, তার ছেলে সুধীরের সঙ্গে একত্র যাইয়া একসঙ্গে থাকিয়া পড়িতে। আমি যদি ঢাকা যাই তো তিনিই সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন"

* * * *

তাহাই হইল। বিনোদিনী তাহার সমস্ত গহনা পত্র বিক্রয় করিয়া ছেলেকে ডাক্তারী পড়াইবেন—সঙ্কল্প করিলেন এবং যথা সময় সুধীরের সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া শূন্য গৃহে শূন্য প্রাণের হাহাকার লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

(৬)

দুঃখের দিন কাহারও জন্য চিরদিন বসিয়া থাকে না। বিনোদিনীরও দুঃখের দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রৌঢ়ে আসিয়া বিনোদিনী সুখের মুখ দেখিল।

জ্যোতি যথাসময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরী লইয়াছে। মাতা পুত্রের কর্ম্মস্থলেই আছেন। বিনোদিনীর মনে এখন আর কোন দৈন্য, কোন শূন্য নাই। পুত্রকে বিবাহ করাইয়া পৌত্রের মুখ দেখিতে পাইলেই তাহার সাধ পূর্ণ হইত। জ্যোতি পিতাকে গৃহে না ফিরাইয়া আনিতে পারিলে বিবাহ করিবে না—বলায় বিনোদিনী তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিতেছে না।

এদিকে শচীন্দ্রনাথেরও কোন খোজ নাই। ৭।৮ বৎসর যাবৎ শচীন্দ্র যে কোথায় আছে, কেহই বলিতে পারে না। জ্যোতি নানা উপায়ে পিতার অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।

(৭)

জ্যোতি যশোহর জেলে বদলী হইয়া আসিয়াছে। বিনোদিনী সঙ্গেই আছেন। মাতার ইচ্ছা নিজ পল্লি গৃহের ন্যায় সহরের বাসায়ও তরি-তরকারীর বাগান করেন। জেলের ডাক্তারের পক্ষে ইহা খুব ব্যয় সাধ্য ব্যাপার নহে। ইচ্ছা যখন-তখনই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল।

ডাক্তারের অনুরোধে জেইলার কয়েদি খাটাইয়া বাগান প্রস্তুত করিয়া দিতে ওয়ার্ডারকে ইঙ্গিত করিলেন—কার্য্য আরম্ভ হইল।

জ্যোতি মাকে বলিল—"আপনি রঘুকে দেখাইয়া দিবেন—কোন দিকে কিরূপ করিবে—আমি জেলে যাই।"

রঘু সরকারী চাকর, জেলের ডাক্তারের বাসায় কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

জ্যোতি চলিয়া গেল। বিনোদিনী বেড়ার আড়ালে থাকিয়া রঘুর মারফতে প্রয়োজন মত তাহার ইচ্ছা জানাইল ও দেখাইয়া দিল। ওয়ার্ডার সেই নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করাইতে লাগিল।

কয়েদীদ্বয়ের কার্য্য বিনোদিনী নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়াছিল এবং চিন্তা করিয়াছিল। আজ সকলদিকের কাজ শেষ হয় নাই, কালও তাহারা আসিবে। বিনোদিনী কালও তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবে। বিনোদিনীর লক্ষের বিষয় ছিল যাহা—যাহা সে সারা দিন-রাত চিন্তার বিষয় করিয়া বসিয়াছিল, পরের দিন তাহার সেই চিন্তায় ব্যাঘাত পড়িল।

পরদিন ১০টায় দুটী নূতন কয়েদীকে লইয়া ওয়ার্ডার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদিনী পূর্ব্ব দিন যাহাকে দেখিয়াছিল, যাহার বিষয় সে সন্দেহ করিয়া সারা রাত ভরিয়াছিল, আজ যাহাকে আরও অধিক মনোযোগের সহিত সন্দেহ ভাঙ্গিয়া দেখিবে মনে করিয়াছিল—বিনোদিনীর আশা উৎফুল্ল আঁখি দেখিল—সে কয়েদীটী আসে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে—আর দুইজন নূতন লোক।

বিনোদিনী রঘুকে জিজ্ঞাসা করিল—"হারে রঘু কাল যে দুজন কাজ করিয়াছিল, তারা এলোনা কেন ?"

রঘু উত্তর করিল—"সে কয়েদী ছুছরা কামে গেছে—কত কাম, তারকি পরিমাণ আছে ?"

বিনোদিনী স্থির করিল—জ্যোতি আসিলে আজ তাহা ক বলিয়া দেখা যাইবে। বিনোদিনী তাহার মনের সন্দেহ মনে চাপিয়া রাখিয়া উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইল।

রাত্রিতে বিনোদিনী পুত্রের নিকট তাহার মনের সন্দেহ জানাইল। জ্যোতি ভোরে উঠিয়াই জেলখানায় চলিয়া গেল।

জ্যোতি ও জেইলার উভয়ে কয়েদির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিল। অনুসন্ধানে জানাগেল শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নামক যে কয়েদীকে গত পরশ্ব দিবস জেলের ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে মোতায়েন দেওয়া গিয়াছিল, তাহার ম্যাদ অন্ত হওয়ায় গত কল্য সে মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

জ্যোতি পিতার উদ্দেশ্যে চারিদিকে লোক পাঠাইল। কিন্তু কেহই কোন সুখবর লইয়া আসিতে পারিল না।

বিনোদিনী অদৃষ্টের দিকে তাকাইয়া—বহুদিন পরে—আজ নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিল।

শ্রীনলিনীবালা নাগ।

"কাকস্য পরিবেদনা"।

১

বসিয়াছে বেণুবনে বিহঙ্গের সান্ধ্য সম্মিলন !
চলিতেছে তাহাদের সম্মিলিত আনন্দ-ঝঙ্কার !
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, চতুর্দ্দিকে জমে অন্ধকার !
নিশান্তে চলিয়া যাবে !—মানবের এমনি জীবন !
যতকাল আছি ভবে সকলের কত না আপন !
জীবনে জ্বলিয়া যবে চলে' যাব বৈতরণী পার,
দু'ফোঁটা ফেলিবে অশ্রু দু'টী দিন যারা 'আপনার' !
তারপর সবশেষ ! কার্ কথা কে ভাবে কখন্ !
যতদিন বেঁচে আছি বাঙ্গলার নীল নভোতলে,
নানা পাখী-মুখরিত চির-রম্য পল্লী-নিকেতনে,
ধ্যান-মগ্ন দিনগুলি কাটাইয়া অতি কৌতুহলে,
রভস-আবেশে যেন চলে' পড়ি দক্ষিণ পবনে !
যে সুর ধ্বনিছে আজি সুখে দুঃখে হৃদয়ের বলে,
রেশ্ তার সমীরিবে বাঙ্গালার গগনে ভুবনে।

২

ভুক্তিতে আসিনি বিশ্ব ভোগাতুর বিষয়ীর মত,
বিলাস-ব্যসনাসক্ত নহি, নহি,—চির-উদাসীন।
মৃত্যুালয়ে খেলা করি, শব-বক্ষে কাটে রাত্রিদিন ;
শিবের সাধনা করি, অমঙ্গল চরণে প্রণত।
বহুক বিপদ-ঝঞ্ঝা, ঈর্ষা-বৃষ্টি হোক অবিরত,
অন্যায়-অশনি-ঘাতে কভু চিত্ত হবে না মলিন ;
অত্যাচার-প্রেত-ভয়ে প্রাণশক্তি হয় কি বিলীন ?
প্রকৃতি শাক্তের কাছে চিরকাল র'বে অনুগত।
মৃত্যুঞ্জয়ে পূজি নিত্য মৃত্যু হেরি' মাথার সকাশে,
মৃত্যু-ভীতি নাহি তবু, নাহি মজি ভোগ-লালসায় ;
জগতে এসেছি যবে স্মৃতি-চিহ্ন রাখিবার আশে,
কায়-মনঃ-প্রাণসহ ধ্যানমগ্ন দিবস নিশায় ;
অমৃতের পুত্র যেবা, কে না তারে সদা ভালবাসে ?
প্রবাসে আনন্দে রহি' চলে' যাব দেশে পুনরায় !

৭ই আষাঢ় ১৩৩১।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, রাধানগর।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন এবার হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে হইয়াছে। এ গ্রামে রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মার্টিন কোং'র লাইট রেলওয়ে চাঁপাডাঙ্গা হইয়া আমরা গিয়াছিলাম। আর একটা পথ আছে, তাহা ই, আই রেলের কোলাঘাট হইয়া যাইতে হয়। পরে ষ্টিমারে যাইতে হয়। ষ্টিমার ছাড়িয়া কতদূর যাইতে হয় গো-গাড়ী বা পাল্কীতে। কর্ম্মকর্ত্তারা যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা চাপাডাঙ্গায় রাত্রে গিয়া থামিলাম, তখন রাত্রি ১০টা। চাপাডাঙ্গা নামিয়া আমাদের জন্য গো-গাড়ী ও পাল্কী এবং হাতী পাইলাম। কেহ পাল্কীতে কেহ হাতীতে যাত্রা করিলাম। আমি একখানা পাল্কী দখল করিয়াছিলাম। রাত্রি ৩টার পর রাধানগর পঁহুছিয়া আমরা যথাকিঞ্চিত আহার করিলাম। চাপাডাঙ্গাতেও আমরা জলযোগ করিয়া আসিয়াছিলাম।

রাধানগর পল্লী হইলেও তাহার বিশিষ্টতা আছে। ৺রাজা রামমোহন রায়ের বংশধরেরাই এখানকার জমিদার। তাঁহারা আমাদের জন্য সকল বিষয়েরই বিশেষ সুবিধা করিয়া রাখিয়াছিলেন? তাঁহাদের ব্যয়েই এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে! জমিদারেরা কলিকাতা প্রবাসী কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় ও কর্ম্মচারীগণ আমাদের সেবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, আমরা তাহা ভুলিতে পারিব না। জমিদারদের বৃহৎ বাগান বাড়ীতে আমাদের বাসা হইয়াছিল। আর তাঁহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীতেও অনেকে বাসা লইয়াছিলেন। দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার, সাহিত্যের সভাপতি রায় বাহাদুর জলধর সেন, ইতিহাসের সভাপতি রমাপ্রসাদ চন্দ, বিজ্ঞানের সভাপতি ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী—আমরা সকলেই বৃহৎ বাগান বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিলাম। মূল সভাপতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই জমিদার বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিলেন। রাধানগর থানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজভুক্ত। স্বল্প স্রোতা কাণা নদী গ্রামের ভিতর দিয়া গিয়াছে। কাণানদী এখন ক্ষীণকায় হইলেও বর্ষায় ইহাতে বানডাকে; তখন দু'কুল ছাপিয়া জলরাশি সমুদ্রের জলের ন্যায় সশব্দে যাইতে থাকে, সে জলের প্রাবল্যে দেশ ভাসাইয়া দেয়, মানুষ, গরু, ক্ষেত, খামার ভাসাইয়া নেয়, কাণাকে দেখিয়া আমাদের সেভাব অনুমান করা অসম্ভব হইলেও গ্রাম্য লোকের মুখে ইহার বিক্রমের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

আমি সৌরভ সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে সাহিত্য সম্মিলনে ও ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধিরূপে ব্রাহ্মণ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলাম। ম দিন ব্রাহ্মণ সম্মিলনেই যাই।

ভাটপাড়ায়, ব্রাহ্মণগণের রক্ষণশীলতার খনিতে এবার ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন হইয়াছিল। আমি ব্রাহ্মণ সম্মিলনে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, সে সকল প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না বলিয়া আমি আর ভাটপাড়ায় অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিলাম না। বিশেষ ব্রাহ্মণ সম্মিলনের অবস্থা দেখিয়া এবং যুবক জামতার হস্তে বৃদ্ধ শ্বশুরের দন্ত পাটির লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করিয়া তথায় থাকা নিরাপদও মনে করিলাম না।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অধিবেশন স্থান ভাটপাড়া হইতে কলিকাতা আসিয়া রাধানগর সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্, এ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম; তিনি আমাকে কোলাঘাট হইয়া যাইতে বলিলেন। আমি নিকটেই শ্যামদাস কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে আহার করিয়া আসিয়া আর তাঁহাদিগকে পাইলাম না; সুতরাং আমাকে চাপাডাঙ্গা হইয়াই আসিতে হইল। পথ যেমন দুর্গম, কষ্ট আমাদের তেমন হইল না। পথে যাইতে আমরা শুষ্ক দামোদর নদ পাইয়াছিলাম। দামোদরের বর্ষার বিক্রমের সহিত এ অঞ্চলের লোকের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। বর্ষার বন্যায় এ সকল ডুবিয়া যায়।

আমরা রাধানগর পঁহুছিলেই একটী জমিদার বাড়ী হইতে লোক বাহির হইয়া আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা আমাদিগের বাসস্থানের ঠিকানা বলিয়া দিলেন--বাগান বাড়ীতে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহকেরা তদনুসারে সেই পথ ধরিয়া চলিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া আমরা অভ্যর্থিত হইলাম।

পরদিন প্রাতে রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ী, উপাসনা মন্দির ও গৃহ দেখিয়া আসিয়া স্নানান্তে সভার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কাণানদীর অপর তীরে সভাপণ্ডপ

প্রস্তুত হইয়াছিল। বংশ নির্ম্মিত সেতু পার হইয়া আমরা সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সভাপতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই আমি বলিয়া উঠিলাম—"তারকেশ্বরের মোহন্ত সতীশ গিরিকে কেন অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি করা হইল? তাহার নাম থাকাতে সম্মিলনের গৌরব নষ্ট হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা হীন চরিত্রের লোক কি আপনারা পাইলেন না? ইঁহার নাম থাকাতে আমাদেরও মর্য্যাদা হানি হইয়াছে। তাহার নাম কাটিয়া না দিলে আমরা সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইব।"

সকলেই আমার কথায় সায় দিলেন। সভাস্থলে বিষম গোলমাল আরম্ভ হইল। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কৈফিয়ৎ দিতে দাঁড়াইলেন। তাহার কৈফিয়ত কেহ শুনিতে চায় না। তখন উদ্যোক্তাগণ ও সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমাকে আসিয়া ধরিলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভায় বলিলেন—"অভ্যর্থনা সমিতি মোহন্তের নাম দিয়াছেন, আমরা এখন কিছু করিতে পারি না, আগামী কল্য আমরা ইহার বিহিত করিব।" আমি তখন উঠিয়া বলিলাম "সম্মিলনটা এ জন্য নষ্ট করিয়া দেওয়া চালে না; সকলে শান্ত হউন, আমরা সম্মিলনের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিয়া যাই, তাহারাও ইহার বিহিত করুন।"

অতঃপর সভাপতি নিয়োগ করিয়া কার্য্যারম্ভ হইল।

ইতিহাস শাখায় আমার দুইটী প্রবন্ধ ছিল, সাহিত্য শাখায়ও দুইটী প্রবন্ধ ছিল। যথাকালে আমি তাহা পাঠ করিলাম। সাহিত্য শাখায় আমার "হরপের মামলা" প্রভু মণ্ডলী হাস্য প্রফুল্ল মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। আরো বহু প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। খানাকুল কৃষ্ণনগর ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাম। খানাকুলেই সম্মিলনের অধিবেশন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে এক মহাপুরুষ গোপীনাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। দেবালয়ের সেবাইত গোস্বামী গণের অনুরোধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কীর্ত্তন হইয়াছিল। সে দিন মধ্যাহ্নে আমরা গোস্বামীগণের বিনীত অনুরোধে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আরো দেখিবার জিনিষ এখানে আছে।

সম্মিলনের পরদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাধানগর সাধারণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে স্থানে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হইয়াছে উহা গ্রামের মধ্যে, বাজারের নিকট, দেবালয় ও জমিদার বাড়ী হইতেও দূর নহে। জেলাবোর্ড পানীয় জলের সুবিধার্থ সম্মিলনের পাশে একটী ও প্রতিনিধিদের বাসস্থানের নিকট একটী নলকূপ দিয়াছিলেন; তাহাতে পানীয় জলের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তাদের আপ্যায়ন আমরা ভুলিব না। এ গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী; শারীরিক অসুস্থতা হেতু তিনি বাড়ী আসিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীরও এ গ্রামেই বাড়ী, তিনি সম্মিলনের কয়দিনই এখানে থাকিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। এ গ্রামে লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দ্ব দেখিলাম না।

এখন আমাদের রাধানগর পরিত্যাগের পালা। ক্রমে সকলেই পাল্কীতে উঠিতে লাগিলেন। আমি যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করি নাই সুতরাং আমি পশ্চাতে পড়িলাম। তাঁহারাও পাল্কী যোগাইতে পারিতেছিলেন না। ইতি মধ্যে আমাদের দলের একজন বলিয়া উঠিলেন "শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিজের হাতী আছে, তিনি হাতীতে চড়িতে পারেন; তাঁহাকে হাতীই দেওয়া হউক।", মতাধিক্যের জোড়ে আমার জন্য স্বর্গারোহণই ব্যবস্থা হইল। আমিও অপর এক প্রতিনিধি হস্তী পৃষ্ঠে চড়িয়া চাপাডাঙ্গা ও তথা হইতে মার্টিন কোংর লাইট রেলে হাবড়া হইয়া কলিকাতা আসিলাম।

মার্টিন কোং যদিও ইংরেজী নাম কিন্তু উহা এখন স্বদেশী এই রেলে ট্রামের মত দৌড়ের উপর উঠা নামাও যায়। রেলের কর্ম্মচারীরা সবই স্বদেশী ভাবের, কাহারও পরিধানে হাটকোট নাই। ষ্টেসনগুলিও ছোট ছোট। এরূপ রেল বাঙ্গালায় আরো আছে। আমাদের ময়মনসিংহ হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত এইরূপ লাইনেরই প্রস্তাব হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

শূদ্রক বনাম ভদ্রক।

রোশ্‌নাই।

ম'রে গিয়ে বেঁচে গেছে নামজাদা স্মার্ত্ত,
থাকিলে, বাবুরা তারে গুলি ক'রে মারৃত।
অতি বড় রুইটারে কাটিয়াছে ভগবান,
স্মার্ত্তের নাই তাতে স্বার্থের সন্ধান।
যারা ছিল একদিন ধর্ম্মের রক্ষক,
তাহাদের সন্তান তাহাদেরি ভক্ষক।
সমাজের কণ্টক, স্বদেশের জঞ্জাল,
আর্য্যের মহিমার ঘৃণাকর কঙ্কাল,
আলোকের ছায়ামাখা পুলকিত হিন্দু—
দলে দলে চ'লে যায় পার হ'য়ে সিন্ধু;
তপ ক'রে বর পেয়ে, ফিরে এসে স্বদলে
রুইটার ঘাড়ে পিঠে চেপে যায় সবলে।
ভাগ্যিস্ রুইটার মাথা আছে ঠাণ্ডা,
সমাজের প্রাণ যারা তারা নয় পাণ্ডা।
পুচ্ছের দিকে যারা তারা করে ফর্‌ ফর্‌,
হুজুগের তালে তালে নাচে যত বর্ব্বর।
গোপনে হাসিল ক'রে ষোলআনা স্বার্থ,
স্মার্ত্তেরে গা'ল দেয় যত অপদার্থ।
বামুনের অপরাধ—তারা কেন মস্তক,
তাহাদেরি হাতে কেন বেদ বিধি পুস্তক;
সুতরাং হিংসায় ম'রে যায় বাবুলোক,
শাস্ত্রের কুচ্ছায় সাফ্ করে পরলোক।
শূদ্রক হ'য়েছেন পুচ্ছের মুখপাত,
এইবারে থেমে যাবে সমাজের উৎপাত;
কেড়ে নিয়ে বামুনের শাস্ত্রের অধিকার,
ধু'য়ে মু'ছে ফেলিবেন বিধাতার অবিচার।
এত যদি গ'লেছেন হুজুগের বন্যায়,
বিবাহ করুন দেখি মেথরের কন্যায়;—
তা হ'লেই দূরে যাবে বামুনের বাম্‌নাই—
লেজ নেড়ে শূদ্রক করিবেন রোশ্‌নাই।

ভদ্রক।

ভদ্রক-ভয়-ভঞ্জন।

আসল কথার নাইকো জবাব, গাইতে এসে পাল্টা;
ও ভদ্রক, কেমন তোমার কবি গাওয়ায় হাল্‌টা?
উচিত কথায় তাত্‌ লেগে যে একেবারে অন্ধ;
মাতাব্‌ জেলে রোশ্‌না'য়েতে মিছেই ছড়াও গন্ধ!
ধমক্ দিয়ে কর্ত্তে চাহ শূদ্রকেরে জব্দ?
সৈন্য নাহি গণ্য করে পট্‌কা ফাটা শব্দ।
"ভদ্র' সনে 'অক' জুড়িলে অর্থ কি হয় উল্টা?
বাক্যগুলি সাক্ষ্য যে দেয়, তাই ভাঙেনা ভুলটা।
শূদ্রকেরে ঠাউরে নিয়ে লেজের মুখ-পত্র;
নিজেই এসে মুণ্ড 'পরে ধর্‌লে ছেঁড়া ছত্র!
মুণ্ড নাকি নিতান্তই হিমের মতন ঠাণ্ডা?
নইলে কি আর চোখ রাঙায়ে উচিয়ে তোলে ডাণ্ডা!
দস্যুরাও মনকে বুঝায়, তাদের যাহা বৃত্তি—
ভগবানের দেওয়াই সেটা, তাঁরই অপকীর্ত্তি!
ভাতের হাঁড়ী, জলের ঘড়ায়, সেঁদিয়ে গেছে ধর্ম্ম;
কেমন ক'রে বুঝ্‌বে লোকে উহার কি যে মর্ম্ম?
হাটের মাঝে ভাঙ্‌লে হাঁড়ী, ঘাটের মাঝে কল্‌সী;
ধর্ম্ম আবার উঠ্‌তে পারে নবীন বেশে ঝল্‌সি!
চম্‌কে গেলে চল্‌বে নাকো, কিংবা হ'লে ক্রুদ্ধ;
ভিন্ন ভাতে পুত্র পিতার আত্মীয়তা রুদ্ধ!
মুণ্ড থাকে তুণ্ড বুজে, পুচ্ছ করে ভক্ষণ?
শুন্‌লে পরে বল্‌বে লোকে উন্মাদেরি লক্ষণ!
সাগর জলের ডাঁগর ঢেউয়ে যাঁহার জলাতঙ্ক,
বরং তিনি মাখুন গা'য়ে পচা ডোবার পঙ্ক!
ভদ্রকেরি ভদ্র-ভাষা তাঁদের পরেই যোজ্য;
দেশের যাঁরা মুকুট-মণি জগত জনের পূজ্য।
সাগর পথের পথিক যে গো বীর বিবেকানন্দ!
রামমোহনের গায়েও নাকি বেজায় পূতি-গন্ধ?
বিশেষণের কোন্‌টী তোমার, মহাত্মা সে গান্ধী?
তিন গুলিতে তিনটী সাবার' আ'রা ধ'রে টান্‌ দি?
শক্তি-হীনে সবাই চাপে, কান্নাটাই লজ্জা;
মুখের চেয়ে বুকের জোরে উচিত রণ-সজ্জা!
মুণ্ড যবে চণ্ড ছিল—ব্রহ্মতেজে দীপ্ত;
পুচ্ছ ছিল স্বেচ্ছা-ভরে উচ্চ-সেবা-লিপ্ত।

কর্ম্মদোষে শর্ম্ম দারা, ধর্ম্ম শুধু দণ্ড
শক্তিহীনের দণ্ডে কেহ হয় না হতভম্ভ।
বেদের মালিক বিধির মালিক ছিলেন তাঁরা সত্য ;
খেদের বিষয়, বেদের এখন ক'জন রাখেন তথ্য ?
বেদ বেচে খায় শুদ্ধ বামুন শূদ্র কেনে সস্তায় ;
হাওড়া সহর ফেল্লে ঢেকে চতুর্ব্বেদের বস্তায়!
বিধির সনে নিধির মিলন, আক্রা দরে চুক্তি ;
স্বার্থ-বিহীন স্মার্ত্ত বেচেন মহাপাপের মুক্তি !
বৃদ্ধ আমি, রুদ্ধ দুয়ার, পেরিয়ে গেছে ষষ্ঠি,
মেথর কেন, ভদ্র পেলেও জাগ্‌বে না সে ফষ্টি !
মনের খেদে মেথর যদি দু'দিন ধরে ধন্না ;
মুণ্ড তখন তুণ্ড ঢেকে নিজেই মেথর হন্‌না ?
ভুল করোনা শুঁরার মেয়ে, বল্‌তে মরি লজ্জায় ;
অনেক কিছু ঢুকে গেছে মুণ্ডখানার মজ্জায় !
ঘটকালীটা ফস্‌কে গিয়ে ক্ষুণ্ণ কেন চিত্ত ?
ফন্দি ছিল ডবল বিদায়, সঙ্গে পৌরহিত্য ?
কর্ম্ম দোষে লেজ হারায়ে, লেজের 'পরে খাপ্পা ;
ভুলব নাকো কথামালার খেঁক্‌শিয়ালের ধাপ্পা !
পরকালের জুজুর ভয়ে কেউ ঢোকে না গর্ত্তে ;
আপন মনের আগুণ নিয়ে সবাই জানে লড়্‌তে ;
শাস্ত্র রূপী সস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ো ভদ্রক ;
কোমর বেঁধে খুব্‌ লেগে যাও, নুন দে খেয়ে আদ্রক !
হারিয়ে যাওয়া লেজ জিনে নাও, জালিয়ে দিয়ে রোশ নাই ;
জুড়্‌তে যদি পারোই আবার, কিছুই তাতে দোষ নাই !

শূদ্রক—

অতঃপর এ সম্বন্ধে আর কোন বাদ প্রতিবাদ সৌরভে প্রকাশিত হইবেনা। (সৌঃ সঃ)

সংবাদ।

গত ২রা আষাঢ় পূর্ণিমা রজনীতে গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাসগুপ্ত ভিষকশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

গত ১৫ আষাঢ় রবিবার সৌরভ আফিসে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য সৌরভ সঙ্ঘের এক অধিবেশন হইয়াছিল ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

কবি সম্রাট ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীনে যাইয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছেন। চীনের দার্শনিক ডাক্তার হু-সি ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিত মিঃ লিয়াং টী চাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমগ্র চীন বাসীর পক্ষ হইতে চুটেনটোন উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই উপাধিটীর অর্থ—"ভারতের বজ্রগম্ভীর প্রভাত।"

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শান্তি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ বিরচিত। মূল্য বার আনা। এই কবিতা পুস্তক খানিতে অনেক গুলি কবিতা আছে ; অধিকাংশ কবিতাই আমাদের নিকট প্রীতিপ্রদ বোধ হইল। ভাব গুলি যেন সাধকের প্রাণের ভিতর হইতে আসিয়াছে। শান্তিতে শান্তির উপকরণ আছে।

হাসির হল্লা—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য তিন দুয়ানী। যতীন্দ্রপ্রসাদের কবি প্রসিদ্ধি এখন অবিসংবাদিত। কবি তাঁহার এই কবিতা পুস্তক খানার নাম "হাসির হল্লা" রাখিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার কবিতা গুলি যেন দুর্জ্জয় শাসন, কঠোর ব্যঙ্গ ও শাণিত তিরস্কারই অধিক ব্যক্ত করিতেছে। কবিতাগুলি উচ্চশ্রেণীর, তাহা 'হাসিয়া' না হইলেও 'হল্লা' করিয়া পাঠের যোগ এবং মিলিত হইয়া উপভোগের যোগ্য।

আম্বাড়িয়ার জমিদার বংশ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার প্রণীত। মূল্য লিখা নাই। লেখক এই পুস্তিকায় হেমনগরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বংশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্রুতকীর্ত্তি হেমবাবুর এরূপ সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত পাঠে আমাদের তৃপ্তি হয় নাই, তাঁহার গুণ—তাঁহার বহু সৎকার্য্য সম্বন্ধে এত লিখিবার আছে, যাহাতে একখানা বৃহৎ উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারে। যাহা হউক —ইহাতেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে ; আমরা এই কঙ্কালের উপর একখানা সুগঠিত কাঠামো রচিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলে সুখী হইব।
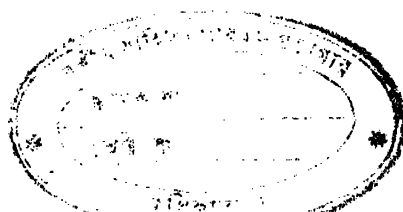
স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর
রামগোপালপুর—ময়মনসিংহ।

সৌরভ
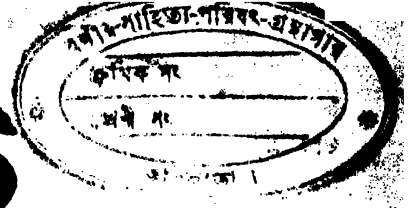
দ্বাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩৩১। | অষ্টম সংখ্যা।

মার্কিন দেশের হাইস্কুল।

প্রত্যেক দেশের শিক্ষাকেই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্য শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। কলেজে প্রবেশ করিবার পুর্ব্বে উচ্চ শিক্ষা হয় না। হাই স্কুল হইতে বাহির হইলেই মধ্য শিক্ষা সমাপন হয়। আর বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আমরা পুর্ব্বে যুক্ত রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে তথাকার মধ্য শিক্ষা সম্বন্ধে চর্চ্চা করিব।

যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান মধ্য শিক্ষার ইতিহাসকে তিনটী যুগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথম যুগকে কলোনিয়েল বা ঔপনিবেশিক যুগ বলিতে পারা যায়। এই যুগ ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া রাজা তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের বিশেষ লক্ষণ এই যে তখন কেবল গ্রামার স্কুল সমূহই স্থাপিত হইয়াছিল।

স্বাধীনতার যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়কে দ্বিতীয় যুগের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। এই যুগে একাডেমি নামক হাইস্কুল সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সময়কে তৃতীয় যুগ বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ সর্ব্বসাধারণের অর্থ প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্ত্তী অন্য কোন শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতে পারিবে কিনা তাহা নিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের বিচারে নিষ্পত্তি হইল যে প্রাইমারী স্কুল সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের ভোটদাতা ইলেকটারগণের সম্মতিক্রমে প্রাইমারী গ্রেড্ ছাড়া অন্য প্রকার শিক্ষার জন্যও সাধারণের অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে হাইস্কুল সমূহ সম্পূর্ণরূপে ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে।

হাইস্কুলগুলি সাধারণতঃ একাডেমি, পাবলিক হাই, শিল্পশিক্ষা, বাণিজ্যশিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) একাডেমি—এই স্কুল সমূহ বহুদিনের পুরাতন। ইহাদের অনেকেরই প্রচুর অর্থ আছে। সাধরণতঃ ধনী লোকের সন্তানই একাডেমিতে পাঠ করিয়া থাকেন। এখানে পাঠ করিলে ছেলেদিগকে স্কুলের বেতন দিতে হয়।

(২) পাবলিক হাইস্কুল—দিবাভাগে এই সকল স্কুলের কাজ চলে। পাবলিক এলিমেণ্টারি স্কুল বা অন্য কোন প্রাথমিক স্কুল হইতে পাশ করিয়া যে কেহ এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে। এখানে স্কুলের বেতন দিতে হয় না। পাবলিক হাইস্কুল সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত ছাত্র গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু জীবন ব্রত সুন্দররূপে উদযাপন করিতে শিক্ষা দেওয়াই পাবলিক স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য। আর একাডেমির উদ্দেশ্য কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গঠন করা। এই উভয় জাতীয় স্কুলেই বালক বালিকা একত্রে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এবং উভয়েতেই চারি বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।

স্কুল বসিবার সময়—দিনে কেবল মাত্র একবার ৯টা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত স্কুল বসে। মধ্যে জলযোগ অথবা বিশ্রাম করিবার জন্য ৩০ মিনিট সময় দেওয়া হইয়া থাকে। ৪০ অথবা ৪৫ মিনিটের পর পর ঘন্টা বাজান হয়। সাধারণতঃ ১৪ বৎসর বয়সেই এই সকল হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে হয়।

কেহ বা ১৬ বৎসরেও ভর্ত্তি হইতে পারে।

পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার এক একজন বিশেষজ্ঞের হাতে ন্যস্ত আছে। ঐ বিশেষজ্ঞেরা আপনাদের বিষয়ের কতটুকু কোন শ্রেণীতে পড়াইতে হইবে, কিরূপ ভাবে পাঠ দিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এবং পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। স্কুলের প্রিন্সিপাল ও ঐ সকল বিশেষজ্ঞকে লইয়া স্কুল ফেকালটী গঠিত হয়। তাঁহারা শাসন ও সংযম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় মীমাংসা করেন। শিক্ষক সমিতির (Staff) প্রাচীন (senior) ব্যক্তি বর্গই স্কুল পরিচালনের সমুদয় বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল স্কুলে প্রত্যেক শিক্ষককেই একটী মাত্র বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে হয়। আমাদের দেশের প্রত্যেক শিক্ষককেই যেমন সব-জান্তা হইয়া যাবতীয় বিষয়ই পড়াইতে হয়, সে খানে তেমন নহে।

পাঠ্যতালিকা—পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে এখন ও নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। তাহাতে এরূপ বিষয় সমূহ স্থান পাইতেছে যেন ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানলাভ এই উভয়েরই সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। বর্ত্তমানে ব্যবসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করিবার দিকেই লোকের ঝোক বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমতঃ স্কুলপাঠ্য বিষয় সমূহে জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যের সংসৃষ্ট বিষয় সমূহ যোগ করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে আবার প্রাচীন সাহিত্য, নবীন সাহিত্য, ও বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রভৃতির পৃথক পৃথক ধারা প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পরিহার্য্য ও অপরিহার্য্য (Compulsory & optional) ভেদে বিষয় সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অপরিহার্য্য বিষয় সমূহ সকলকেই পাঠ করিতে হয়। কিন্তু পরিহার্য্য বিষয় সমূহ হইতে ছাত্রগণ ইচ্ছামত ২ | ৩টী বাছিয়া লইতে পারে। ইহাকেই ইলেক্‌টিভ প্রিন্সিপলস্ বা নির্ব্বাচনী প্রথা বলে। তথায় ইংরাজি সাহিত্য একটী অপরিহার্য্য বিষয় সুতরাং ইহা সকলকেই পাঠ করিতে হয়।

আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও মেট্রিকুলেশন ক্লাসে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাষায় শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে জাতীয়তার পক্ষে তাহা গৌরবজনক নহে।

সার্টিফিকেট—স্কুলের পাঠ শেষ হইলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ছাত্রগণের কার্য্যকলাপের বিচার করিয়া ছাত্রদিগকে একখানা করিয়া স্কুল পরিত্যাগের সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার বিষয় ওয়ারী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উপস্থিতির গড় রক্ষা করিতে হয়। নচেৎ শ্রেণী পরিবর্ত্তনের পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। নিয়ম এই যে শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরেই সপ্তাহে অন্ততঃ একটী করিয়া প্রতি বিষয়ে উপস্থিতি রক্ষা করিতে হইবে।

হাতের কাজের স্কুল বা শিল্পবিদ্যালয়—জ্ঞান লাভ ও অর্থ উপার্জ্জন এই দ্বিবিধ শিক্ষা প্রদান উদ্দেশ্যেই এই সকল স্কুল স্থাপিত করা হইয়া থাকে। হস্তের কাজ ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা আছে। যাহারা অর্থোপার্জ্জনে চেষ্টিত তাহারা এই স্কুল হইতে যাইয়া বড় বড় নগরে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। ইংরেজি ও ফরাসী ভাষা, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রসায়ণ, অঙ্কন, ও চিত্রবিদ্যা, কাঠের উপর কারুকার্য্য সূত্রধরের কাজ, নমুনা তৈয়ার, ছাচে ঢালাই করিবার কাজ, কল কারখানার কাজ ও যন্ত্র মেরামত প্রভৃতিও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

উপরে যে সকল বিষয়ের কথা লিখিত হইল, সে সকলের অনেকগুলিই আমাদের দেশে শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া মনে হয় না। এখানে আর একটী কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন জাতি বৈদেশিক ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ ফরাসী ভাষার সাহায্যে করে না। পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশেই মাতৃভাষার সাহায্যেই শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে; এবং ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এই প্রাকৃতিক নিয়মটী কেবল ভারতবর্ষেই বিরল।

বাণিজ্য স্কুল—যুক্তরাজ্যে ২৬৩০টী কমার্সিয়াল স্কুল আছে। এই স্কুল সমূহে ২৩৩৬৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। ব্যবসা ক্ষেত্রে দৈনন্দিন যে সকল কার্য্যের দরকার হয়, সেই সমুদয় বিষয় বা কার্য্যই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে ঐ সকল স্কুলে কতকগুলি কৃত্রিম আফিস বসান হইয়াছে। এই সকল কৃত্রিম আফিসে—ক্রয় বিক্রয় জীবন

বীমার পলিসি, বন্ধকী খত, টাইপরাইটিং প্রভৃতি লিখন প্রণালী; খত বিক্রয়, পাইকারী বিক্রয়, খুচরা বিক্রয়, জাহাজে মাল বোঝাই, বিদেশে মাল রপ্তানি করা, জাতীয় ব্যাঙ্কের কাজ, বুককিপিং, হেণ্ডনোট, চেক, প্রভৃতি লিখনপদ্ধতি এবং পোষ্টাফিসের কাজ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া এবং করাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মনি।
তদর্দ্ধং রাজ-সেবায়াৎ ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥

বলা বাহুল্য, ইহা সত্ত্বেও, বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি বিষয় আমাদের দেশে 'এডুকেশন'—বলিতে যে শিক্ষা বুঝাইয়া থাকে, তাহার অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতেছে না!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্নেহের দান।

(৩)

একটী সাদা পোষাক পরা ভদ্র লোককে বাড়ীর ভিতরে অগ্রসর হইতে দেখিয়া একটী এগার বার বৎসরের বালিকা তাহার ক্রোড়স্থিত ক্ষুধায় কাতর ক্রন্দমান শিশু ভাইটীকে নিজ জিহ্বার লালা চুসাইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে করিতে ঘরের বারেন্দার বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি চান আপনি?"

মেয়েটীর ক্ষীণ কণ্ঠে স্পষ্ট কথা উচ্চারিত হইতে ছিল না। তাহার জীর্ণদেহে লাবণ্যের কমনীয়তা যেন মেঘাচ্ছন্ন উষার অরুণালোকের মত দেখা দিবার সুযোগ না পাইয়া ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছিল। তাহার শত ছিন্ন পরিধান-বস্ত্রের জন্য সে সঙ্কুচিত ভাবে শরীরের এদিক ওদিক তাকাইতে ছিল, আর সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটীর নিকট কোন আশার কথা শুনিবার জন্য তাহর দিকে ফেল্‌ফেল্ করিয়া চাহিতে-ছিল।

মেয়েটীর চেহারা দেখিয়াই মাখন তাহার অবস্থা বুঝিল। বুঝিল, বালিকা ক্ষুধায় পীড়িত, শিশুটীর অবস্থাও শোচনীয়। করুণায় মাখনের চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। মাখন জিজ্ঞাসা করিল "এই বাড়ী বলরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি"?

বালিকা একটু কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—"হাঁ!" তারপর জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি আমাদিগকে চাউল দিবেন?"

কিছুদিন পুর্ব্বে সরকার হইতে কিছু চাউল বিতরণ করা হইয়াছিল। শুনা যাইতেছিল, পুনরায়ও সরকারী চাউল আসিবে; বালিকাও ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া সেই ভরসাই করিতেছিল, তাই লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া চাউলের কথাই জিজ্ঞাসা করিল।

মাখন পুঁঠিকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে বলিল—"হাঁ। তিনি কোথায়?"

পুঁঠি—"বাহির হইয়াছেন।"

মাখন—"তোমার মা কোথায়?"

পুঁঠি—"পাড়ায় গিয়াছেন।"

পুঁঠির দাঁড়াইয়া কথা বলার অবসরে শিশুটী কাঁদিতে লাগিল; পুঁঠি অমনি তাহার জিহ্বাটী তাহার মুখে দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিল।

অবস্থা দেখিয়া মাখন বলিল—"এরূপ করিও না; ওতে ব্যারাম হইবে। ও কাঁদে কেন?"

পুঁঠি বলিল—"ওর ক্ষুধা পাইয়াছে। আজ এপর্য্যন্ত কিছুই খাইতে পারে নাই। আমরাও দুই দিন যাবত উপবাসী; আপনি কি আমাদিগকে চাউল দিতে আসিয়াছেন?"

পুঁঠির কথা শুনিয়া মাখন চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। সে বালিকাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"হাঁ, চাউল দিতে আসিয়াছি।"

মাখন বারান্দায় উঠিয়া একখানা জলচৌকী টানিয়া লইয়া বসিল এবং মণিকে ডাকিল।

মাখন জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মা কি তোমাদের খাবার আনিতে গিয়াছেন?"

পুঁঠি—"না, ধান আনিতে গিয়াছেন। ঐ বুড় গৃহস্থ বাড়ী হইতে ধান আনিয়া ধান ভানিয়া দিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই আমরা বিকালে খাইব। বাবা গিয়াছেন পৈতা লইয়া, যদি বিক্রি করিয়া কিছু আনিতে পারেন, তবে খোকার বার্লি খাওয়া হইবে। আপনি আমাদিগকে কিছু খাবার এখন…"

বালিকার মুখে আর কথা আসিল না; স্বাভাবিক লজ্জা যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

মাখন বুঝিল নিদারুণ দারিদ্র্য তাহাকে তাহার লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করিয়াছে। পেটের দায় মানুষকে আরও অনেক কিছু করাইতে পারে।

মাখন বলিল "হাঁ, সবই আনিয়াছি—সবই দিব এখন। তোমাদের ঘরে কে?"

মাখন ঘরের ভিতরের দিকে মাথা বাড়াইয়া দিয়া ভিতরের অবস্থাও দেখিতে চেষ্টা করিল। সে জ্বলন্ত উনুনের উপর কড়া দেখিয়া বলিল—"ও কি রান্না হইতেছে?"

পুঁঠি বলিল—" আমার কথা বলিতে কষ্ট হইতেছে; আপনি খাবার দিন! ওখানে কিচুসিদ্ধ হইতেছে। এ বেলা আমরা তাহাই খাইব।"

মাখন—" কে রান্না করিতেছে?"

বালিকা—" আমার দিদি।"

মাখন—" তোমার দিদির নাম কি?"

কথা বলিতে পুঁঠির ইচ্ছা হইতেছিল না; কিন্তু বাবু কিছু দিবেন বলিয়াছেন—সে আশায় পুঁঠি উত্তর দিতে কৃপণতা করিল না। বলিল—'কুসুম।'

মাখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। পুঁঠি কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। মাখন ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। কুসুমের অবস্থা দেখিয়া মাখন ঠিক থাকিতে পারিল না; বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পুঁঠির পরিধানে তবু দাঁড়াইবার মত বস্ত্র আছে—কুসুম প্রায় উলঙ্গ—একখানা জীর্ণ চট জড়াইয়া কুসুম কোনরূপে লজ্জা রক্ষা করিতেছিল। মাখনকে দেখিয়া সে লজ্জায় একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িল।

মাখন বলিল—"মণি তুমি বস, আমি বোট হইতে চাউল ও কাপড় লইয়া আসিতেছি।"

পুঁঠির দিকে চাহিয়া বালিকাকে আশ্বাস দিয়া মাখন বলিল—"যাই, আমি, আমাদের নৌকা হইতে চাউল, কাপড় ও খাবার লইয়া আসিতেছি। তুমি খাবার খাইয়া, স্নান করিয়া নূতন কাপড় পরিয়া আমাদের জন্য রান্না করিবে। আমরাও তোমাদের বাড়ীতে খাইব।"

পুঁঠি কথাগুলি শুনিয়া আনন্দে নির্ব্বাক হইয়া গেল। মণি বসিয়া রহিল; মাখন বোটে চলিয়া গেল।

এই সময় পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ী হইতে একটা গোলমালের শব্দ আসিল। মণি অগ্রসর হইয়া জানিল—পার্শ্বের বাড়ীর মেয়েরা দুই দিনের উপবাসের পর আজ ক্ষুদ রাঁধিয়া খাইতে বসিয়াছিল, একটা মুসলমান ঘরে ঢুকিয়া একজনের সম্মুখ হইতে এক থালা ক্ষুদ লইয়া দৌড়িয়া পালাইয়াছে।

মণি আরও একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া অবস্থাটা দেখিল। দেখিয়া দুঃখে তাহার অন্তর গলিয়া গেল। দেশের এরূপ অবস্থা যে তাহাদের ধারণারই বিষয় হইতে পারে না।

মাখন বোট হইতে মাঝির মাথায় তুলিয়া আহার্য্য সামগ্রী ও কাপড়ের ট্রাঙ্ক লইয়া আসিল, এবং তাহা পুঁঠির সম্মুখে রাখিয়া, ট্রাঙ্ক হইতে দুই খানা কাপড় খুলিয়া লইয়া বলিল "এই নেও তোমাদের দুই বোনের কাপড়—তোমার দিদিকে স্নান করিয়া আসিয়া—আমাদের জন্য রাঁধিতে বল। আর তুমি তোমার ভাইটীকে আমার কোলে দিয়া এই কাপড় পরিয়া তোমার মাকে ডাকিয়া আন?"

আনন্দে পুঁঠির শক্তিহীন মন লাফাইয়া উঠিল। সে কাপড় পরিতে পরিতে বলিল—"এ যে মস্ত কাপড়, আপনার নিজের বুঝি?"

পুঁঠি কাপড় পরিয়া শক্তিহীন দেহকে একটু উৎসাহের সহিত চালাইয়া ভাইটীকে কোলে লইয়াই মায়ের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

কাপড় পরিয়া কুসুম ধীরপদে লজ্জা ও সরমকে প্রতি-পদে গ্রাহ্য করিয়া আসিয়া মাখনের পদে নত হইয়া প্রণাম করিল।

মাখন বলিল—" আপনি কাকে প্রণাম করিতেছেন?"

কুসুম বলিল—" আমার মাখন দাদাকে।"

মাখন—" বেশ, তা হইলে একেও কর!"

লজ্জায় নত হইয়া গিয়া লুপ্ত সুষমার ভার লুটাইয়া দিয়া কুসুম মণির পদে ধীরে ধীরে প্রণাম করিল।

মণি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মাখন এ আবার কি করিল?

পুঁঠি মাকে আনিতে যাইয়া তাহাকে পথেই পাইয়া বলিল—" মা শীঘ্র বাড়ী আইস, দুইটী বাবু আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন, অনেক চাউল দাইল ও ট্রাঙ্ক ভরা কাপড় লইয়া আসিয়াছেন এই দেখ না ..."

পুঁঠি আনন্দে এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারিতেছিল না।

মা পুঁঠির অসম্ভব কথা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; কেন না পুঁঠি তাহার প্রমাণ সঙ্গে করিয়াই লইয়া গিয়াছিল।

পুঁঠির মা ছিন্ন বস্ত্র লইয়া সম্মুখের দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া ঘুরিয়া পাছের দরজায় ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ঘোমটা ঈষৎ উত্তোলন করিয়া আগন্তুক দিগকে দেখিতে চেষ্টা করিলেন। মাখন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া জেঠী মাকে প্রণাম করিল, এবং পুঁঠিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আমি কে—পরিচয় দে দেখি পুঁঠি?"

পুঁঠি কিছুই বলিতে পারিল না।

কুসুম বলিল—"মাখন দাদা যে পিসীমা!"

পিসীমা আবেগভরে আসিয়া মাখনকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মণি ততক্ষণে বারান্দা হইতে নামিয়া বাহের বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। মাখন পুঁঠির দিকে চাহিয়া বলিল—"যাও দিদি, ও ঘরের চৌকির উপর একটা পাটী ফেলিয়া দিয়া আইস…"

পুঁঠি পাটী লইয়া চলিয়া গেল।

মাখন জেঠীমার কোলের কাছে বসিয়া তাঁহাদের সমস্ত অবস্থা শুনিল।

—দীনেশ ও মধু কুসংসর্গে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুসুমকে বিবাহ দিয়া দীনেশ পালটা বিবাহ করিবে সর্ত্তে তাহাকে বাড়ী হইতে লইয়া গিয়া তারপর অকৃতকার্য্য হইয়া পালাইয়া গিয়াছে, কুসুমকে তাহার পিসা মহাশয় গিয়া উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই হইতে কুসুম অন্য পূর্ব্বা হইয়া আছে। তাহার আর বিবাহের কোন সম্বন্ধ আসিতেছে না। যদু ঘরজামাই বিবাহ করিয়া পিতা মাতার আর কোন খবর লইতেছে না—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

মাখনও তাহার নিজ অবস্থার ও কৃতকার্য্যতার কথা সংক্ষেপে জেঠীমার নিকট বলিতে লাগিল।

ক্ষুধিত মেয়েরা ততক্ষণে মাখনের আনীত আহার্য্য সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

মালয় সভ্যতা।

মালয় জাতি প্রাচীন মঙ্গোলীয় জাতির এক শাখা বিশেষ। ইহাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণী বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে বাস করে। বর্ত্তমানে মালাক্কা সুমাত্রা দ্বীপেই এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকের বাস। আর এক শ্রেণী এর চেয়ে এক ধাপ উপরে। তাহারা আধুনিক সভ্যতার মাপ কাঠি অনুসারে একটু আধটু সভ্যতার দাবী করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। ইহারা জলের উপর ভাসমান কুটীর কিম্বা নৌকা প্রস্তুত করিয়া বাস করে।

মালয় জাতির আর একটি শাখা শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতায় একটু অগ্রসর। তাহারা খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে হিন্দু সভ্যতা ও পরে ইসলাম ধর্ম্মের সংশ্রবে আসিয়া অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এখন ইহাদের বংশধরগণ সুমাত্রা, বর্ণিও ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে।

সকল জাতির সভ্যতাই একটা বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। মালয় জাতির চরম ও পরম লক্ষ্য—কাজ না করিয়া আরামে বসিয়া থাকা। মালয় সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—এই বৈশিষ্ট্যের উপর। মালয় জাতির ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমকে জগতে আর কেহ এত ঘৃণার চক্ষে দেখে কিনা সন্দেহ। তবে পেটের দায়ে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। যাহাদের সামান্য একটু আভিজাত্যের দাবী আছে তাহারা প্রাণান্তেও হাতে ধরিয়া কোন কাজ করিতে চায় না! তাহারা "ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ" এই চার্ব্বাক-নীতির অনুসরণ করিয়াই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ভালবাসে। সেই জন্য তাহারা শান্ত-শিষ্ট, ও আরামপ্রিয়। বেকার বসিয়া থাকিলেও বিপ্লব বা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া তাহারা দেশের ও দশের শান্তি-ভঙ্গ করে না। মালয় সভ্যতার অলস কর্ম্মহীন বৈশিষ্ট্যটুকু যেন যবদ্বীপের সমাজ জীবন ও কর্ম্ম জীবনের ভিতর দিয়াই আজও বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। যবদ্বীপের লোকেরা অনাহারে থাকিয়া মরণকে বরণ করিয়া লইবে, তথাপি আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিতে রাজী হইবেনা। তাহারা

এমন ক্রীড়া কৌতুকই ভালবাসে যাহাতে শরীর চালনার কোন প্রয়োজন হয় না। জুয়া খেলায় মালয় জাতির বড় আসক্তি। ইহার নাম শুনিলেই যেন তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে। "মোরগের লড়াই" তাহাদের সব-চেয়ে বেশী আমোদের ক্রীড়া। মোরগের মালিকেরা প্রচুর অর্থ বাজি রাখিয়া মোরগগুলিকে লড়াই করিতে ছাড়িয়া দেয় যেখানে মোরগের লড়াই হয়, সেখানে লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। যবদ্বীপে এই প্রথা অদ্যাপি বিশেষভাবে প্রচলিত।

যবদ্বীপের পুরুষ।

মাদকদ্রব্যের প্রতি মালয় জাতির আসক্তি নিতান্ত কম নহে। অহিফেন সেবনে তাহারা চীনাদের সমকক্ষ। তাহারা মাদকদ্রব্যের নেশায় বিভোর হইয়া আরামে দিন কাটাইতে ভালবাসে। বাস্তবিক এই জীবন সংগ্রামের দিনে তাঁহাদের ন্যায় অলস কর্ম্মকুণ্ঠ জাতি জগতে বিরল। তাহারা বাঙ্গালীর ন্যায় অদৃষ্টবাদী। অদৃষ্টের ঘাড়ে সকলদোষ চাপাইয়া ইহারা আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেই আরাম বোধ করে।

সুমিত্রা বর্ণিও ও যবদ্বীপ প্রভৃতি আধুনিক মালয় সভ্যতার লীলানিকেতন বটে; ইহাদের অধিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক বর্ব্বর প্রথা প্রচলিত আছে যাহার নাম শুনিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। তন্মধ্যে "নরবলি" প্রথাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাহারা নরমুণ্ড দ্বারা পিতৃ পুরুষের তর্পণ করিতে পারিলেই নিজকে ধন্য মনে করে। নরমুণ্ড তাহাদের নিকট অতি পবিত্র জিনিষ। এমন কি, যুবকেরা যদি বাগ্‌দত্তা পত্নীকে বহুসংখ্যক নরমুণ্ড উপহার দিতে না পারে, তবে তাহারা বিবাহ করিতে পারে না। দিয়া (Dya) জাতিরাই নরমুণ্ড ছেদনে সিদ্ধ হস্ত। তাহারা নরকপাল অতি যত্নের সহিত বাক্সের ভিতর রাখিয়া দেয়। যদি মালয় জাতির কোন বড় লোক তাহার বাড়ী ঘর সাজাইতে ইচ্ছা করে, তবে যেরূপেই হউক তাহাকে নরকপাল সংগ্রহ করিতে হইবে। নরকপালে বড় লোকের গৃহ সজ্জিত না হইলে তাহাদের পদ মর্য্যাদার হানি হয়। পূর্ব্বে মালয়গণ সামাজিক প্রথা অনুসারে একটা বংশ-দণ্ডের উপর নরমুণ্ড ঝুলাইয়া সকলে মিলিয়া ইহার চারি পাশে গীত বাদ্য নৃত্যাদি আমোদ প্রমোদ করিত। এখনও কোন গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভিত্তিভূমির উপর একটা নরমুণ্ড ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। যাহারা নরমুণ্ড শিকারে নিপুন কেবল তাহাদের গায়ই উল্কী থাকিবে। অন্য কেহ উল্কী চিহ্ন ধারণ করিতে পারিবেনা। তাহাদের মধ্যে কোন গুরুতর জাতীয় কলহ উপস্থিত হইলে নরমুণ্ড ছেদনেই ইহার সুমীমাংসা হয়।

নরমুণ্ড শিকারের ব্যবসা অতি সুন্দর। ঠগীদের ন্যায় দিয়া জাতির বহুলোক ধর্ম্মের নামে দল বাধিয়া নরহত্যার আয়োজন করে। প্রথমে তাহারা একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেবতার নামে উহা উৎসর্গ করে। কুটীরের চারি পাশে এমনি ভাবে বেড়া দেওয়া হয়, যেন সহজে ইহার ভিতর কেহ প্রবেশ করিতে না পারে। শিকারীদের দলভুক্ত লোক ব্যতীত অন্যকেহ প্রবেশ করিলে সে মৃত্যু দণ্ডেও দণ্ডিত হইতে পারে। শিকারীগণ কুটীরখানিকে নানাবর্ণের পুষ্প-পল্লবে এমনি ভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখে যে, দেখিলে বাস্তবিক ইহাকে দেবতার কুঞ্জ-কুটীর বলিয়াই মনে হয়। ঘরের ভিতর চকচকে ইস্-পাতের কৃত্রিম অস্ত্রশস্ত্র ও বিষাক্ত শর সারিসারি ঝুলান থাকে। কুটীরের ভিতর তাহারা বহু দিন: বাস করিয়া

নর শিকারের সুযোগ-সুবিধার পন্থা আলোচনা ও আবিষ্কার করে; তারপর শিকার অন্বেষণে বহির্গত হয়।

কেহ কেহ রজনীর ঘোর অন্ধকারে ও সুষুপ্ত নর নারীর শিরচ্ছেদ করিয়া বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কেহ সবুজ মাঠের মাঝখানে ধানক্ষেতের আড়ালে অনাথ সঙ্গীহারা শিশু অথবা অবলা নারীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। সুযোগ পাইলে হিংস্র পশুর ন্যায় তাহাকে হত্যা করিয়া মুণ্ড লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে।

মালয় সমাজে নারীর বড় গৌরব। পুরুষ নারীকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে। পতি পত্নীকে প্রহার করিতে পারে না। নারীকে প্রচুর অর্থ না দিলে কেহই বিবাহ করিতে পারে না। ইহা কন্যাপণেরই রূপান্তর মাত্র।

মালয়দের আসামী দোষী কি নির্দ্দোষ, তাহা নির্ণয় করিবার প্রণালী বড়ই অদ্ভুত। যদি আসামী ফুটন্ত তৈলাধার হইতে একটা আংটা তুলিয়া আনিতে পারে, কিংবা জ্বলন্ত লৌহখণ্ড জিহ্বাগ্রে লেহন করিতে পারে, তবে সে নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হয়। কোন কোন অপরাধে আসামীগণকে একটা জ্বলন্ত প্রদীপের পানে স্থির নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আদেশ দেওয়া হয়। যাহার প্রতি দীপশিখা হেলিয়া পড়ে তাহাকেই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। দুইজনের মধ্যে কোন বিষয় নিয়া কলহ উপস্থিত হইলে তীক্ষ্ণ বংশ দণ্ড দ্বারা উভয়ের মস্তকের পশ্চাদ্দেশে প্রহার করিতে হয়। যাহার মস্তক হইতে বেশী রক্তপাত হয়, তাহারই পরাজয় হইল মনে করিতে হইবে।

বোর্ণিও দ্বীপে মালয় সমাজের নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ বড়ই কৌতুকাবহ। যদি কোন যুবতীকে দেখিয়া যুবকের মনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয় তবে যুবক তাহাকে নানা কার্য্যে সাহায্য করে, অঙ্গুরী উপহার দেয়। ইহাতে উভয়ের ভাবের আদান প্রদান সুরু হয়; প্রাণ বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে।

রাত্রি ৯।১০ টার সময়, যখন যুবতীর মাতা পিতা ভাই ভগ্নী, মশারির ভিতর আরামে ঘুমের ঘোরে অচেতন হইয়া পড়ে, তখন যুবক অতি সঙ্গোপনে ও সন্তর্পণে মশারির ভিতর ঢুকিয়া প্রণয়িনীকে জাগাইয়া তাহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করে এবং তাহাকে তাম্বুল উপহার দেয়। এই উপহার প্রত্যাখ্যান করিলেই বুঝিতে হইবে নায়িকা নায়কের সহিত প্রেম বিনিময় করিতে অনিচ্ছুক। তখন যুবতী আলো জ্বালিয়া যুবককে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে আদেশ করে। যদি কন্যার মাতা পিতা যুবকের সহিত তাহার নৈশ সম্মিলনে কোন আপত্তি উত্থাপন না করে, তবেই বুঝাগেল ইহাদের বিবাহ হইবে। নতুবা নায়ক পূর্ব্বরাগের নিষ্ফলতার নিদারুণ বুকভরা বেদনা লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

তাহাদের বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে চলে না। টাকা ধার করিয়াও বিবাহে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে হয়।

যবদ্বীপের রমণী।

শব সংস্কারে তাহাদের বিশেষত্ব তেমন কিছু নাই। দাহ ও সমাধি উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের অবসান হয় না। শব-সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসককে শবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে। তজ্জন্য চিকিৎসকের অতিরিক্ত পারশ্রমিকের বন্দোবস্ত আছে। রোগীর মৃত্যু হইতে না

হইতেই তাহার জননী-ভগিনী-কন্যাগণ তারস্বরে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। কিন্তু পুরুষদের তখন কাঁদিবার রীতি নাই। শবদেহ স্নান করাইয়া নবীন বসন ভূষণে ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া তাহাকে একটা প্রকাণ্ড ঘরের ভিতর স্থাপন করা হয়। মৃত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবগণ তখন ইহার চারিপাশে দাঁড়াইয়া শোক প্রকাশ করে। লোকের অভাব হইলে ভাড়া করিয়া শোক প্রকাশক লোক আনিবারও বিধি আছে। শোকগাথক নানা ছন্দে বিনাইয়া করুণ কণ্ঠে শোক সঙ্গীতের ধোয়া তুলিলে সকলে তাহার সহিত সুর মিলাইয়া গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলে। আনুষ্ঠানিক শোক প্রকাশ শেষ হইলেই বহু লোক শোভা যাত্রা করিয়া মৃতদেহ লইয়া সমাধি স্থানে বা শ্মশানক্ষেত্রে উপনীত হয়। তারপর যত শীঘ্র সম্ভব শব মাটীর নীচে পুতিয়া বা পুড়িয়া সেখান হইতে চলিয়া আসে। কারণ তাহারা ভূত প্রেতকে অত্যন্ত ভয় করে। শ্মশান মশান, ভূত প্রেতের আবাসস্থল বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস।

সুমাত্রা ও বর্ণিও প্রভৃতি পূর্ব্বভারতের দ্বীপাবলীর অধিকাংশই যবদ্বীপের লোক। কাজেই যবদ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিলে বর্ত্তমান মানব সভ্যতার স্বরূপ আরও বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিবে।

যবদ্বীপের লোক শান্ত সৌম্য প্রিয়দর্শন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা অলস ও বিলাসী কিন্তু কৃষাণেরা বড় পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল। তাহাদের রাজা ওলন্দাজ। যদি ওলন্দাজ রাজ পুরুষদের অধীনে কেহ পদস্থ কর্ম্মচারী হইতে পারে তবে সে জীবনকে ধন্য ও সার্থক মনে করে। উচ্চ রাজপদ লাভ করাই তাহাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। কেহ কেহ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ পাইলেই তাহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনেরা বিরাট ভোজের আয়োজন ও নৃত্য-গীত বাদ্য ইত্যাদি আমোদের ব্যবস্থা করে। সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা জরির কাজকরা ঝকমকে রেশমী পোষাক পরে ও হীরামণি-মুক্তার অলঙ্কার ব্যবহার করে। পথে চলিবার সময় একজন ভৃত্য তাহাদের মাথার উপর নানা কারুকার্য্য খচিত রেশমী ঝালর-যুক্ত সোণালী ছত্র ধারণ করে। তাহাদের বাড়ীঘর অতি সুন্দর। ধনী লোকেরা তিনমহল বাড়ীতে বাস করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের বাড়ী দুই মহল। যারা গরীব, তারা পর্ণকুটীরে বাস করে। চাষারা জাঙ্গিয়ার উপর লুঙ্গি ব্যবহার করে। তাহাদের লম্বা চুল, তাহারা মাথার উপর চূড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখে। একখানা রঙ্গীন রেশমী রুমাল মাথায় বাঁধিয়া তাহারা শিরঃশোভা বর্দ্ধন করে।

যবদ্বীপের পল্লী গ্রামের মেয়েরা বুক খোলা কামিজ পরে। তাহারা এমন একটা ঘাগরী পরে যা মাটির উপর দিয়া লুটাইয়া যায় এবং ওড়না চাদরের ন্যায় ভাঁজ করিয়া কাঁধের উপর ঝুলাইয়া রাখে। সৌন্দর্য্য প্রিয় যুবতী মেয়েরা বেণী রচনা করে না, কিন্তু আলু থালু চুলগুলি গুছাইয়া অতি সুন্দর খোঁপা বাঁধিয়া তার উপর নানা রংএর কাঁটা ও ফুল গুজিয়া দেয়। তাহারা বড় বড় কুণ্ডল কানে ঝুলাইয়া রাখে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অঙ্গুরীয়ক ও সুবর্ণ বলয় পরিধান করে।

যবদ্বীপের যুবতী মেয়েরা বেশ বিলাসিতা প্রিয়। সুগন্ধি পুষ্প নির্য্যাসে বা সুবাসিত বৃক্ষপত্রাদির সৌরভে তাহার পোষাক পরিচ্ছদগুলিকে সুরভিত করিতে বড়ই ভালবাসে। তাহারা বিম্বাধর তাম্বুলরাগে রঞ্জিত ও চরণ-তল অলক্ত-রাগে রক্তিম করিয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে নগ্নপদে থাকে কিন্তু বাহিরে ও পথে যাওয়ার সময় কেহ কেহ জুতা ব্যবহার করে। এগুলিযে পাশ্চাত্য সংস্রবের ফল ইহা বলাই বাহুল্য। যবদ্বীপে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা বহু বিবাহ করে। গরীব লোকেরা এক স্ত্রী লইয়াই ঘরকন্না করিয়া থাকে। দরিদ্রতাই তাহাদের এক পত্নীত্বের মূল কারণ।

যবদ্বীপের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাহারা জল সিদ্ধ করিয়া পান করে। জলপান করিবার সময় পাত্র তাহাদের মুখ স্পর্শ করে না।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

ছন্দ-স্পন্দন।

(আর্‌বী রমল ছন্দে রচিত)

(১)

বিশ্ব সংসার চল্‌ছে ছন্দে,
সৃষ্টি ভরপুর ছন্দ-স্পন্দে!
সূর্য্য-ইন্দু সপ্ত সিন্ধু,
ধায় আনন্দে ছন্দোবন্ধে!

ছন্দে পক্ষী ঝাপ্‌টে পক্ষ,
উঠ্‌ছে পড়্‌ছে ছন্দে বক্ষ,
সুর-তরঙ্গে, নৃত্য-ভঙ্গে,
ছন্দ সঙ্গে রাখ্‌ছে সখ্য!

ফুল্ল পুত্র ওই ঘুমন্ত
খাচ্ছে দোল্‌নায় দোল্‌ অনন্ত!
হাস্‌ছে খিল্‌খিল্‌, হয় না গর্‌মিল,
ছন্দোবন্ত রূপ শ্রীমন্ত!

ঝর্‌ছে ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষা-বর্ষণ!
হচ্ছে ছন্দে বজ্র-গর্জ্জন!
কাঁপছে অম্বর, বিশ্ব-অন্তর,
ছন্দে দিক্‌ দেশ কর্‌ছে নর্ত্তন!

ঝঞ্ঝা-ঝঙ্কার ছন্দে সোর্‌-সাড়,
ছন্দে শির তার কুট্‌ছে বাঁশ্‌-ঝাড়;
নদ ভয়ঙ্কর, হয় শুভঙ্কর,
চল্‌ছে ছন্দে; মুগ্ধ সংসার!

বৃক্ষপত্রে ছন্দ স্বন্‌ স্বন্‌,
ছন্দোনির্ভর ছুট্‌ছে পল্‌টন্‌,
হাস্য-ক্রন্দন, লাস্য-বন্দন,
শ্বাস্‌ প্রশ্বাসে ছন্দ-স্পন্দন!

জড়্‌ জীবত্বে ছন্দ-হিল্লোল,
ঝর্ণা-উৎসে ছন্দ-কল্লোল,
ছন্দে মঞ্জুল দুল্‌ছে ফল্‌-ফুল,
ছন্দে সাৎরায় হংস-শ্বেত্‌কোল!

ছন্দে উদ্ভব, ছন্দে লয় সব,
ছন্দোময় প্রাণ বিশ্বে দুর্ল্লভ!
ছন্দে যৌবন আজ্‌কে উন্মন্‌!
স্বপ্ন হয় মোর ছন্দে বাস্তব!

ছন্দোময় বাক্‌ উঠ্‌ছে দিন্‌রাত!
চিত্ত-পাপ্‌ড়ি খুল্‌লো দৈবাৎ!
ছন্দে নন্দি' নিত্য বন্দি!
চট্‌কা সব শেষ! দাও, মা, সাক্ষাৎ

হৃৎ-শ্বেতাব্জ শুভ্র নির্ম্মল!
বস্‌, মা, বিদ্যুৎ-বর্ণা উজ্জ্বল!
বাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌, মা, তূর্ণ!
লুব্ধ চিত্ত হচ্ছে চঞ্চল!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গৌরীপুর পূর্ণিমা-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

ভারতের বাহিরে রামায়ণী কথার প্রচার।

রামায়ণী কথা যে কেবল ভারতবর্ষের দেব-ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষা সমূহেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; প্রাচীন কালে হিন্দুর গতি-বিধি ও উপনিবেশ যে যে স্থানে ছিল, সেই সেই স্থানেই রামায়ণও নীত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে সেই সেই দেশের কবি-ভাষায় তাহার প্রচার হইয়াছিল, এইরূপে যবদ্বীপে, বালীদ্বীপে, লম্বকদ্বীপে, ব্রহ্ম দেশে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশে মূল রামায়ণ কথা প্রচারিত হইয়াছিল।

যবদ্বীপে বোধহয় খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে রামায়ণ কথা নীত হয়। যবদ্বীপের রামায়ণের সহিত উত্তরকাণ্ড গ্রথিত নহে।

যবদ্বীপের রামায়ণ—'রামকবি।'

এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, যবদ্বীপে যে সময় ভারতীয় রামায়ণ কথা নীত হইয়াছিল, তখন ভারতীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ড ছিল না। তাহার পরে ভারতীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ড যুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার কৃত্তিবাসের ন্যায় যবদ্বীপের কবিরাও মূল রামায়ণকে নানা প্রকারে পরিবর্ত্তন করিয়া তথাকার কবি-ভাষায় রচনা করিয়া লইয়াছেন।

যবদ্বীপের কবি ভাষায় রচিত রামায়ণের নাম 'রামকবি' রামকবি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা রাম গুণফং, রামযজ্ঞ বা রামভদ্র, রামতালী এবং রামায়ণ। রামগুণফং অংশে আদি কাণ্ডের কথাই বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে রাম বনবাস হইতে রাহবণ (রাবণ) কর্ত্তৃক সীতা হরণ পর্য্যন্ত আছে। তৃতীয় অংশে হনুমানের দৈত্য ও অঙ্গলকা (স্বর্ণলঙ্কা) গমনের সেতু নির্ম্মাণের কথা পর্য্যন্ত আছে। চতুর্থ বা শেষ অংশে রাম-রাবণের যুদ্ধ, সীতি (সীতা) উদ্ধার ও সকলের

আযুজার (অযোধ্যা) প্রত্যাগমন এবং বিবিষণকে (বিভীষণ) লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে।

যবদ্বীপের কবি-ভাষায় "কাণ্ড" নামেও একখানা পুরাণ-গ্রন্থ আছে। তাহাতেও সৃষ্টি প্রকরণ ইত্যাদির বর্ণনার সহিত রামায়ণ, ও মহাভারতের কাহিনীর এবং অন্যান্য পুরাণ বর্ণিত কাহিনীর বর্ণনা আছে।

যবদ্বীপের, কাণ্ড'।

যবদ্বীপে উত্তরকাণ্ডও আছে। তাহা পৃথক গ্রন্থ।

যবদ্বীপ হইতে যবদ্বীপের হিন্দু অধিবাসীরা যখন বালীদ্বীপে ও লম্বকদ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহারাও তাঁহাদের এই সম্পদটীকে অন্যান্য প্রিয় সম্পদের সহিত লইয়া আসিয়াছিলেন।

বালীদ্বীপের রামায়ণও বাল্মীকি প্রণীত বলিয়া পরিচিত; কিন্তু এই রামায়ণ বালীদ্বীপের কবি-ভাষায় রচিত। এই কবি ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে বালীর রামায়ণ ৬ কাণ্ডে ও ২৫ সর্গে সম্পূর্ণ। এই রামায়ণেও উত্তরকাণ্ড নাই। এখানেও উত্তরকাণ্ড পৃথক গ্রন্থ বলিয়া প্রচলিত। উহার বিশেষত্ব এই যে—উহাতে রামের মৃত্যুর পর রঘুবংশীয় দিগের বিবরণ ও চরিত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বালী-রামায়ণের ছয় কাণ্ডে সংক্ষেপে মূল রামায়ণের বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে এবং শেষে রামের বার্দ্ধক্য অবস্থায় বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বালীদ্বীপের রামায়ণ।

বালীর কবি-ভাষায় রাজা কুসুম রচিত দ্বিতীয় আর একখানা রামায়ণ আছে; সে খানাও উত্তরকাণ্ড হীন। বালীতে সেই রামায়ণেরই এখন প্রচার বেশী।

ব্রহ্ম দেশের রামায়ণী কথার নাম "রামযৎ"। (Ramazat) রামযতের রাবণ দশগিরি নামে পরিচিত; দশ-গ্রীব নহে। বাল্মীকির রাবণও কিন্তু দশমুণ্ড বিশ হস্ত ধারী নহে। রাবণের রাজমুকুট দশ শৃঙ্গ সমন্বিত হেতু ব্রহ্ম দেশের রামযতে তিনি দশগিরি।

ব্রহ্ম-রামায়ণ "রামযৎ"।

ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ সমূহে এবং ব্রহ্ম, আসাম, মালয় প্রভৃতি স্থানে দ্রাবিড়-সভ্যতাই বিস্তৃত হইয়াছিল; সেই জন্য মনে হয়, ঐ সকল দেশের রামায়ণে দ্রাবিড়-প্রভাব বেশী সংক্রামিত হইয়াছিল।

শ্যামদেশে অযোধ্যার আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, সে জন্য শ্যামে মূল বাল্মীকি রামায়ণই প্রচারিত হইয়াছিল। শ্যামের প্রাচীন রামায়ণ এখন আর পাওয়া যায় না। শ্যামের বালী ভাষায় (বোধহয় পালীভাষা) এই রামায়ণ লিখিত ছিল। বালী ভাষাও সংস্কৃত শব্দ বহুল ভাষা।

এগুলি সমস্তই সংস্কৃত মূলক ভাষা; আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার বিস্তৃতি ব্যপদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দু সভ্যতার বিস্তৃতি ব্যপদেশে ব্যতীত, বিভিন্ন আগন্তুক জাতি কর্ত্তৃকও রামায়ণী কথা পৃথিবীর দিকে দিকে নীত হইয়াছিল; যখনই যে জাতীয় লোক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতের এই মনোরম জাতীয় চিত্রটীকে অতি যত্নের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপে রামায়ণী কথা এসিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং ক্রমে ইয়ুরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল।

অনেকের বিশ্বাস হোমারের ইলিয়ড কাব্য রামায়ণের গল্পাংশের অনুকরণে রচিত। ইহার বিপরীত কথাও জন সমাজে প্রচারিত আছে। বাস্তবিক পক্ষে হোমার বাল্মীকির অনুকরণে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কি বাল্মীকি হোমারের গল্পাংশ লইয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, এ তর্কের মীমাংসা নাই। তথাপি সমাজের বিশ্বাস অনুসারে এ তর্ক চলিয়া আছে; তর্কের অবকাশ আছে * বলিয়াই, তাহা থাকিবেও

* ইলিয়ডের চিন্তা যে ভারত হইতে গৃহীত তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্য এস্থলে গ্রীসের প্রাচীন কথা একটু উল্লেখ করা গেল। প্রাচীন গ্রীসের কোন ইতিহাস ছিল না। স্ত্রী সমাজে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতা ছিল; তাহারা যখন তখন স্বামী হত্যা করিত। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মহামতি লাইকারগাস গ্রীসের সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি নানা দেশের ভাব ও চিন্তা লইয়া গ্রীসের সমাজ-নীতি নির্দ্ধারণ করেন; লাইকারগাস এই উপলক্ষে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। লাইকারগাসের সময় ৮৮৪—১১০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। এই সময় হোমারের ইলিয়ড গ্রীসে প্রচারিত হয় নাই। লাইকারগাসের অভিজ্ঞতার ফলে গ্রীসের ইতিহাস ও সমাজ গঠিত হইয়াছিল। এই সমাজ ও ইতিহাস-গঠনের চিন্তার ভিতর যে ভারতের চিন্তা প্রভূত পরিমাণে গৃহীত হইয়াছিল, ইহা বর্ত্তমান জগতের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণও স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা এইরূপ সম্বন্ধের সূত্র নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন না। আমরা লাইকারগাসের ভারতভ্রমণই তাহার কারণ বা সূত্র বলিয়া মনে করি। কোন বিরাট কার্য্য যে একটী মাত্র কারণের উপর নির্ভর করে না, তাহাও আমরা অস্বীকার করিনা। প্লুটার্ক লাইকার-

বোধহয় চিরকাল। কোন দুই জাতির যে এক রকম চিন্তা হইতে পারে না; বা কোন দুই দেশের বা একই দেশের, দুই ব্যক্তির যে ভাব বা কল্পনার সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, বা থাকা অস্বাভাবিক, তাহা নহে। রামায়ণ ও ইলিয়ডের গল্পাংশ অনেকটা একরূপ হইলেও এবং উভয় কাব্যের চরিত্র গুলির অধিকাংশ এক ছাঁচের হইলেও অনেক মনীষী সমালোচক এই মহাকবিদ্বয়কে পরস্পরের নিকট ঋণী মনে করেন না।

গ্রীক চিন্তার সহিত ভারতীয়চিন্তার যে বহু বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা 'রামায়ণের সমাজ' ও 'রামায়ণের সভ্যতা' এই দুই গ্রন্থেরই বহুস্থলে প্রদর্শন করিয়াছি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হইবে, প্রাচীন ভারতের সহিত প্রাচীন গ্রীসের একটা আদান প্রদানের সম্বন্ধ ছিল। এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াও অধ্যাপক মেক্সমূলার, অধ্যাপক ওয়েবার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই উভয় কাব্যের মূল চিন্তায় কোন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন নাই। মেক্সমূলার মনে করেন, বেদের পনি ও সরমার গল্প লইয়া হোমার ইলিয়ড রচনা করিয়াছিলেন। আর ওয়েবার বলেন,

গাসের যে জীবনী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই উক্তির আভাস আছে। হোমার এসিয়া মাইনরের কবি বলিয়া খ্যাত। এসিয়ামাইনরে দ্রাবিড়ের পনি বণিক দিগের সহিত ভারতীয় চিন্তা আরো পূর্ব্বে গিয়াছিল। হোমার যদি বেদের সরমা ও পনির গল্প হইতে ইলিয়ডের কল্পনা লইবার সুযোগ পাইতে পারেন, তবে রামায়ণের গল্প ভাগ ও এই উপায়েই পাইয়াছিলেন, কল্পনা করা যাইতে পারে। ইলিয়ডের কবি যদি প্রকৃতই রামায়ণের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তবে এইরূপে অথবা এইরূপ অন্য উপায়ে তাহা তাঁহার গ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, ইহা চিন্তা করা যায়।

অপর পক্ষে, যাহারা রামায়ণকে ইলিয়ডের অনুকরণ মনে করেন, তাহাদিগকে—গ্রীক বিজয়ের পর ভারতীয় কবির যে এইরূপ ভাব ও চিন্তা গ্রহণের সুযোগ হইয়াছিল,—ইহা মনে করিয়া আলোচনা করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বৈদেশিক কোন চিন্তার প্রভাবে নিজ সমাজ চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন—এমন কোন প্রমাণ নাই।

গ্রীক বিজয়ের পর ভারতীয় সমাজে ও চিন্তায় যে পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাব আসিয়াছিল, রামায়ণ-মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশে ও পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে; বর্ত্তমান গ্রন্থে ও গ্রন্থান্তরে (রামায়ণের-সভ্যতা) তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি।

এই বিষয়ে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে। তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দক্ষিণ ভারতে কৃষি প্রবর্ত্তনের রূপক কথা লইয়াই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল।

ইলিয়ড ও রামায়ণের সম্বন্ধ নির্ণয় ব্যাপারে আলোচনার প্রচুর হেতু থাকিলেও আমরা এ স্থলে তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

রামায়ণী কথা চীন সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থ "মহাবিভাষার" উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, এই গ্রন্থখানা কাত্যায়নী পুত্র কৃত "জ্ঞান প্রস্থান" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের এক খানা বিরাট টীকা গ্রন্থ। এই বিরাট টীকা গ্রন্থ মহাবিভাষায় রামায়ণের গল্পাংশ—সীতা হরণ হইতে সীতা উদ্ধার পর্য্যন্ত আছে। মহাবিভাষা দুই শত খণ্ডে সমাপ্ত; ইহার ৪৬শ খণ্ডে এই রামায়ণী কথা প্রদত্ত হইয়াছে। মহাবিভাষা শকরাজ কণিষ্কের সময় রচিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত চীন ভাষায় অনুদিত হইয়া চীন দেশে নীত হইয়াছিল। অতঃপর চীন পরিব্রাজক য়ু-য়েন-সঙ্গও এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শকরাজ কণিষ্ক বুদ্ধের দেহ ত্যাগের ৩০০ বৎসর পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। *

দশরথ জাতকের গল্পাংশের সহিত মহাবিভাষার গল্পাংশ যুক্ত করিয়া লইলে খৃঃ পূঃ তৃতীয়, ৪র্থ শতাব্দীতেও যে বৌদ্ধ সাহিত্যে সম্পূর্ণ রামায়ণ কথা ছিল, তাহা প্রকাশ পাইবে। এই চিন্তা গ্রাহ্য করিতে গেলে কিন্তু লঙ্কাবতার সূত্রকে অগ্রাহ্য করিতে হয়।

অতঃপর আরবের অভ্যুদয় কালে বোগদাদের রাজা হারুণ-অল-রসিদ ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ চরক-সুশ্রুতের সহিত রামায়ণ-মহাভারতেরও অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর সাহের রাজত্বকালে তাঁহার আদেশে আবদুল কাদের বদায়ুনি রামায়ণের এক পারস্য অনুবাদ সুসম্পন্ন করেন। চারিবৎসরে তাঁহার অনুবাদ শেষ হয়। বদায়ুনি লিখিয়াছেন, তিনি ৬৫ অক্ষর সমন্বিত পঁচিশ হাজার শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ অধিকারের পর ইয়ুরোপীয় দিগের দৃষ্টি ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দিকে নিপতিত হয়। ফলে শ্রীরামচন্দ্রের

* The oldest Record of the Ramayana in a Chinese Budhist Writing. J. R. A. S. 1907 January.

মিসনারী কেরী ও মার্সম্যান ১৮০৬ ও ১৮১০ সালে বঙ্গদেশীয় সংস্করণের বালকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করেন।

১৮২৯ অব্দে ভন স্লিগেল (Augustus Willium Von Schlegal) কাশী-সংস্করণ রামায়ণের বালকাণ্ডের সম্পূর্ণ ও অযোধ্যাকাণ্ডের কতক অংশের মূল সহ লাটীন অনুবাদ প্রচার করেন।

১৮৪০ অব্দে ইটালি দেশবাসী সিগনর গেরেসিও বঙ্গীয় সংস্করণের সম্পূর্ণ রামায়ণ-মূল সংস্কৃত সহ ইটালিয় ভাষায় প্রকাশ করেন। গেরেসিও সরকারী সাহায্যে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৪০ অব্দে তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ১৮৬০ অব্দে তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। তাহার রামায়ণের ন্যায় উৎকৃষ্ট সংস্করণ এ পর্য্যন্ত আর প্রচারিত হয় নাই।

গেরেসিওর রামায়ণ অবলম্বন করিয়া হিপোলাইট ফচি (M. Hippolyte Fouche) ফরাসী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ প্রচার করেন।

এই সময় বিলাতের Westminster Review (Vol. L.) পত্রে রামায়ণ সম্বন্ধে একটী মূল্যবান প্রবন্ধ প্রচার করিয়া ইয়ুরোপীয় দিগের দৃষ্টি এই কাব্যের প্রতি আকর্ষণ করেন এবং ভারতীয় সিভিলিয়ান কাষ্ট সাহেব (R. N. Cast) কলিকাতা রিভিউ (No. 45) পত্রিকায় রামায়ণের প্রসংশা কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই আলোচনাদ্বয়ের ফলে ইয়ুরোপের বহু মনীষী ব্যক্তির মনে রামায়ণ আলোচনার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে।

কাশী কুইন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্রিফিৎ সাহেব (Ralph T. H. Greffith M. A.) কাশী-সংস্করণ রামায়ণের সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করেন। মনিয়র উইলিয়ম Indian Epic Poetry লিখিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। স্পিয়ার পত্নী (Mrs. Speir) Life in Ancient India, গ্রন্থ রচনা করেন। ফরাসী লেখক Mlle Clarisse Bader—La Femme dans L' Inde Antique প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কবি গুরু বাল্মীকির যশ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

দেশীয় দিগের মধ্যে স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্ত রামায়ণের সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে রামায়ণ কথার আলোচনা বৈদেশিক পণ্ডিত-দিগের মধ্যে অনেকেই করিয়াছেন। মনিয়র উইলিয়মের "Indian Epic Poetry" ব্যতীত তাঁহার "Indian Wisdom." Oman সাহেবের "Great Indian Epics" ডোনাল্ড মেকেঞ্জির "Indian Myth & Legend," জনৈক ইংরেজ মহিলার "Iliod of the East" প্রভৃতি ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য।

টালবয়েড হুইলারও একখানা রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ রামায়ণ তাহার প্রণীত ভারত ইতিহাসের (History of India) একটি খণ্ড মাত্র। এই রামায়ণ খণ্ড দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম অংশে রামায়ণী কথা ও দ্বিতীয় অংশে রামায়ণের আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার বৃহৎ; কিন্তু দুঃখের বিষয় হুইলার সাহেব শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণের আলোচনা করেন নাই। তাহার মনের ঈর্ষাপ্রসূত কলুষ-ভাব আলোচনার কথায় কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

অলাবু বা লাউ।

ইহার লাটিন নাম লেজেনেরিয়া ভালগেরিস্ (Lagenaria Vulgaris) এবং ইংরাজী নাম বটল্ গোর্ড বা ফকির্‌স্ বটল্ (Botlle-Gourd—Faguir's Bottle) হিন্দীতে দেশভেদে কদু, কদিমা, লৌকা, লাওকি, লবলউয়া, মিঠি তুম্বী, এবং মহারাষ্ট্র দেশে দুধ্যা ও ভোপলা বলে।

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই অলাবু ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইতেছে। বহু প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদেও অলাবুর দোষ গুণের বর্ণনা আছে। ইহাতেই বুঝা যায় ভারতবর্ষই অলাবুর আদিম জন্মস্থান।

লাউ একটী উপাদেয় তরকারী, এবং নানা প্রকার ব্যঞ্জনেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমিষ, নিরামিষ, ঝাল, ঝোল, অম্বল, চচ্চরী, শুক্‌তো, ছেঁচকি প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্যেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া নানাবিধ কার্য্যে নিপুন লোকের প্রতি—"ইনি যেন ঝোলে লাউ, অম্বলে কদু" এই প্রবাদ, দৃষ্টান্ত

রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সুস্বাদের দিক ছাড়িয়া দিলেও লাউয়ের অনেক গুণ আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ অভিধানে লেখা আছে লম্বাকৃতি ও গোলাকার এই উভয় প্রকার লাউই মধুর-রস, রুচিকর, তৃপ্তিপ্রদ, বলকারক, শুক্রজনক, পিত্তনাশক, ধাতু পুষ্টি কারক, গুরু এবং শ্লেষ্মা বর্দ্ধক। সুতরাং কফধাতু ও অজীর্ণাক্রান্ত লোক ব্যতীত সকলের পক্ষেই লাউ বিশেষ হিতকর খাদ্য। ইউনানী হাকিমগণও লাউয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহারা মাংসের সহিত লাউ ব্যবহার অত্যন্ত উপকারী বলিয়া বর্ণনা করেন।

লাউয়ের বীজ হইতে উৎপন্ন তৈল কপালে লাগাইলে মাথা বেদনা নিবৃত্ত হয়। প্রস্রাব বন্ধ হইলে লাউয়ের, লাউপাতার, লাউয়ের ডাঁটার অথবা লাউয়ের আঁকড়া বা শোঁয়ার রস খাওয়াইলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। জ্বর রোগে প্রলাপ দেখা গেলে রোগীর মস্তকে লাউয়ের সত্ব প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রবাদ আছে গর্ভিণীর প্রসব বেদনা বৃদ্ধি পাইলে ছাইগাদার উপরে যে লাউ গাছ জন্মে তাহার অখণ্ড মূল গর্ভিনীর চুলে বাঁধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

নবমী তিথিতে 'লাউ' ভোজন এবং গোলাকার লাউ ভোজন শাস্ত্র নিষিদ্ধ। দেশ প্রথায় কোন কোন স্থানে ভাদ্র ও চৈত্র মাসে লাউ ভোজন করে না। এই সময়ে লাউয়ের আস্বাদ ভাল থাকেনা, বলিয়াই বোধহয় উহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়না।

খণ্ড খণ্ড লাউ কলাইয়ের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। লাউয়ের বৃহদাকার ও সুপক্ক বস তম্বু বা বাওস্ দ্বারা তাম্বুরা সেতার একতারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও নানা প্রকার জলাধার ও অন্যবিধ পাত্রাদি প্রস্তুত হয় বলিয়া খাদ্যের হিসাব ছাড়াও ইহার উপযোগিতা আছে এবং অল্প যত্ন চেষ্টায়ই বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করা যায়। একটী বৃহদাকার লাউয়ের বস ৪।৫ টাকা মূল্যেও কলিকাতায় বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি।

লাউ প্রায় বারমাসই জন্মে। কিন্তু অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত যে লাউ জন্মে তাহাই অধিকতর সুখাদ্য। এই লাউকে আমনে লাউ বলে। আর যে লাউ চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে জন্মে তাহাকে আউসে বলে।

কলিকাতা অঞ্চলে তুম্বা, তিলে ও শিঙ্গে এই তিন প্রকার লাউ দেখা যায়। যে লাউগুলি গোলাকার তাহাকে তুম্বা বলে। যেগুলি লম্বাকৃতি তাহাকে শিঙ্গে, আর যেগুলি লাউ মাঝারী আকারের এবং গায় সাদা তিলের মত চিহ্ন থাকে তাহাকে তিলে বলে। পূর্ব্ববঙ্গেও দু তিন রকম আকারের লাউ দেখিয়াছি। কোন কোন স্থানের লাউ ৪।৫ হাত লম্বাও হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ ভিটি জমি বা উচ্চ দো-আশ মাটীতে লাউ জন্মিয়া থাকে। 'ফার্মিঙ্গার সাহেব বলেন'—প্রচুর সারযুক্ত বেলে জমিতে লাউ ভাল জন্মে। আমি নিজে সারযুক্ত বেলে জমিতে গাছ লাগাইয়া সুফল পাই নাই। প্রচুর সার অর্থে ফার্মিঙ্গার সাহেব কি মনে করেন জানিনা। আমি যে পরিমাণ সার ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত কম নয়। তবে এটেল মাটীতে লাউ ভাল হয় না।

পোড়ামাটী, মাছ ধোয়া জল, চাল-ডাল ধোয়া জল, ঘর দোর ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা, গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা ও পুরাতন গোবর-সার সাধারণতঃ লাউ গাছে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছে ফল ধরিলে আমি সপ্তাহে এক দিন করিয়া তরল গোবর সারও প্রয়োগ করিয়া থাকি। যাঁহারা রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বিঘাপ্রতি ৪০০ শত গাছের হিসাবে ১০ দশসের নাইট্রোজেন, ২৫ পঁচিশ সের পটাস সার ও ১৬॥ সাড়ে ষোল সের ফস্ফরিক এসিড সার প্রয়োগ করিতে পারেন। রাসায়নিক সার সকলের পক্ষে সহজ লভ্য নহে। যাঁহারা রাসায়নিক সার সংগ্রহে অপারগ তাঁহারা নাইট্রোজেন সারের পরিবর্ত্তে পুরাতন গোবর সার ও খৈ, পটাস সারের পরিবর্ত্তে কলার খোল বা পাতার ছাই বা কচুরী পানার ছাই এবং ফস্ফরিক এসিড সারের পরিবর্ত্তে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতে পারেন। নদী খাল বিল পুকুর খানা ডোবা বা গর্ত্তের পলি মাটিও লাউ গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। পলিমাটিতে যথেষ্ট পটাস থাকে বলিয়াই ইহা নানাবিধ তরি তরকারী ও শাক সবজীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। গোবর সারের পরিমাণ বেশী হইলে অনেক সময় গাছ ঝাঁড়াইয়া যায়, অধিক ফল হয় না। চারা লাগাইবার পূর্ব্বে মাদায় মাটীর সঙ্গে অন্য সারের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে টাটকা ছাই মিশ্রিত করিয়া

দিলে ফসল ভাল হয়। কারণ ছাই মিশ্রিত জমি অধিক জল শোষণ করিতে পারে এবং তজ্জন্য গাছ অধিক রস গ্রহণ করিয়া ফলের আকার বৃদ্ধির সহায়তা করে।

এক একটী মাদায় (৬ হইতে ৯ ইঞ্চি উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ) ২।৩টি করিয়া সুপুষ্ট বীজ বপন করিতে হয়। মাদার মাটীর সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত সার উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া 'মাদা প্রস্তুত' করিয়া লওয়া আবশ্যক এবং মাদা প্রস্তুতের ৩।৪ দিন পরে বীজ বপন কর্ত্তব্য। 'মাদাগুলির পরস্পরের দূরত্ব' ৪।৫ হাত হইলেই যথেষ্ট। বপন করিবার পূর্ব্বে বীজগুলি ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিলে সহজে চারা উৎপন্ন হয়। প্রসিদ্ধ উদ্যানবিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় তাঁহার "সবজীবাগ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বীজ" অঙ্কুরিত করিবার আর একটী সহজ উপায় এই যে, বীজগুলি একখণ্ড কাপড় আলগা করিয়া বাঁধিয়া কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তদনন্তর কতকগুলি খড় উত্তমরূপে ভিজাইয়া লইবে। এক্ষণে জল হইতে বীজের পুঁটুলি উঠাইয়া সেই সিক্ত খড়ের দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধিয়া আধ হাত মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। ছত্রিশ ঘণ্টা পরে সেই পুঁটুলি মাটী হইতে উঠাইয়া লইলে দেখা যাইবে যে, বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে। এবং তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকৃত মাদায় ঐ অঙ্কুরিত বীজের তিন চারিটী করিয়া বপন করিতে হইবে। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে বীজের অবস্থা বুঝিয়া পুনরায় বার বা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পুতিয়া রাখা উচিত আমি এই প্রক্রিয়া পরীক্ষা করি নাই ; কিন্তু প্রবোধ বাবু স্বয়ং যাহা পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া ৬।৭ ইঞ্চি বড় হইলে উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সবল চারাটি রাখিয়া অবশিষ্ট চারাগুলি ফেলিয়া দিবে বা অন্য কোন স্থানে প্রয়োজন হইলে পুতিয়া দিবে। অনেকে এক জায়গায় একাধিক চারা রাখিয়া থাকেন দেখা যায়। বোধ হয় তাঁহারা মনে করেন একসঙ্গে ২।৩টী গাছ হইলে ফল অধিক পাওয়া যাইবে—আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু ইহার বিপরীত। আমি দেখিয়াছি একই স্থানে ২।৩টী বা ততোধিক চারা রাখিলে সব গাছই দুর্ব্বল হয়, ফল কম ধরে এবং অপকৃষ্ট হয়। ইহাই স্বাভাবিক—একইস্থানে বহু গাছের মূল একত্রে জড়াইয়া গিয়া উপযুক্তরূপে বাড়িতেও পারে না অথচ প্রত্যেক গাছের পক্ষে প্রয়োজনীয় যথোচিত খাদ্যও সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং কোন গাছই সবল হইতে পারে না এবং প্রচুর সুপুষ্ট ফলও ধারণ করিতে পারে না। কাজেই একত্রে বহু গাছ পুতিয়া লাভবান হওয়া দূরে থাকুক বরং ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া থাকে।

লাউগাছ মাচায় তুলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য, নতুবা ফল ভাল হয় না গ্রীষ্মকালে লাউ মাঠেও হয় বটে কিন্তু তাহা উপযুক্তরূপ বড় হয় না। জলের ধারে লাউগাছ পুতিয়া মাচা বাঁধিয়া দিলে, জলের আর্দ্র বায়ুতে ফল বড় হয়। এই জন্য লাউগাছের তলায় অনেকে জলপূর্ণ পাত্র রাখেন। এমন কি প্রত্যেকটি লাউয়ের অল্প নীচেই জল পূর্ণ পাত্র রাখিয়া দেন। ইহাতে লাউয়ের আকার বৃহৎ হয় সন্দেহ নাই।

অন্যান্য গাছের ন্যায় মাটীতে রসের অভাব হইলে লাউ গাছেও জল প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু অতিরিক্ত জল বা আবদ্ধ জল লাউ কুমড়ার পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। এইজন্য সাধারণ জমি হইতে ৭।৮ ইঞ্চি উচু ও ১॥ হাত ব্যাসযুক্ত মাদা বা মাটীর ঢিপি করিয়া লাউ কুমড়া প্রভৃতির চারা বসান হইয়া থাকে। বর্ষাকালে লাউ ক্ষেতে যাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে তাহার সুব্যবস্থা করা উচিত।

লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা, ফুটি, চিচিঙ্গা, কাঁকরোল, কাকড়ি, তরমুজ, খরমুজ—এই সকল জাতীয়ের সহজেই সঙ্করবর্ণ উৎপাদন করা যায়। ফ্রান্স ও আমেরিকা ইহাদের বহু সঙ্কর জাতি উৎপাদিত হইয়াছে। এই সব কার্য্যে একটু ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু তাহার ফলে যে বিচিত্র নব নব আকার ও আস্বাদের তরি তরকারি সৃষ্টি করা যায় তাহাতে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্ময়ান্বিত না না হইয়া থাকা যায়না, এবং সমগ্র পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান হয়। বারান্তরে এবিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
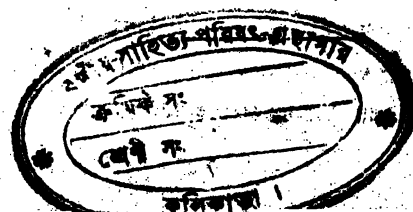
প্রিয়তম।

অতীতের অসীম জীবন সিন্ধু করিয়া মন্থন
তোমারে পেয়েছি আজ, ওগো মোর হৃদয়ের ধন!
অনবদ্য অমৃতের খনি
ওগো মোর নয়নের মণি!
আপনারে সাজায়েছ সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রাশি দিয়া,
তব মুখ পানে চেয়ে আছে মোর অতৃপ্ত এ হিয়া!
তোমার সুরভি শ্বাসে প্রাণ মোর পুলকে পাগল,
পরশে হরষ জাগে প্রতি অঙ্গে আবেশ বিহ্বল।
হে মোর পরাণ প্রিয়তম!
অমূল্য রতন তুমি মম!
তোমারে পাইতে কাছে নিরন্তর মান অভিমান
দূর হ'য়ে গেছে সব; আছ তুমি দীপ্তিমান্।
সীমাহীন বিচিত্র এ রাজ্য-মাঝে বিশ্ব প্রকৃতির,
অথবা কল্পনা রাজ্যে, দৃষ্টি যেথা নাহি রয় স্থির,
হে অতুল! হে চির শাশ্বত!
তোমার তুলনা মান-হত!
তোমা ছাড়া আর কেহ নাহি দেখি আপনার জন,
দেহ মন প্রাণ মোর একে একে করেছ হরণ।
তোমারে বিলায়ে দিছি যাহা কিছু ছিল আপনার,
উন্মদ লালসানল নিভে গেছে চির দুর্নিবার।
হে সুন্দর! হে চীর নবীন!
এক মাত্র তুলনা বিহীন।
জীবনের সঙ্গী হ'য়ে সাধিতেছ সতত কল্যাণ,
মরণেও লভি যেন তোমাতেই অনন্ত নির্ব্বাণ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

বাদল-বরণ।

গদ্য কবিতা

(১)

তপ্ত-ধরিত্রী অভিশপ্ত যক্ষের মতো বাঞ্ছিতের বিরহে
অধীর হয়ে উঠেছে!
শিরীষের কর্ণাভরণ খসে পড়েছে;
উষ্ণ হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে,
কাল-বৈশাখীর হা হুতাশে,
গুমটের মূর্চ্ছায়,
তার প্রাণ যায় যায়।
সহসা সে একদিন শুন্‌তে পেলে
তার বাঞ্ছিতের ডাক।
সে যে কী মধুর! কী সুন্দর!!
কি যে সে, তা'কি বলা যায়!
সে ডাক,
"প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো!"
তখন সে ময়ূর-পেখমের চোখ মেলে,
পথ-হারাণো হরিণ-শিশুর মতো
চঞ্চল চোখের ব্যাকুল চাউনি
দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলে!
কৈ? যে ডা'ক্‌লো তার তো খোঁজ পাওয়া
গেল না!
যাকে সে এই আট মাস ধরে খুঁজেছে,
যাকে দেখ্‌তে চায় চোখ,
শুন্‌তে চায় কান,
যার কেশের সুবাসে মাদকতা আসে,
অধর যার সুধার পিয়াসায় অধীর,
শিহরণ যার পরশ-প্রতীক্ষায় উন্মুখ,
এক কথায় বল্‌তে গেলে,—
"রূপ লাগি ঝুরে আঁখি, মন মন লাগি,
প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি।"
কৈ? তা'কে তো পাওয়া গেল না!
তখনও তা'রে চোখে ছাখেনি,
শুধু বাঁশী শুনেছে।
তা'তেই মন প্রাণ দিয়ে ফেলেছে
ওগো কৈ, তুমি কত দিনে দেখা দেবে!

(২)

তখন ঘূর্ণি-হাওয়ার রথে চড়ে ধূলিরা সব
দিকে দিকে ছুটলো!
চাতকের ক্ষীণ-কণ্ঠে কান্না বেজে উঠ্‌লো!
সারাদিন তপনের ঝাপ্‌সা দৃষ্টি,

সমস্ত বিনিদ্র-রজনী চাঁদের পাণ্ডুর পরিবেশ!
"বর্ষভোগ্য" বিরহে "অস্তগমিতমহিমা" ধরণীর
এ দীনতা তো আর সওয়া যায় না!
ওগো দেখা দাও! দেখা দাও!

(৩)

তখন মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগ্‌লো—
নিদাঘের রুদ্র-যবনিকার ফাঁক দিয়ে
একটু উঁকি ঝুঁকি!
কখনো বা বিদ্যুতের এক আধটুকু কটাক্ষ।
কে যেন দুষ্টু মেয়ের মতো উঁকি মারে,
আর চোখে চোখে পড়্‌লেই ছুটে পলায়—
চোরা চাউনির ঘা মেরে।
তা'তে কি আশ মেটে!
যা'কে শতবাহু বেষ্টনে বেঁধে, "অবিরলিত কপোল" হয়ে
কোটিকল্প যুগ রাখ্‌লেও তৃষা মেটেনা,
তার অন্তর কি সওয়া যায়!
তাই কেবল এসো, এসো, এসো!
শুক্‌নো পাতার ঝর্‌ঝরি, এসো গো, এসো!
মরা নদীর কল্‌কলি,—এস গো, এস!
গরম হাওয়ার হা-হুতাশ,
ফুলের কুঁড়ি ফুট্‌তে গিয়ে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়া!

(৪)

সারা বিশ্বে এ রকম করে যখন বিরহ বেজে উঠ্‌লো
তখন, কি আর সে থাক্‌তে পারে?
দেখা দিলে একদিন,—
তারার মালা ছেঁড়া,
চাঁদে টিপ্‌ মোছা,
পরণে নীল শাড়ী,
নীলাম্বরীর নীল আঁচল সারা আকাশে লুটুছে!
বিজুলি-হার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ছে।
তাই দেখেই এ পারের একটা সাড়া পড়ে' গেল!
মাছরাঙারা ছুটো ছুটি করে,
দিক্‌ বধূদের খবর পৌঁছে দিলে—
"ওগো সে আস্‌ছে! সে আস্‌ছে!"
শুক্‌নো নালা-ডোবায় বৈঠক বসে' গেল
ব্যাঙ্‌ বৈতালিকদের।
তারা অভিনন্দনের গান জুড়ে দিলে।
করবীরা তাদের মধু-পূর্ণ পান পাত্র তুলে ধর্‌লো।
গরম হাওয়া নরম হয়ে মরা নদীদের ঠেলে দিলে;
তারা কুলকুলিয়ে জেগে উঠ্‌লো!
ঝুম্‌কোলতা দোদুল্‌দোলে দুলে,
কদম গাছ মোটা বাহু নেড়ে,
ডাকতে লাগ্‌লো—"এসো, এসো, এসো!"
এত ডাকাডাকি, এত আশা-ভরসা,
সবই কি বৃথা হোলো?
হায়, সেত এল না!
কে জানে কোন্‌ অজানা দেশে ভেসে ভেসে
মিশিয়ে গেল!
গরম হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে
গুমটে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

(৫)

আর একদিন আবার সেই আয়োজন,
সে দিনও দেখা দিয়েই চলে যাওয়া!
এ রকম রোজই আসে, রোজই যায়।
এক দিকের 'বাসক' শয্যা, অন্য দিকের অভিসার,
সবই হয় বৃথা।
এ রকম লুকোচুরি নিয়ে ক'দিন থাকা যায়।
তারপর বিরহী এলিয়ে প'ড়লো।
অভিসারের আড়ম্বরে এখন আর সে ভোলে না;
দুঃখ যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে।
নাঃ! আর এল না!
সে নিরাশ হয়ে গা ঢেলে দিলে!
এখন আর তাকে দেখ্‌লে ফিরেও চায় না!
কদম-কুঁড়ি উঁকি মারে না,
নিজের বোঁটায়ই নিজে শুকিয়ে মরে!
ব্যাঙেরা তাদের তান্‌সুর থামিয়ে দিয়েছে।
কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁর ভাঙা একতারায়
কাতর ঝঙ্কার!
আর "দুপুর দিন ঘুঘুর" করুণ সুর!
শেষে কি জানি কি মনে করে একদিন মাদল বাজিয়ে

ঝড়ো হাওয়ার রথে চড়ে
অগ্নিকেতন উড়িয়ে নিজেই এসে হাজির!
আজ দেখি তার আর এক বেশ!
ধোঁয়াটে রঙের শাড়ী পরা,
গলায় বলাকার মালা,
ইন্দ্রধনুর সিঁথি আঁটা,
পায়ে জলতরঙ্গের মল বাজ্‌ছে!
গাল টিপে টিপে কী হাসি!
বঞ্চিত জগত দেখেও দেখ্‌তে চায় না!
একি! সত্যিই যে দুয়ারে এসে দাঁড়ালো!
তাইত, কি হবে তবে?
যে চির-প্রার্থীত, যাকে পাওয়ার জন্য
এত দিন ধরে এত আয়োজন,
আজ সে নিজেই আমার দুয়ারে!
এ অযাচিত অতিথিকে কি করে বরণ করে ঘরে তুল্‌বো?
আজ যে কোন আয়োজনই নেই!
অতিথি নিজেই জলধারার আল্‌পনা দিয়ে,
শুক্‌নো পাতার ঝর্‌ঝরি বাজিয়ে,
কোনো রকম করে' ঘরে এলেন।
ধরার তখন বুকফেটে কান্না আস্‌তে লাগ্‌লো!
ওগো! এমনই কি হয়?
বাঞ্ছিতকে পাওয়ার জন্য যখন আয়োজন করি,
তখন সে আসে না।
আর কোনো এক অজানা লগ্নে নিজেই এসে
দুয়ারে দাঁড়ায়!

(৬)

সে এসে শতবাহু বেষ্টনে বেঁধে,
ধরাকে যেন টেনে তুল্‌তে লাগ্‌লো!
চুম্বনের মুদ্রাঙ্কন কদমের কুঁড়িতে কুঁড়িতে
পরিয়ে দিলে।
তখন মান অভিমান সব মিটে গেল।
সয়ে থাকা যায় কি আর!
কেয়ার ঝাড়ে কেতকী অধর মেলে কি
যেন বল্‌তে গিয়ে তার মুখের
কথা মুখেই রইল!

তখন ধরায় ধারায় লুটোপুটি,
শাখায় হাওয়ায় ছুটোছুটি,
নদীর জলে জলে গলাগলি!
এখন তপ্ত-শ্বাস হয়ে উঠেছে স্বস্তির নিশ্বাস;
ঝড়ের হাহাকার আনন্দের কোলাহলে
পরিণত হয়েছে।
গুমটের মূর্চ্ছায় আনন্দের অসাড়তা এসে পড়েছে।
সেই "আষাঢ়স্য প্রথম দিবস" থেকে
আজ "প্রশম দিবস" অবধি
দিন নেই রাত নেই—
এই যে ঝর্‌ঝরাণি,
এই যে হাসি, কান্না, অভিমান—
এর ত আর বিরাম নেই!
কখন মুষল ধারায় ধরা ভাসিয়ে দিয়ে
তার রুদ্ধ বেদনা মুছে দিচ্ছে।
শাখায় শাখায় দম্‌কা নাড়া দিয়ে
কুঁড়িদের জাগিয়ে দিচ্ছে!
নদীর তরঙ্গে ছিনিমিনি খেলা,
আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো ধরে
মুখখানা ভাল করে, দেখে নেওয়া!

(৭)

কখন অভিমানে মুখখানা ভার,
হাওয়ার নরন চড়ন নেই,
গুমটে গরমে, মানিনী কিশোরীর মতো
নত মুখে বসে আছে—পেছন ফিরে।
এক রাশ্‌ কালো চুলে ঢাকা!
মুখে কথা নেই, চখে ইল্‌সে গুড়্‌নি;
কে জানে এ আবার কোন্‌ ভাব?
কখন যেন একটি চঞ্চলা বালিকা,
হাওয়ার গাড়ীতে চড়ে ছুটোছুটি,
বিদ্যুৎ নিয়ে কন্দুক-ক্রীড়া,
চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি,
মেঘের ঘোম্‌টা টেনে একবার মুখখানা
ঢেকে ফ্যায়;
আবার তুলে তুলে ত্যাখে;

যেমন শিশু তার মায়ের
মুখ খানা নিয়ে করে।
কখনো বা দেখি প্রগল্‌ভা
প্রৌঢ়ার মতো,
অট্ট হাসিতে গগন ফাটিয়ে দিয়ে,
দিকে দিকে সোর্‌-গোল ফেলেদিচ্ছে।
তার ছুটোছুটিতে পায়ের কনক নূপুর
ঝল্‌সে' উঠ্‌ছে।
শতধারার কাঞ্চি-প্রহারে ধরাকে অতিষ্ঠ
করে তুলছে।
নাচ্‌তেগিয়ে ময়ূর থম্‌কে "উন্নমিতৈকচরণে"
"ন যযৌ ন তস্থৌ" হয়ে আছে!
দাছুরী আগেই তার গান থামিয়ে
বসে আছে।
শত কদম-চোখ আজ আনত!
কখনো বৃষ্টি ধোয়া শাদা মেঘের পেঁজা তুলোর
বিছানায় শুয়ে, কে এক অবগুণ্ঠিতা।
তার গায়ের সোনালী রঙ্‌ অবগুণ্ঠন ফুঁড়ে বেরুচ্ছে!
আবার কখনো পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে,
নদীর কূলে পা ছড়িয়ে,
রোদে-ধোয়া খসে-পড়া আঁচল খানি
দিয়ে ঢেকে;
ধরণীকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে—
বর্ষিয়সী জননীর মতো!

(৮)

আজ্‌ তার সব কথার অন্ত হয়েছে,
সেদিন ছিল—

"কোথায় জল, কোথায় জল!
নি-জল খাল পুকুর তল
তৃষ্ণায় জীবন যায়
চাতক চায় 'ফটিক্‌ জল'।
দুপুর দিন ঘুঘুর ক্ষীণ
উদাস-সুর কাঁদায় প্রাণ;
মগজ্‌-শির টাটায় আজ,
ঝিঁঝিঁর ঝাঁজ্‌ ফাটায় কান।" (যতীন্দ্রপ্রসাদ)

আজ ধরিত্রী মিলনের আনন্দে আত্মহারা;
মাতাল হাতীর মতো গা দোলানো
ধানের ক্ষেতের সবুজ ঢেউয়ে চড়ে',
প্রণয়িনীর কণ্ঠালিঙ্গন করে',
মেঘমল্লারে গান ধরে দিয়েছে;

"আমায় এম্‌নি খুসি করে রাখ
কিছুই না দিয়ে,
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।
এম্‌নি ধূসর মাঠের পারে,
এম্‌নি সাঁজের অন্ধকারে,
বাজাও আমার প্রাণের তারে
গভীর ঘা দিয়ে।
আমায় এম্‌নি রাখ বন্দী করে
কিছুই না দিয়ে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

ওগো আমার চিরবাঞ্ছিত, তুমি কি আস্‌বে না?
আমার 'বাসক-শয্যা' কি নিতিনিতিই বিফল হইবে!

শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত ভিষক্‌শাস্ত্রী।

—※—

স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রকিশোর।

দয়া ও দাক্ষিণ্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, হিন্দুধর্ম্মের একনিষ্ঠ উপাসক পূর্ব্ববঙ্গের স্বনাম ধন্য জমিদার, রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বিগত ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ তারিখে, মহানগরী কলিকাতায় মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী রামগোপালপুরের প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ জমিদারী বংশে ১২৬৪ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঊর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ পুরুষ প্রখ্যাত নামা শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পূর্ব্ব নিবাস বগুরা জেলার অন্তর্গত কড়ুই গ্রামে ছিল। ঐ জেলার তরফ্‌ কড়ুই, শেরবর্ষ এবং ছিন্দাবাজু পরগণা তাঁহার জমিদারীভুক্ত ছিল। অদ্যাপি

কড়ইগ্রামে তাঁহার আবাস বাটীর ধ্বংশাবশেষ বিদ্যমান্ থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; উল্লিখিত জমিদারীও অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ ভোগ দখল করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবুদ্ধি ও দৈহিকবলের তুল্যাধিকারী ছিলেন। তদানিন্তন বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সরকারে তিনি কাননগোর কার্য্য করিতেন, এবং ঐকার্য্যে তিনি নবাব সরকারে সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পারদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ অষ্টদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহাকে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করিয়া পরগণা ময়মনসিংহ ও পরগণা জফরসাহীর জমিদারী প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ১ম পরিণীতা পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ, কৃষ্ণকিশোর ও গোপালকিশোর নবাব সরকার হইতে রায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই কৃষ্ণকিশোর ও গোপালকিশোরের বংশধরগণ রায় চৌধুরী নামে আখ্যাত। কৃষ্ণকিশোর পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার বিধবা পত্নী রত্নমালা ও নারায়ণী দেবী কেল্লাবোকাই নগরের নিকটবর্ত্তী রামগোপালপুর নামক স্থানে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। গৌরীপুরের জমিদারগণ গোপালকিশোরের বংশধর।

রত্নমালা ও নারায়ণী দেবী জ্ঞাতিবর্গের সহিত নানারূপ বৈষয়িক বিবাদে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ায়, তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ঐ বিবাদের মীমাংসা করিয়া নারায়ণী ও রত্নমালা দেবীকে পরগণা ময়মনসিংহ এবং জফরসাহীর অর্দ্ধাংশের মালিক সাব্যস্থ করিয়া ১৭৭৪ খৃঃ অঃ ১২ই জুলাই তারিখে আপন স্বাক্ষর যুক্ত এক সনন্দ প্রদান করেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐ সনন্দের প্রতি লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(Sd.) Warren Hastings.

N. B. Sanad to Ratnamala and Naryani, the widows of Krishna Kishore granting to them the right of the 8 annas division of Mominsing and Jafarshi formerly employed by (illigible) Registered by order of Hon'ble the Resident and Council of Revenue at Fort William. The 12th July. *

সপত্নী রত্নমালা দেবীর মত্যুর পর, নারায়ণী দেবী সম্পূর্ণ জমিদারীর অধিকারিণী হইয়াছিলেন। নারায়ণী দেবী অতিশয় মহিয়সী মহিলা ছিলেন। তাঁহার বিবিধ সদগুণাবলী অধ্যাপি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় স্থানীয় জন সাধারণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। নারায়ণী চৌধুরাণীর প্রদত্ত বহু ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ ও পীরপাল ভূমি ময়মনসিংহ এবং জফরসাহীর প্রজাগণ অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। জামালপুরের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ দয়াময়ী দেবী, নারায়ণী চৌধুরাণীরই অন্যতম কীর্ত্তি।

নারায়ণী চৌধুরাণীর দত্তকপুত্র রামকিশোর, রামকিশোরের দত্তকপুত্র কালীকিশোর এবং কালীকিশোরের দত্তকপুত্র কাশীকিশোর। এই কাশীকিশোর রায় চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর বংশের এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন। কাশীকিশোর ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া তৎকালিক বিজ্ঞ সমাজে বরণীয় হইয়াছিলেন। কাশীকিশোর ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্ব প্রথম অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। রামগোপালপুরে তাঁহার ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট বেঞ্চ ছিল। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্, হৃদয়বান, এবং স্বধর্ম্ম পরায়ণ জমিদার ছিলেন। বিষয়ী হইয়াও ত্যাগ তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। ঢাকার কমিসনার বাহাদুর তাঁহাকে রাজোপাধি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তদুত্তরে তিনি জানাইয়া ছিলেন যে—আমার পক্ষে কাশীকিশোর শর্ম্মণ থাকাই বাঞ্ছনীয়; রাজোপাধিতে আমার প্রয়োজন নাই। এই আদর্শ চরিত্র মহাপুরুষ রাজর্ষি জনকের আদর্শে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বাংলা ১২৯৪ সনের আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপুর্ণিমা তিথিতে মানব লীলা সম্বরণ করেন।

রাজা যোগেন্দ্রকিশোর উক্ত কাশীকিশোর রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। যোগেন্দ্রকিশোর আশৈশব পিতার তত্ত্বাবধানে বর্দ্ধিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার সহিত পিতার যাবতীয়

* পারস্য ভাষার লিখিত সনন্দখানার গাত্রে যে ইংরেজী অংশটুকু ছিল, তাহাই উদ্ধৃত হইল।

সদগুণাবলীতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহার ন্যায় পিতৃভক্ত পুত্র দুর্লভ। তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনে তিনি পিতার উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। পিতৃ প্রসঙ্গে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও বালকের ন্যায় হইয়া যাইতেন। পিতার তৈলচিত্রকেও তিনি জীবিতবৎ সম্মান করিতেন।

যোগেন্দ্রকিশোর এক জন আদর্শ আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। নিত্য নৈমিত্তিক পূজা অর্চ্চনাদি তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত যাগ, যজ্ঞ, ব্রতপুরশ্চরণাদিতে রাজভবন বর্ষব্যাপী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকিত। ছোট বড় সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্পন্ন করিতেন। পুরোহিতবর্গের কোন প্রকার ক্রটী বিচ্যুতি ঘটিলে তিনি স্বয়ং তাহা সংশোধন করিয়াদিতেন। তন্ত্রোক্ত এবং বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। গুরু এবং ব্রাহ্মণের পাদোদক গ্রহণ না করিয়া তিনি কদাচ জল গ্রহণ করিতেন না।

তাঁহার গুরুদেব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস তত্ত্বরত্ন মহাশয়কে তিনি সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে পদব্রজে গুরুদেবের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতেন। প্রাকৃতিক বিপ্লবও তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত না। গুরু দেবের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তিনি তাঁহার বিপুল জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের পরিচালনা করিতেন। ফলতঃ তিনি তাঁহার গুরুদেবকে ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম জীবনের তুল্য উপদেষ্টা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার গৃহ-দেবতা মদনমোহন দেবের প্রতি তিনি যে কতদূর ভক্তিমান ও নির্ভরশীল ছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মদনমোহন দেবকে তিনি বাবা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ফলতঃ তাঁহার কার্য্যকলাপে উভয়ের মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধই পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। মদনমোহন দেবের ভোগ আরতি অঙ্গরাগ প্রভৃতির প্রতি তাঁহার এতদূর সজাগ দৃষ্টি ছিল যে, ঐ সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্র ক্রটী ঘটিবার সাধ্য ছিল না।

বিগত ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে রামগোপালপুর রাজভবনের সমগ্র সৌধরাজী বিধ্বস্ত হইয়া এবং ভূগর্ভ হইতে বেগে জলরাশি উত্থিত হইয়া অধিবাসীবর্গের মনে মুহুর্মুহুঃ আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা-উদ্রেক করিতে থাকে। সেই সময়ের দৃশ্য যিনি স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন তিনি কিছুতেই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। এই ভয়াবহ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া যোগেন্দ্রকিশোরের সর্ব্ব প্রথম মনে হইয়াছিল তাঁহার প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন দেবের কথা। তখনো কম্পন বেগ প্রশমিত হয় নাই, তিনি ত্রস্তপদে মদনমোহন দেবের মন্দির সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন মন্দির ভূমিসাৎ হইয়াগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সাহায্যে ইষ্টকরাশি অপসৃত করিয়া বিগ্রহের উদ্ধারসাধন করিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় বিগ্রহ অক্ষত শরীরেই ছিলেন। এই ঘটনার পরে তাঁহার পরিবারবর্গের কথা মনে হইয়াছিল। তখন তৎসম্বন্ধে কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসু হইলেন। কি পরিমাণ ভক্তি ও ঐকান্তিকতা হৃদয়ে নিহিত থাকিলে, পাষাণের ঠাকুরে ঈদৃশ বাস্তবতা আরোপ করা যাইতে পারে, তাহাই চিন্তনীয় বিষয়।

তাঁহার হৃদয় নিরতিশয় দয়া-প্রবন ছিল। পরদুঃখ মোচনে তাঁহার উৎসাহের অবধি ছিল না। কোন দুস্থ সঙ্কটাপন্ন রোগীর বিষয় তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ ব্যয়ে উপযুক্ত চিকিৎসক পাঠাইয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কোন আসন্ন প্রসবা প্রসূতির প্রসব-কষ্টের বিষয় অবগত হইলে তিনি উপযুক্ত ডাক্তার ও ধাত্রী পাঠাইয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতেন। প্রার্থীগণকে তাঁহার নিকট হইতে কখনও রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে দেখা যায় নাই। এমনও অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, কোন বিদ্রোহী প্রজা তাঁহারই সহিত মামলা মোকদ্দমায় হৃত সর্ব্বস্ব হওয়ার পর পুনরায় তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহার জমি জমা তাহাকে পুনরায় অর্পণ করিয়াছেন।

বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি দীন-ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি প্রতিদিন কদলী পত্রে ভোজন করিতেন। সুরম্য-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া সামান্য গৃহে বাস করিতেন। প্রয়োজন ব্যতীত পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখাইতেন না।

তিনি আসক্তি-শূন্য সংসারী ছিলেন। কর্ম্মফলাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। সাধুসঙ্গ, ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তাঁহার সমাধিক উৎসাহ ছিল। তাঁহার দ্বার-পণ্ডিত লালমোহন ব্যাকরণ-কেশরী এবং মহেশ্বর সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ের সহিত তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করিতেন।

বিদ্যোৎসাহিতা তাঁহার জীবনের একটী অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নিকটস্থ অধিবাসীবর্গের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা সৌকর্য্যে তিনি রামগোপালপুরে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং কল্‌তাপাড়াতে একটী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ঐ দুইটী বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার ষ্টেট হইতে বার্ষিক ৪০০০৲ চারি সহস্র টাকার উপরে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান আন্দোলনের বহু পূর্ব্বেই তিনি দেশে শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের সুফল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ছিলেন। তাহার ফলে বিগত ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতার নামে ময়মনসিংহ সহরে কাশীকিশোর টেক্‌নিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার বহন করিয়া উহাকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে তিনি ৫০০০০৲ পঞ্চাশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিবৎসর বহু কারিগরের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ময়মনসিংহ সিটি কলেজের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য এক সময়ে বহু অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ অর্থ সংগৃহীত না হইলে কলেজটী উঠিয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। তখন যোগেন্দ্রকিশোর এককালীন ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়া ঐ কলেজটী রক্ষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার এই দানের জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কলেজের নামের সহিত তাঁহার নামযুক্ত করিয়া, কলেজটীকে যোগেন্দ্র-কিশোর কলেজ নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু তিনি ঐ প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং ময়মনসিংহের গৌরব স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর নামে কলেজের নামকরণ করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করাতে, ঐ সময় হইতে কলেজটী 'আনন্দমোহন' কলেজ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে ঐ কলেজটীকে ১ম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করার সময় তিনি পুনরায় ৯০০০৲ নয় হাজার টাকা দান করিয়া ছিলেন।

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্যও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। ঢাকার সারস্বত সমাজের জন্যও বহুকাল হইতে তাঁহার বার্ষিক দান নির্দ্দিষ্ট আছে। বিভিন্ন ধর্ম্মসভা ও পরীক্ষা-সমাজগুলিতে তিনি প্রতিবৎসর বহু টাকা দান করিয়াগিয়াছেন। চতুষ্পাটী ও অধ্যাপকগণের বার্ষিক বৃত্তি তাঁহার ষ্টেট হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

দেশবাসীর চিকিৎসার সুবিধা সৌকর্য্যে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত রামগোপাল-পুরের দাতব্য চিকিৎসালয়টী তাঁহারই সাহায্যে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ময়মনসিংহের সূর্য্যকান্ত হাসপাতালের জন্য তিনি এককালীন ২০০০০৲ বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁহার বার্ষিক-দান ধার্য্য আছে।

জন-হিতকর বিবিধ কার্য্যে তাঁহার দানের অন্ত ছিল না। প্রজা সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি এককালীন ২০০০০ বিশ হাজার টাকা দান করেন। ঢাকার উয়ারী পল্লীতে পূর্ব্বে জলের কলের ব্যবস্থা ছিল না; তিনি বহু ব্যয়ে তথায় জলের কলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তত্রত্য অধিবাসীবর্গের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া দিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ তীর্থের 'বাড়বানল' মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি উহা আমূল সংস্কার করিয়া উহার ভিত্তিগাত্রে শ্বেত-কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ স্থানে একটী অন্তিম আশ্রয় নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এতৎ-ব্যতীত লেডি-ডাফ্রিন হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, ঢাকার অনাথ আশ্রম, নর্থব্রুকহল, ইডেনফিমেল স্কুল, কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল, জামালপুরের টাউনহল, উডবর্ণমেমোরিয়াল, কেশবএকাডেমি প্রভৃতির জন্য তিনি বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অতিথি সৎকার অতি প্রসংশনীয় ছিল। তাঁহার রামগোপালপুরস্থ অতিথিশালায় প্রতিদিন বহু অতিথি আহার্য্য পাইয়া থাকে এবং অতিথিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানারূপ সুবন্দোবস্ত আছে। অতিথিশালা ব্যতীত ও মদনমোহন দেবের ভোগ হইতে ২৫ জন অতিথির এবং জামালপুরের দয়াময়ীর ভোগ হইতে দৈনিক ৩০ জন অতিথির আহারের ব্যবস্থা আছে।

তিনি অতিশয় সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ গুণিগণের উৎসাহের বর্দ্ধনকল্পে অর্থব্যয় করিতে তিনি কদাচ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার নিকট কলাবৎ এবং যন্ত্রবিদ্‌গণের অবারিত দ্বার ছিল। তিনি খ্যাতনামা ওস্তাদ নিযুক্ত করিয়া পুত্রগণকে উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত-বিস্তায় সুশিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তৃয় পুত্র কুমার সৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী একজন প্রসিদ্ধ কলাবৎ এবং তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র কুমার হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ন্যায় উচ্চ অঙ্গের তবলাবাদক বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বিরল।

দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি বৃহৎ ব্যাপারে তিনি সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বিবিধ প্রকার গীত বাদ্য আমোদ প্রমোদ এবং ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন। ঐ সময়ে বহুদূর হইতে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইত। সমস্ত ব্যাপারগুলিই তিনি রাজোচিৎ ভাবে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুতে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে যে বিরাট দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার সুখ্যাতি অদ্যাবধি লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

রাজদ্বারে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তাহার ফলে ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি এবং ১৯০৯ খৃঃ অব্দে রাজোপাধিতে ভূষিত হন।

বর্ত্তমান যুগের সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ পল্লী জীবন অপেক্ষা নাগরিক জীবন সমধিক পছন্দ করিয়া থাকেন কিন্তু যোগেন্দ্রকিশোর তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তিনি কদাচ তাঁহার আবাস-বাটী পরিত্যাগ করিয়া শুধু বিলাস-বাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাইয়া বাস করেন নাই এবং তাঁহার পুত্রগণকেও কদাচ ঐ বিষয়ে প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। এই জন্যই তিনি তাঁহার আবাস ভূমির ঈদৃশ উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার পারিবারিক জীবন অতিশয় শান্তিময় ছিল। নগেন্দ্রকিশোর, যতীন্দ্রকিশোর সৌরীন্দ্রকিশোর এবং হরেন্দ্রকিশোর নামক তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় যেমন পিতৃভক্ত তেমন চরিত্রবান হওয়াতে তাঁহাকে কখনো পারিবারিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী রাধারঙ্গিনী দেবী আদর্শ পতিব্রতা এবং লক্ষ্মী স্বরূপিণী মহিলা ছিলেন। দান ধ্যান, ব্রত পুরশ্চরণ ইত্যাদি তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বৈধব্যকে তিনি অতিশয় ভয় করিতেন। মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই রাজা বাহাদুর কম্প বাত এবং অন্যান্য ব্যাধিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তখন রাণী ঠাকুর দেবতার নিকট শুধু এই প্রার্থনা করিতেন তাঁহাকে যেন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত।

অতৃপ্তি।

খেলিতে ধূলো খেলা
চাহেনা ভাঙ্গা প্রাণ!
ডুবিয়া গেল রবি
আঁধারে ধরা ম্লান।

পাতকী ভাবে বসি
তরিতে কবে পাবে,
ভিড়িবে ঘাটে কবে
পারের তরী খান্!
ডুবিয়া গেল রবি
আঁধারে ধরা ম্লান!

অকাজে দিন যায়!
কেবলি হায়-হায়!
মনরে গাহ তুমি
বিভুর গুণ-গান্।
খেলিতে ধূলো খেলা
চাহেনা ভাঙ্গা প্রাণ।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

একটী চিত্র।

"তোমার এই শীতের সন্ধ্যায় যাতে, মাঘের শীতে বাঘ—পালায়—প্রায় বিবস্ত্র হইয়া কোথায় চলিয়াছ?"

"বাবু! গায়ের বস্ত্র কোথায় পাইব, পরিধানের বস্ত্রই যোটেনা; গামছা খানা পরিয়াছি, বাড়ী যাইয়া ইহা ছাড়িয়া ছাড়া ধুতিখানাই গায়ে দিয়া রাত্রি কাটাইব।"

"তা তোমার ঐ সামান্ত কাপড়েই কি শীত মানায়?"

"তা বাবু কি করিব, যা জোটে তাহা দ্বারাইত ব্যবস্থা করিতে হইবে; যখন শীত আর সহ্য করিতে না পারি তখন ক্ষেতকুড়ান—বিচালী মেজেতে জ্বালাইয়া শরীর মাঝে ২ গরম করিয়া আবার শুই, আবার শীতে ঘুম ভাঙ্গিলে আবার এই ব্যবস্থা।"

"তুমি বাঁকে করিয়া কি লইয়া যাইতেছ?"

"আজ্ঞে আমরা কলু, 'মাল' লইয়া যাইতেছি, তেল ভাঙ্গিয়া বাজারে বিক্রী করি।"

"তোমার এই পনর সের মাল ভাঙ্গিতে কতক্ষণ লাগে?"

"বাবু গরু দিয়া ভাঙ্গিলেত কম সময়েই হয়, তবে আমার একটু সময় বেশী লাগে।"

"তার মানে? তুমি কি মানুষ দিয়া ভাঙ্গাও নাকি?"

"বাবু, সে সয়মের কথা না বলাই ছিল ভাল; গরীব মানুষ, গরু কোথায় পাই? আমি আমার স্ত্রী দুজনেই ঘানি ঘুরাই।"

"তা বেশ কর, বাপু মেহনত আন্দাজ পেট পোষাও কি করিয়া?"

"আজ্ঞে, কোনদিন খোদাও চালান, আর কোনদিন আমিও চালাই।"

"আহা, বাপু তা নয়, ক্ষিদে পেটে ঘানিই বা কি করিয়া ঘোরে, আর তেলই বা পড়ে কি করিয়া?"

"আজ্ঞে জিজ্ঞাস কচ্ছেন ক্ষিদে পেটে ঘানি কি করে ঘুরাই—কেন পাশে ঘড়া ভড়া জল আছে, ঘটি ঘটি খেলেইত পেট ভরিয়া ঘানি চালান চলে।"

"তা বেশ বাপু, বউত ঘানি ঘুড়ায়, ছেলে পেলে নাই?"

"বাবু তা খোদা মাস ৮।৯ হইল একটি ছেলে দিয়াছেন।"

"ঐ কচি ছেলেকে রাখিয়া কাচা পোয়াতী অত হাড়ভাঙ্গা মেহনতের পর কি করিয়াই বা ছেলে পালন করে,—আর বাপু, কি করিয়াই বা তাহার বুকে দুধ থাকে?"

"আজ্ঞে তার বুদ্ধিও খোদাই জান!"

"কি প্রকার বাপু? এরও আবার একটা আবিস্কার হয় নাকি?"

"তা বাবু, ভাতের মার বাটীতে রাখিয়া পাট কাটি একদিকে ঐ বাটিতে রাখি, আর এক ন্তাকড়া বাধা পাট কাটি ছেলের মুখে রাখি। প্রথমটা ছেলেটা খুব কাঁদিত বটে, তা এখন আর কাঁদে না, সহিয়া গিয়াছে।"

"তোমার বুদ্ধির খুব তারিফ বটে, মাঝে ২ গরুর দুধ বা বার্লী টার্লি খাওয়াও না?"

"আজ্ঞে অত পয়সা কোথায় পাই, তবে, হাঁ, হাটের দিন দুই পয়সার মিছরী আনি, তা জলে একটু একটু গুলিয়া মাঝে মাঝে খাওয়াই; বাবু রাত্রি হইতেছে, আমি বাড়ী যাই, বউ বসিয়া আছে।"

"তা, তুমি যাও, তোমার বউ হয়ত বা অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমার ভাত লইয়া বসিয়া আছে।"

"আজ্ঞে, তা নয়, আজ দিনে মোটেই রান্না হয় নাই, চাল ছিল না, তেল বেচিয়া চাল আনিয়াছি, শীগগির শীগগির বাড়ী গেলে তবেত রান্না হইবে।"

"তা যাও, আচ্ছা তুমি যে স্ত্রী দ্বারা ঘানি চালাও তাতে সে তোমার উপর কি বিরক্ত?"

"আজ্ঞে না, বার বছর বয়সে সাদি করিয়াছি, আর আজ এই পঁচিশ বছর, আমি শরীরের রক্ত জল করিয়া দুপুরে সন্ধ্যায় হাটে মাঠে ঘুরি, আর সে সংসারের গোছগাছ না করিলে যে সকলেরই রোজা মুখে কাটাইতে হইবে, তা বাবু আসি, আদাব,"

কিয়দ্দূরে যাইয়াই ভাটিয়ালী সুরে গলা ছাড়িয়া কলুর ছেলে গৃহের দিকে ফিরিল আর আমি গায়ের শালটা আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে উদাস মনে গৃহে ফিরিলাম।

শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী বি, এ।

বর্ষা-মঙ্গল।

ঐ এলরে বর্ষা এল!
বর্ষা খেতের চাষীর প্রাণে নবীন মেঘে ভরসা হল!
এতদিনের গুমট-গরম ঝল্‌সান রোদ চোত বোশেখের;
পিপাসার সে হা-হুতাশার এবার বুঝি মিট্‌লরে জের!
শান্তি হল দারুণ তৃষার কম্‌ল দেহের ঘর্ম্ম বারি,
বাঁচল প্রাণে গরীব পথিক, ছাত্র, উকীল, কর্ম্মচারী!
সকল শ্রান্তি ঘুচলরে আজ, জীব জগতে শান্তি পে'ল!
বর্ষা এল!

তপ্ত রবির খর্পরেতে ছুট্‌ল যে রে অগ্নি কণা;
উগ্র তাহার বহ্নি ভালে, জটার শত লক্ষ ফণা!
ক্রুদ্ধ দেবের তীব্র রোষে পুড়্‌ত ধরা অগ্নি-বাণে,
ছুট্‌ত আগুণ হল্‌কা হাওয়ায় টান্‌তে জীবে মৃত্যু পানে!
কোন্ মায়াবীর মোহন পরশ আকাশের গায় বুলিয়ে যেয়ে
হঠাৎ দেখে নবীন নীরদ নীল গগনে গেছে ছেয়ে।
শ্রাবণ ধারায় ভিজল ধরা চাতকের প্রাণ জুড়িয়ে গেল!
বর্ষা এল!

মেঘের পরে মেঘ জমেছে মেঘ মিশেছে চক্রবলে,
দিনান্তেতে আঁধার ঘনায়, ঢাক্‌ল রবি অন্তরালে,
সজল হাওয়া দিগ্‌বধূকে নীল নয়নে পরায় কাজল,
অলক ছুয়ে যায় পুলকে নীলাম্বরীর উড়ায় আঁচল!
কেয়ার ডাকে নীপের শাখে মত্ত শিখী নৃত্য সুখে,
চাঁপার বনে মাতাল মধুপ ফুলের রেণু মাখছে মুখে,
বার্ত্তা পেয়ে আজ অমরায় কৃষ্ণ চূড়া মুঞ্জেছে, লো!
বর্ষা এল!

সুরু হ'ল ভেকের ডাকে শ্রাবণ রাতের মাতামাতি,
কোন্ অতলে চাঁদ লুকাল জোনাকীরও নিবল বাতি!
গৃহের কোণে বিরস মনে কোন্ তরুণী পল্লীবালা
প্রবাসী তার স্বামীর তরে আজ নিশীথে হয় উতালা!
আজ কবরীর বকুল মালা বৃথাই কেবল সুবাস ছড়ায়,
সুগন্ধ দীপ পুড়ল বৃথা, বক্ষে শুধু আঁধার ঘনায়
বাদল হাওয়া মাদল বাজায়, আজকে নিশি বৃথা গেল!
বর্ষা এল!

শ্রীসুধেন্দুপ্রসাদ গুপ্ত।

সাহিত্য-সংবাদ

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলন—গত ৩২শে আষাঢ় সান্ধ্য দীপালোকে গৌরীপুর রাজেন্দ্রকিশোর হাইস্কুল গৃহে গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার চক্রবর্ত্তীর কবিতা "কর্ম্মদেবী," শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "নামের বাহার" শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তীর "জগৎজীবন সূর্য্য," শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দত্তের কবিতা "গোবিন্দদাস," শ্রীযুক্ত সুরজিৎ ভিষক্‌শাস্ত্রীর "বাদলবরণ," শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ীর "জীবন সংগ্রাম," শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের কবিতা "ছন্দের স্পন্দন" ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ আচার্য্যের কবিতা "জ্যোৎস্না" পঠিত হয়। ২৯শে শ্রাবণ ৫ম পূর্ণিমা সম্মিলনের অধিবেশনের তারিখ।

ভগবানের করুণায় ও আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের আশীর্ব্বাদে আমরা সৌরভের জন্য একটি প্রেস স্থাপন করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যা সৌরভ, সৌরভ প্রেসেই মুদ্রিত হইল।

সৌরভের লেখক শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ বি এ, বি টি, প্রণীত সচিত্র স্যর আশুতোষ সৌরভ প্রেসে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

আগরতলা রাজবাটী হইতে 'রবি' নামে একখানা ত্রৈ-মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। রবির কিরণে প্রাচীর গগন উদ্ভাসিত হউক।

কলিকাতা হইতে সচিত্র সাপ্তাহিক "নব-যুগ" বাহির হইতেছে। নব-যুগ বর্ত্তমান যুগ-সাহিত্যের গতি ও পন্থা নির্দ্দেশ করিবে ভরসা করা যায়। আমরা এই নবীন সহযোগীর অভিনন্দন করিতেছি।

নৃত্যবেশে আঙ্গামী নাগা।
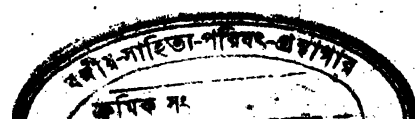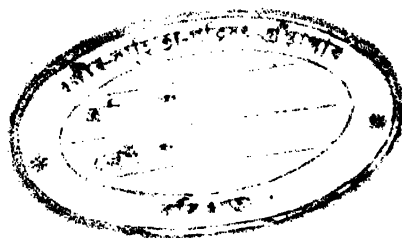
শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে।

দ্বাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩৩১। | নবম সংখ্যা।

জীবন সংগ্রাম।

গ্রন্থাদিতে যখন জীবন সংগ্রাম এই যৌগিক বাক্যের উল্লেখ দেখিতাম তখন মনে হইত যে, আমাদের এই একঘেয়ে অনাড়ম্বর জীবনকে একটু জম্‌কালো করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় লেখকগণ জীবনকে সংগ্রামের সহিত উপমা দিয়া থাকিবেন। কিন্তু জীবনটা যে সত্য সত্যই সংগ্রাম, ইহা যে কবির কল্পনাপ্রসূত ভাব মাত্র নয়, তাহা আজ বেশ উপলব্ধি হইতেছে। বস্তুতঃ একটু অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে, যে, জীবনকে সংগ্রাম বলিলে অতিশয়োক্তি ত হয়ই না বরং ইহাকে সংগ্রাম না বলিয়া আর কিছু বলিলেই ইহার স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটে।

এই যে ইয়োরোপে মহাসমর হইয়া গেল, ইহার পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দেখা যাইবে যে, জাতি বিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হইতেই ইহার উৎপত্তি, একে অন্যকে বশীভূত করার চেষ্টাতেই ইহার স্থিতি ও একের জয় ও অন্যের পরাজয়েই ইহার লয়। ব্যক্তি বিশেষের দ্বন্দ্বযুদ্ধেও এই একই প্রকার কার্য্য-কারণ ও পরিণাম লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে সমারোহ না থাকাতে ইহাকে যুদ্ধ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় না। আর এক প্রকার সংগ্রামের কথা বলিব, যাহাতে 'নীরব সংগ্রাম' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; তাহা হইতেছে অর্থ-নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আপাতদৃষ্টিতে ইহার মধ্যে সংগ্রামের বীভৎস চিত্র প্রত্যক্ষ না হইলেও একথা সত্য যে, এই নীরব অভিযান গুপ্তঘাতকের আক্রমণ অপেক্ষাও সাংঘাতিক। এ সংগ্রামের কার্য্যকারিতা তখনই হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন দরিদ্রনামধেয় ব্যক্তি ও জাতির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি। দারিদ্র্যগ্রস্ত জনগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, যেন তাহারা কোন এক অদৃশ্য বিরাট দৈত্যের করতলগত কঠোর নিষ্পেষণে পলে পলে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, প্রাণে অভাবের মর্ম্মন্তুদ যাতনা অথচ অনাথ শিশুর মত অসহায় ও দুর্ব্বল, দিনে দিনে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। যুদ্ধে হতাহত সৈনিকদের সৎকারেরও একটা ব্যবস্থা আছে কিন্তু এই নীরব সংগ্রামে বিধ্বস্ত জনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার বুঝি কেহই নাই। এই ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিলে অর্থ-নৈতিক সংগ্রামের নগ্ন করালমূর্ত্তি সহজেই প্রকটিত হইয়া পড়ে। তখন মনে হয়, পরকীয় পণ্যবাহী পোতের বংশীধ্বনি প্রলয়ঙ্কর কামানের গর্জ্জনের তুল্যই ভীতিপ্রদ, পরকীয় শিল্পসম্ভারে পূর্ণ আপণ-শ্রেণী গোলাবারুদে পরিপূর্ণ গুদামঘরের ন্যায় সমানই প্রাণান্তকারী।

এ হেন ত্রিবিধ সংগ্রামে আমরা নিয়তই লিপ্ত আছি। আর এ সংগ্রাম শুধু মানুষের মধ্যেই নয়—পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ হইতে স্থাবর জঙ্গমের অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত এই সংগ্রামে নিযুক্ত। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই হয়ত এই তথ্য শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইবেন এবং এবম্বিধ জীবনান্তকর সংগ্রামের যাহাতে অবসান হয়, তৎপক্ষে মানব মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য মনে করিবেন। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা এই যে—এই সংগ্রামের নামই জীবন, ইহার অবসানের নাম মৃত্যু; এই সংগ্রামের নাম সৃষ্টি ইহার অবসানের নাম প্রলয়। সুতরাং উদ্দেশ্য আমাদের ইহা

হইবেনা যে সংগ্রামের যাহাতে অবসান হয়; উদ্দেশ্য হইবে এই যে, আমরা যাহাতে এ সংগ্রামে জয়ী হইতে পারি। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই সংগ্রামের সূচনা হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত যে কি ভাবে চলিতেছে ও চলিবে, তাহা সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য সন্দেহ নাই।

প্রাণী মাত্রেরই যে সকল প্রবৃত্তি আছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইতেছে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা। সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলের বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। প্রতি পলে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হইতেছে, যদি তাহাদের সকলেরই অন্ততঃ কিছুদিনও বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে এই পৃথিবীতেই তাহাদের সংকুলান হইবে না। সুতরাং সৃষ্টির অনুপাতে প্রতি পলে ধ্বংস ক্রিয়াও অনবরত চলিতেছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে যে কে মরিবে, আর কে বাঁচিবে! ব্যাপার অতি গুরুতর; সকলের জীবন মরণের সমস্যা। দেখা যাইতেছে এ ধরাপৃষ্ঠ রণাঙ্গন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী এ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কে কাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবে! কে বাঁচিবে, কে মরিবে!!

উত্তর অতি সহজ—যে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিবে সেই এ সংসারে টিকিতে পারিবে, আর যে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইবে তাহার অস্তিত্ব ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইবে। স্বভাবতঃই মনে হইবে যে তাহা হইলে সিংহ ব্যাঘ্রাদি পরাক্রান্ত প্রাণীরাই হয়ত এ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিবে। বস্তুতঃ তাহা নহে। কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী আমরা বর্ত্তমানে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে দেখিতেছি কিন্তু কত যে অতিকায় প্রাণীর বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকারস্তরে ঐ সকল প্রাণীর কঙ্কাল মাত্র, অবশিষ্ট থাকিয়া তাহাদের অতীত জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে শুধু পাশবিক বলের সাহায্যেই কেহ জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে নাই। এ যুদ্ধে জয়লাভের মূলমন্ত্র—দেশকালপাত্রানুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করা। গঙ্গার প্রবাহ মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিলে ঐরাবতকেও তৃণ খণ্ডের মত ভাসিয়া যাইতে হয় কিন্তু পিপীলিকাও কোন পত্রকে আশ্রয় করিয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নিজের জীবন রক্ষা করিতে পারে। এইরূপ যে সকল প্রাণী পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়া তদনুসারে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই, তাহাদের কাহাকেও আর এখন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, কিন্তু যাহারা পারিয়াছে, তাহাদের এ সংসারে ধ্বংস নাই, তাহারা অমর।

কিন্তু কৈ কাহাকেও ত অমর হইতে দেখা যায় নাই। দুদিন আগে হউক পরে হউক সকলেরই ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়। সত্য, কোন দেহধারী জীব তাহার দেহকে চিরস্থায়ী করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু সে সন্তান সৃজন দ্বারা নিজের জীবনধারাকে অব্যাহত রাখিতে পারে। পুত্র পিতার সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক দোষগুণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় বলিয়া উভয়ের জীবন অভিন্ন বলিলেই চলে। তাই প্রাণী মাত্রেই সন্তানের জীবনের জন্য এত উৎকণ্ঠিত ও সন্তান জন্মগ্রহণ না করিলে বংশ লোপের আশঙ্কায় ক্ষুণ্ণ। জীবন সংগ্রামে যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছে তাহার সন্তান তজ্জাতীয় অন্যের সন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং এই শ্রেষ্ঠ জীবগণের মধ্যে আবার যাহারা নিজের যোগ্যতা দেখাইতে পারে তাহাদের সন্তান তদপেক্ষা উন্নত জীবন লাভ করিতেছে। এইরূপে ক্রমোন্নতি দ্বারায় শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর জীবের উদ্ভব এই জগতে হইয়াছে ও হইতেছে। আপনারা দশাবতারের কথা জানেন—তাহা দ্বারাই ক্রমবিকাশের ধারা পরিস্ফুট হইবে।

সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল পণ্ডিতগণ এই-রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে অবস্থায় জলচারী প্রাণীই শ্রেষ্ঠ জীব ছিল বলিয়া প্রথমতঃ মৎস্যাবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপর যখন ভূপৃষ্ঠ দেখা দিল, তখন জলচর প্রাণীদিগের মধ্যে যাহারা চেষ্টা করিয়া জলেস্থলে বিচরণ করিতে সক্ষম হইল তাহারাই শ্রেষ্ঠ, তাই উভচর কূর্ম্মাবতার। পরে স্থলভাগ বৃদ্ধি পাইলে ও উভচর জীবের আধিক্য ঘটিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থলচর প্রবল জীবের

উদ্ভব হইল। অথচ জলভাগের সহিত সম্বন্ধ থাকায় বরাহ অবতার। তারপর বহু স্থলচর পশুর জন্ম হইয়া প্রতিযোগিতা চলিলে অর্দ্ধ-পশু অর্দ্ধ মানবরূপী অসভ্য রাক্ষস জাতীয় নৃসিংহাবতার। যখন রাক্ষসগণের মধ্যে বিরোধ চলিল তখন বুদ্ধিমান জীবের জন্ম হইল—বামনাবতার অর্থাৎ অসম্পূর্ণ মানব। তৎপর আমরা মানবরূপী পরশুরামের সাক্ষাৎ পাই কিন্তু তাহাতেও ক্রোধ ও যুদ্ধবিগ্রহের ভাব অধিক প্রকাশিত ও যুযুৎসু ক্ষত্রিয়গণের সহিত তাঁহার সংগ্রামই উল্লেখ যোগ্য। শ্রেষ্ঠমানব রামচন্দ্র অতঃপর শান্তি ও ন্যায়ের রাজত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হন কিন্তু তাঁহার সময়েও বানর, রাক্ষস, চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট মানবের আধিক্য লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মানব হইলেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। গোচারণ হইতে রাজ্যশাসন, একধারে সারথ্য ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান তাহাতেই সম্ভব হইয়াছিল। তথাপি সমাজে শান্তিসংস্থাপন হইল না, এক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরগণ মৃত্যুকে বরণ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। তাই বুদ্ধাবতারে অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হইল। এবং কথিত আছে শ্রেষ্ঠতম অবতার কল্কি উত্তরকালে সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি বিদূরিত করিয়া মঙ্গলময় রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হইবেন।

এই দশাবতারের আলোচনা মৎস্য হইতে আরম্ভ হইলেও তৎপূর্ব্বে বহু অবস্থা অতিক্রম না করিয়া কখনই মৎস্যসৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। প্রথমতঃ পঞ্চভূত জাতীয় সৃষ্টির জড়-উপাদান, তৎপর জড়, জড়বৎ জীব, উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতির ভিতর দিয়া উল্লেখযোগ্য জীবের জন্ম হইলে পর দশাবতারের কল্পনা করা হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন কি প্রকারে সংসাধিত হয়, মৎস্য কিরূপে কূর্ম্মে পরিণত হয়, কূর্ম্ম কিরূপে বরাহে পরিণত হয়, তাহার আলোচনা জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেকেই পৃথক ভাবে করিতে হইবে। তবে এ সম্বন্ধে সামান্য আভাস না দিলে হয়ত কেহ কেহ অনুসন্ধান না করিয়াই এই যুক্তিতে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন। ক্রমবিকাশের মূলসূত্র এই যে—জীব তাহার যে অঙ্গ যে ভাবে পরিচালনা করিতে প্রয়াস করিবে বংশানুক্রমে সেই অঙ্গ সেইরূপ পরিচালনার উপযোগী হওয়ার জন্য ক্রমপরিবর্ত্তন দ্বারায় তদনুযায়ী ভিন্ন আকার ধারণ করিবে; পক্ষান্তরে যে অঙ্গ পরিচালিত না হইবে তাহা বংশানুক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মৎস্য যদি স্থলে বিচরণ করিতে চেষ্টা করে তবে তাহার ডানা ক্রমশঃ পদে পরিণত হইতে পারে এবং যদি শূন্যে উড়িতে চেষ্টা করে তবে ঐ ডানা ক্রমশঃ পক্ষাকারে পরিণত হইতে পারে। পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে হইয়াছেও তাহাই। অপর পক্ষে আপনারা কলিকাতা মিউজিয়ামে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কঙ্কাল সাজাইয়া দেখান হইয়াছে যে বানর ক্রমশঃ সোজা হইতে হইতে কিরূপে মানুষে পরিণত হইয়াছে। যদিও বানরের লাঙ্গুল ব্যবহৃত না হওয়াতে উহার লোপ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন অস্থিখণ্ড যাহা লাঙ্গুলের আশ্রয় ছিল, বর্ত্তমানে আমাদের বংশ পরিচয় দেওয়ার জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

এইরূপে এক আকৃতির জীব ভিন্ন আকৃতি অবলম্বন করিতে যে বহুবংশ অতিক্রম হইয়া যায়, বিভিন্নপ্রকার প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ৮৪লক্ষ জন্মের পর মানবজন্ম লাভ করা সম্ভব হয়। অবশ্য বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে ৮৪লক্ষ জন্মকে মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম না ধরিয়া সন্তানউৎপাদনরূপ পুনর্জ্জন্ম ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং ৮৪ লক্ষ জন্ম অর্থ বহু বহু বংশ মনে করিতে হইবে। সন্তান উৎপাদনকে পুনর্জ্জন্ম মনে করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে বলিয়া মনে করি। হিন্দুশাস্ত্রেও বলে যে আত্মা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি হয়। তারপর যে ব্যক্তি সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিল তাহাতে তাহার পূর্ব্ব কোন জীবনের কোন প্রতিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে এরূপ প্রমাণ বিজ্ঞান এখনও পায় নাই, কিন্তু তাহার পিতৃপিতামহের আকৃতি প্রকৃতি বুদ্ধি বিবেক যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় তাহা সর্ব্বসাধারণেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে—যে সকল ক্রমবিকাশের ধারার ভিতর দিয়া মানব পুরুষানুক্রমে বর্ত্তমান

অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সে সমস্ত অবস্থাই প্রত্যেক মানবের জীবনে এখনও উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রতম জীবকোষের অবস্থা হইতে নৃসিংহাবতারের অবস্থা পর্য্যন্ত গর্ভস্থভ্রূণে অতিক্রম করিয়া শিশু বামনাবতারে জন্মগ্রহণ করে এবং পরবর্ত্তী অবতারের অবস্থাগুলি ক্রমশঃ নিজ জীবনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গর্ভস্থ ভ্রূণ অল্পদিন মধ্যেই দীর্ঘাকৃতি মৎস্যাকার তৎপর পিণ্ডাকৃতি কূর্ম্মাকার ও তৎপর হস্তপদ বিশিষ্ট বরাহাকার ও সর্ব্বশেষে বিকটাকৃতি নৃসিংহাকার ধারণ করিয়া দুর্ব্বল বামনাকার শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করে। তারপর বাল্যকালে দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি পরশুরামরূপী, কৈশোরে ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন রামরূপী, যৌবনে সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট কৃষ্ণরূপী, প্রৌঢ়ে অহিংসা পরায়ণ বুদ্ধরূপী ও বার্দ্ধক্যে শান্তিপ্রয়াসী কল্কিরূপী হইয়া মানব মৃত্যুতে চিরশান্তি লাভ করে।

যুদ্ধে আহত সৈনিকগণ অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন ও বিকৃতদেহ ধারণ করিয়া যেমন জীবন যাপন করে তেমনি অনাদিকাল হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকাতে তাঁহাদের বিভিন্ন অঙ্গ যে সকল বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারই সমষ্টি ও পরিণতি আমাদের এই দেহ। সৈনিক যুদ্ধে জয়ী হইয়া যেমন ক্রমোন্নতি দ্বারায় শ্রেষ্ঠ পদবী-লাভ করে তেমনই জীব জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে হইতে মানবে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর মানবের দেহের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বর্ত্তমানে জীবন সংগ্রাম যে ভাবে চলিতেছে তাহতে মস্তিষ্কের ব্যবহারই অধিক হইতেছে, পুরাকালের ন্যায় শারীরিক বল প্রয়োগ দ্বারা দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আর নাই। সুতরাং মস্তিষ্কের অসাধারণ উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই শারীরিক খর্ব্বতা ঘটিয়া কল্কি অবতারের সূচনা করা অসম্ভব নয়। পণ্ডিতগণ মানবের দন্ত ও কর্ণের জন্যই বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন কারণ উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে দন্ত ও কর্ণ ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হইতেছে। স্কুলে ও পাঠশালায় কর্ণের যে ব্যবহার ছিল তাহা কর্ণের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে প্রচলিত রাখা উচিত কি না তাহা আপনারা এখানে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এই হইল জীবন সংগ্রামের এক অধ্যায়ের বর্ণনা ইহাই মূল সংগ্রাম। এতদ্ব্যতীতও আমাদের চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্মতর বিবিধ সংগ্রামে আমরা জড়িত আছি। তন্মধ্যে দুইটি সংগ্রামের কার্য্যকারিতা আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, প্রথমতঃ দেহের অভ্যন্তরে জীবাণুর কার্য্য, দ্বিতীয়ত চিন্তাশক্তির কার্য্য। আপনারা সহজেই দেখিতেছেন এই বিষয় দুইটি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ্য। যাঁহাদের শরীরতত্ত্বের জ্ঞান নাই, তাঁহাদিগকে দেহের অভ্যন্তরের কার্যপ্রণালী এবং যাঁহাদের মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান নাই তাঁহাদিগকে চিন্তার প্রণালী সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিব এ ভরসা আমার নাই। সেইজন্য ইহাদের সূক্ষ্মতত্ত্বের অবতারণা না করিয়া একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। যাঁহাদের ঐ সব বিষয়ে জ্ঞান আছে তাঁহারা ইহা হইতেই বিশদভাবে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

এমন অসংখ্যজীব আছে যাহারা এতক্ষুদ্র যে আমাদের চক্ষুগোচর হয় না। এই সকল জীবাণু জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, আমাদের দেহের অভ্যন্তরে, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের নিজদের মধ্যে জীবন সংগ্রাম যথারীতি চলিতেছে এবং তদ্বারা আমাদেরও ইষ্টানিষ্ট কতকটা তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহয্যে একবিন্দু জলে লক্ষ লক্ষ জীবাণু দৃষ্টিগোচর হয়, আরও কত যে অদৃশ্য থাকে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং আমরা যে জলপান করি বা যে খাদ্য আহার করি অথবা প্রশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি তাহার সহিত গণনাতীত জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে, তাহা ছাড়া লোমকূপের ভিতর দিয়াও বহু জীবাণু প্রবিষ্ট হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেহের ভিতরেও বহু জীবাণু স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে। ইহাদের কতকগুলি আমাদের দেহের পক্ষে হিতকর কতক অহিতকর। সুতরাং দেহের অভ্যন্তরে ইহাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। ইহাদের যুদ্ধের একটা উদাহরণ দিতেছি। দেহের মূলউপাদান রক্ত; ঐ রক্ত দেহের সর্ব্বত্র চলাচল করিতেছে, শ্বেত কণিকাকার দেহ রক্ষী জীবাণু ঐ রক্ত-

স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া সর্ব্বদা পাহারা দিতেছে। যেই-মাত্র শরীরের কোন স্থানে কোন অনিষ্টকর জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে অমনি লক্ষ লক্ষ শ্বেতকণিকা তাহাকে আক্রমণ করে এবং যে পর্য্যন্ত না নবাগত জীবাণুকে বধ করা যায় সে পর্য্যন্ত বহু শ্বেতকণিকার জীবন পাত হইলেও যুদ্ধের বিরাম হয় না। ইহারা আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন নবাগত জীবাণু অতিশয় বলশালী হয়, তখন এই যুদ্ধের ইতিহাস আর আমাদের অজ্ঞাত থাকে না, শরীরে বিপ্লব উপস্থিত হয়, আমরা রোগাক্রান্ত বোধ করিয়া ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করি। তাহাতেও সর্ব্বদা নিস্তার নাই, কলেরা. বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণু অনেকের জীবনলীলা অবিলম্বে সাঙ্গ করিয়া দেয়।

এক্ষণে মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। নিকৃষ্ট জীবগণের মন প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, মিথুন প্রভৃতি কার্য্য যে তাহারা করে সে শুধু সুখ-দুঃখের অনুভূতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া। কিন্তু ক্রমবিকাশ দ্বারা যেমন দেহের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছিল তেমনি মনেরও উন্নতি হইতেছিল। জীব দেখিল যে আপাত মনোরম অনেক বস্তু পরিণামে কষ্টদায়ক, আবার বর্ত্তমানে কষ্টস্বীকার করিলে অনেক সময় ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে সুখভোগ করা যায় সুতরাং জীবের মনে তখন বুদ্ধি প্রকাশ পাইল, তৎপর ক্রমশঃ চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি ও বিচারক্ষমতা লাভ করিয়া মানবত্বে আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রবৃত্তিগুলি ও পরিবর্ত্তিত হইয়া দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহমমতা প্রভৃতি উচ্চগ্রাম অধিকার করিল। ফলে এইরূপেও বিবেক সম্পন্ন মানব অন্য-প্রাণী অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে যে অন্যসকল প্রাণীর জীবন মরণ এখন মানবের হাতে বলিলেই চলে।

এ কথা শুনিয়া আপনারা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িবেন না, কারণ পশুর সহিত সংগ্রাম প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও মানবের সহিত সংগ্রাম প্রবলভাবে বাঁধিয়া উঠিতেছে। সে সংগ্রামে এক এক জাতি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে ও যাইবে। আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসীগণের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে, এদিকে আদিম টাস্মান্ দেশীয়ের বংশ সম্পূর্ণ লোপ হইয়া গিয়াছে। কে ইহাদের ধ্বংস করিতেছে বলিবার উপায় নাই, তাই ইহাকে বলিয়াছি 'নীরব সংগ্রাম।' আপনারা জানেন যে পত্রাপত্রে সতরঞ্চ-খেলা হওয়ার প্রথা আছে। এ পক্ষ এক চাল লিখিয়া পাঠাইলেন, আবার সে পক্ষ এক চাল লিখিয়া পাঠাইলেন, এইরূপ হইতে হইতে এক পক্ষের জয় অন্যপক্ষের পরাজয় হইয়া যায়, অথচ দুইপক্ষে সাক্ষাৎ নাই। সেই-রূপ আপনারাও যে অশ্বচক্র, পিলচক্র হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন কিন্তু যে ঘুরাইতেছে তাহাকে ধরা যাইতেছে না। মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও অহঙ্কার থাকিতে পারে যে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই। কিন্তু তাহা মহাভ্রম—ক্রমবিকাশের ফলে দেহের বাহ্য পরিবর্ত্তন না হইলেও মস্তিষ্কের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। মানবের মস্তিষ্কের ওজন একপোয়া হইতে তিনপোয়া পর্য্যন্ত হইতে পারে। অধিক মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোক এত অধিক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ যে তাহাকে সাধারণ মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব মনে করাই সঙ্গত। এবম্বিধ শ্রেষ্ঠ মানবের সংখ্যা যে জাতির ভিতর যত বেশী, সে জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানে তত উন্নত ও প্রবল পরাক্রান্ত। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন যে কিছুতেই আমাদের নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। আমাদের অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ঘৃণিত পরপদদলিত জীবন ধারণ করিয়া আমাদিগকে বংশানুক্রমে অধোগতি লাভ করিতে হইবে।

চারিদিকে বিপদ দেখিয়া কেহ অহিংসানীতির দোহাই দিয়া কেহ বা স্বার্থত্যাগের আদর্শ উপস্থিত করিয়া জীবনযুদ্ধের এই পরাজয়কে গৌরবান্বিত করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। এহেন মোহান্ধ মানবদিগকে বুঝাইবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গীতার অবতারণা করিয়াছেন। আশা করি গীতোক্ত অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাঁহদের 'ক্লীবত্ব' ঘুচিবে এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে কর্ত্তব্য পালনই মানবের ধর্ম্ম, তাহাতে অন্যের বিনাশ সাধিত হইলেও কোন অন্যায় হইবে না; কারণ সকলেরই মৃত্যু

অবশ্যম্ভাবী, ঘাতক কেবল নিমিত্ত মাত্র। অন্যপক্ষে সংগ্রামের ভীষণতা দেখিয়া যদি ভয় বা শোষ উপস্থিত হয়, তবে সে ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করাই মানবের কর্ত্তব্য। সুতরাং পরিশেষে কবির ভাষায় এই বলিয়া উপসংহার করিব যে—

সংসার সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর প্রাণপণে,
ভয়ে ভীত হয়োনা মানব।
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী

বাঙ্গালায় কন্যার জন্ম।

দীনের ভবনে উঠে হুলাহুলি
রাঙিয়া সবুজ পাতা,
পাড়ার শিশুর কল কোলাহল
পাখী কলরবে বাতাস চঞ্চল,
বহু আশা পরে বামুন-গৃহিনী
হইলেন আজি মাতা।
ওয়া ওয়া কাঁদে শিশুর কণ্ঠ
ধাই বলে হ'ল কন্যা,
কারো মুখে হাসি কারো মুখ কালো,
নুকাল অকালে আকাশের আলো,
কেউ কাটে জিভ্; নারীর মহলে
শুকাল এচন বন্যা।
ঠান্ দিদি বলে 'বেঁচে থাক্ বাছা
চাতকের বারি-ধারা,
নাহি ছিল আশা হবে যে সন্তান,
সদয় বুঝিবা হ'ল ভগবান্,
মেয়ে হ'লো বেশ্, ছেলে কি হবে না?
হ'তে নাই আশাহারা।
কেউ বলে "তবু তবু এই— এই
ছেলে হলে সুসন্তান—"
অপরা বলিছে 'একি কথা দিদি,
মাথ-খোদা শিশু গড়ে নাই বিধি
কেন তবে বলো কোন্ সে কারণে
মেয়ে হবে কু-সন্তান?'

মেয়ে হ'লো বেশ, চাঁদের আলোয়
উজলিবে সারা গেহ,
কচি হাসিমুখে আধ আধ বুলি,
দেখি শুনি মাতা যাবে আত্মভুলি'
চুমো খেয়ে মুখে পুলকে পুরিবে
মন প্রাণ সারা দেহ।
সখী বলে 'আজি মেয়ের জনমে
সই মম হ'ল মা,—
মা ত নয় শুধু, হলেন শাশুড়ী
কে জানে বিধির শুভ কারিকুড়ি
কোন্ কুলে কোথা রয়েছে জামাই
কাহারো ত নাই জানা।
"সবুর্ কর না কয়টা বছর
বাছিব সকলে পাত্র,
রূপে গুণে মানে বিনয়-বচনে
বিদ্যাবিভবে পাব যেইজনে,
সে হবে জামাই, কেজানে নিজের
ছেলে দহিবেনা গাত্র।"
পুত্রের যশে পিতার্ কীর্ত্তি
কুল যশ যদি বাড়ে,
পূর্ব্ব পুরুষ পায় যদি জল,
পিতা পিতামহে শ্রদ্ধা অচল,
রহে যদি তবে, সে বটে পুত্র,
বাখানে সকলে তারে।
একটি কন্যা সাতছেলে সম
যদি সুপাত্রে দত্তা,

* * *

কি বাতাস এল বাংলার ভুমে
কন্যা হইল পণ্যা,
বরের বাজারে পণ চতুর্গুণ—
বর-দুর্ভিক্ষ, লেগেছে আগুন;
বাংলা মায়েরে বাঙ্গালী সবে
করিল ধরণী ধন্যা।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাগবত-শাস্ত্রী

প্রক্ষিপ্ততায় রামায়ণের ক্ষতি কি ?

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পরবর্ত্তী ভাব প্রবেশ করিলে প্রাচীন গ্রন্থের মর্য্যাদা কি পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এই স্থলে তাহার আর একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাউক।

বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি দ্বারা এবং রামায়ণ, মহাভারত, গুলিস্তান, ওডেসি, ইলিয়ড প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য-মহাকাব্যগুলি দ্বারা সেই সেই সমাজের সমসাময়িক আচার ব্যবহার ও সমাজ ধর্ম্মের প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; সেই সেই সমাজের রুচির এবং নীতিরও পরিমাণ করা যাইতে পারে; দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের গতিও লক্ষ্য করা যাইতে পারে; এক কথায় বলিতে গেলে—দেশ ও সমাজের সমগ্র ইতিহাস দেশের একখানা সুলিখিত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বা কাব্য-গ্রন্থ হইতে আহরণ করা যাইতে পারে। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে যে রামায়ণের সমাজের পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাও কেবল মাত্র মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত গীতিকাব্য রামায়ণের সাহায্যেই করিয়াছি।

এরূপ স্থলে এই সকল প্রাচীন রচনায় যদি পরবর্ত্তীকালের চিন্তা ও চিত্র প্রবেশ করিতে সুবিধা পায়, তবে যে তাহা মূল গ্রন্থের রচয়িতার সমসাময়িক সমাজের চিত্র ও চিন্তা হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

যদিও দুগ্ধে গোচনা সংস্পর্শের ন্যায় এইরূপ অতি সামান্য কথার সংস্রব দোষে সুপ্রাচীন গ্রন্থ স্বীয় প্রাচীনতার গৌরব হারাইয়া অর্ব্বাচীন ও মূল্যহীন হইয়া যায় না, তথাপি নিন্দুক ও ছিদ্রান্বেষীদিগের বিচারে তাহা সন্দেহজনক প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের ঐরূপ সন্দেহের ফলে অনেক কুতর্কের সুযোগ সম্মিলিত হয়। দুই একটী কুতর্কের দৃষ্টান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে; এস্থলে এইরূপ আরো কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করা গেল।

রামায়ণের বর্ত্তমান সংস্করণ গুলিতে জাবালি কথিত নাস্তিক বাদটী যে বৌদ্ধযুগের অবসানে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগে, কোন বুদ্ধদ্বেষী সম্প্রদায় দ্বারা বুদ্ধের মতকে নিন্দা করিবার জন্য প্রবেশ করান হইয়াছিল, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

জাবালির মুখে এই নাস্তিক্য চিন্তা ও বুদ্ধ-বিদ্বেষ রামায়ণের অঙ্গে বিন্যস্ত থাকায় অনেকে মনে করিয়া থাকেন, রামায়ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় বুদ্ধকে এবং তাঁহার ধর্ম্মকে নিন্দা করিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। এইরূপ মত যাহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিক হুইলার সাহেব তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধের নাম বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ যদিও রামায়ণের আর কোন স্থলেই নাই, তথাপি হুইলারের সন্দেহাত্মক লেখনী সরল পন্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। হুইলার ঠিক ঐ কথাই লিখিয়াছেন—"Valmiki the author of Ramayana appears to have flourished in the age of Brahmanical revival, and the main object of his poem is to blaken the character of the Buddhists & to represent Rama as an incurnation of Vishnu"

এরূপ স্থলে হয় আমাদিগকে এই কলুষিত মত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, নতুবা ঐ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিয়া বিচার করিতে হইবে।

রামায়ণের স্থানে স্থানে রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা প্রক্ষিপ্ত আছে দেখিয়া ভারতগৌরব ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পর্য্যন্ত এই হুইলারি মতে সায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের (অর্থাৎ কাশী সংস্করণের) একখানা সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বেনারেস কুইন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্রিফিথ সাহেব (R. T. H. Griffith) রামায়ণের এক ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। গ্রিফিথ সাহেব যে মূল রামায়ণ খানা আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ মূল আদর্শে নাকি এমন কয়েকটী অশ্লীল কবিতা ছিল, যাহার ভাব অনুবাদ করিতেও গ্রিফিথ লজ্জা বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অধ্যাপক গ্রিফিতের এসম্বন্ধীয় মন্তব্য উপলক্ষ্য করিয়া খৃষ্টান পাদরীরা রামায়ণকে একখানা "কুরুচি-পূর্ণ অশ্লীল-কাব্য" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। C. T. Societyর

প্রচারিত রামায়ণ কথার মুখবন্ধে প্রচারক গ্রিফিথের পরিত্যক্ত স্থানের উল্লেখে লিখিয়াছেন——"Some sections of the poem are so indecent that Grifith could not translate them in English."

গ্রিফিথ ঐ সমস্ত স্থানের ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করিয়া লাটিন অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্ত ঐ সকল স্থানের ইংরেজী অনুবাদই দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বঙ্গদেশে যে সকল সংস্করণ প্রচলিত আছে, এবং আমরা তাহার যে কতগুলি দেখিয়াছি, কোন খানিতেই আমরা গ্রিফিথ সাহেবের পরিত্যক্ত অংশের অস্তিত্বের আভাস প্রাপ্ত হই নাই। গ্রিফিথ সাহেব ও মন্মথ বাবু এই উভয়ে যে একই অমূলক চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, অথবা পরবর্ত্তী বাঙ্গালী অনুবাদক স্বীয় কার্য্য সৌকর্য্যার্থে যে পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজ অনুবাদকের অন্ধ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাও আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

রামায়ণের কবি বাল্মীকির রুচি অত্যন্ত সংযত। আমরা তাঁহার রচনার কুত্রাপিও অশ্লীলতার চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাই না। এমন অবস্থায় এই অশ্লীল ভাবগুলি নিতান্তই যদি কোন রামায়ণে থাকে, তবে তাহা যে পরবর্ত্তী যুগের প্রাদেশিক চিন্তার ফল, তাহা মনে করা ব্যতীত অন্য উপায় দেখি না।

প্রাদেশিক চিন্তার ফলে প্রাদেশিক সংস্করণ গুলিতে যে কি পর্য্যন্ত আধুনিক ভাব প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, ডোনাল্ড মেকেঞ্জির রামায়ণ কথা তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। Donald A. Mackenzie প্রণীত "Indian Myth & Legend" গ্রন্থে, গ্রন্থকার তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের জন্য হিন্দুর বিবিধ কাব্য-সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থের গল্পকথা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থ হইতে রামের বাল্য জীবনের একটী অধ্যায়ের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক, বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন—এই বিলাতী রামায়ণী কথা মোটেই আর্ষ রামায়ণ হইতে গৃহীত হয় নাই।

রামের বাল্য-লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া লেখা হইয়াছে—"One evening a full moon rose in all its splendour & Rama stretched out his hands because he desired to have it for a toy. His mother brought him jewels, but he threw them from him & wailed & wept until his eyes were red & swollen. Many of the women assembled round the cradle in deep concern. One said that the child was hungry, but he refused to drink, another that the Sasti was unpropitious and offerings were at once made to that goddess; still Rama wept. A third woman declaired that a ghost haunted & terrified the child & mantras were chanted......the moharaja was called but Rama heeded him not. In this dispair Dasaratha sent for his chief councellor who placed Ram's hands a mirror which reflected the moon. Then the little prince was comforted......"

পাঠক, রামের শৈশব লীলার আভাস পাইলেন; অতঃপর তৎ পরবর্ত্তী কালের দুই একটী কথা শ্রবণ করুন:—

"When the children grew older they began to lisp words & as they were unable to pronounce were asked his name, he answered "Ama......

In their third year the princes had their ears pierced & after that they played with other children. They made clay images & put clay offerings in their mouth, & they broke the images because they would not eat.

Their education begun when they were five years old Vasistha was the Preceptor, first he worshiped Saraswati goddess of learning & instructed his pupils to make,

offerings of flowers & fruits. They received instruction daily begining with alphabets.

এই বিস্তৃত অংশের সংক্ষিপ্ত ভাব এই যে—শিশুকালে একদিন রাম আকাশের পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া অনবরত কাঁদিতে থাকেন। রাণী তাহাকে কত কিছু দিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিছুতেই কিছু হইল না; রাম চাহেন্ আকাশের চাঁদ। তখন রামের অবস্থা দেখিয়া সমবেত নারীগণের কেহ বলিলেন, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে; কেহ বলিলেন, ষষ্ঠী দেবীর কোপ তাহার উপর পড়িয়াছে; কেহ বলিলেন, ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। যে যেমন বলিলেন, তেমনি সব প্রতিকার তখন তখন করা হইল। খাদ্য আনীত হইল; ষোড়শোপচারে ষষ্ঠী দেবীর পূজা প্রদত্ত হইল; ভূতের উঝা আসিয়া ঝাড়া-ফুকা করিল; কিন্তু কিছুতেই রামের কান্নার নিবৃত্তি হইল না। তখন স্বয়ং রাজা আসিলেন; রাজমন্ত্রীরাও আসিলেন। পরামর্শ চলিল। ইত্যবসরে এক মন্ত্রী বুদ্ধি করিয়া একখানা দর্পণ আনিয়া রাজকুমারের সম্মুখে ধরিতেই সে চাঁদ হাতে পাইয়াছে মনে করিয়া আব্দার পরিত্যাগ করিল।…

বালকেরা বয়োবৃদ্ধির সহিত মাকে আ-ম্-মা … ইত্যাদি বলিতে শিখিল। তৃতীয় বর্ষে তাহাদের কর্ণভেদ হইল। তারপর তাহারা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার সম্মুখে বালির নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু যখন দেখিল, মাটির পুতুল নৈবেদ্য খায় না, তখন তাহারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। … … …

পাঁচ বৎসরে তাহাদের বিদ্যারম্ভ হইল। কুলগুরু বসিষ্ঠ বিদ্যার দেবতা সরস্বতীর পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি ও ফল উপকরণ দ্বারা ছেলেদের বিদ্যারম্ভ করাইলেন। তাহারা প্রতিদিন বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করিল…ইত্যাদি।

মেকেঞ্জি ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের উপর প্রচুর শ্রদ্ধাবান; তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করিলে হৃদয় উৎফুল্ল হয়; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তিনি বাল্মীকির রামায়ণ বলিয়া যে রামায়ণের রামলীলা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা মোটেই মহাকবি বাল্মীকির রচিত রামায়ণের নায়ক রামের কথা নহে। তাঁহার বিবরণ তুলসীদাস ও ভগবতদাসের রামায়ণ ও রামলীলা গ্রন্থের সম্মিলিত চিন্তা হইতে গৃহীত। কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণে যেরূপ বাঙ্গালী জীবনের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তুলসীদাস, ভগবতদাস প্রভৃতিও সেইরূপ প্রাদেশিক সমাজ-জীবনের ভাব ও ছায়া লইয়া স্ব স্ব রামায়ণীকথা রচনা করিয়া গিয়াছেন। হুইলার এবং মেকেঞ্জি উভয়েই সেই প্রাদেশিক রাম লীলার পালাগুলি হইতে গল্প ভাগ লইয়া মূল রামায়ণের বিচার করিয়াছেন।

হুইলার ও মেকেঞ্জি মূল বাল্মীকি রামায়ণের সংস্করণ গুলি দেখিয়া তাহা হইতে গল্প ভাগ চয়ন করিলে যে এইরূপ অন্যবিধ কোন ক্রটী করিতেন না, তাহা নহে; মূল রামায়ণের সংস্করণ গুলিতেও অনুরূপ সাময়িক কল্পনা কালেকালে আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে; তাঁহারা মূল রামায়ণের সংস্করণ গুলির সাহায্য গ্রহণ করিলেও স্ব স্ব সংস্কার অনুসারেই অপসিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেন।

প্রাচীন ভাবের সহিত নবীন ভাবের সামঞ্জস্য বিধান খুব বেশী চেষ্টা না করিলে হয় না। রামায়ণের সংস্করণ গুলিতে এই চেষ্টার অভাব-হেতু অসামঞ্জস্য খুব সহজেই ধরা পড়ে; তাই যাঁহারা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য স্মরণ রাখিয়া এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাদের বিচার বুদ্ধিতে প্রাচীন ভাবের ও অর্ব্বাচীন ভাবের অসামঞ্জস্য সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইঁহারা উভয়েই প্রাদেশিক কবিদিগের স্বাধীন ভাবে লিখিত কাব্য-কথার অনুসরণ করায় ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের ও স্বাধীন বিচার বুদ্ধি পরিচালনার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। পরন্তু নিজের অপসিদ্ধান্ত রক্ষার জন্যই প্রাণপণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠীদেবী, ভৌতিক ব্যাপার, তন্ত্র-মন্ত্র, কর্ণভেদ প্রথা, মূর্ত্তিপূজা, সরস্বতী দেবীকে ফুল-ফল দ্বারা নৈবেদ্য দান, বর্ণমালা শিক্ষা প্রভৃতি যে সকল পরবর্ত্তী সমাজ-চিন্তার উপাদান মেকেঞ্জী রামায়ণীকথার উদ্ধৃত অংশে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল যে বাস্তবিকই অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিন্তার ফল, তাহা হুইলার যেমন স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ মেকেঞ্জিও স্বীকার করিয়াছেন। মেকেঞ্জি এই সকল আধুনিক কল্পনাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই বলিয়াছেন— বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হইয়া পৌরাণিক ধর্ম্ম বিস্তৃত-হইলে বৈদিক দেবগণ নিস্তেজ হইয়া পড়েন;

তখন পৌরাণিক দেবগণ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব স্ত্রী (দেবী) দিগকে লইয়া আসিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। রামায়ণ এই সময়ের রচনা।

হুইলার ও মেকেঞ্জি অনুরূপ উপাদান লইয়া বিচার করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুরূপই হইবে। কালী, দুর্গা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ যে পৌরাণিক দেবতা—কিছুতেই বৈদিক দেবতা নহেন—ইহা পৌরাণিক হিন্দু সমাজের বিশ্বাসের বাহিরের কথা হইলেও ছিদ্রান্বেষী বৈদেশিক লেখকদিগের জ্ঞানের বাহিরে নহে। এই ত্রুটীর জন্য দোষী আমরা। আমাদের নিজ ত্রুটী সংশোধন করিতে বিচার বুদ্ধি ব্যয় করিয়া মাথা ঘামাইতে যাইবে কেন অপরে? তাঁহাদের কি প্রয়োজন?

(ক্রমশঃ)

কুষ্মাণ্ড।

চাল, ছাঁচি বা পানিকুমড়া।

বঙ্গদেশের স্থানভেদে কুষ্মাণ্ড এইরূপ নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার লাটিন নাম বেনিনকেসা-সেরিফেরা (Benincasa cerifera) ইংরাজিতে পামকিন বা হোয়াইট্ গোর্ড (Pumpkin—White Gourd) বলে। সংস্কৃতে কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডী, কুস্তাণ্ড, কুস্তাণ্ডী, সুফলা, কুষ্কফলা, নাগ পুষ্পফলা, পুষ্পফল, বৃহৎফল, ঘ্রাণাবাস, তিমিষ, শিখিবর্দ্ধক, গ্রাম্যকর্কটী, গুণী ও কর্কারু বলে। ওড়িষ্যা ভাষায় কর্খারু ও পানি কর্খারু; হিন্দিতে কোঁহড়া, কুম্ভড়া, পেঠা; মহারাষ্ট্রে কোহঠা; গুজরাটীতে ভুরুং কুলুং ও ফারসীতে বুড়া কদু বলে।

কুষ্মাণ্ডের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে কুমড়ার চাষ করা হইতেছে। ইহার প্রমাণ আমরা চরক সুশ্রুত প্রভৃতি অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই।

চরক বলিয়াছেন,—

কুষ্মাণ্ডমুক্তং সক্ষারং মধুরাম্লং তথা লঘু।
সৃষ্ট মূত্রপুরীষঞ্চ সর্ব্বদোষ নিবর্হণম্॥

সুশ্রুত বলিয়াছেন;—

পিত্তঘ্নং তেষু কুষ্মাণ্ডং বালং মধ্যং কফাপহম্।
পক্কং লঘূষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনম্।
সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং পথ্যংচেতোবিকারিণাম॥

হারীত কুষ্মাণ্ড সম্বন্ধে বলিতেছেন;—

পক্কং পিত্তহরং শীতং দীপনং বস্তিশোধনম্।
শোফং বালকফৌ হন্তি রক্তপিত্তনিবর্হণম্।

নানাবিধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে কুষ্মাণ্ডের নিম্নলিখিত গুণ দেখা যায়; মধুর, শীতল, পুষ্টিকর, শুক্রজনক, শ্লেষ্মাজনক, গুরুপাক এবং বায়ুপিত্ত ও রক্তের উপকারী। অপরিপক্ক কুষ্মাণ্ড শীতল ও পিত্তঘ্ন। অপক্ক কিন্তু সুপুষ্ট কুমড়া কফবৃদ্ধি কারক অথচ গুরুপাক। পরিপক্ক কুমড়া মধুর, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ ক্ষারগুণ যুক্ত, অনতিশীতল, অগ্নিবৃদ্ধি-কারক, বস্তিশোধক, রক্তপিত্তঘ্ন, মদাত্যয় বা চিত্তবিকার রোগে উপকারক। কুমড়ার পাতাও লতা মধুর, গুরুপাক, ক্ষারযুক্ত, রুক্ষ, রুচিপ্রদ; বায়ু, কফ, শর্করা ও অশ্মরী রোগে উপকারক। কুমড়ার ডগার অভ্যন্তরস্থ মঘ্যা মধুর, পুষ্টিকর, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, তৃষ্ণানাশক পিত্তঘ্ন, মূত্র ও কুষ্ঠ পরিষ্কারক এবং প্রমেহ অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগে উপকারক। কুমড়ার বিচির তৈল গুরু, শীতল, কফবর্দ্ধক ও বায়ু পিত্তনাশক।

কুমড়া দ্বারা নানা প্রকার সুখাদ্য ব্যঞ্জনাদি বঙ্গের নানাদেশীয় স্ত্রীলোকগণ পাক করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া কুমড়ার মোরব্বা কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানের মিঠাইকরেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই মোরব্বা উপাদেয় অথচ উপকারী। মাসকলাইয়ের ডালের সহিত পাকা কুমড়ার শাঁস নানাবিধ মসল্যা সহযোগে বাটিয়া যে বড়ি প্রস্তুত করা হয় তাহা বহুদিন হইতে এদেশে প্রচলিত আছে।

বৈদ্যক নিঘণ্টুতে লিখিত আছে;—

কুষ্মাণ্ডং কর্ত্তয়িত্বাহস্তজলং নিকাশ্য যত্নতঃ।
কুস্তুম্বুরু নিশামাষচূর্ণং সতিল সৈন্ধবম্।
নিক্ষিপ্য বটকাঃ কার্য্যা আতপে শোষয়েত্ততঃ।
রুচিকৃ বাত হন্তার স্তিলতৈলে সুপাচিতাঃ॥

অর্থাৎ কুষ্মাণ্ড কাটিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার জল নিংড়াইয়া

ধনে, হরিদ্রা, মাষকলাই চূর্ণ, তিল ও সৈন্ধব সহযোগে বড়ি করিবে এবং তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এই বড়ি তিল তৈলে সুপাচিত হইলে রুচিকারক ও বায়ু নাশক ক্রিয়া করে।

তরকারীর দিক ছাড়িয়া দিলেও আয়ুর্ব্বেদীয় বহু প্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া সুপক্ক পুরাতন কুমড়া বেশ দামে বিক্রয় করা যায়। ৩।৪ বৎসরের একটা কুমড়ার মূল্য সময় বিশেষে ৮।১০ টাকাও হইয়া থাকে। অথচ কুমড়া পুরাতন করা বিশেষ ক্লেশ সাধ্য নহে। সুপক্ক কুমড়া রৌদ্র বাতাস পায়, এইরূপ কোন ঘরে সিকায় তুলিয়া রাখিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। সাধারণতঃ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে গাছ হইতে কুমড়া পাড়িয়া মাটীতে রাখিলে সেই কুমরা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না—শীঘ্রই পচিয়া যায়। এই সংস্কারের মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা বলা যায় না—তবে একথা ঠিক যে কুমড়ায় কোনরূপ আঘাত লাগিলে তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। অন্যান্য কোমল প্রকৃতি ফল তরকারী সম্বন্ধেও এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। কোন কোন ফল, যথা—আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতিও আঘাত প্রাপ্ত হইলে স্বাদের বিলক্ষণ অপচয় হইয়া থাকে।

চাল কুমড়ার আর একটী জাতি দেখা যায়। ইহাকে দেশ-ভেদে গিমা কুমড়া, চূর্ণা কুমড়া বা কোচ কুমড়া বলে। ইহার গুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় কোন গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই। তবে ইহার আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বাদে মনে হয়, ইহাও অনেকটা চাল কুমড়ার মতই গুণ সম্পন্ন।

উচ্চ দো-আঁশ ভিটি মাটীতেই চাল কুমড়া ভাল জন্মিয়া থাকে। পোড়ামাটী, গোবর সার, ঘর ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা, ছোট মাছের আইস, মাছ ও চাল, ডা'ল ধোয়া জল ও কাঠ কয়লার ছাই প্রভৃতি ইহার সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে লাউয়ের মত মাদায় বা উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপে—ইহার বীজ বপন করিতে হয়। প্রত্যেক মাদায় ৩।৪টী বীজ ৩।৪ আঙ্গুল দূরে দূরে বপন করাই নিয়ম। কিন্তু চারাগুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত উচ্চ হইলেই একটী সবল চারা রাখিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল চারাগুলি স্থানান্তরে রোপণ করা যায় বা ফেলিয়া দিতে হয়। চাল-কুমড়ার গাছেও মাচা করিয়া দিতে হয়। কেহ কেহ খড় বা ছনের ঘরের চালে গাছ তুলিয়া দিয়া থাকেন। (বোধ হয় চালে এই কুমড়া ফলে বলিয়াই ইহার নাম চাল কুমড়া হইয়াছে) আবার কেহ কেহ উচ্চ গাছেও কুমড়া তুলিয়া দেন। ঘরের চালেই কুমড়া ভাল ফলিয়া থাকে। কারণ কুমড়াগুলির ভার শুধু বোঁটার উপর না পড়িয়া চালের উপরও পড়িয়া থাকে। ইহাতে কুমড়া গাছে আঘাত কম লাগে এবং কুমড়াগুলিও উপযুক্ত পারিমাণে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে পারে। মাচায় ফলের জন্য সিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া আবশ্যক নতুবা অনেক সময় উপযুক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ার পূর্ব্বেই ফলের বোঁটাটি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উপযুক্ত রস ফলে সঞ্চালন করিতে পারে না।

প্রতি গাছে ৪।৫টীর অধিক লম্বাকৃতি কুমড়া রাখা উচিত নয়। অধিক ফল গাছে থাকিলে ফলগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এক প্রকার গোলাকার চাল কুমড়া পাওয়া যায়, তাহা একগাছে অনেকগুলি ফল ধারণ করিয়া থাকে; অথচ ফলের আকারের কোন তারতম্য ঘটেনা।

গিমা কুমড়া উচ্চ মাটান বা দো-আঁশ জমীতে ভাল জন্মে। পূর্ব্ববঙ্গে নদীর চর ভূমিতেও ইহার বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। পলিমাটী (অর্থাৎ নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণীর তলার মাটী) গিমাকুমড়ার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। কারণ এইরূপ মৃত্তিকায় পটাসের ভাগ অধিক থাকে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কুমড়ার মত মাদা করিয়া ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল পাকে। কিন্তু অপক্ক কচি গিমাকুমড়াই তরকারীর পক্ষে অধিক উপযোগী বলিয়া তৎপূর্ব্বেই অধিকাংশ ফল সংগৃহীত হয়।

চালকুমড়ার বা গিমাকুমড়ার বিশেষ কিছু পাইট করিতে হয় না। কেবল গাছের গোড়ায় ঘাস জন্মিলে উহা এরূপ সাবধানে নিড়াইয়া দিতে হয়, যেন গাছের শিকড়ে কোন আঘাত না লাগে এবং মাটী অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেলে প্রয়োজন মত সময় সময় জল সেচন করিতে হয় মাত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

শারদাগমে।

গগণ ভর্‌তি আভের নক্‌সা
সুনীল ওড়্‌না সফেদ্ কায।
রোদের বর্ণ নয়ন চম্‌কা
সোণার শঙ্কা, সরম্ লাজ॥
ঘাসের শীর্ষে শিশির বিন্দু
মোতির চুম্‌কি সবুজ পর্।
নদীর চল্‌তি বিসম জল্‌দি;
সাগর-সঙ্গ পতির ঘর॥
পুকুর পূর্ণ মুকুর স্বচ্ছ;
কুমুদ কঞ্জ প্রমোদ ভোর।
বিলের বক্ষে হাজার লক্ষে
মরাল হংস জাগায় সোর্॥
রূপার বর্ণ রাতের জ্যোৎস্না,
চাঁদির চন্দ্র কেমন ঠাট্।
সুদূর ব্যাপ্ত সবুজ সিন্ধু
সোণার রঙ্গে ধানের মাঠ॥
আধেক সিক্ত আধেক শুষ্ক
মাটির গন্ধে ধূপের বাস।
কাশের পুষ্প চামর শুভ্র,
বাজনা বাদ্য ভ্রমর ভাষ॥
সিঁদুর লিপ্ত সাঁঝের সঙ্গে
দীপের সজ্জা তারার দল।
শরৎ বন্দে রঙ্গীন ছন্দে,
জগৎ বন্দ্যের চরণ তল॥

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত।

মা হারা।

সে দিন ছিল বড় বাদ্‌লা।

বাসায় ফিরে দেখি বেলা দুপুর।

বুড়ো চাকর বিশু দোরে বসে ঝিমুচ্ছে, ঝি বেটী পাশেই পা ছড়িয়ে চুল এলো কোরে চিমটি কেটে কেটে চুল বাছছে আর বিশুর সঙ্গে গল্প কোর্‌ছে।

পায়ের শব্দ পেয়েই ঝি মাথায় কাপড় টেনে দিলে। বিশু চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি হাত থেকে ছাতা নিয়ে রাখ্‌লো।

ঘরে ঢুকে জামা খুল্‌তে যাচ্ছি' বাইরে কে ডাক্‌লো "ভায়া আছ!"

"আরে, কেও; দাদা নাকি?"

এসে দেখি সত্যি সুরেন্ দা'!

সুরেন্ দা' আমার একজন সাহিত্যিক বন্ধু।

তখনই 'চয়নিকা' পেড়ে কাব্য আলোচনা আরম্ভ করা গেল।

"ওরে তামাক দিয়ে যা"!

বিশু তামাক দিয়ে নিরাশার চাউনি চেয়ে চলে গেল, ঝি উঁকিমেরে দেখে গেল।

পোষা বেড়ালীটি এসে পায়ের কাছে ল্যাজ বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুরে ঘুরে ডাক্‌তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ—দম্‌কা হাওয়ার মতো ছুটে এসে আমার চার বছরের ছেলে বাদল বল্লে—

"বাবা তুমি ভাবি দুষ্টু! রোজই দেরী কর্‌বে। মা খাবেনা?"

চমক্ ভাঙলো। চেয়ে দেখি, ওঃ! দুটো বাজে! বন্ধুবর বিদায় নিলেন।

তাড়াতাড়ি নেয়ে খেতে গিয়ে দেখি, পাশের বাড়ীর একটা কচি বাছুর চার পা কাদামাখা—বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বিষ্টি-ভিজে—শীতে কুঁকড়ে কাঁপ্‌ছে, সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠেছে, কান দুটো ঝুলে পড়েছে, ল্যাজ বেয়ে জল পোড়্‌ছে।

বড় রাগ হোল। ঘর নোংরা কর্‌ছে বলে লাঠি নিয়ে তাড়া করে গেলেম।

আমার স্ত্রী বল্লে—"ওগো ওকে মেরোনা। আহা, ওর মা নেই! শীত পেয়েছে, মার কোল খুঁজ্‌ছে।"

সেই বাছুরটা! দু'দিন আগে যার মা মরে গেছে। কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিলে।

পাশে বাদল দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে কোলে করে খেতে যাব, সে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্‌লো।—

"যদি খোকা না হয়ে

আমি হতেম কুকুর ছানা!
তবে পাছে তোমার পাতে,
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে,
তুমি কর্‌তে আমায় মানা?
সত্যিকরে বল্,
আমায় করিস্‌নে, মা ছল
বল্‌তে আমায় 'দূর দূর দূর'!
কোথা থেকে এল এই কুকুর।"
যা মা তবে যা মা,
আমায় কোলের্ থেকে নামা,
আমি খাব না তোর হাতে
আমি খাব না তোর পাতে!
(রবীন্দ্রনাথ)

পোষা ময়নাটা "হো, হো" করে হেসে উঠ্‌লো; টিক্‌টিকিটা বল্লে "ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্!"

মেঘে ভরা থম্‌কা আকাশ হঠাৎ গর্জ্জে' মুষলধারে বৃষ্টি পোড়তে লাগ্‌লো!

আদালতে আনা আসামীর মতো আমার মন, সবার কাছে আজ নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল!

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

আঙ্গামী নাগা।

আসাম প্রদেশের উত্তর পূর্ব্ব দিকে নাগা পাহাড় অবস্থিত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশেই নাগা জাতির আবাস স্থল। আমাকে রাজকার্য্য উপলক্ষে কিছুকাল কোহিমায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সেই সময় নাগাজাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহারই ফল সৌরভের পাঠককে উপহার প্রদান করিলাম।

মণিপুরের উত্তরাংশেই এই আঙ্গামী নাগাদের বাসস্থান। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কাহারও মতে "জ্যাকোমা" গ্রামের নিকটবর্ত্তী হ্রদ হইতে, কাহারও মতে "মনসা" গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষ হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। মতান্তর 'খোজ-খেলোমার' গ্রামের এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড হইতে ইহাদের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করে।

সমস্ত নাগাজাতির মধ্যে আঙ্গামীরা দেখিতে দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ। তাহারা সাধারণতঃ ৫। ৬ ফুট লম্বা। ইহারা খুব কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। একাদিক্রমে প্রত্যহ ৩০। ৪০ মাইল পার্ব্বত্যপথ অনায়াসে যাতায়াত করিতে এবং ৩০। ৪০ সের বোঝাও মস্তকে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। পুরুষদের চেয়ে কম হইলেও স্ত্রীলোকেরাও ভার বহনে অসমর্থ নহে। ইহারা দেখিতে সুশ্রী ও ইহাদের কণ্ঠস্বর মধুর এবং আমাদের ন্যায় উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট। ইহাদের চক্ষু আয়ত ও পিঙ্গলবর্ণ, চুল কাল ও লম্বা। প্রায়শঃই ইহারা শ্মশ্রু ও গুম্ফ হীন। উচ্চ স্থানে যাহারা বাস করে তাহাদের বর্ণ অনেকটা গোলাপি আভাযুক্ত। ইহারা সর্ব্বদা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকে; পুরুষেরা লম্বা চুল রাখে এবং মধ্য স্থলে লম্বা চুলের ঝুটি বাঁধিয়া রাখে। আঙ্গামীরা অসভ্য হইলেও বেশভূষা অনেকটা উন্নত রকমের। কর্ণে নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কার্পাস, লালকাগজ ইত্যাদি এবং গলায় পদ্মের খিল, কদলী বীচির মালা ব্যবহার করে। কেহ কেহ শঙ্খ গলায় পরে। কেহবা ঘাড়ের পশ্চাৎ ভাগে ঝুলাইয়া রাখে। ইহারা বাহুতে হাতীর দাঁত, পিত্তলের বালা বা আংটী ও পায়ে বেতের মল পরিধান করে।

অনেকে আবার কাইন্ড কোর্ত্তা পরিধান করে। এই কাপড়ের দুই পার্শে লাল এবং হলদে রং এর রেখা থাকে। বর্ষায় ইহারা পাতার টুপি ও বর্ষাতি কাপড় ব্যবহার করে।

স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ আস্তীন বিহীন সবুজ বা লাল রংএর কাপড় ক্রসের ন্যায় বুকের দুই দিক আবৃত করিয়া পড়ে। আর এক খানা কাপড় কটিদেশে মেখলার মত ব্যবহার করে। অবিবাহিতা বালিকাদের চুল চাঁচিয়া ফেলা হয় কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা পশ্চাতে খোপা বাঁধিয়া থাকে। ইহারাও পুরুষদের ন্যায় হস্তে পিত্তলের বালা, বা শঙ্খ পরিধান করে। ইহারা কর্ণে কোনও অলঙ্কার পরে না; কেহ কেহ বা পিত্তলের আংটী পরিয়া থাকে কিন্তু খুব কম। স্ত্রীলোকেরা সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত সাদা শঙ্খ ব্যবহার করে, তারপর ইহা খুলিয়া ফেলে। গলায় বিশেষ কোনও আভরণ রাখে না। প্রায়শঃই হাঁসের ডিমের আকারের একখণ্ড কাঠ ইহাদের গলায় ঝুলান থাকে এবং উহাতে মাঝে মাঝে সাদা পাথরের ছোট খণ্ড গুজিয়া রাখে।

সমস্ত নাগাজাতির মধ্যে আঙ্গামীরাই বুদ্ধিমান। ইহারা অতিশয় অনুকরণ পটু, হইলেও অনুসরণ প্রিয় নহে। প্রয়োজন হইলে ইহারা মিথ্যাকথা বলিতে কিম্বা শপথ করিতে কুন্ঠিত হয় না। কোনও বিষয় অতিরঞ্জিত করিতেও ইহারা বিশেষ পটু। আঙ্গামীরা রাজভক্ত এবং বিশ্বাসী, আশ্রিত বৎসল, রসিক এবং সঙ্গীতপ্রিয়। এই সকল সঙ্গীতের অধিকাংশই প্রেমবিষয়ক। ইহারা মৃত্যুকে বড়ই ভয় করে এবং সুখে দুঃখে সর্ব্বদাই মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী ছায়া দেখিয়া থাকে। শপথ প্রথাটা ইহাদের মধ্যে খুব প্রচলিত। শপথের পর মিথ্যা বাক্য বলিলে মৃত্যুতে আক্রান্ত ঘটিবে এই ইহাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইহারা ভবিষ্যতের জন্য শপথ করিতে একান্তই অনিচ্ছুক।

আঙ্গামী নাগারা ঈশ্বরবাদী কিন্তু একেশ্বর বাদী নহে। ঈশ্বরের কোন প্রকার রূপ ইহাদের কল্পনায় আসে না। ইহাদের বিশ্বাস ভিন্ন

ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর আছেন। ইহারা দৈনিক শুভাশুভ-কার্য্যের উপর এক অতীন্দ্রিয় আত্মার প্রভাবে আস্থাসম্পন্ন। ইহার প্রতিকারে ইহারা পুজাদি করিয়া থাকে। উপদেবতাদিগকে ইহারা সয়তান (Evil spirit) বলিয়া থাকে। কোনও গ্রামে মড়ক উপস্থিত হইলে ইহারা গ্রামের বাহিরে ব্যাধি পুতিয়া রাখে অর্থাৎ ইহাতে ব্যাধির আর বৃদ্ধি হইবে না, এই ইহাদের বিশ্বাস। চুরি করিলে পাপ হয় এবং সৎকার্য্যকরিলে পুণ্য হয়, ইহা ইহাদের বিশ্বাস আছে। ইহাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গগামী হয় অর্থাৎ আকাশে গমন করে।

আঙ্গামী পুরুষ।

ইহাদের বাসস্থানের তেমন কোনও পারিপাট্য নাই। ইহারা পাষাণের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে। গৃহ সাধারণতঃ দৈর্ঘে ৩০ হইতে ৬০ ফুট এবং প্রস্থ ২০ হইতে ৪০ ফুট হয়। দুইটী বৃহৎ কাষ্ঠ দণ্ডায়মান গৃহের সম্মুখে থাকে। সাধারণতঃ বাঁশের দেওয়াল দেওয়া হয় এবং উহাতে বৃহৎ বৃহৎ দরজা রাখা হয়। গৃহাভ্যন্তর দুই তিনটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠ ধান্য ইত্যাদি রাখিবার জন্য, মধ্যের প্রকোষ্ঠ আহার ও শয়নাদির জন্য এবং পশ্চাতের প্রকোষ্ঠ গবাদি গৃহপালিত পশুর জন্য রক্ষিত হয়। ইহাদের গৃহে সাধারণতঃ হাঁস, কুক্কুট, গরু, কুকুর, এবং শূকরই প্রতিপালিত হয়। ইহাদের গৃহে অগ্নি কদাপিও নির্ব্বাপিত হয় না। গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইহারা গৃহের প্রতি অপদেবতার দৃষ্টি নিবারণের জন্য গৃহের চতুর্দ্দিকে ৪টী খুঁটী গাড়িয়া থাকে।

আঙ্গামীদের স্বজাতির মধ্যে ও অন্যান্য নাগাদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত। একাধিক বিবাহের রীতি নাই এবং শ্যালিকা বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহাদের বিবাহ দ্বিবিধ; (১) নাগাজাতির প্রথানুযায়ী, (২) রীতি বিগর্হিত। প্রথম বিবাহ সম্ভ্রান্ত সামাজিকগণের মধ্যেই সচরাচর হয় কেননা উহা ব্যয়সাধ্য। দ্বিতীয় প্রকারের প্রথা যুবকযুবতীর অবৈধ প্রণয়জাত সম্মিলন মাত্র। দরিদ্রতা নিবন্ধন জাতীয় বিবাহ ও সময় সময় অনুষ্ঠান ব্যতীতই সম্পন্ন হয়।

আঙ্গামী স্ত্রীলোক।

কোনও যুবক কোনও যুবতীর পাণি-প্রার্থী হইয়া প্রথমতঃ আপন পিতা মাতাকে জানায়। তখন যুবকের পিতা মাতা—পিতৃহীন হইলে যুবকের গ্রামস্থ কোনও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক—উহা যুবতীর পিতামাতাকে জ্ঞাপন করে। কন্যার পিতামাতা কন্যাকে ইহা জানাইলে কন্যার কোনও আপত্তি না থাকিলেই ইহাদের মিলন হইয়া থাকে। বিবাহ স্থির হইলেই বর কন্যা উভয়েই পৃথক পৃথক ২টী মোরগ ফাঁসি দিয়া হত্যা করে। উক্ত মোরগের দক্ষিণ পদ বাম পদের উপর আড়া আড়ি ভাবে থাকিলেই বিবাহের ফলাফল শুভ হইবে বলিয়া জানিতে পারা যায়। তারপর সেই রাত্রিতে যুবক যে স্বপ্ন দেখে তাহা যদি শুভ হয় (ক্রন্দন অবসাদ ইত্যাদি অশুভ) তবে উক্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মারফতে যুবক তাহার ভাবীপত্নীর স্বপ্নের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। উভয়ের স্বপ্ন শুভ হইলেই বিবাহ হইতে পারে, নতুবা বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়। উভয়ের স্বপ্ন অশু

হইলেই পিতা মাতা পণের প্রস্তাব করেন। তখন যুবক মোরগ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আপনার গৃহে প্রস্তুত করিয়া রাখে, কন্যাও মধু প্রস্তুত করিয়া রাখে। বিবাহ দিনে কন্যার পিতা ১ পাত্র মাংস ও কতকগুলি শুখনা লাউ (বাওয়াস) মধু পূর্ণ করিয়া রাখে। কন্যা স্বীয় সখীদের সহিত বিবাহ দিনে ঐ গুলি লইয়া বরের বাড়ীতে যায় এবং বলপূর্ব্বক তাহার বাড়ী হইতে শূকর ও মোরগগুলি লইয়া আপন গৃহে ফিরিয়া আইসে এবং সকলে তথায় পানাহার করে। তারপর গোধূলিতে ২ জন লোক ঐ পাত্রগুলি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বরের গৃহে যায়। তারপর সর্ব্বপ্রথম কন্যা ও ক্রমান্বয়ে একটিবালক, ৩টা বালিকা, কন্যার সখীরা নাচিতে নাচিতে তথায় যায়। প্রথম ৭জন গৃহে প্রবেশ করে। বরের গৃহে তখন বর ও তাহার পিতামাতা উপস্থিত থাকেন। তখন শ্বশুর গৃহ হইতে আনীত মদ্য ও মাংস বর ও বরের পিতামাতা ভক্ষণ করে এবং সর্ব্বশেষে অন্যান্য সকলে প্রীতি ভোজন করে। তারপর সকলে গৃহে চলিয়া যায়; শুধু বালক ও ৩টা বালিকা বরের গৃহে রাত্রি যাপন করে। পরের দিন বরের মাতা কন্যাকে মধু পান করিতে দেয়। কন্যা সেদিন রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করায়। তৎপর তৃতীয় দিবসে বর কন্যা কৃষি কার্য্য আরম্ভ করে। বিবাহের পর ৩। ৪ মাস পর্য্যন্ত বর কন্যা একত্র বাস করে না।

বালিকাদের সাধারণতঃ ১৫ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে এবং যুবকদের ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়ালাপাদির প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই। চরিত্র দোষ ঘটিলে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। সাধারণতঃ বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা নাই; কিন্তু ইহা প্রায়ই এখন ঘটিয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। ইহারা জারজ সন্তান জন্মমাত্রেই নষ্ট করিয়া ফেলে; কদাচিৎ বয়প্রাপ্ত হইলে উহা পিতার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। কন্যা হইলে উহা মাতার সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে পুত্রই সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারী। স্ত্রীলোকেরা জমি ক্রয় করিতে পারে কিন্তু তাহার মালীক হয় তাহার পতি অথবা পিতা।
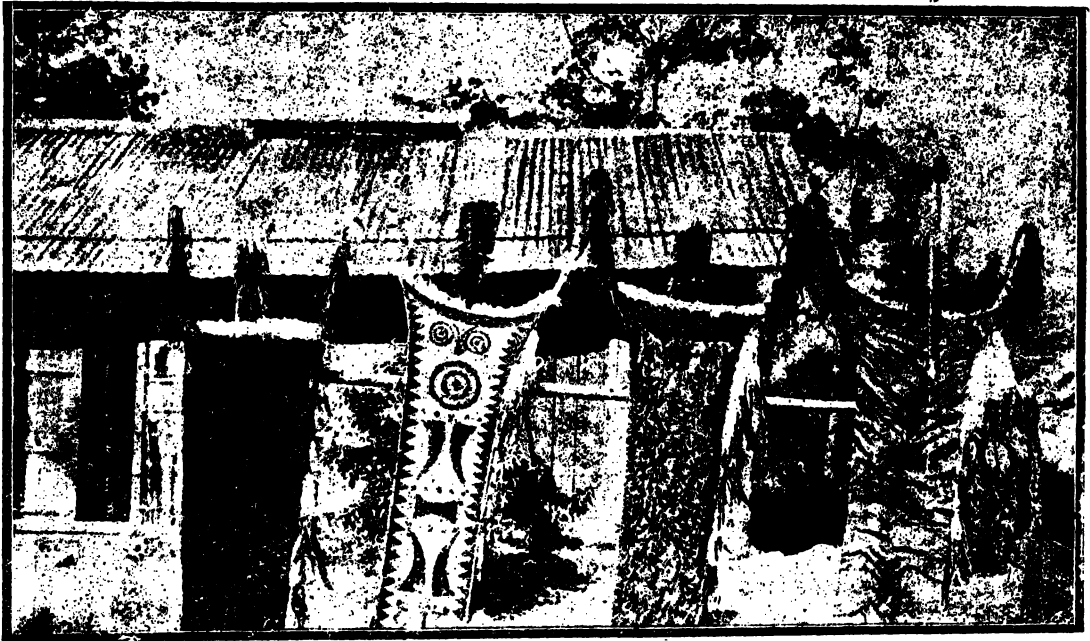
আঙ্গামী নাগাদের বিভিন্ন প্রকার ঢাল।

আঙ্গামীরা মৃতদেহ গ্রামের ভিতর পুতিয়া রাখে। পুত্র ইচ্ছা করিলে পিতার দেহ গৃহের সম্মুখেও পুতিয়া রাখিতে পারে। মৃতদেহের সহিত রন্ধন কাষ্ঠ, একখানি দা, একটি জীবন্ত মুরগী এবং গড়ুসি নামক এক প্রকার তিক্ত বীজ দেওয়া হয়। কেননা ইহাতে মিসিমো দেবতা উহা খাইয়া মৃতাত্মাকে স্বর্গে লইয়া যাইয়া থাকে।

উহারা কাঠি, ঢাল, এবং দা ব্যবহার করে। ঢাল গণ্ডার হস্তী কিম্বা মহিষের চর্ম্মে প্রস্তুত। ইহাদের মধ্যে তীর ধনুক প্রচলিত নাই।

ইহারা কৃষী ও শিকার লব্ধ মাংসে জীবন ধারণ করে। ভুট্টা, যব, সিম, কুমড়া, লঙ্কা, সরিষা প্রভৃতিই ইহাদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সময় সময় ইহারা বস্ত্রের জন্য পাটের চাষও করিয়া থাকে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্নেহের দান।

(৪)

রামকানাই আট গাছা পৈতা লইয়া বিক্রয়ার্থ বাহির হইয়াছিলেন ; চারি আনা বিক্রয় হইলে একসের চাউল আনিতে পারেন। একসের চাউলে এক বেলা করিয়া দুই দিন চলিবে। তারপর সরকারী সাহয্য আসিতে পারে— ইহাই ভরসা। যাহা হউক, আজ তো চলিবে!

পৈতা দুই পয়সা করিয়া বিক্রয় হইল না, অগত্যা ৮ গাছা আট পয়সা বিক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা অর্দ্ধসের চাউল লইয়া রামকানাই বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ঘাটে বজরা বাঁধা দেখিয়া সরকারী সাহায্য পুনরায় আসিয়াছে মনে করিলেন। ঘাটের দিকে যাইতে তাঁহার উপবাস ক্লিষ্ট শরীরের উদ্যম ও শক্তিতে কুলাইল না।

তিনি ধীরে ধীরে বাড়ী প্রবেশ করিয়া বাহিরের ঘরে দেখিলেন, একটী ভদ্র লোক বসিয়া আছেন। দুশ্চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক পীড়িত করিতেছিল ; আজকার উপায় তাঁহার এই অর্দ্ধসের চাউল। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?"

মণি কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া সংক্ষেপে বলিল— "অতিথি এই—বাড়ীরই।"

"কি সর্ব্বনাশ, অতিথ! উপায় কি! ছেলে-মেয়ে গুলা দু দিনের উপবাসী, অর্দ্ধসের চাউল, তাহার উপর অতিথ।"

রামকানাইর মাথার ভিতর মগজ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল ; তিনি আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সেখানেও সাদা পোষাকি-কাপড় পরা লোক। আর কি সর্ব্বনাশ! ভিতরে বাহিরে কত অতিথি? রামকানাই তখন চক্ষে কেবল সরিষা ফুল দেখিতেছিলেন। তিনি মধ্য উঠানে লাঠি ভরদিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভাদ্রের মেঘান্তরিত রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে তাঁহার চক্ষু তারকা উর্দ্ধদিকে টানিয়া তুলিল, তিনি নিজকে ঠিক রাখিতে পারিলেন না।

"পুঁঠি…" তাঁর মুখে আর কথা সরিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে রামকানাই ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

মাখন দৌড়িয়া আসিয়া জেঠা মহাশয়ের সংজ্ঞা শূন্য দেহ কোলে করিয়া ঘরে লইয়া গেল। পুঁঠি বাতাস করিতে লাগিল। গৃহিণী মাথায় জল দিতে লাগিলেন।

জ্ঞানোদয় হইলে রামকানাই বলিলেন—"অতিথির উপায় কি? মাত্র যে পাইয়াছি আধসের চাউল…"

গৃহিণী সাহস দিয়া বলিলেন —"সে চিন্তা আর আপনাকে করিতে হইবে না, ভগবানই সে চিন্তা করিয়াছেন—মাখন আসিয়াছে…"

মাখন জেঠা মহাশয়ের সম্মুখে যাইয়া তাঁহার চরণে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

রামকানাইর মুখে কথা ফুটিল না ; স্থির নেত্রে মাখনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কেবল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মণি সকলি দেখিয়াছিল এবং সকলি প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছিল। সে এইবার ভাবিল—এ দৃশ্য রাজ প্রাসাদের লোকগুলা অনুভব করিতে পারে না, কল্পনা করিতে পারে না বলিয়াই তো দেশের এই অবস্থা।

(৫)

পুঁঠি ও কুসুম সন্ধ্যার পরে আসিয়া বজরা-জাহাজ দেখিল।

মাখন বলিল—"কেবল দেখিলে কি হইবে, চল না নৌকায় বেড়াইয়া আসি।"

পুঁঠি বলিল…"চল দাদা ওই বিলে যাই ; খুব পদ্ম ও সাপলা আছে ; সাপলা তুলিব আর ভেট খাইব। আমরা ভেটের খৈ খাইয়া কত দিন রহিয়াছি ;…সালুক খাইয়াছি, সাপলার নাল, পদ্মের নাল, চাকি খাইয়াছি…ক্ষুধার জ্বালায় কত কিছু খাইয়াছি।"

পুঁটি নিজে অনুরোধ করিয়া তাহাতেই নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিল না, কুসুমকেও অনুরোধ করিতে উত্তেজনা করিতে লাগিল।

মাখনের ইচ্ছাছিল, তথাপি মুখে অনিচ্ছা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল "তোমরা বড় হইয়াছ, এখন তোমাদিগকে দূরে লইয়া গেলে জেঠিমা মন্দ বলিবেন।"

পুঁঠি বলিল—"তুমি লইয়া গেলে কি আর কেহ মন্দ বলিবে?"

মাখন বলিল—"কুসুমের কি মত? কি কুসুম, জেঠিমা মন্দ বলিবেন না?"

"কুসুম লজ্জা জড়িত কণ্ঠে সংক্ষেপে বলিল—না"।

মাখন হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, তবে আমার দোষ নাই।"

আদেশ পাইয়া মাঝি ধীরে ধীরে বজরা খুলিয়া দিল। শুক্ল-পক্ষ; প্রথম রাত্রির জোৎস্না ছিল। নৌকা বিলে পড়িলে সকলেই উঠিয়া গিয়া নৌকার ছাদের উপরে বসিল।

পুঁঠির অনুরোধে মাঝিরা সাপলা ও পদ্মের কলি তুলিয়া বজরা ভরিয়া ফেলিল। পুঁঠি তখন তখনই সাপলা ও পদ্মের নালে মালা গাঁথিয়া দাদার গলায় ও মণির গলায় পরাইয়া দিল। কুসুম ও মালা গাঁথিয়াছিল; কিন্তু সে কাহারও গলায় পরাইতে সাহস পাইতেছিল না। মাখন তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিল—"দাও কুসুম, তোমার ইচ্ছাটা অপূরণ থাকে কেন?" কুসুম নিজের বস্ত্রাঞ্চল দাঁতে কামড় দিয়া ধরিয়া মাখনের গলায় পদ্মের লহর পরাইয়া দিয়া মণির গলায়ও একটা ঝুলাইয়া দিল।

সেদিন অল্পক্ষণ ঘুরিয়াই বজরা আসিয়া বাড়ীর ঘাটে লাগিল। তারপর সকলে আহারাদি করিয়া মাখন ও মণি বজরায় আসিয়া ঘুমাইল।

এইরূপ প্রতিদিন—কোন দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন দিন পরে, তাহারা বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতে জলভ্রমণ করিতে লাগিল। মণি যে একজন খুব বড় জমিদার, তাহা ক্ষুদ্র পানার গ্রামে প্রচার হইতে খুব বেশী কাল বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং তাহার বজরার নিকট দিনের বেলায় ভিড় লাগাই ছিল এবং যথা সম্ভব সেও দীনের সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেছিল না।

(৬)

দৌলতপুরের আরঙ্গে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে যে নৌকা দৌড় হইয়াছিল, তাহাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গোলমাল হইয়াছিল; সে জন্ত আজ সেই প্রতিযোগিতার দৌড় পুনরায় হইবে।

দেশ দরিদ্র হইলেও লোকের সখ দরিদ্র নহে। সৌখিন লোকেরা না খাইয়াও সখ করিয়া থাকে। শ্রাবণ সংক্রান্তি হইতে নিয়মভঙ্গে 'নৌকা বাইচ' বা প্রতিযোগিতার সহিত নৌকা দৌড় হইয়া থাকে। দেশে এই যে দুর্দ্দিন, এই দুর্দ্দিনেও নৌকা বাইচের উৎসাহের কোন ন্যূনতা নাই।

আরঙ্গের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। কুসুমের উত্তেজনায় পুঁঠি মাকে ধরিয়া বলিল—"আমাদিগকে নৌকা দৌড় দেখাইতে হইবে।"

মা দেখিলেন, ইহা এক সময় বামনের চাঁদ পাড়িয়া দিবার মত খেয়াল ছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা তেমন সুকঠিন নহে; ঘাটে জাহাজী নৌকা বাঁধা, ইচ্ছা করিলেই তাহা হয়। তিনি বলিলেন "তোর দাদাকে বল, লইয়া যাইবে।"

পুঁঠি বলিল—"দিদিও যাইবে তবে।"

মা বলিলেন—"আচ্ছা"।

কুসুম বলিল—"তুমি যাইবে না পিসী মা?"

পিসী মা হাসিয়া অসম্মতি জানাইলেন। পুঁঠি দৌড়িয়া গিয়া দাদাকে জানাইল; তার-পর তাড়াতাড়ি স্নান আহার শেষ করিয়া কুসুম, পুঁঠি, মাখন, মণি দৌলতপুরের নদীতে নৌকার বাইচ খেলা দেখিতে যাত্রা করিল।

কুসুম বজরায় উঠিয়া মাখনের হাতে একটা কাগজ দিয়া বলিল—"এই দেখ দাদা, তোমার সেই উপহার!"

মাখন কাগজের ভাজ খুলিয়া দেখিল, এ তার সেই নন্দী-গ্রামের শেষ দিনের করা অসম্পূর্ণ গোলকধামের ছক্—বিচিত্র আল্পিনায় চিত্রিত করিয়া কুসুম তাহা সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সে অঙ্কন কোন অংশেই তাহার নিজ পরিকল্পনা হইতে হীন হয় নাই। ছক্ দেখিয়া মাখনের পূর্ব্ব স্মৃতি নিমিষ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সে আর ইতস্তত না করিয়া বলিল—"মণি, স্বর্গে মর্ত্তে তো এত দিন বেশ দৌড়া দৌড়ি করিলে, এখন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাও দেখি! চল গোলকধাম খেলা যাউক, দৌলতপুরের ঘাটে যাইতে বেলা তিনটা হইবে, ইতিমধ্যে দুএক বাজি হউক⋯"।

মণি বলিল—"বা খুসি, মূঢ়ের দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই।"

বজরায় তিনটী বড় কামরা ছিল। সম্মুখের কামরায় টেবিল চেয়ার সজ্জিত আফিস ঘর, মধ্যের কক্ষে শয্যা, তার পরে স্ত্রীলোক দিগের কক্ষ, তারপর স্নানাগার ইত্যাদি। মণিকে লইয়া মাখন দ্বিতীয় কক্ষে যাইয়া ছক পাতিয়া বসিল; কুসুম ও পুঁঠি পরামর্শ করিয়াই বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া কড়ি আনিয়াছিল। প্রথমে দুই বন্ধুতেই খেলা আরম্ভ হইল; ক্রমে পুঁঠিও যোগদান করিল।

মণি বলিল—"চারি হাতে খেলা না হইলে জুড়ে বাঁধে না।"

মাখন মুচকি হাসিয়া কুসুমকেও গুটি বসাইতে বলিল।

ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দোলনায় দুলিতে দুলিতে কুসুমও একদিকে বসিয়া পড়িল। খেলা চলিতে লাগিল।

মণি ও মাখনের হাতে খেলা উঠিতেছিল না। কুসুম ও পুঁটির কড়ি হুকুম মতে উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। তাহারা তিন চার বার উঠিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল; মণির নরক-বাসের ও মাখনের সংসারবাসের বিড়ম্বনা কিছুতেই ঘুচিল না! কুসুম মাখনের হাত ধরিয়া কড়ি ফেলাইয়া কোন মতে তাহার ঘুটির গোলকধাম প্রাপ্তি ঘটাইল! মণির এ ধর্ম্মাচরণে কেহ সহায় হইল না, সুতরাং তাহার ঘুটি অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া পুনঃ পুনঃ অধোদিকে প্রয়ান করিতে লাগিল।

মাখন নিজ ঘুটি গোলকধামে রাখিয়া হাত-তালি দিয়া বলিল—"দেখ হে, সংসার সাগর অতিক্রম করিতে একটি সাহায্য হস্ত নিতান্তই প্রয়োজন।"

মণি হাসিয়া বলিল—"নিতান্তই।"

মণি খেলায় হারিলেও খেলাটা তাহার নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইতেছিল না। মাখন বলিল—"এখন একটু বিশ্রাম করা যাউক"।

কুসুম ও পুঁটি খেলিতে লাগিল। মণি ও মাখন আফিস ঘরে আসিয়া বসিল।

মাখন হাসিয়া বলিল—"একথা স্বীকার্য্য যে, কেবল সঙ্গিনীর অভাবেই তোমার স্বর্গের পথটা এত বড় আয়োজন সত্ত্বেও রুদ্ধ হইয়া গেল—শাস্ত্রে সেই জন্যই বলে—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" তোমার তাই এখন একটা সঙ্গিনী চাই-ই।

মণি হাসিয়া বলিল—"দুটী প্রাণীতে অন্ধকারে স্বর্গরাজ্যে যাইয়া আর এমন বেশী কি লাভ হইবে? তোমাদের নিঃসঙ্গের যে অবস্থা আমারও বরং তাহাই হইবে। সকলে মিলিয়া নরকই গুলজার করিব।"

মাখন অনেক দিন ধরিয়া যে চিন্তা মনে মনে পোষণ করিতেছিল, তাহা অদ্য সুসময় বুঝিয়া হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিল—"অতএব আমার প্রস্তাব, মণি কুসুমকে তুমি গ্রহণ কর।" কথাটি পরিস্কার করিয়া বলিয়া মাখনের বুক পাতলা হইয়া গেল।

মণি বলিল—"অসম্ভব।"

মাখন কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়া মণির মন পরীক্ষা [illegible] মণির মত নাই বুঝিয়া সে মণির সমর্থন করিয়াই বলিল—"সেটা আমিও মনে করিতেছি; তোমার মা এরূপ স্থলে বোধ হয় সম্মতি দিবেন না এবং তোমারও সে মত উপেক্ষা করা উচিত নহে।"

মণি উচ্চ হাস্য করিল। অনেক দিন সে এরূপ উচ্চ হাস্য করে নাই। হাস্য করিয়া মণি বলিল—"না হে, না! তোমার মত লোক উকিল তো হইতেই পারে না—ঘটক হওয়া আরও বিড়ম্বনা।"

মাখন লজ্জিত হইল। মণি যে তাহার অনুরোধটা এত সহজে এবং এত সংক্ষেপে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিবে, মাখন তাহা ভাবিতে পারে নাই; তাই অবস্থা বুঝিয়া সে মুহূর্ত্ত মধ্যেই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

এবার মাখনও মণির সহিত হাসিল।

মণি বলিল—"আর কি বলিবার আছে?"

মাখন মনের ভিতর কোনরূপ দৈন্য ভাব না দেখাইয়া হাসিয়া বলিল—"এসম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই বটে কিন্তু তোমার বিবাহ সম্বন্ধে ঢের বলিবার ও ব্যবস্থা করিবার আছে। আজ দৌলতপুরের খেলা দেখিয়া আমরা ইদিলপুর যাইবার ব্যবস্থা করিব। সেখানে গিয়া পাত্রী দেখিয়া তারপর যাহা বলিবার বলিব।"

"বটে, সেখানে বুঝি পাত্রীর কারখানা আছে? গেলেই তা পাওয়া যাইবে?"

মাখন বলিল—"পাত্রীর কারখানা জগত জুড়িয়াই আছে—তবে তোমাদের পালটা ঘর তো আর সর্ব্বত্র নাই।"

মণি নরম হইয়া বলিল—"বেশ, চল। এখনও ঢের সময় আছে, আর দুটা হাত হইয়া যাউক না।"

মাখন বলিল—"না আর ভাল লাগিতেছে না; এখন চারিদিকটা দেখা যাউক।"

হাসি তামসায় ভাবের কোন অভাব না প্রত্যক্ষ হইলেও ইহার পর আর দরবার জমিতেছিল না।

মণি ডাকিল "পুঁটি দিদি, এদিকে আন দেখি খেলাটা।"

পুঁটি মধ্যখানে তাহাদের খেলা বন্ধ করিয়া সে আদেশ তামিল করিল; ছকটা আফিস ঘরে আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মণি বলিল—"নীচে বিছানায় বসিয়া খেলিলে, চারিদিগের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না; চল টেবিলের উপর

খেলি।" এই বলিয়া মণি মাধবীকে এক কোণে রক্ষিত কেম্প টেবিলটি সাজাইয়া দিতে বলিল এবং নিজেই আফিসের টেবিলটি গুটাইয়া উপরের হুকের মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়া চারিদিকে বেশ স্থান করিয়া লইল। মাধবী চারিদিকে চারিখানা চেয়ার রাখিয়া গেল।

খেলা পুনরায় আরম্ভ হইল। মাখন আর মণি খেলিতে লাগিল। মণি বলিল ভাল লাগিতেছে না ; তুমিও সংসারী আমিও নারকী, এর ভিতর পুণ্যাত্মা চাই—যেন অগ্রসর হওয়া যায়..."

মাখন বলিল—"পুঁঠি খেলাবি নাকি ?"

পুঁঠি ঘুটি বসাইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল।

মণি বলিল—"অনর্থক আর একটা প্রাণীকে নির্জ্জন কারাবাসে রাখিলে কেন ?"

মাখন বুঝিয়াও শব্দ করিল না। মাখন না ডাকিলে বা না অনুমতি করিলে কুসুম কখনও নিজ হইতে মণির সম্মুখে আসিয়া গল্প করিত না। এবার আর মাখন ডাকিল না, সুতরাং কুসুমও আসিল না। মণি বুঝিল, তাহার কথা মখন খেলায় নিবিষ্টতা হেতু শুনিতে পায় নাই ; সে পুনরায় আর একটু পরিস্কার গলায় বলিল—"পুঁঠি দিদি চেয়ারে বসিয়া খেল ; আর একটা চেয়ার যে খালি রহিল মাখন !"

পুঁঠি চেয়ারে বসিল না বরং আরও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "ও মা ! ওতে কি মেয়ে মানুষে বসে ? দোষ না !"

মাখন তাতেও সাড়া দিল না, দেখিয়া মণি হাসিয়া বলিল—'এই জন্যই অসম্ভব।"

মাখন ঘুটি চালাইতে চালাইতে বলিল—"মেয়েরা চেয়ারে না বসিলে, জুতা মোজা পায়ে না দিলে, বাইসিকলে না চড়িলে, গাঙ্গ না সাঁতরাইলে যদি—ব্যাপার অসম্ভব হয়, তো সে অসম্ভব শ্লাঘ্য—বরণীয়।

মণি চুপ করিয়া রহিল। এই সময় মাধবী বাহির হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাঃ! বাঃ! বাঃ!"

সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল।

(ক্রমশঃ)

নিয়তি।

"আশু বাবু কি বাড়ী আছেন ?"

বহির্ব্বাটীতে দাঁড়াইয়া অতুলবাবু ক্ষীণকণ্ঠে এই প্রশ্ন করিতে না করিতেই একটি ভৃত্য আসিয়া বলিল—"হাঁ, কর্ত্তাবাবু বাড়ী আছেন। আপনি বসুন ; আমি খবর দিই।"

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী ; বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। জরা সর্ব্বাঙ্গে জুড়িয়া বসিয়াছে। জরা ব্যাধির অন্তরঙ্গ বন্ধু। জরার আক্রমণে ব্যাধি প্রায়ই আশুবাবুর দেহ আক্রমণ করিয়া থাকে ; তাই তিনি বড় একটা ঘরের বাহির হন না, বাড়ীর ভিতরে বিছানার অথবা আরাম কেদারার আশ্রয় নিয়া কোন প্রকারে সময় কাটাইয়া থাকেন।

ভৃত্য বাড়ীর ভিতর যাইয়া সংবাদ দিলে, আশুবাবু বলিলেন—"লোকটির নাম ও আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করে এস। বিশেষ প্রয়োজন হলে সাক্ষাৎ করব ; নতুবা অসুস্থ শরীর নিয়ে আর বেরব না।"

ভৃত্য আসিয়া কর্ত্তাবাবুর অভিপ্রায় আগন্তুকের নিকট নিবেদন করিল। অতুল বাবু চাকরের নিকট নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলিয়াদিলেন :— "বলো—নাম অতুল বাড়ুয্যে। ব্যবসা মোক্তারী। ঢাকাথেকে এসেছেন। সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁর বিশেষ জানা লোক—"

আশুবাবুর সহিত অতুলবাবুর পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। ঢাকায় অনেক-বার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আশুবাবু মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় যাইয়া একবার অতুল বাবুর বাসায় আতিথ্যও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পূর্ব্ব পরিচিত অতুলবাবু আসিয়াছেন, শুনিয়া আশুবাবু কাষ্ঠ-পাদুকা সংলগ্ন পা দুখানি অতি ধীরে ধীরে ফেলিয়া যষ্টির উপর ভর দিয়া দিয়া কাশিতে কাশিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অতুলবাবু তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"নমস্কার মশায়, ভাল তো ?"

আশুবাবু প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন—"এ বয়সে কি
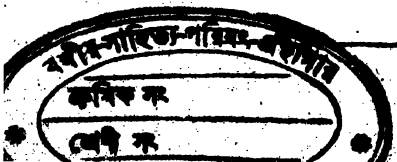
আর ভাল থাকা যায়? আপনি কেমন আছেন তাই বলুন। আপনাকে বড্ড ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। একটু বিশ্রাম করুন, পরে আলাপ হবে'খন"

আশুবাবু চাকরকে ডাকিয়া তামাক আনিতে বলিলেন। তিনি নিজে কফের দরুণ ধূমপান করেন না; সুতরাং চাকর হুকা আনিয়া অতুল বাবুর হাতে দিল। তাম্রকূট-প্রিয় অতুলবাবু অনেকক্ষণ পর ধূমপানের সুযোগ পাইয়া বেশ একটু তৃপ্তিলাভ করিলেন।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর, কি প্রয়োজনে এ দিকে?"

"প্রয়োজন আছে বৈ কি? সেটা গুরুতরই বটে;—কন্যাদায়। শুনেছি আপনাদের গ্রামে কয়েকটি ছেলে আছে। দুই একটি পাশও করেছে..."

"এ আপনার কোন্ মেয়ে?"

"সেজো মেয়ে।"

"মেয়েত আমি দেখেছি, বেশ সুশ্রী—সুলক্ষণা। এমন মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবনা কি? আপনি যখন দিতে থুতে পারবেন, মেয়েও সুন্দরী,—আপনার হয়ে যাবে।"

"দিতে পাচ্ছি কোথায়? এই দেখুন না—বড় মেয়ের বিয়েতে বহু টাকা ধার করতে হয়েছে; সে ঋণ এখনও শোধ দিতে পারিনি..."

"গ্রামে পাশ করা ছেলে আছে বৈ কি? ওপাড়ায় আমাদের একটি জ্ঞাতির ছেলে,—কলিকাতায় বি, এল পড়ছে। এ পাড়ায়ও আছে—আমার নিজের ছেলেও আছে—ঢাকায় বি, এল পড়ছে। আপনার কি মতলব জানতে পারলে ..." বলিয়া আশুবাবু গম্ভীর হাসি হাসিয়া তাকিয়াটি ঠেস্ দিয়া বসিলেন।

"দুয়ার আমার অবস্থাতো আপনি জানেন..."

"বেশ ভালই জানি। কি বলতে চান তাই বলুন।"

"আপনি যদি দয়া ক'রে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন, তবে আপনার ছেলের সঙ্গেই ..."

"এ আনুকূল্যের মানে? আপনি কি বলতে চান? এখন আর সেকালের সেদিন নেই,—লক্ষ কথা উঠে নেই;—এক কথায় বিয়ে হয়ে যায়। আপনার মন্তব্য শেষ করে ফেলুন।"

অতুলবাবু সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"বড় মেয়ের বিবাহের ঋণ এখনও প্রায় সবই রয়ে গেছে। তাতে বাস্তু ভিটা বাঁধা পড়ে নাই! এবার তা বন্ধক দিয়ে হাজার খানেক টাকা যোগাড় করতে পারি"—বলিয়া অতুলবাবু আশুবাবুর মুখ পানে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি কি করুণ! কি নিরাশ্রয়!

"হাজার খানেক টাকা"—কথাটা যেন আশুবাবুর কৌলীন্য মর্য্যাদায় নিদারুণ আঘাত করিল; অতুল বাবুর প্রতি তাহার মনে একটা ভয়ানক বিদ্রোহের ভাব জাগাইয়া তুলিল। তিনি তাহা দমন করিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ওতে কি আর বি, এল, ছেলে আশা করা যায়! যাক—এখন স্নানাহার করুন, পরে আলাপ করা যাবে।"

আশুবাবুর মুখের ভাবভঙ্গী হইতেই অতুলবাবু তাঁহার উত্তর পাইয়াছিলেন। ইহার পর অসময়ে আশুবাবুর অনুরোধ রক্ষা করা ব্যতীত অতুলবাবু আর অন্য কোন উপায় দেখিলেন না।

আহারাদির পর আশুবাবুর সহিত আর অতুলবাবুর সাক্ষাৎ হইল না। চাকরের নিকট আশুবাবুর দিবানিদ্রার খবর শুনিয়া অতুলবাবু বিদায় হইয়া আসিলেন।

(২)

অতুলবাবু মোক্তার লাইব্রেরীতে কোন বন্ধুর নিকট শুনিলেন, কামাখ্যা মুখুটি চতুর্থবার দার-পরিগ্রহ করিবেন। মুখুটি মহাশয় ছাত্রবৃত্তি পাশ প্রবীণ মোক্তার। তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইলেও দাঁত একটিও পড়ে নাই, বা নড়ে নাই। তিনি আর এখন প্রেকটিস্ করেন না। একপুত্র মুন্সেফ, আর একপুত্র জজকোর্টের উকীল। আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল। গেণ্ডারিয়ার প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ী, পল্লীগ্রামের পৈতৃক তালুক-সম্পত্তির আয়ও নেহাত কম নয়।

কোর্ট হইতে বাসায় ফিরিয়া অতুলবাবু কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই কাহারও নিকট কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি গেণ্ডারিয়ায় জনৈক বন্ধুর বাসায় চলিয়া গেলেন। এই বন্ধুর মারফতে তখনই সকল কথা শুনিয়া ও শুনাইয়া

অতুল বাবুর নিরাশ প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। তিনি কল্পনার জাল বুনিতে বুনিতে পথ চলিতে লাগিলেন। বিবাহ অদৃষ্ট-পরীক্ষা বৈ আর কিছুই নয়। বর বৃদ্ধ হইলেও অর্থবান স্বাস্থ্যবান। অদৃষ্টে থাকিলে মেয়ের স্বামী-সুখ হইবে। অন্ততঃ খোরাক পোষাকের জন্য ভাবিতে হইবে না। সবচেয়ে সুবিধা এখানে পণের দাবী নাই। কাজেই কামাখ্যা বাবুর হস্তে কন্যা সম্প্রদান করাই অনন্যোপায় অতুল বাবু মনে মনে স্থির করিলেন। অন্যথায় অন্য উপায়ই বা কি ?

অতুল বাবু গৃহে আসিয়াই গৃহিণীকে স্নেহ-সিক্ত-কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "বর তো হলো এখন মেয়ের অদেষ্ট…"

"কোথা হলো গো,—বর কি কচ্ছে—কেমন অবস্থা, টাকা কড়ি—পণই বা কত দিতে হবে…?

"দিতে হবে না কিছুই—সেটাই বড় কথা! অর্থবিত্ত যথেষ্ট আছে—পাকাবাড়ী, নগদ টাকা, তালুক সম্পত্তি যথেষ্ট আছে—এখন মেয়ের অদেষ্ট।"

"করে কি ?"

"এর পর আর কর্‌বে কি ?—একটি ছেলে মুন্‌সেফ—আর একটি উকীল…"

"ও মা দুজবর" ?

"তা আর কি কর্‌ব ? দেখ্‌লে তো এই দুটো বছর… পাঁচ হাজার টাকার কমে একটি বর জুটে উঠছেনা। এখন মেয়ের অদেষ্ট—। অদেষ্টে থাকলে—দেখ না—ঘোষেদের মণি—কতগুলি ছেলে মেয়ে রেখে—বুড়ো জামাই রেখে মরল। সবই অদেষ্ট। তার পরেও—বর একেবারে বুড়ো নয়; বেশ নাদুস নোদুস দেহ। শরীরে সামর্থ বেশ আছে! অদেষ্টে সুখ থাকলে মেয়ের জন্য ভাব্‌তে হবে না আর…"

গৃহিণীর নিকট কথা শেষ করিয়া যখন কোন বিদ্রোহের ভাব লক্ষ্য করিলেন না, তখন অতুল বাবু কামাখ্যা বাবুর হস্তে কন্যা সম্প্রদান করাই কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা দেখিলেন।।

[৩]

গৃহিণীর মন বৃদ্ধবরের প্রতি কিছুতেই উঠিতেছিল না। যখনই পাড়া-প্রতিবাসিনী মেয়েরা আসিয়া এই বিবাহ সম্পর্কে গৃহিণীর সহিত নানা কথায় আলোচনা করিত এবং কেহই ইহাতে সায় দিত না, তখনই গৃহিণীর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। তারপর তিনি গালে হাত দিয়া বসিয়া কেবল প্রতিকার উপায়ই চিন্তা করিতেন।

অতুলবাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা বিপিনবাবু কুমিল্লা জজ কোর্টের কেরাণী। তিনি বিবাহ উপলক্ষে বাসায় আসিয়াছেন। তিনি পঁহুছিবা মাত্রই—গৃহিণী তাহাকে বলিলেন,—"ঠাকুরপো তোমরা মেয়েটাকে ষাটবছরের বুড়োর হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছ"…

"এতে আমায় বৃথা দোষীকর বৌদি ; আমি এ সম্বন্ধে বিস্তর আপত্তি দাদাকে জানাইয়াছি, যখন দেখ্‌লাম তুমিও কোন আপত্তি কল্লেনা, তখন আমার বাধ্য হয়েই এতে সায় দিতে হলো …"

"এখন এর কোন প্রতীকার নেই কি ?"

"বিয়ে না দেওয়াই প্রতীকার।"

এ উত্তর বৌ'দির নিকট ভাল ঠেকিল না; তিনি দেবরের হাতে ধরিয়া বলিলেন

"ঠাকুর পো, তোমার হাত ধরে বল্‌ছি—একটা কিছু কর।"

"তোমার যদি অমত থাকে, করব। আসুন তিনি, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি!"

বিপিন বাবু যখন বাসায় পৌঁছিয়াছেন, তখন অতুল বাবু কোর্টে ছিলেন। পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে বিপিন বাবু অতুল বাবুকে বউদিদির প্রাণের আকুল আবেদন নিবেদনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি স্বয়ং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ বিবাহে সায় দিয়াছিলেন—ইহাও দাদাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

অতুলবাবু বলিলেন—"তবে এখন কি করা যায়, বল দেখি"

"বিয়ে স্থগিত রেখে অন্য বরের অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য বলে মনে হচ্ছে।"

"তিন দিন পরে বিয়ে, এখন কি তা সম্ভব ? সম্ভব হলেও এতে মেয়ের বিয়ের ভবিষ্যৎ সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে নাকি ?

"কেন ?"

"লোকে—বল্‌বে এদের কথার কোন মূল্যনেই; আবার

কেহ কেহ এমনও মনে কর্‌বে—হয়ত কনের কোন গুরুতর দোষ আছে—তাই বরপক্ষ রাজি হলনা ... ”

“একথা সত্যি বটে ; তবে লোকে কি বল্‌বে—এ ভেবেই কি আমরা হাতে ধরে নিজের মেয়েটাকে বলি দেব ?”

“তাকি হয়।”

“আপনি ত তাই কচ্ছেন।”

“মনের মত বর না জুট্‌লে কি কর্‌ব ভাই ?”

“চিরকাল আইবুড়োই থাকবে।”

“হিন্দুর মেয়ে কি সেরূপে রাখা যায় ?”

খুব রাখা যায়। বিয়ের পর যে মেয়ে স্বামী-সুখ ভোগ কর্‌তে না পারে, তার বিয়ে হওয়ার চাইতে আইবুড়ো হয়ে থাকা অনেক ভাল।”

অতুলবাবু নীরব হইলেন। মেয়ের ভাবি জীবনটা যেন বিপিনবাবুর কথায় তাহার মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি হতাশ হইয়া বলিলেন, “তবে তুমি এসেছ, এখন যা ভাল বুঝ কর। আমি আর কি কর্‌ব ভাই ; দুটা বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেখলাম। ...”

[৪]

বিপিনবাবু বরের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে সতীশের সহিত বিপিনবাবুর সাক্ষাৎ হইল। সতীশ বি, এ ক্লাশের ছাত্র ; স্বদেশী ভাবাপন্ন যুবক। দেশের ও দশের হিতসাধন—তাহার জীবনের অন্যতম ব্রত। সে বিপিনবাবুর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। বিপিনবাবু তাঁহাদের আসন্ন-বিপদের করুণ কাহিনী সতীশের নিকট বলিলেন। কথাগুলি উদারপ্রাণ সতীশের হৃদয়ে বড়ই স্পর্শ করিল। সে বলিল, “আমার সঙ্গে মেছে চলুন” চেষ্টা করে দেখ্‌ব’খন কিছু করা যায় কি না।”

মেয়ের বাপের কন্যাদায়-কাহিনী চিরকালই করুণ। সতীশ তাহার স্বভাবসিদ্ধ করুণকণ্ঠে কথাটাকে আরও অধিকতর করুণ করিয়া মেছের ছাত্রদের নিকট উপস্থিত করিল। তাহার উত্তেজনার ভাষায় বিনয়ভূষণের মন গলিয়া গেল। বিনয় বলিল, “এ যে একটা খুব কঠিন ব্যাপার তা নয়, তবে একেবারে সোজাও নয় ; প্রতিবন্ধক, বাধা-বিঘ্ন পদে পদেই আছে ...”

সতীশ বলিল—“প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করিতে যদি ভয় পাও, পরহিতে ব্রতী হইবে কি করিয়া ? তোমার প্রতিবন্ধক কি ?”

“মাতপিতার অজ্ঞাতসারে কাজ কল্লে যা স্বাভাবিক বিপদ আপাততঃ তাই ...”

“পড়াশুনার খরচের কথা বল্‌ছ ?”

“হাঁ, তাই।”

“তার জন্যে ভাবনা নাই ? ক’নের বাবার এস্থলে যখন পণ দিতে হবে না, তিনি অবশ্যই তা দেখবেন। কি বিপিনদা ?”

বিপিনবাবু জানিলেন, বিনয়ের আর এক বৎসর মাত্র ল কলেজে বাকী। তিনি বলিলেন—“নিশ্চয়।”

বিনয় বলিল—“তা হ’লে আর আমার কোন আপত্তি নাই।”

[৫]

সতীশ নির্দ্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট সময় বরযাত্রী লইয়া অতুলবাবুর বাসায় উপস্থিত হইল। গোধূলি লগ্নে বিনয়ের সহিত অতুলবাবুর সেজো মেয়ে সুরবালার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিনয়কে বাসরঘরে ফুলশয্যায় নবীন জীবন সঙ্গিনীর কোমল করকমলে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার বন্ধুগণ আহারান্তে ছাত্রাবাসে ফিরিয়া আসিল।

বৃদ্ধ কামখ্যাবাবুর বরযাত্রীর দল অতুলবাবুর বাসায় রাত্রি ১০টার সময় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথে শুনিল—বাক্‌দত্তা কন্যার বিবাহ গোধূলি লগ্নে অন্য এক যুবক বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কামাখ্যাবাবু কন্যার পিতার নামে ক্ষতি-পূরণের নালিশ রুজু করিবে—ভয় দেখাইয়া নবীন পত্নীলাভের ব্যর্থপ্রয়াসের নিদারুণ বুকভরা বেদনা লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। উপযুক্ত পুত্রেরা পিতাকে এবিষয় নিয়া আর বাড়াবড়ি করিতে দিলেন না।

বিবাহের পর দিন বিনয়ভূষণের বাড়ী যাইবার বন্দোবস্ত হইল। সতীশ সব বন্দোবস্ত করিয়া বরযাত্রীর দলসহ যাত্রা করিল। যাত্রার প্রক্কালে বিপিনবাবু বিনয়ের পিতাকে তারযোগে প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে বিনয়ের বৃদ্ধ পিতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় বরযাত্রিগণ সহ পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

দ্রুত গমন।

এক সময়ে লোকে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লইয়া পর্য্যটনে বিন্দু মাত্র ভীত হইত না। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অবলীলা ক্রমে পর্য্যটন করিয়াছেন। সেরূপ অনেক মহাপুরুষই তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে সমস্ত ভারত পদব্রজে পর্যটন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ২।১ মাইল পথ চলিতেই আমাদের নানারূপ যান বাহনের প্রয়োজন হয়। ইহা দ্বারাই মনে হয়, আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি অথবা বিজ্ঞানের সহায়তায় পরিশ্রম লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই বিজ্ঞান উদ্ভাবিত যানের মধ্যে রেল, জাহাজ, মোটর ইত্যাদিতেও আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না। ইহা অপেক্ষাও দ্রুতগামী যান হইলে আমাদের ভাল হয়। এইরূপ দ্রুতগমন ভবিষ্যতে প্রকৃতির সাহায্যেই সম্ভব হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেছেন। বায়ু মণ্ডলের নিম্নস্তরে যেরূপ বাণিজ্য বাতাস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ উর্দ্ধস্তরেও প্রবল প্রবাহমান বায়ু স্রোত বর্ত্তমান আছে। এই বায়ুস্রোতে এরোপ্লেন ছাড়িয়া দিতে পারিলে হয়ত ঘণ্টায় ৩০০ মাইলের উপরে চলা সম্ভব হইবে।

বিমানচারীগণ আজ পর্য্যন্ত যত উর্দ্ধে এরোপ্লেন উঠিয়াছে তাহা অপেক্ষাও উর্দ্ধে উঠিতে চেষ্ট করিতেছে। অল্পদিন হয় একজন বিমানচারী অত্যধিক উর্দ্ধে উঠিয়া এরূপ এক বায়ু স্রোতে পতিত হইয়াছিল যে সে মনে করে উহার গতি মিনিটে ৩০০ মাইল। যদিও তাহার নির্দ্ধারণে ভুল হওয়া সম্ভব তথাপি উহার বেগ যে অত্যন্ত অধিক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিছুদিন হয় এক নাবিকহীন বেলুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহ ৬ মাইল উর্দ্ধে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে উর্দ্ধস্তরে যে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহার বেগ ভূমির নিকটের প্রবলতম 'হারিকেনেরও' দ্বিগুণ। উর্দ্ধস্তরে যে প্রবল বায়ু বর্ত্তমান আছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বিভিন্নস্থান হইতে তাহার পরীক্ষা চলিতেছে।

ভূপৃষ্ঠ হইতে কখন কখন বেলুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সহ ২০ মাইল উর্দ্ধেও উঠান হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সময়ে ১০০ মাইল যাওয়া যায়, উর্দ্ধস্তরের প্রবল বাতাসের সাহায্যে সে সময়ে ১০০০ মাইল যাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিবেচনা করেন, আমাদের উচ্চতম পর্ব্বতের বহু উর্দ্ধে উত্তর আমেরিকা হইতে ইয়োরোপের দিকে—পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যে প্রবল বায়ু প্রবাহ বর্ত্তমান আছে, তাহার বেগ অতি দ্রুতগামী রেলের গতি অপেক্ষাও বহুগুণ অধিক। ইউরোপ হইতে আমেরিকা যাওয়ারও সেরূপ বায়ুবর্ত্ত উর্দ্ধে বর্ত্তমান আছে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; মূল্য ১৲ এক টাকা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি এবং উহার বিশেষত্ব কি, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। জগতের সকল ধর্ম্ম প্রচারকগণই সময়ের ফল। প্রয়োজন হইলেই মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হন। গীতায় ভগবান আশ্বাস দিয়াছেন; যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই; সাধুদিগের রক্ষার জন্য এবং অসাধুদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমি যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করি। গীতার এই মহীয়সী বাণী উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ভোগ বিলাসিতাময় পাশ্চাত্য সভ্যতা যখনই এদেশের শিক্ষিত সমাজকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, যখন নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম আচার রীতিনীতি সকলই কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই যুগ সন্ধিকালে ভারতের সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া উন্মার্গগামী সমাজকে স্বধর্ম্মে নিরত করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই সময় রামমোহনের আবির্ভাব না হইলে আপাত মধুর আবিলতাময় পাশ্চাত্য সভ্যতার খরস্রোতে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। রামমোহন রায়

আমাদের জাতীয় জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য। ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশিষ্টতা সহজ কথায় বিবৃত করিয়াছেন। ইহার কোথায়ও গোড়ামী কিম্বা সাম্প্রদায়ীক সংকীর্ণতা নাই। গ্রন্থকার অতিশয় ধীর ও সংযতভাবে স্বীয়মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট; বাঁধাই ও সুন্দর হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থখানার বহুল প্রচার আশা করি।

ফুলরেণু শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় প্রণীত মূল্য বার আনা। ইহা একখানা কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি অধিকাংশই কবিত্ব পূর্ণ; লেখক শব্দ চয়নে ও ভাব যোজনায় যেমন মনোযোগ দিয়াছেন, ছন্দ রক্ষায় তেমন যত্ন করেন নাই। করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। আশা করি কবির ভবিষ্যত রচনায় আমরা সেইরূপ চেষ্টারও পরিচয় পাইব।

৺ শনির পাঁচালী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; বিক্রমপুর মধ্যপাড়া হইতে চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

বিক্রমপুরের প্রাচীন কবি স্বর্গীয় দ্বিজ যদুনাথের প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ করিয়া লেখক প্রাচীন কবির স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টা সর্ব্বথা প্রসংশনীয়।

(১) গান্ধি মাহাত্ম্য, (২) মহাযজ্ঞ—শ্রীকালীহর বসু ভক্তিসাগর প্রণীত। মূল্য যথাক্রমে ৵৹ ও ।৵৹ আনা। পুস্তকদ্বয়ে উচ্চাঙ্গের ভাবুকতা আছে, জেলা ঢাকা পোঃ হলদিয়া শ্রীমনসাচরণ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

স্যর আশুতোষ—শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ বি এ, বি টি প্রণীত। মূল্য চারি আনা; ঢাকা রিপণ লাইবেরীতে প্রাপ্তব্য।

গৌর বাবুর রচনা সৌরভ পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। তিনি তত্ত্ব সংগ্রহে বিশেষ নিপুন; তাঁহার প্রবন্ধাবলি তত্ত্ব-সম্পদে যেমন মূল্যবান ও সুখপাঠ্য এ পুস্তকখানাও সেইরূপ হইয়াছে। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও বালকদিগের নিকট বঙ্গগৌরব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণ জীবন গ্রন্থ রূপিয়াই আদৃত হইবে। পুস্তকে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এক খানা চিত্রও আছে। পুস্তক সৌরভ প্রেসে উত্তম কালিতে মুদ্রিত।

সাহিত্য সংবাদ।

মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ৭ই ভাদ্র তারিখে ৺ কাশীধামে তাঁহার পরমাত্মা ৺ বিশ্বেশ্বরের চরণে লীন হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গের মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীও পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভগবান ইঁহাদের স্বর্গীয় আত্মার শান্তি বিধান করুন।

গত ২৯শে শ্রাবণ গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পদ্মিনীমোহন নিয়োগী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষ।

বয়সটা বেশী এমন কিই বা হ'ল
পঞ্চাশ পার হয়েছে বই ত নয়?
দন্ত নড়িছে চুল পেঁকে গেছে বল?
তা তো সে এযুগে সবারই এমন হয়।

দৃষ্টি-শক্তি কমেছে? কে বলে ছি ছি!
ওই গাছ-পালা-ঘর-বাড়ী গুল যত,
দেখিতে পেতেছি (চসমা যদি ও দিছি)
ঠিক গাছ-পালা-ঘর-বাড়ীরই মত।

চেহারাটা? তাও দেখিলে—আয়না দিয়া
দেখা যায় বেশ দিব্যি মানান সই;
কালো পেড়ে ধুতি জামা ও ছড়িটা নিয়া
বেড়াতে বেরুলে কমতো বাবুটি নই?

কথায় কথায় হাসির লহরী ছুটে
রসিক ইয়ার প্রেমের ফোয়ারা খানি;
তবু যত সব শত্রুর দল জুটে'
বুড়া বলে সদা করে মরে কাণাকাণি।

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর।

স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস ও ময়মনসিংহের সাহিত্যিকগণ।

পশ্চাতে—শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

মধ্যে—শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ, ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, ৺মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ৺অমরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সোম ও শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ।

সম্মুখে—৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সৌরভ

দ্বাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩৩১। | দশম সংখ্যা।

কবি গোবিন্দ দাস।

ঋণ-জর্জ্জরিত কবি গোবিন্দদাস ১৩২৫ সনের শ্রাবণ মাসের শেষভাগে একদিন অপরাহ্ণে গৌরীপুর সদর ডিহি কাচারীতে আমার পিতাঠাকুর ৺ রোহিণীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এসে হাজির। তাঁর কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি একজন পদাতিকের মারফতে একটি চিরকুট দিয়ে আমাকে কাচারীতে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখি—কবি গোবিন্দদাস আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁকে সাদরে আমাদের বাসা-বাটীতে এনে বসালাম; জীবনে এই তাঁকে প্রথম দেখলাম।

তরুণ জীবনের উষাকাল থেকে যৌবন-মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বাংলার বহু গণ্য মান্য লোকের সংসর্গে বহুবার এসেছি, কিন্তু উপেক্ষিত পল্লী-কবি গোবিন্দদাসকে তাঁদের সকলের চেয়ে এক পৃথক ব্যক্তিরূপেই দেখেছিলাম। লোকটির চেহারা ও বাহ্য পোষাক-পরিচ্ছদের সাথে অন্তরের হুবহু মিল দেখতে পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি দেখতে নেহাৎ সাদাসিধে ধরণের সেকেলে ভশ্চাযি বামুনের মতন সরল প্রকৃতির খাঁটি মানুষটি ছিলেন। খাঁটি সোনার সাথে তামার খাদ না মেশালে যেমন নিত্য ব্যবহার্য্য অলঙ্কারাদি বানানো যায় না এবং বানালে তা টেঁকসই হয় না, তদ্রূপ কবি গোবিন্দদাসের ভিতর ভেজাল কিছু না থাকায় তিনি প্যাকা-পোক্ত সংসারী হয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে যেতে পারেন নি। এক কথায় বলতে গেলে, কবি গোবিন্দদাস আমরণ কবিই ছিলেন, দশের মত স্বার্থসাধনে মনোনিবেশ করতে আদৌ সুযোগ পান নাই। সাগর সলিলে বাড়বাগ্নি আছে, অরণ্যানীতে দাবাগ্নি দৃষ্টিগোচর হয়, পুষ্প-পেলব পদার্থও বজ্র-কঠোর হতে পারে, এসব এযাবৎ শুনেই আসছি কেবল, কস্মিনকালেও চোখে দেখি নি; কিন্তু কবি গোবিন্দদাসকে চোখে দেখে, ওঠা-বসা ও আলাপ-সালাপ করে, আমার ঐসব শোনা কথা যে খুব সত্য, তা সর্ব্বান্তকরণে মেনে নিয়েছি। বাস্তবিকই, ভাওয়ালগড়ের বন-জঙ্গলে, শাল-সেগুণের ছায়ায় এক বিরাট্ খাঁটি মানুষই জন্মেছিল বটে! কবি গোবিন্দদাস দরিদ্র ছিলেন, তাই বলে' তিনি অমানুষ ছিলেন না। তাঁর মত চরিত্রবান্, নির্ভীক, তেজস্বী, সত্যবাদী ও পরদুঃখকাতর মানুষ সচারাচর দেখা যায় না। আহারে, বিহারে, আচারে, বিচারে, পোষাকে, পরিচ্ছদে, কথায়, বার্ত্তায়, চালে, চলনে, মনে ও মুখে কবি সত্যসত্যই একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন।

ঋণগ্রস্ত কবির মুখে তাঁর সকল দুঃখের কথা শুনে; আমি তাঁকে সাথে নিয়ে স্থানীয় চৌতরপের প্রত্যেক জমিদার মহোদয়গণের বাড়ীতে বাড়ীতে কবির ঋণমুক্তির সাহায্য-ভিক্ষা করে বেড়িয়েছি। তিন চার দিন ধরে কেবল এই কাজই করেছিলাম। অনেকেই কিছু-কিঞ্চিৎ করে সাহায্য করেছিলেন। কেউ কেউ "আপনি এখন বাড়ীতে যান, ঠিকানা দিয়ে যান, বাড়ীর ঠিকানায় যা-হয় কিছু পাঠিয়ে দেবো।" বলে বিদায় করেছিলেন। কবি যতখানি আশা করে সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পাড়ে এসেছিলেন, ঠিক ততখানি নিরাশ হয়ে আমার কাছে অনেকবার দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। সে সব অপ্রিয় কথার আলোচনা—সত্য হলেও, এখন তা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। সুতরাং এই সম্বন্ধে আমি আর কিছুই বলতে চাই না।

কবি আমার কাছে এসে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়েছিলেন; স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও বেজায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আমার বাসায়

সামনে প্রকাণ্ড 'অনন্ত সাগর' দীঘি দেখে তার প্রশংসা বারম্বার করেছিলেন। সজ্জিত সুশোভিত সুবৃহৎ উদ্যান দেখেও তিনি মোহিত হতেন না। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছাড়া আর-কিছুতেই যেন তাঁর মন সাড়া দিত না। মানুষের হাতে গড়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে কবি মোটেই সন্তুষ্ট হতেন না। এই স্বাভাবিক পল্লী-সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়েই সেই সর্ব্ব-সুন্দরের উপাসনা করে কবি ধন্য হয়ে গেছেন।

একদিন দুপুরে কবিকে নিয়ে আহার করতে বসেছি আমার বিবাহিতা তৃতীয়া ভাগিনী স্বয়ং কবিকে পরিবেশন কর্‌ছিল। অন্ন, ডাল ও অন্যান্য তরী-তরকারি খাবার পর কবিকে আমার মা লুচি, রসগোল্লা প্রভৃতি খেতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কবি পরিতোষ সহকারে আগেই খেয়ে দেয়ে পেট ভরিয়েছেন। শেষে লুচি, রসগোল্লা আর তেমন খেতে পারছেন না দেখে, আমার ভগিনী বীণাপাণি কবিকে সম্বোধন করে বললো—"বুড়া দাদা, ওসব না খেয়ে উঠ্‌তে পারছেন না! খেতে হবে কিন্তু।" এই কথাগুলো শুন্‌বা মাত্র কবি নত মস্তকে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসু হয়ে কেবল লক্ষ্য করতে লাগলাম, কবির কিছু চাই কিনা। শেষে বললাম, "দাস মশায়' কিছু লাগবে কি?" তিনি বল্‌লেন, "না, দাদা! একটা কথা পরে বল্‌বো। এখন আত্মসংবরণ কর্‌লাম মাত্র।" শেষে আহারান্তে মুখ ধুয়ে এসে মুখশুদ্ধি করার পর আমাকে বললেন, "আমি চির-দরিদ্র ও লোক-লাঞ্ছিত সাধারণ ব্যক্তি। আমাকে এত যত্ন করে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি; কেউ আমাকে প্রাণ খুলেও ভালোবাসে না। আমি দিদির মুখে এমন মিষ্টি সম্বোধন শুনে আকুল হয়ে পড়েছিলাম! অশ্রু অবরুদ্ধ করে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করেছিলাম। জীবনে এমন সম্বোধন কখনো শুনিনি বলেই 'দাদা' ডাকে আমার অশ্রুর উৎস খুলে গিয়েছিল, কণ্ঠরোধ হয়েছিল। তাই খেতে বসে তখন আর কিছু বলতে পারিনি, এখন খুলে বললাম।"

আমি এসব কথা চাপা দিয়ে তাঁরসঙ্গে সাহিত্যালাপ সুরু করেছিলাম। তাঁর কাব্যজীবনের আরম্ভ কেমন করে হোলো, "মগের মুলুক" রচনার কারণ কি ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করলাম। দাস মহাশয় প্রাণ খুলে সব একে একে বলে যেতে লাগলেন। তাঁর জীবন যে সেই "মগের মুলুক" রচনার যুগে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হয়েছিল, তাও বিস্ফারিত লোচনে সব শুনতে লাগলাম। ওসব কথা অনেকেই জানেন। অতএব বিস্তৃত আলোচনা একান্ত অনাবশ্যক।

পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, দাস মহাশয়, আপনার সাথে অক্ষয় বড়ালের কেমন মেশামেশি ছিল?" উত্তরে বললেন, "অক্ষয় বাবু আমাকে খুব ভালোবাসতেন। কোলকাতায় 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাসায় থাকার সময়ে অনেকবার অক্ষয় বাবুর সাথে, সমাজ-পতির সাথে, রবি বাবুর সাথে অনেক আলাপ হয়েছে। আমি নিজে গিয়ে সকলের সাথে আলাপ করে এসেছি।" তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাথে আপনার কোনো আলাপাদি হয়েছিল কি?"

দাস মহাশয় বললেন, "একদিন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মশায় আমাকে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে টেনে নিয়ে গিছ্‌লেন। আমি অত বড় বিদ্যার জাহাজ, বিলাত-ফের্ত্তা হাকিমের কাছে যেতে চাচ্ছিলাম না। দেখেই, সমাজপতি মশায় নাছোড়্‌বন্দা হয়ে নিয়ে গেলেন। আমি দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীতে গিয়ে দেখি, তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়ে শয্যায় শুয়ে আছেন। সমাজপতি মশায় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালকে বললেন, 'এই সেদিনকার 'নব্যভারতে' প্রকাশিত "স্বদেশ" কবিতার কবিটিকে দেখেছেন কি?' দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, 'না, দেখিনি তো!' সমাজপতি বললেন, 'যদি বলেন, তবে এনে দেখাতে পারি আপ্‌নাকে। দেখচেন কি? আচ্ছা, "স্বদেশ" কবিতাটি কেমন হয়েছে বলুন দিকি?'

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন শয্যায় উঠে বসে বললেন, অমন কবিতা জীবনে কখনো পাঠ করিনি।' এই বলে তিনি ঐ "স্বদেশ" কবিতাটি আদ্যন্ত আবৃত্তি করতে লাগলেন। আবৃত্তি করতে করতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, যে, আবৃত্তি শেষ হওয়া মাত্র বিছানাতে ধপাস করে শুয়ে পড়লেন। সমাজপতি মশায় তাড়াতাড়ি করে জল এনে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে মুখে দিয়ে পরে মাথাটাও ধুইয়ে দিলেন। শেষে হাত-পাখা দিয়ে বাতাস করে দ্বিজেন্দ্রলালকে

মুগ্ধ করার পর সমাজপতি মশায় স্বয়ং উপযাচক হয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে অত্যন্ত আদরের সাথে কাছে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলাপাদি করলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাথে আমার সেই প্রথম ও শেষ আলাপ।"

আমি দাস মশায়কে বললাম, "মানুষ হিসাবে কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে কেমন লাগলো আপনার?"

দাস মশায় বললেন, "অমন মানুষ খুব কমই দেখেছি। কোনো গর্ব্ব নেই! একেবারে সাদাসিধা, গোঁফ্-কামানো থানধুতি-পরা, চটি পায়-দেওয়া দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর আর কি! বিলাত-ফের্ত্তা বলে বোঝাই যায় না! অন্তঃকরণ খুব বড় না হলে অমন হয় না।"

শেষে আমিও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললাম, "দাস মশায়, সত্যি বলছি, আপনি 'চন্দন', 'কুমকুম্', 'প্রেম ও ফুল', 'বৈজয়ন্তী', 'কস্তুরী' 'ফুলরেণু' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক না লিখেও, যদি ঐ "স্বদেশ" কবিতাটিই মাত্র লিখে যেতেন, তবেও আপনি ঐ একটি মাত্র কবিতার জন্যই বঙ্গ-সাহিত্যে অমর হতেন!" কবি গোবিন্দ দাস তখন আমার কথার আর কোনো জবাব দিলেন না।

যে কয়টা দিন কবি আমাদের কাছে থেকে গেছেন, সে কয়টা দিন আমরা কত না আনন্দেই কাটিয়েছি। দিন্‌কে দিন, রাত্‌কে রাত কেবল একটানা সদালাপে, সাহিত্য-লোচনায়, কবির অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী শুনেই কাটিয়ে দিয়েছি। শালীহর গ্রাম নিবাসী (অধুনা পরলোকগত) নবীনচন্দ্র কর আমাদের বাসায় প্রত্যহ কাব্যালোচনার জন্য আসতেন। কবি গোবিন্দদাস আমার কাছে আসার পর তিনি একরকম আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে প্রায় সারাটি দিন-রাত আমাদের বাসায় পড়ে থাকতেন। নবীনবাবুর মত গোবিন্দ-গুণ-মুগ্ধ ভক্ত এতদঞ্চলে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি! তিনি কবির অনেক কবিতা কবিকে চাক্ষুস দেখবার বহু বৎসর আগে থেকেই কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। কথায় কথায় দাস মশায়ের কবিতা নবীন বাবুর মুখে উৎসরিত হতে দেখে তিনিও নবীন বাবুর প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার কাড়লাগড়-নিবাসী ও অধুনা গৌরীপুর প্রবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরজিৎ দাশ গুপ্ত ভিষক্‌শাস্ত্রী মশায়, গৌরীপুর স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর ধর ও শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম সান্যাল, স্বর্গগত নবীনচন্দ্র কর, আমি—আমরা এই পাঁচ জনে মিলেই কবির সাথে সারা-দিনরাত আলাপাদি করতাম। এখানে তথাকথিত 'শিক্ষিত' ভদ্রলোকের সংখ্যা নেহাত কম হবে না বটে, কিন্তু কবির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসাটাও যে একটা আবশ্যক কার্য্য—এটা অনেকেই ভুলে গেছলেন। কিন্তু আমরা কবিকে এসব ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেই নি। আমরা পাঁচজনেই পাঁচশো হয়েছিলাম। বিক্রমপুর বাসীরা তো কবিকে তাঁর 'বৈজয়ন্তী' কবিতা-পুস্তকে প্রকাশিত 'বিক্রমপুর' কবিতাটি ও 'নব্যভারতে' প্রকাশিত 'বিচিত্রপুর' কবিতাটির জন্য 'একঘরে' করেই বসেছিলেন। তাঁরা কবির সাথে দেখা করতেও একান্ত নারাজ ছিলেন। তাতে কবির কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। কবিও দেহ-সর্ব্বস্ব লোকদের সংস্পর্শে যেতে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করতেন। কবিই নিজ মুখে বলে গেছেন, "আমি যদি স্পষ্টবাদী না হয়ে ধনীর স্তাবক হতাম, তবে ভাওয়াল—জয়দেপুরে আমার বাসের জন্য দোতালা দালান উঠ্‌তো। মনুষ্যত্ব বিক্রি করতে পারলাম না, এই যা দুঃখ আমার।"

কবির সরলতায় আমরা যৎপরোনাস্তি মোহিত হয়ে-ছিলাম। আমার কবিতায় আকৃষ্ট হয়ে আমার সাথে গৌরীপুরে দেখা করতে এসে কবি গোবিন্দদাস সোজাসুজি আমার ৺ পিতৃদেবকে 'বাবা' সম্বোধন করতেন। আমাতে ও তাঁতে যে কোন পার্থক্য নেই, তা স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্ত্তায় প্রকাশিত হয়ে পড়তো। আমার বাবাকে 'বাবা' মাকে 'মা' বোনদেরকে 'দিদি ও আমাকে 'দাদা' সম্বোধন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার বলেই মনে হতো। আমরাও তাঁকে সোজাসুজি 'আপনার' করে নিয়েছিলাম।

কবিকে কথা প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার কারণ জিজ্ঞাসা করতে আমি কসুর করিনি। তিনি সত্যিই, দ্বিতীয়বার বিয়ে না করলে এত জড়িত হয়ে পড়তেন না। আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে বললেন, "দাদা, ঠিক কথাই বলেছেন। দ্বিতীয়বার বিয়ে করি মুক্তাগাছার স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত জগতকিশোর আচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে ও সাহায্যে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর

মৃত্যুর পর সন্তানাদিও রইল না। তারপর আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্মও গ্রহণ করিনি। সংসারে থাকতে গেলে বিবাহ না করেও উপায় নেই। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ঠ্যালাটা আজ কয়েকটি পুত্র কন্যার পিতা হয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি। এই বিয়ে করার ফলেই স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছে, নানান্ দিক্ দিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়েছি, পর-পদ-লেহন-প্রবৃত্তি প্রাণের কোণে উঁকি মারছে।"

কবি গোবিন্দ দাসের অনুতপ্ত হৃদয়ে আঘাত করবার জন্য আমি আর এই প্রসঙ্গ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করলাম না।

আমার পিতা-মাতার কাব্যানুরাগের কথা শুনে কবি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। মাতাঠাকুরাণী যে 'কস্তুরী' ও 'ফুলরেণু' ব্যতীত তাঁর অন্যান্য চারখানি কবিতা-পুস্তক কোলকাতার গুরুদাসের দোকান থেকে আনিয়ে আমাকে স্বহস্তে লিখে উপহার দিয়েছিলেন, সেই কথা আমার প্রমুখাৎ অবগত হয়ে ভক্তি-পূতঃ চিত্তে পুনঃ পুনঃ মাতা-ঠাকুরাণীর প্রশংসা করেছিলেন; 'কস্তুরী' ও 'ফুলরেণু' বই দুখানি কবি ঢাকায় গিয়ে আমার কাছে নিজে স্বহস্তে আমাকে কতকগুলো বিশষণে বিভূষিত করে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার ৺ পিতাঠাকুর মশায় খুব আশাবাদী তেজস্বী মানুষ ছিলেন। মাতাঠাকুরাণীও সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। তিনি শৈশবে মাতৃহীনা হয়ে, যৌবন- প্রারম্ভে বৃহৎ পরিবারে বিবাহিত হয়ে এসে, নানাভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে, এখন ঘোরতর দুঃখ-বাদী হয়ে পড়েছেন। তাই মাতাঠাকুরাণী বাঙ্গালী দুঃখবাদী কবিদের সব দুঃখপূর্ণ কবিতাদি সাদরে পুনঃ পুনঃ পাঠ করে থাকেন। মানকুমারী, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কবি। গোবিন্দ দাস মশায় এসব শুনে মাকে প্রণাম করে ধন্য হবার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তাঁকে মায়ের কাছে এনে হাজির করা মাত্র তিনি দুর্গা প্রতিমাকে প্রনাম করার ন্যায় দূরে থেকে মাটিতে মাথা লুটিয়ে মাকে প্রণাম করে শেষে শান্ত হয়েছিলেন। এসব কথা ভাবতেও এখন অশ্রুতে চক্ষু ঝাপ্সা হয়ে আসে। জীবনের ঐ পাঁচ ছয়টা দিন কি এক সুখেই কাটিয়া দিয়েছিলাম।

কবি ১৩২৫ সনের শ্রাবণের একেবারে শেষাশেষি গৌরীপুর থেকে চলে যান। আমরা দু তিন জনে গৌর-পুর ষ্টেশনে গিয়ে তাঁকে টিকেট করে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

আমার কাছ থেকে যাওয়ার প্রায় মাসাধিক কাল পর অকস্মাৎ একদিন অগ্রজোপম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাকে ঢাকা থেকে লিখলেন, "ভায়া, মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে কবি গোবিন্দ দাস তোমাদের গৌরীপুর থেকে এসে গত ১৩ই আশ্বিন (১৩২৫) সোমবার ঢাকায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন।"

তারপর 'সৌরভ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মশায় লিখলেন,—

"প্রিয় যতীন বাবু,

আমাদের প্রিয় কবি, বাঙ্গালার গৌরব, আপনার সেদিনকার অতিথি কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস আমাদিগকে ছাড়িয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। গত সোমবার রাত্রে বিনা চিকিৎসায়—বিনা পথ্যে—ভীষণ দুর্দ্দশায় পড়িয়া কবি স্বর্গপ্রয়াণ করিয়াছেন। দরিদ্র কবিকে নিরাহারে বিনা চিকিৎসায় মরিতে হইল—ইহা পূর্ব্ব বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য। আপনি "কবি প্রয়াণ" সৌরভের জন্য লিখিবেন। ইত্যাদি—ইত্যাদি।"

কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অরবিন্দনাথ দাসও ১৭ই আশ্বিন ব্রাহ্মণগাঁও থেকে তার পিতার শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ আমাকে লিখে জানিয়েছিল।

আমি "সৌরভের" জন্য "কবি প্রয়াণে" নাম দিয়ে একশো ছত্রের যে কবিতাটি বুকের রক্তের সাথে চোখের জল মিশিয়ে রচনা করেছিলাম, সেটি ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণের "সৌরভে" প্রকাশিত হবার পর আমাকে অনেকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন এবং দু-চার জনে মৌখিক ঝাঁটিকা-প্রহারও যে না করেছিলেন এমন নয়। এক আধজনে আবার আমার কবিতাটির ঝাঁঝালো ঝাঁজে মগজে ঝিঁঝিঁ ডাকিয়ে, পত্রিকায় টীকা প্রবন্ধ লিখে, তীব্র প্রতিবাদ করে, সদ্য-স্বর্গগত স্বদেশীয় কবির প্রতি তাঁদের যে কি জঘন্য মনোভাব, তাও ব্যক্ত করতে ত্রুটি করেন নি।

কবি আমার কাছ থেকে চলে যাবার পর বিভিন্ন স্থান থেকে আমার কাছে খান কতক চিঠিও লিখেছিলেন। সে গুলো এখন নানান্ কারণেই প্রকাশ করতে চাই না।

পূর্ব্ববঙ্গের একটা গৌরব, অথচ নিত্য-উপেক্ষিত, চির-লাঞ্ছিত, ক্ষুৎপীড়িত একটা নামজাদা কবির মত কবির শোচনীয় মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁর সাথে আমার মিলন-কাহিনী-টুকু সংক্ষেপে এইটুকুই।

দক্ষিণ-বঙ্গবাসীদের একটা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা এইরূপ, যে, পূর্ব্ববঙ্গজেরা স্বাভাবতঃই ঈর্ষাপরায়ণ ও একান্ত পরশ্রী-কাতর হয়ে থাকেন। এই ধারণা বাস্তবিকই অমূলক নয়। এই ধারণা মিথ্যা হলে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সহর ঢাকা হতে ঢাকাবাসী কবিও লেখকেরা তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকে এমন ঘৃণিতভাবে চির-বিদায় দিতেন না! কবিবরের মৃত্যুর পর মাত্র পাঁচ সাত জন নগণ্য লোক তাঁর শবানুগমন করতেন না। "ঢাকায় বহুতর সাহিত্যসেবীর বাস, কিন্তু এই আদরণীয় মৃত কবির প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা গভীর কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে!"—কবির জীবনী-লেখকের এই মর্ম্মান্তিক উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমরাও এই উপেক্ষিত কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অত্যন্ত গর্ব্বের সাথে তাঁর দেশবাসীদেরকে বলছি—

"সত্যই কবি কি মরে? বোঝেনা অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ।"

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গোবিন্দ স্মৃতি লাইব্রেরী।

দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া গোবিন্দ বাবু বিক্রমপুর ব্রাহ্মণগাঁ আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবির স্মৃতি রক্ষার্থ ব্রাহ্মণগাঁ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একটী পাঠাগার খোলা হইয়াছে। স্বগ্রামে সম্মানই প্রকৃত সম্মান—ইহাও সান্ত্বনার কথা।

কবি গোবিন্দ দাস।

দৈন্যাঘাতে দীর্ণ পরাণ বাঙাল দেশের ওহে কাঙাল কবি!
জানিনাকো কোন্ খাতিরে এসেছিলে হেতায় জন্ম লভি।
সারা জীবন গেলে স'য়ে বুক-ফাটা, হায়, নিষ্ঠুর অত্যাচার,
মুদলে আঁখি বক্ষে লয়ে নিরন্নতার গভীর হাহাকার।
এদেশে নাই গুণীর আদর, তোমার কদর বুঝ্‌লে না কেউ হায়;
কবির জীবন মর্‌ল কেঁদে অন্নাভাবে দেশের উপেক্ষায়।
ছিলে তুমি খাটি মানুষ, লোহার মত শক্ত বুকের ছাতি;
অত্যাচারের বজ্র-জ্বালা সইলে নিত্য আপন বক্ষ পাতি;
উচিত কথা কইতে কারে ভয় করনি, তাইতে তোমার 'পরে
অত্যাচারির হিংস্র আক্রোশ আস্‌ছে ক্ষেপে পিষে মারার তরে।
নির্ভীক তুমি ন্যায়ের সেবক, অন্যায়ের সেই মিথ্যা ক্রোধের ভরে
কোথাও কিন্তু হওনি নত, মনুষ্যত্বে ক্ষুণ্ণ কভু করে।
যতই আঘাত হান্‌ছে বুকে প্রাণের আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে;
দীপের মত দীপ্ত শিখায় জ্বল্‌ছে আজি বাণীর চরণ তলে।

* * * *

এখন আম্‌রা সভা করে উচ্চ কণ্ঠে গাইছি যশের গীতি
আবেগ ভরে কবির প্রতি নিবেদন যে করছি শ্রদ্ধা প্রীতি,
লজ্জায় ক্ষোভে পরাণ কাঁদে—তাতে যে নাই মোদের অধিকার!
যে দেশেতে জন্মে' কবি সইল শুধু নিষ্ঠুর অত্যাচার!
ধাতার চোখে হয়তো এটা ঠেক্‌ছে একটা দারুণ উপহাস,
স্বর্গ থেকে কবির আত্মা হয়তো ক্ষোভে ফেলছে দীর্ঘ শ্বাস।
আলোর দেশের পথহারা এক আলোক রেখা ধরায় বুকে লুটে
ভাওয়ালেরই নিরস ভূমে পুষ্প হয়ে উঠেছিল ফুটে,
সারা জীবন পান করিয়া রুক্ষ ভূমির তপ্ত হাহাকার
বিনিময়ে দিয়ে গেছে প্রাণ চিরে' সে সকল সম্পদ তার।
অমর তুমি ওহে কবি! নাই অধিকার যমের তোমার 'পরে,
নশ্বর যাহা ছিল তোমার চিতার আগুন দিছে ভস্ম করে'
তোমার যাহা আসল খাঁটি তাহা কভু হওয়ার নহে ম্লান;
কবি তোমার আত্মা-জ্যোতি বিশ্বমাঝে চির অনির্ব্বাণ।

শ্রীজানকীনাথ দত্ত।
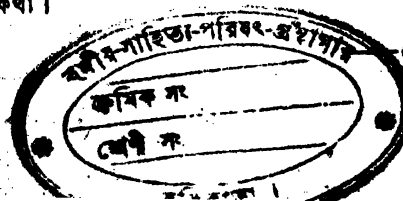
কবির সহিত পরিচয়।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস আমাদের নিকট বাল্যকাল হইতে পরিচিত হইলেও তাঁহার নিকট আমরা সে সময় ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলাম না, অপর দশজন ছাত্রের ন্যায় ছিলাম। তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ের সুযোগ হয় "কুমার" পরিচালন উপলক্ষে।

১২৯৩-৯৪ সালে আমরা "কুমার" নামে এক খানা পাক্ষিক পত্রিকা পরিচালন করিতে আরম্ভ করি। ১২৯৫ সালে কুমারের জন্য মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া 'কুমার'কে মাসিক পত্রে পরিণত করি। ঐ সময় কুমারের জন্য কবিতা-সংগ্রহের চেষ্টায় সহরের লেখকদিগের নিকট যেমন ঘুরিতাম, কবিবর গোবিন্দ দাসের নিকটও সেইরূপ কয়েকদিন ঘুরিয়াছিলাম।

কবিকে ধরিবার এই সময় আমাদের এক সুযোগ ছিল এই যে,—কবি যে "দেবনিবাসে" বাস করিতেন, আমার এক পরমাত্মীয়ের বাসা সেই দেবনিবাসের সহিত—সংলগ্ন না হইলেও—সম্বন্ধ যুক্ত ছিল। দেবনিবাসের কর্ত্তা স্বর্গীয় দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য মহাশয় সর্ব্বদা সেই গৃহে আসিতেন, আমার পরমাত্মীয়গণও তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন।

এইরূপ সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করিয়া একদিন বিকালে কবিকে ধরিয়াছিলাম এবং এক খানা "কুমার" উপহার দিয়া আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলাম। কবির সহিত সে উপলক্ষে কি কথা হইয়াছিল, মনে নাই। দু-চার দিন হাঁটাহাঁটির পরে কবির নিকট হইতে যে একটী কবিতা আদায় করিতে পারিয়াছিলাম এবং সেই কবিতার কাগজ খানা লইয়া যে আনন্দাতিশয্যে উর্দ্ধ শ্বাসে প্রেসে আসিয়া নিজেই তাহা কম্পোজ করিয়া ফেলিয়াছিলাম—এই কথাটীই এই সুদীর্ঘ ছয়ত্রিশ বৎসর পরেও মনে রহিয়াছে।

কবিতাটীর নাম কি ছিল, খুব স্পষ্ট মনে নাই; 'কুমারের' "ফাইল" বাসা পুড়ায় পুড়িয়া গিয়াছে। আমার যেন মনে হয়—কবিতাটীর নাম ছিল—"বলে যাও সমীরণ—সে আমার আছে কেমন?" এটী কবিতার নাম, কি কবিতার একটী চরণ—ঠিক মনে হইতেছে না। কবিতাটী কিন্তু তাঁহার কোন মুদ্রিত পুস্তকে পরে দেখিতে পাই নাই।

ইহার পর কবি তাঁহার কবি বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট হইতেও কবিতা পাইবার জন্য একখানা চিঠি দিয়াছিলেন এবং আমরা সেই চিঠি পাঠাইয়া স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে একটী কবিতা আদায় করিয়াছিলাম।

এই ঘটনায় যে কবির সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল, তাহা নয়। কবি উপরোধ অনুরোধে আবদ্ধ হইয়াই আমাদিগকে কবিতা দানে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন; নিজের পরিচয়ের খাতিরে নহে।

ইহার পর আর একটী বিশেষ ঘটনায় তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয়ের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল; ঘটনার অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাহা হইতে পারে নাই। ঘটনাটীর সহিত তাঁহার নির্য্যাতিত জীবনের প্রচুর সম্বন্ধ থাকায়, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল।

গোবিন্দ বাবুর কন্যা মণিকুন্তলার বিবাহ স্থির হইয়াছিল, আমার সেই পরমাত্মীয়দিগেরই পরিবারের কোন একটী যুবকের সহিত। বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন দেবনিবাসের ৺ দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য। তখন গোবিন্দ বাবুর কি উৎসাহ! তাঁহার নির্য্যাতিত আত্মা যেন নূতন আত্মীয়তার আশ্রয় পাইয়া জগৎকে তৃণ সম গণ্য করিতে উদ্যত!

বিবাহের দিন বিবাহের আয়োজন সব প্রস্তুত। পাত্রীর গৃহ—দেবনিবাসে দেবেন্দ্রকিশোর নিজ শক্তিতে যত কুলায় আয়োজনের ত্রুটী করেন নাই। বিবাহের মঙ্গল আচরণের যাবতীয় সাময়িক কার্য্য যথারীতি বর-কন্যা উভয়ের গৃহেই আচরিত হইতেছিল। উভয় পক্ষই নিজ নিজ গৃহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছেন। মেয়ের স্নান হইয়া গিয়াছে; এই সময় স্নানের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান প্রয়োজন হইল—অনুসন্ধানের ভার পড়িয়াছিল আমারই উপর। আমি যথা সাধ্য পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার খোজ পাইলাম না। ক্রমে বিষয়টা যতই গুরুতর বিবেচিত হইতে লাগিল, অনুসন্ধানের গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

'বরকে পাওয়া যাইতেছে না' কথাটী বায়ুবেগে প্রচারিত হইয়া সহর ময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বর-গৃহে দুই ভ্রাতারই বিবাহ ছিল; সুতরাং তথায় বুদ্ধিভ্রান্ত চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানও চলিতে লাগিল। কন্যা-গৃহ সেরূপ অবস্থায় কিরূপ দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অন্যের উপলব্ধির বিষয় নহে।

কন্যা-কর্ত্তা দেবেন্দ্রকিশোর খালিপায়—গামছা মাথায়, এক রকম্ দৌড়াইয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহারও মুখে অন্য কথা নাই, কেবল—"কোথায় গেল!" "কোথায় গেল?"

* * * *

তিনটা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও যখন পলাইত পাত্রের কোন খোজ পাওয়া গেল না, তখন পাত্র-পক্ষ আমাকেই তাহার স্থলবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দ বাবুকে এই বিপদ হইতে, দেবেন্দ্র বাবুকে লজ্জা হইতে এবং আমার আত্মীয়গণকে উপস্থিত কর্ম্মবিপাক হইতে উদ্ধার করিতে অনুরোধ করিলেন।

গোবিন্দ বাবুর পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হইতেছিল, দেব-নিবাসে গিয়া সে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সুতরাং এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিপন্ন কবিকে বিপন্মুক্ত করিতে এবং এই আকস্মিক সুযোগে নিজকে কবি-জামতা বলিয়া সুপরিচিত করিয়া তুলিতে আমি মোটেই কোন আপত্তির কারণ দেখিলাম না।

কথাটা অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই পক্ষের আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু শেষটায় আমার অভিভাবক পক্ষের সম্মতি না থাকায় কার্য্য হইল না। কবি তাঁহার জীবনে যে সকল আঘাত পাইয়াছিলেন, এই আঘাতই তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং মর্ম্মান্তিক আঘাত হইয়াছিল। যে হত-ভাগ্য যুবক এই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার ঘটাইয়া এই নিরপরাধ পিতা পুত্রীর নিদারুণ অভিসম্পাতের ভাগী হইয়াছিল—সেও ইহ-জীবনে পত্নী-সুখ প্রাণেপ্রাণে উপভোগ করিয়া যাইতে পারে নাই—অভিসম্পাতের দুর্ব্বিসহ বোঝা বহন করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এই পরিচয়ও দুর্দ্দিনের পরিচয়।...

ইহার পর আমরা যখন 'বাসনা' বাহির করিতে ব্যস্ত, প্রবন্ধ ও প্রুফ লইয়া বাসায় ও প্রেসে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলাম, সেই সময় একদিন—বাসন্তী-প্রেসে 'প্রিন্টার্স ডেবিলে' * বসিয়া প্রিন্টার বাবু রামচন্দ্র অনন্তের সহিত পত্রিকা পরিচালন সম্বন্ধে পরামর্শ আটীতেছিলাম—দেখি, ছাতায় মুষ্টিবদ্ধ হস্ত—কবি গোবিন্দদাস সম্মুখে উপস্থিত।

আমি স্কুলের রীতি অনুসারে পণ্ডিত মহাশয়কে অভিবাদন (সেলিউট) করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার অভিবাদনে তিনি যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। রামবাবু তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইলেন; আমাকে তাঁহার নিকট পরিচয় করাইয়া দিলেন। তারপর "বাসনা" পরিচালনের কথাবার্ত্তা হইল—অনুষ্ঠান পত্র দেখান হইল। এই যে আমরা এত উৎসাহের সহিত এতগুলি কথা বলিলাম, তিনি তাহা কেবলই শুনিয়া গেলেন; একটী কথাও তাঁহার মুখে বাহির হইল না।

আমি "কুমারের" কথা তুলিয়া—তিনি যে 'কুমারে' কবিতা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র সেনের কবিতা যে তাঁহার চিঠির বলেই পাইয়াছিলাম, এবং আমিই যে তাঁহার নিকট হইতে কবিতা আনিয়াছিলাম—ইত্যাদি বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করিলাম।

তিনি ইষৎ হাসিয়া কথাগুলি মাত্র শুনিলেন, নিজে কোন কথাই বলিলেন না। সে দিন তাঁহার সহিত আলাপের এইরূপ সুযোগ পাইয়াও আলাপে সুখী হইতে পারি নাই।

এইরূপ স্বল্পভাষিত্বের জন্য শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কোন নূতন পরিচয় আকাঙ্ক্ষীর সহিত আলাপ ও ব্যবহারে সুনাম লাভ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে আমি খুবই দুঃখিত হইয়া-ছিলাম। এমন কি "আরতি" পরিচালন ব্যাপারে যখন স্বর্গীয় মনোমোহন সেন আমাকে গোবিন্দ দাসের নিকট চিঠি লিখিতে বলেন, আমি তাঁহাকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া গোবিন্দ দাসের প্রতি দু একটা অভদ্র-উক্তি প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলাম না। হায়, তখন জানিতে পারি

* বাসন্তী প্রেসে—প্রিন্টার রামচন্দ্র অনন্ত মহাশয়ের যে শয্যাটী ছিল, তাহাতে অগণিত ছারপোকার বাস ছিল। মনোমোহন ঐ বদ্ধুত সমন্বিত শয্যাকেই "প্রিন্টার্স ডেবিল" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

নাই—বুঝিতে পারি নাই—দাস কবি এমনি মূক স্বভাবের—এমনি কথা-কৃপণ!

ইহার কিছুদিন পরেই—একদিন প্রাতে মনোমোহন বাবু দাস কবিকে লইয়া আসিয়া আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। মনোমোহনের হাতে একখানা ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপি—তাহা আমার হাতে দিয়া মনোমোহন বলিলেন—"এই গোবিন্দ বাবুর কবিতার খাতা—আমি কাল বেগুনবাড়ী হইতে গিয়া কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছি।..."

গোবিন্দ বাবুকে—পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া—সাদরে গ্রহণ করিলাম। অনেক কথা হইল। দেখিলাম, প্রায় সবগুলি কথাই আমরা বলিলাম—কবি দু-একটী কথার বেশী—বাজে খরচ করিলেন না।

কবিকে বিকালে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলাম। আমি যে ছাত্র, এবার তাঁহাকে বলিলাম না। সুতরাং তিনিই আমাকে অগ্রে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন।

বিকালে কবি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, কবির নিকট পরিচিত হইয়াছি।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

দাস কবির একটী কবিতা।

একবার কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় স্বর্গীয় প্রবীণ সাহিত্যিক অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অমর বাবু দাস মহাশয়কে নানা কথার পর বলিয়াছিলেন—"আপনার সারস্বত কবিতাগুলি আর প্রকাশিত হইল না; সেগুলি যেরূপ উগ্র ভাষায় লিখিত, তাহা দেশ-কাল ভেদে একটু পরিবর্ত্তন না করিলে মুদ্রিত করিতে যাওয়াও আর এক বিড়ম্বনার কাজ হইবে। আপনি সে-গুলি * * * কে দেন; সে সাময়িক আব-হাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দুই একটা স্থান বা শব্দ—যাহা পরিবর্ত্তন আবশ্যক, পরিবর্ত্তন করিয়া "সৌরভে" প্রকাশ করিবে। কোন স্থানে প্রকাশিত হইলেই কবিতাগুলি থাকিবে। ......"

ইহার কিছুকাল পরে গোবিন্দ বাবু তাঁহার অপ্রকাশিত সারস্বত কবিতাগুলি ও অন্যান্য কতগুলি দেশাত্ম-বোধক কবিতা ও গান—যাহা তাহার কোন কবিতা পুস্তকেই বাহির হয় নাই—আমাকে দেন এবং অমর বাবুর সহিত পরামর্শ ক্রমে সেগুলির সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন।

সারস্বত কবিতাগুলির মধ্যে দুটী দীর্ঘ কবিতা কিছু কিছু পরিত্যাগ করিয়া "সৌরভে" প্রকাশ করিয়াছিলাম। বাকীগুলি ক্রমে প্রকাশ করিব, ইচ্ছা ছিল।

কবির মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান অরবিন্দ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহার পিতার এই রক্ষিত সম্পদের কথা আমি তাহাকে জানান উচিত মনে করিয়া জানাইয়াছিলাম।

সে দ্বিতীয়বার ময়মনসিংহ আসিয়া আমার নিকট ঐগুলি দাবি করিলে—দুই-একজন বন্ধুর নিষেধ স্বত্বেও—তাহার পৈতৃক সম্পত্তি তাহার হস্তে অর্পণ করি।

এখন শুনিতেছি সে সম্পদ, সে যত্নে রক্ষা করিতে পারে নাই।

কবিতাগুলির সহিত ভারত-হিতৈষী জনৈক মহাপ্রাণ ইংরেজ রাজপুরুষের লিখিত "Awake" নামক ইংরেজী কবিতাটী এবং দাস কবির অনূদিত সেই কবিতার বঙ্গানুবাদ "জাগ" কবিতাটীও ছিল। উভয় কবিতাই স্থানীয় "চারুবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে-ও সিকি শতাব্দীর উর্দ্ধের—প্রায় ৩০। ৩৫ বৎসরের কথা।

ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ কবি—মূলের সহিত অনুবাদের কিরূপ সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন তাহা প্রদর্শন জন্য—সেই মূল কবিতাটীরও কয়েক পাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। ইংরেজী কবিতাটীর নিম্নে—লেখকের নামের স্থলে ছিল—UNION.

সৌঃ সম্পাদক।

AWAKE.

Sons of Ind why sit ye idle,
Wait ye for some Deva's aid ?
Buckle to, be up and doing !
Nations by themselves are made !

Are ye Serfs or are ye Freemen,
Ye that grovel in the shade?
In your own hands rest the issues!
By themselves are nations made!

Ye are taxeed, what voice in spending
Have ye when the tax is paid?
Up! Protest! Right triumphs ever!
Nations by themselves are made!

* * *

জাগ।

অলস হইয়া বসি ভারত সন্তান,
সাহায্য করি'ছ ভিক্ষা কোন্ দেবতার?
সাধ কার্য্য—কর সজ্জা—করহ উত্থান,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

তোমারা কি চিরদাস অথবা স্বাধীন,
দিশা হারা অন্ধকারে ডুবে চিরদিন?
তোমাদের (ই) হস্তে ইহা মীমাংসার ভার;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

এই যে বসেছে টেক্স, ব্যয়ের সময়
মতামত দিতে পার—আছে অধিকার?
সত্যের সর্ব্বদা জয় জানিও নিশ্চয়,
ওঠ, কর প্রতিবাদ—ভয় কি তোমার?
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

যদিও বিপদাপন্ন সমস্তই হায়,
তবু দেশ তোমাদেরি, তোমাদেরি প্রাণ,
সর্ব্বস্বই তোমাদের; ক্ষমতা কোথায়
সাধিতে অহিত কিংবা করিতে কল্যাণ?
বোবা কি তোমরা? সবে চাহ অধিকার;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

ঐশ্বর্য্যে কি উপকার? কোন্ প্রয়োজন
হেন শিক্ষা শূদ্রোপাধি নীচ ব্যবসায়?
মূল্যবান ততোধিক স্বায়ত্ত শাসন!
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

তোমরা কি অন্ধ কিংবা শিশু সমুদয়,
হামাগুড়ি দেয় যারা ভয়ে নত ভীত?
থাকিবে কি চিরকাল শৈশব সময়?
আপনার যত্নে জাতি হয় সংগঠিত!

কাণাকাণি আর্ত্তনাদ চলেছে আঁধারে,
হামাগুড়ি দিয়া যায় ক্ষুদ্র কীটচয়,
সাধ্য কি এ অন্যায়ের প্রতিকার করে,
উপত্যকা তলে যারা লুকাইয়া রয়!
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয়!

বোঝ কি এত যে ক্লেশ সহ অবিরাম?
অপমান অনুভব করে কি হৃদয়?
কর অন্যায়ের সঙ্গে নির্ভয়ে সংগ্রাম,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয়!

চেয়োনা সাহায্য স্বর্গ নরকের কাছে,
আত্মার ভিতরে খোজ, সেখানেই আছে!
যে করে সাহস—ইচ্ছা, সর্ব্বস্ব তাহা'র;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার!

ভারত সন্তান সবে হও হে জাগ্রত,
হও কার্য্যে অগ্রসর করি প্রাণপণ,
অবাধে কার্য্যের গতি কর প্রবাহিত,
প্রাণান্তে দিও না তাহা রোধিতে কখন!
দেখ পূর্ব্বদিকে চেয়ে অরুণ উদয়,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের মানসী।

গোবিন্দ দাসের কবিত্বের ধারা নির্ণয় করিতে গিয়া আমার কোন বন্ধু অভিযোগ করেন, ইঁহার কবিতা উশৃঙ্খল—কোন ধারা নাই। আমি কিন্তু বন্ধুবরের সহিত

একমত হইতে পারি নাই! আমি গোবিন্দ বাবুর কবিতা আলোচনা করিতে গিয়া তাহার শৃঙ্খলা দেখিয়া মুগ্ধ হই। সেই প্রাচীন 'বান্ধবে' প্রকাশিত বেনামী কবিতা "পরশুরামের শোণিত তর্পণের" "স্বাধীনতা মুক্তিপদ" কামী গোবিন্দ চন্দ্রকে আমরণ দেখিলাম, তিনি দেশাত্মবোধের একনিষ্ঠ সাধক। কবিবর নবীন চন্দ্রের ("শবসাধনা") কিম্বা হেমচন্দ্রের ("ভারতভিক্ষার") চাইতে গোবিন্দ-চন্দ্রের ("পরশুরামের শোণিত তর্পণে") দেশাত্মবোধ বেশী কি না, আমরা তাহার আলোচনা করিব না। কিন্তু একথা নির্ঘাত সত্য যে গোবিন্দ বাবুর প্রাণটার ষোল-আনাই দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত হইয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্র একটা আদর্শ সৃষ্টি করিতে আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধনী হইলে তাঁহার জয় হইত। দেশের দুঃখ দূর করিতে আজ সকলেই ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পরামর্শ দিতেছেন, কাঞ্চন-কৌলিন্য বা মহার্ঘ পরিচ্ছদের সম্ভ্রম অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ফতোয়া দিতেছেন, কিন্তু গোবিন্দ বাবু বিনা বক্তৃতায় আজীবন এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। কবিতায় লিখিয়াছেন এক রকম, কাজে তাহার বিপরীত; এ ধাতের মানুষ তিনি ছিলেন না। যাঁহা বাহিরে তাঁহা ভিতরে—এই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব। আমরা দেখি অনেক কথক (বক্তা বলাই বোধ হয় ভাল ছিল) খদ্দরের মহিমা প্রচার করেন, আচার্য্য রায় বা অন্য কোন কর্ম্মীর প্রশংসা করেন, নিজে সভা-সমিতিতে ধোলাই খদ্দরের পোষাক লইয়া যান, আবার ২য় শ্রেণীর গাড়ীতে চলেন। ট্রেন প্লাট ফরম্ ত্যাগ করিলে আসল বিলাতী স্যুট পরিয়া সাহেব সাজেন। গোবিন্দ চন্দ্রের মানসী এইখানে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। "স্বাধীনতা মুক্তিপদ" প্রার্থী কবি—একটু শির নত করিলে মোগলাইথানা, না পাইলেও সুখে থাকিতেন, কিন্তু এই বাঙ্গালী কবি মহাবীর রাণা প্রতাপ সিংহের মত সর্ব্বত্যাগী পুরুষ ছিলেন। বিলাস তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারিত না। তাঁহার মানসী তাঁহাকে বড় যত্ন করিয়া নিজ বৈশিষ্টে চিরদিন রাখিয়াছিল। বাংলার কবিরা যখন চাঁদের সুধা পানে মুগ্ধ হইয়া প্রেয়সীর রূপবর্ণনায় আত্মহারা হন, গোবিন্দ চন্দ্র তখন চাঁদকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

"ভারত আকাশে এসে উঠিওনা আর,
মিলে সব ভাই ভাই, সিন্ধু বঙ্গ এক ঠাঁই।
যদি শক্তি থাকে, তবে ফিরে পুনর্ব্বার,
উত্তোলিব নব শশী মথি পারাবার!
সুধাশূন্য সুধাকর হাসিও না আর।"

এত গান দেওয়ার কারণ আর কিছুই নহে,—কবির প্রবল দেশাত্মবোধ, তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। তিনিত চন্দ্রের কিরণে বিরহের স্বপ্ন দেখিতেন না তিনি চন্দ্র দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন——

"দুঃখ দরিদ্রতা ভরা, দেখনা কি বসুন্ধরা,
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর!
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষ্যা দ্বেষ, পাতকের একশেষ
চৌর্য্যহত্যা দস্যুবৃত্তি নিয়ত যেখানে;

* * *

আহা হা ভারত ভূমি, কি করে দেখিয়া তুমি,
ধৈরয ধরিয়া আছ, কাঁদেনা অন্তর?"

এ দেশ যে সে দেশ নহে! কেন না—

"যে দেশে তোমার মত, উঠে শশী শত শত,
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর।
যে দেশে শ্মশান ভস্মে, সুন্দর সবুজ শস্যে
হেমন্তে এখনো হাসে দিগন্ত প্রান্তর"

* * *

আর আজ! আজ আর সেই দেশ নাই, সেই দেশের সেই শোভা সম্পদ, সুখ শান্তি নাই। আজ—

সেইদেশে হায় হায়, সন্তানে চিবায়ে খায়,
ক্ষুধার্ত্ত জননী নিত্য পূরিতে উদর।

মহামনাঃ কবির শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। চন্দ্রকে কহিলেন—

"সত্যই ভারত দেখে কাঁদেনা কি প্রাণ?
অযোধ্যার রাজগৃহে, সত্যই কখন কি হে,
এক বিন্দু অশ্রুজল করনি প্রদান?
কখনো কি কুরুক্ষেত্রে, দেখিনি সজল নেত্রে,
আপনার বংশ ধ্বংস——সন্তান শ্মশান?

* * *

দেশগত প্রাণ —গোবিন্দ চন্দ্র অতীতের স্মৃতি মন্থন করিতে লাগিলেন—

যে জাতির পদ ভরে বাসুকি কাঁপিত ডরে
তাহাদেরি হায় হায়, পদাঘাতে প্রাণ যায়
শৃগাল শঙ্কায় কাঁপে সিংহের সন্তান।

এ যাতনা কি সহ্য হয়? যে এক বিন্দু সুধা পায়, সে মরা বাঁচিয়া উঠে, আর তুমি শশধর সুধার আকর—

যে সুধায় মরা বাঁচে তাই কি তোমার আছে?
যে সুধায় ওহে সোম বাঁচিল গিরীশ রোম
সেই সুধা আছে নাকি, ওহে শশধর?
———তোমার সঞ্জীবনী সুধারাশি,
স্পর্শিলে শবের অঙ্গ লভে যে জীবন!
অমৃতে ছাইয়া ফেল কানন কান্তার!

কিন্তু কবির সন্দেহ এই সুধাকরের সুধায় মরা বাঁচিবে না! যদি বাঁচিত, তবে—

"কোথা সে কোশল দেশ, ইন্দ্রপ্রস্থ ভস্মশেষ"
বাঁচিল কি ভীষ্মদ্রোণ কর্ণ পুনর্ব্বার?
মৃত কি বাঁচিল কেহ অমৃতে তোমার?"

তাই মহাতেজস্বী কবি কহিতেছেন,—

"উত্তোলিব নবশশী মথি পারাবার"

ইহাই কবিবর গোবিন্দ চন্দ্র দাসের মানসীর অভিব্যক্তি।

প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার কবিতায়—

"ভারত সৈরিন্ধ্রীবেশে, আছে বিরাটের ঘরে
দুর্ভাগ্য পাণ্ডব পঞ্চ তাহারি দাসত্ব করে;
নাহি আছে অভিমান, না আছে সম্মান জ্ঞান,

প্রভৃতির প্রচার! তাঁহারি উত্তর জীবনে,

"নপুংসকের গুষ্ঠি তোরা"

প্রভৃতি প্রকাশ।

দাস কবির কাব্যের এই দেশাত্মবোধ এক এক সময় এক এক রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সর্ব্বত্রই একই কথা—দেশের দুঃখ, দেশের দুর্দ্দশা প্রবলের অত্যাচার, দুর্ব্বলের হাহাকার, আর্ত্তের মর্ম্মন্তুদ রোদন! কবি তাহার প্রতিকারের জন্যও ভেষজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে অতি নিপুণতার পরিচায়ক,—কিন্তু বড় কঠোর, বড় ভয়ানক।

"রোধিত কণ্ঠে বোধিত বীণা—
আর বাজবে কি না, আর বাজবে কি না,
মূকের যেমন বুকের বাসনা—
রহে চিরদিন আঁধারে লীনা,
রুদ্ধকণ্ঠ———————"

এই অভিব্যক্তির ইঙ্গিত অনেক স্থানেই দেখা যায়। নববর্ষ, ভাওয়াল, বাসন্তীপূজা, গুরুগোবিন্দ সিংহ, নির্ব্বাসিতের আবেদন, বাঙ্গালী, কালীয়দমন, কার্ত্তিকপূজা, নৃসিংহ প্রভৃতি কবিতায় প্রবল ভাবে দেশ-মাতৃকার কথা আন্দোলন করিয়াছেন। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কবি গোবিন্দ লিখিয়াছেন—"আজ মা নিদাঘে হায়, ভারত পুড়িয়া যায়,

ধূ ধূ করে দ্বেষ হিংসা বিঘ্ন বিড়ম্বনা'
আতঙ্কে অবনী কাটে, অগ্নি উঠে, কাঠে কাঠে
কি বিষম আত্মদ্রোহ———
করিব নিদাঘে আজ অগ্নি উপসনা।
....
কপট কুটীল ভণ্ড, ক্ষেপেছে ধর্ম্মের ষণ্ড
বেদ কৈল লণ্ডভণ্ড———
আত্মঘাতী যদুবংশ, আপনি হইল ধ্বংস,
রাখ মা করুণা করি———
কর দেবি ব্রহ্ম বিদ্যা বেদের উদ্ধার!

আর কি চাহেন? কবি তাহাও গোপন রাখেন নাই।

রাখ মা ভারতবর্ষ যায় রসাতলে,
বাণিজ্যে নাহি মা মতি, দিন দিন অধোগতি,
একটী শ্রীমন্ত আর না যায় সিংহলে
সুধু যায় কর্ম্মদোষে, অষ্ট্রেলিয়া মরিশশে
আপনা বেচিতে যায় কুলি দলে দলে।
বেচিয়া চুরট পান, অষ্টাদশ কোটী প্রাণ
বাঁচিতে পারে কি—বল কতদিন চলে?
খুলে দাও নাগপাশ———
কত যুগী জোলা তাঁতী, পারে না রাখিতে জাতি
কাড়িয়া হাতের তাঁত নিল ম্যাঞ্চেষ্টার!
মাথায় মারিয়া বাড়ি, হাতুড়ি নিয়াছে কাড়ি
সেফিল্ডের রজাস্‌সন—
দরজী খলিফা যত সিঙ্গার করিল হত,
কাঁসারি কাচের স্রোতে, ভিক্ষা করে পথে পথে
গৌরাঙ্গ করঙ্গ দিছে হাতে তুলে তার!
হাহাকারে কাঁদে যত কামার কুমার।

*　　*　　*

গিয়াছে বাণিজ্য-শিল্প—কৃষি যায় যায়,

*　　*　　*

যত বেটা গাঁট-কাটা, বুকে * * চিহ্ন আঁটা,
চাষার আশার ধন লুটে নিয়ে যায়।
দুর্ভিক্ষে ভারত মরে　…　…
কত ট্যাক্স পদে পদে, কত নিল গাঁজা মদে,

এই—আমাদের দাস কবির—সরস্বতী পূজা!

আর তাঁর প্রার্থনা—

"পরাণ ভরিয়া দাও প্রতিজ্ঞা অটল।"
যত্ন চেষ্টা একাগ্রতা　…　…
দেও স্বজাতির দুঃখে—দেও চক্ষেজল!
…　…　স্বার্থভুলে　…
করিব দেশের সেবা দেও বক্ষে বল।
হইল ভারত ভূমি দেহ আত্মা মন।"

তাই কবি দেশে সুসন্তান চাহিয়া নারী জাতিকে কহিতেছেন—

পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারি!
সূর্য্য যেমন পুরুষশ্রেষ্ঠ ভুবন উজ্জ্বলকারী।
দীনতা-হীনতা পীড়ন রোগ পাপহারী।

*　　*　　*

বরুণ যেমন পুরুষশ্রেষ্ঠ বিশ্ব প্লাবনকারী,
পাদুকা পিষ্ট চরণ ঘৃষ্ট ভিখারী অনাহারী
অগ্নি যেমন সর্ব্বগত
তপ্তরক্তে ক্ষিপ্ত করে যে শোণিতবাহিনী নাড়ী।

ইহাই কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের আজন্মের সহচারিণী—মানসী!

তাঁহার আরো কত কবিতা যে নব্যভারত, সৌরভ, নারায়ণ, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিকের পৃষ্ঠায় বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার সংখ্যাও অল্প নহে। কে সেই "গোবিন্দ চন্দ্রিকার" পঙ্কোদ্ধার করিবে—অথবা কেহ করিবেকি না—তাহাইবা কে জানে?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গোবিন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা।

(১) সেক্সপীর ও গোবিন্দদাস।

আমরা যখন কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র, তখন অধ্যাপক ৺ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় আমাদের সেক্সপীর পড়াইতেন। তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সুযোগ উপস্থিত হইলেই তিনি অন্যান্য ভাষার কবিদিগের সহিত সেক্সপীরের তুলনা করিতেন। একদিন ক্লাসে অনুতপ্ত পত্নীর মৃত্যু সম্বাদে ম্যাকবেথের বুক ফাটিয়া যে শোকধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই পড়ান হইতেছিল। কুঞ্জবাবু সেদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন্‌ "ম্যাকবেথের ন্যায় পত্নীবিয়োগে আত্মাহারা আমাদের বাঙ্গালী কবি গোবিন্দ দাসও গাহিয়াছেন,—

"ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার,
প্রীতির প্রসন্ন মুখে,　লও সে উদার বুকে,
ভুলে যাই সংসারের ঘৃণা অত্যাচার;
দুঃখীরে করিতে স্নেহ,　জগতে নাহি যে কেহ,
কেবল তুমিই আছ প্রেম-পারাবার,
ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার।"

এই প্রসঙ্গে কুঞ্জবাবু আরও অনেক কথার অবতারণা করিয়া বলিলেন:— "সেক্সপীরের নাট্য-গুরু মার্লো কিংবা মিলটন ও গ্রের ন্যায় সেক্সপীর Scholar poet অর্থাৎ পণ্ডিত-কবি ছিলেন না। কিন্তু কবিত্বের হিসাবে তাঁহার আসন ইঁহাদের সকলের উপরে। কারণ তিনি ছিলেন নিছক স্বভাব কবি; অনেক মাজিয়া ঘসিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইয়া কোন কবিতা তিনি লিখেন নাই। উপেক্ষিত পল্লী-কবি গোবিন্দ দাসও ছিলেন তেমনি খাঁটি স্বভাব-কবি। তাঁহারও তেমন পাণ্ডিত্য ছিলনা—কিন্তু উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ছিল। মানুষের প্রাণের কথা—খাঁটি সরল সত্যকথা—অতি অনাড়ম্বর—প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়া পাঠকের প্রাণে সুপ্ত অনুভূতি জাগাইয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।"

এইরূপ নানা প্রসঙ্গে সেদিনকার ম্যাকবেথ পড়াইবার ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

দুই ঘণ্টা পর কুঞ্জবাবু আবার আমাদের অন্য ক্লাসে সেক্সপীরের টেম্পেষ্ট পড়াইতে গেলেন। তখন

ফার্ডিনেণ্ড ও মিরেণ্ডার পূর্ব্বরাগের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাসের নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগের কথা উঠিল। ফার্ডিনেণ্ড যেমন দেখিবা মাত্রই মিরেণ্ডাকে ভালবাসিয়া ফেলিল, কৃষ্ণও তেমনি রাধিকাকে আড়াল হইতে মুহূর্ত্তের তরে দেখিতে না দেখিতেই তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গেল! প্রেমোন্মাদ কৃষ্ণ বলিলেন—

তড়িৎ বরণী হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে,

* * *

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল,
সঙ্গের সঙ্গিনী কমল কামিনী
ততহি উদয় ভেল।

তারপর কুঞ্জবাবু চণ্ডিদাসের পদাবলীর সহিত গোবিন্দ দাসের

কই দেখিলাম আজি হৃদয়ের রাণী,
হৃদয়নন্দনে দেবি যে চরণ নিত্য সেবী,
কই দেখিলাম সেই চরণ দুখানি।

* * *

কই এলোমেলো চুল কই সে বকুল ফুল,
কই সে আকুল ভাষা—আধ আধ বাণী।

এই কবিতার তুলনা করিয়া বলিলেন, :— "ইহাদের উভয়ের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে"।

সেই দিনই কুঞ্জবাবুর নিকট ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের কথা বিশেষ ভাবে শুনিলাম। তাঁহার কবিতা পড়িবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কলিকাতার বন্ধুমহলে অনেক খুঁজিয়া গোবিন্দ দাসের একখানা পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পরে কুঞ্জবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বলিয়া দিলেন পুরাতন "নব্যভারতে" গোবিন্দ দাসের অনেক কবিতাই প্রকাশিত হইয়াছে"। কুঞ্জবাবুর নির্দ্দেশ মতে "নব্যভারত" সংগ্রহ করিয়া গোবিন্দ দাসের কবিতা পড়িয়াছি। এই খাঁটি বাঙ্গালী কবির কবিতা পড়িয়া বাস্তবিকই মনে হইয়াছিল—

"He feels deeply and sings feelingly"

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

(২) গোবিন্দ দর্শন।

গোবিন্দ দর্শন বল্‌তে কেউ যেন মনে না করেন, আমি শ্রীগোবিন্দের কথা বল্‌ছি। শ্রীগোবিন্দের কথাই বটে, তবে এ গোবিন্দ—কবি শ্রীগোবিন্দ।

ছেলে বেলা যখন কবিতা পড়্‌তেম তখন মনে হোতো কবিরা বুঝি আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন্। তাঁরা বোধ হয় ফুলের মধু খান, মেঘের বিছানায় ঘুমান। না জানি তাঁরা কেমন!

প্রায় ৩০ বছর আগের কথা, তখন কবিবর হেমচন্দ্রের যুগ, সে সময় কবি গোবিন্দ দাশের কবিতা প্রথম পড়ি "নব্যভারতে।" তাঁর সেই,—

"কার্ত্তিক তুমি কি সেই দেব সেনাপতি?

* * * *

কোথা সেই মালকচ্ছ সেবুঝি গয়াংগচ্ছ,
আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি ত্রিকচ্ছ বসতি!

* * * *

এ হেন "বাবুন্" বংশ একদিনে হলে ধ্বংস
তবে ঘুচে বাংলার এহেন দুর্গতি,
কার্ত্তিক তুমি কি সেই দেব সেনাপতি?"

আর;—

"সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র তেরশত সন,
এক পায় দুই পায় বসন্ত চলিয়া যায়
শ্যাম মমতায় মেখে বন উপবন।
তার সে বিদায় ভোজ মধু খায় রোজ রোজ,
ফুলের গেলাস্ ভরি মধুকরগণ!"

তারপর যখন গাঁয়ের ইস্কুল্ ছেড়ে কল্‌কাতায় পড়্‌তে এলেম, তখন বন্ধুর কাছে কবিবরের বই প্রথম দেখ্‌লেম—"ফুলরেণু।" সেই তরুণ যৌবনে "আম মাখা" বেশ ভাল লেগেছিল।

"আম মাখা থালা আর অধর-কমল,
কি দেখিয়া জিবে ওর্ আসিয়াছে জল?"

তার বেশ্ অনেক দিন মনে লেগেছিল। কল্‌কাতায় এসেই আমার প্রথম কবি-দর্শন, কবির সেরা ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথকে। মাঘোৎসবে এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের বাড়ী গিয়েছিলেম। সেবার—

"কূলে বসে আছি একূলা যেতেছে সময় বহিয়া"
এই গানটা হয়ে ছিল, মনে আছে।

তারপর গৌরীপুর এসে এক কবি পেলেম—যতীন্দ্রপ্রসাদকে। তাঁরসঙ্গে খুব মাখামাখি হয়ে গেল। এই আমার প্রথম একটা 'আস্ত' কবি ছোঁয়া।

একদিন বৈকালে বসে গোবিন্দ দাসের, "বাবা থাকুক আমার বিয়ে" কবিতাটা পড়্‌ছি, এমন সময় কবিবন্ধু যতীন্দ্রপ্রসাদ এসে হাজির। সঙ্গে একটী "ব্যোম্ ভোলা নাথ" গোছের ভদ্রলোক। লম্বা, কাল, কাঁচা-পাকা গঙ্গা-যমুনা গোঁপ। শাদা শার্ট গায়, একহাতায় বোতম, আর একটা হাত সুতো দিয়ে বাঁধা; গলার মাঝের বোতামটা উপরের ঘরে আঁটা। আমি বন্ধুবরকে দেখে বল্‌লেম, কবি গোবিন্দ দাসের 'বাবা থাকুক আমার বিয়ে' কবিতাটা পড়েছি, ভারি সুন্দর!"

তিনি বল্‌লেন;—"এই কবি গোবিন্দ দাস" আমি অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি নমস্কার কর্‌লেন। আমি প্রতি নমস্কার কর্‌তে ভুলে গেলাম। "এই কবি গোবিন্দ দাস! এই মানুষটার এত কবিত্ব! এত ছোট চোখে এত প্রতিভা! এযে নারিকেল ফল। বাইরে মোটেই মনে হয় না।

শুন্‌লেম কবি ঋণ-পীড়িত। জীবনের সায়াহ্ন দেখে অঋণী হয়ে মর্‌বার আকাঙ্ক্ষায় এসেছেন—উপকরণবন্তদের দ্বারে সাহয্যের প্রত্যাশায়।

ক'দিন দেখ্‌লেম কবি, কবিবরকে নিয়ে দিন নেই, রাত নেই খুব ছুটাছুটি কর্‌লেন। ফল কত দূর হোলো জানিনে।

কবিবর যে কয়দিন ছিলেন, রোজই সকালে সন্ধ্যায় যেতাম তার কাছে। সম্ভ্রম ও গৌরবের সঙ্গে দাস কবির সঙ্গে মেলামেশা করে খুব পুলক পেতাম।

একদিন মধ্যাহ্নে বাসায় ফির্‌ছি, দেখি কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ কবিবরের কর্ণে সন্তর্পণে অপরাজিতা পরিয়ে দিচ্ছেন, ফুল নয়, লতা। কবিবরের মাথা ধরেছে, তার টোটকা; কবি, কবির কাণে পরিয়ে দিচ্ছেন; ফুল না হওয়ায় সে দৃশ্যটা নেহাৎ গদ্যময় হয়ে ছিল।

একদিন দেখি—যতীন্দ্রপ্রসাদের পিতাঠাকুর মহাশয় কতকগুলি নোট নিয়ে দাস কবিকে সাধ্‌ছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ সকাতরে বল্‌ছেন "আপনি আমার আত্ম সম্মানে আঘাৎ কর্‌তে আদেশ কর্‌বেন না"।

ব্যাপার কি? শুনলেম— * * *

শুনলেম, কবির জীবনে এটা নূতন নয়, আর একবার বাংলার এক মহারাজের কাছে গেছলেন, তিনি দেখা কর্‌লেন না, তাঁর কর্ম্মচারী ৫০৲ টাকা দেওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ নোটখানা দলামোচা করে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

শুনে সম্ভ্রমে আমার মাথা নত হয়ে এল! আত্ম গৌরব অটুট্ রাখবার জন্য জানিনা কজন এমন ত্যাগ কর্‌তে পারেন! এমন কজন ব্রাহ্মণ আছেন, এই দরিদ্র দাস কবির সঙ্গে যাঁদের তুলনা হয়?

আবার দেখেছি শ্রদ্ধা করে দেওয়া সাধারণের এক টাকাও মাথায় ছুঁইয়ে বলেছেন "এই আমার লাখ টাকা"।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।"

কদিন পরে কবি চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে শুন্‌লেম, দাশ কবি পীড়িত হয়ে ঢাকায় কার বাসায় আছেন; শুনে মনে হলো, লোকটার কবি জীবন আগাগোড়াই মিল হয়েছে। কবি জীবনের প্রথম অঙ্ক হচ্ছে, "যে সেবিবে তব পদ সেই সে দরিদ্র হবে"; শেষ অঙ্ক হলো, পীড়িত হয়ে পরের গলগ্রহ থাকা, অথবা "দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ"।

পরে শুন্‌লেম, কবি গোবিন্দ দাস আর ইহলোকে নাই।

শেষে একদিন শুন্‌লেম, দাস কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র এসেছেন—পিতার শ্রাদ্ধের সাহায্য প্রার্থী হয়ে। কবি যে'বার যাঁর দান নেন নি, তিনি এবার কবি পুত্রকে ২৫৲ পঁচিশ টাকা সাহায্য করেছেন। কবি-পুত্রের সাহায্য প্রাপ্তির সহায়তা করে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন।

হায়, কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের মন তাঁকে জান্‌তে দিলে না, এতে যতীন্দ্র প্রসাদ যতটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, মৃত কবির আত্মা তার চেয়ে অনেকখানি আত্মাবমাননা পেয়েছেন!

এই হোলো আমার গোবিন্দ-দর্শন।

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত ভিষক্‌শাস্ত্রী।

(৩) গোবিন্দ কথা।

কবি গোবিন্দ দাস পূর্ব্ববঙ্গের কবি এবং ময়মনসিংহের সারস্বত কবি হইলেও তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ কলিকাতা 'নব্যভারত' আফিসে। কবি 'নব্যভারতের' একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। আমিও মাঝে মাঝে নব্যভারতে লিখিতাম।

ইহার পর তাঁহার সহিত ময়মনসিংহ দেবনিবাসে অনেক দিন সাক্ষাৎ। তিনি সেখানে থাকিয়া স্বর্গীয় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট "আর্য্যদর্শন" সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের স্থাপিত স্থানীয় আর্য্য লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য করিতেন। আর্য্য লাইব্রেরী ছিল তখন এই স্থানের সাধারণ পাঠাগার।

হাসপাতালে কবি গোবিন্দ দাস।

একদিন প্রভাতে নব্যভারত সম্পাদক ৺ দেবীবাবুর ওখানে বসিয়া আছি, কবি তখন আমার পরিচয় পাইয়া আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। আমি সেদিন আমার সুপ্রভাত মনে করিলাম।

৺ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্থান পরিত্যাগের পর আর্য্য লাইব্রেরী উঠিয়া যায়, তখন কবির পুনরায় দুরবস্থা উপস্থিত হয়। তখন ৺ হরচন্দ্র চৌধুরীর "চারুবার্ত্তা" ময়মনসিংহ হইতে চলিতেছিল; তিনি গোবিন্দ দাসকে

চক্রবর্ত্তীর ম্যানেজার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ... ...

* * *

গোবিন্দ বাবুর শোচনীয় অবস্থা শুনিয়া মিটফোর্ড হসপিটেলে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সঙ্গেছিল "সৌরভ" সম্পাদক শ্রীমান কেদারনাথ মজুমদার। হস্পিটালের সম্মুখের বিশাল হলেই গোবিন্দ বাবুর শয্যা। হলে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। গিয়া দেখি, গোবিন্দ বাবু তাঁহার ক্ষত ও ব্যথাযুক্ত পা খানি উপরে রাখিয়া একটা কি লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া কলম দোয়াত সরাইয়া রাখিলেন। জানিলাম—হস্পিটালে একজন বড় রাজপুরুষ আসিবেন, তাই হাস্পাতালের কর্ত্তৃপক্ষ দাস কবিকে একটী অভিনন্দন সঙ্গীত রচনা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দাস কবি বলিলেন, "এইরূপ নিরর্থক প্রশংসা গীতি আমার কলমে আসে না; অথচ ডাক্তার সাহেব অনুরোধ করিতেছেন—তিনি আমার একা থাকিবার জন্য এবং নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার জন্য প্রকাণ্ড হল ছাড়িয়া দিয়াছেন; আমার সুখ সুবিধার জন্য যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করেন নাই ... তাহার অনুরোধ না রক্ষাকরাও অকৃতজ্ঞতা।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজকার ডাইরীতো এই; অন্যান্য দিন কি করেন? এইরূপ নিঃসঙ্গ চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকেন কি? লোক জন আইসে না কি?"

তিনি বলিলেন—"বড় না?"

আমরা—"তবে কি করেন?"

উত্তর—"একখানা গীতার অনুবাদ করিতেছি"।

* * *

সে দিন অনেকক্ষণ থাকিয়া এইরূপ অনেক কথাই হইয়াছিল। ইতিমধ্যেই দাস কবি তাঁহার ছেলেকে দৌড়াইয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই দেখিলাম, ছেলেটী এক থোঙ্গা ভরিয়া সন্দেশ লইয়া উপস্থিত।

আমরা তাঁহার এইরূপ ব্যবহারকে নিতান্ত অন্যায় ও অপমান জনক বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম। তিনি হাসিমুখে তিরস্কার হজম করিয়া তাঁহার পুত্রকে মিষ্টান্ন পরিবেশন করিতে আদেশ করিলেন। নিরুপায় হইয়া আমরাও সেই অপমানই হজম করিতে বাধ্য হইলাম। বিদায় কালে একটী লৌকিকতার মুখবন্ধ করিয়া শ্রীমান সম্পাদক তাঁহাকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় হইয়া গেলেন। কবি মহা সুর-গোল বাদ্ধাইয়া দিলেন—আমিও মাত্র পকেটে হাত দিয়াছিলাম; তিনি আমার হাতে ধরিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং কেদার বাবুর দেওয়া নোটখানি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—"আমি আপনাদের চির দিনেরই পোষ্য, যখন প্রয়োজন হয়, তখন যাহা চাই, পাই। এখনতো আমার কোন অভাব নাই—মুক্তাগাছার অমরেন্দ্র বাবু ছেলেদের প্রতিপালন করিতেছেন; আমি সরকার হইতেই আহার পাইতেছি—ভগবান আছেন—মরিলে যেন এগুলি ভাত পায়, এই দেখিবেন ..."

* * *

আমি আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। অনেকের ধারণা কবি গোবিন্দ দাস "আত্মহত্যা" শীর্ষক যে কবিতা প্রথমে নব্যভারতে ও শেষ "প্রেম ও ফুলে" প্রকাশ করেন—তাহা তাঁহার নিজের স্ত্রীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিত। অনেকের বিশ্বাস ভাওয়ালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া শারদাসুন্দরী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। একথা ঠিক নহে। এই সহরের কেদারনাথ বসুর স্ত্রী ক্ষীরদাসুন্দরীর এইরূপ অত্যাচারে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ চিত্র দেখিয়া ও শুনিয়াই গোবিন্দ বাবু এই কবিতা লিখিয়াছিলেন। এই কবিতা লিখিত হওয়ার সময় গোবিন্দ বাবু নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুলের পণ্ডিত—বোধ হয় তখনও শারদাসুন্দরীর মহাপ্রয়াণ হয় নাই। ক্ষীরোদের আত্মহত্যা এই নগরের—সে সময়ের, এক বিশেষ আলোচনার ও সমালোচনার বিষয় ছিল—গোবিন্দ বাবুর কবিতাটীর প্রতি চরণে সেই ঘটনাই মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ।

---

(৪) অদৃষ্টের ত্রি-ধারা।

যে সমাজে যত অধিক গুণগ্রাহী বিদ্যমান, সে সমাজে প্রতিভার পূজা তত বেশী। বিদ্যুৎ যেমন পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তিকে আকর্ষণ করে তেমনই জগতে গুণীই গুণকে আকর্ষণ করে, রত্নই রত্নের মহার্ঘত্ব জানে।

গুণীর সহিত গুণীর, প্রতিভার সহিত প্রতিভার এইরূপ সম্পর্ক চিরদিন বিদ্যমান।

সুতরাং কবির অনাদর ও উপেক্ষার জন্য কবিই যে একমাত্র দায়ী, তাহা নহে; অনেক স্থলে কবির চেয়ে কবির সমাজ ও দেশই অধিকতর দায়ী। সমাজের ও দেশবাসীর অনাদরে ও উপেক্ষাতেই কবি এবং তাঁহার কাব্য অনাদৃত হয়।

আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণের মধ্যে কবিবর মাইকেল, কান্তকবি রজনীকান্ত এবং সারস্বত কবি গোবিন্দ দাসের কবি-জীবনে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান; কিন্তু ইঁহারা বাঙ্গালার বিভিন্ন সমাজের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিকাশ লাভ করায় ইঁহাদের প্রতিভার বিকাশেও স্ব স্ব সমাজের প্রভাব জড়িত হইয়া আছে। স্ব স্ব সমাজের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতা এবং ভাব ও অভাব, তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের মহান্ পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। কবির ভবিষ্যত জীবনেও তাঁহার সমাজের ও দেশের প্রভাব অনেকটা বিদ্যমান। এই কবিত্রয়ের জীবনের সামান্য আলোচনাতেই উহা উত্তমরূপে পরিলক্ষিত হইবে।

দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব্ব—এই তিন বঙ্গের তিনটী কবিই অতি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।—হইলেও ইহাদের দুঃখের তারতম্য ছিল। অদৃষ্টের প্রভাবে ইহাদের দুঃখের ধারা ত্রি-ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। কেহ চরম দুঃখেও নিজকে পরম গৌরবান্বিত মনে করিয়া দুঃখেও সুখ অনুভব করিয়াছিলেন; কেহ আত্মদোষকে শোচনীয়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মনে করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিবার হেতু পাইয়াছিলেন; আবার কেহ কোনও দিকেই কোন সান্ত্বনার বা গৌরব অনুভবের হেতু পান নাই। অদৃষ্টের এই ত্রিধারার কারণ যে পারিপার্শ্বিক সমাজ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই।

মাইকেল।

মাইকেল আপনার অপরিণামদর্শিতার জন্য—উশৃঙ্খলতার জন্য তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মানুষ আপনার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, সমাজ তাহার কি করিবেন? কিন্তু মানুষের মত মানুষ যদি সমাজে থাকে, তবে সেই সমাজের অপকর্ম্মান্বিত জন, যত অপরাধেই অপরাধী হউক, সেই মানুষের মত মানুষের নিকট অপরাধী সর্ব্বদাই করুণার পাত্র। যে সমাজে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বাস করেন, মনোমোহন ঘোষের ন্যায় প্রতিভার সম্মানকারী ও গুণগ্রাহী যে সমাজের অলঙ্কার, সে সমাজের কবি, কর্ম্মফল ভোগ করিতে গেলেও তাঁহার জীবনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ নিশ্চয় ঘটিবে। মাইকেল দাতব্যচিকিৎসা লয়ে মরিলেও অনাহারে মরেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক বিষয় ছিল—অনেক পাত্রও ছিল। তিনি তাহা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কান্ত কবি।

উত্তরবঙ্গের কবিও উৎকট কষ্টের বোঝা বহিয়া হাসপাতালেই মানব লীলার অবসান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সমাজেও মানুষের মত মানুষের অস্তিত্বতা হেতু—সমাজে গুণগ্রাহী জন-গণের প্রাবল্য হেতু, কান্তকবি উৎকট রোগ ভোগ করিয়া অতি কষ্টে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেও তাঁহার সেই কষ্টেও নিজকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতে করিতে স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু শয্যার কণ্টকবিদ্ধ যাতনা মহাপ্রাণ শরৎকুমারের অমৃত-প্রলেপে ভুলিতে পারিয়াছিলেন। হাসপাতালের নিরাশ্রয়তা দানবীর কাসিমবাজারাধিপতির স্নেহ সম্ভাষণে ও কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ আপ্যায়নে ভুলিতে পারিয়াছিলেন।

কঠোর যাতনায় কবির প্রাণ বাহির হইয়াছিল বটে কিন্তু সেজন্য তিনি দুঃখ করেন নাই; বরং তাঁহার সেই অবস্থাটাকে তিনি পরম গৌরবেরই বিষয় মনে করিয়াছিলেন। এবং এই গৌরবের গর্ব্ব তিনি তাঁহার হাসপাতালের রোজনামচায় কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সারস্বত কবি।

আর পূর্ব্ববঙ্গের সারস্বত কবি গোবিন্দ দাসের অদৃষ্ট? একই দেশের কবি হইয়াও মাইকেল এবং কান্তকবি হইতে তাঁহার অদৃষ্ট ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। মৃত্যুর বিভীষিকা বা যম-যাতনা ধনী নির্ধন সকলেরই পক্ষে তুল্য হইলেও—সেই বিভীষিকা বা যম-যাতনার ভিতরও যে সান্ত্বনা আছে, পূর্ব্বোক্ত দুই কবির মৃত্যুর চিত্র ভাবিলে তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। হতভাগ্য কবি গোবিন্দ দাস সেরূপ সান্ত্বনার কথা স্বপ্নেও

ভাবিতে পারেন নাই। কেন তাঁহার ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছিল। কেন তাঁহার নিরাশ্রয় পুত্রেরা শ্মশান ক্ষেত্রে যাইয়া রামকৃষ্ণ মিসনের গুটীকয়েক সেবককেই শ্মশান বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন? পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় বিদ্যাসাগর ছিল না সত্য, মুনীন্দ্রচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত লোক না থাকিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লইয়া কি কোন সাহিত্যিক ছিলেন না?

* * *

কবি শুধু নিজেই উপেক্ষিত হইয়া যান নাই, তাঁহার কাব্যও উপেক্ষিত হইয়াছে। যেখানে কবি উপেক্ষিত হইয়া গিয়াছেন, সেখানে কাব্যের উপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু দাস কবির এই উপেক্ষার জন্য তিনি নিজে তত দায়ী নহেন, যত দায়ী তাঁহার সমাজ ও তাঁহার দেশ।

তিনি তাঁহার কাব্যে বাঙ্গালি জাতির যে বৈশিষ্ট্য যে জাতীয়তা প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন—নীলকণ্ঠের মত বিষ খাইয়া যে অমৃত পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন—বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালী সময়ে তাহা বুঝিতে পারে নাই। ... ...

তিনি ছিলেন—নিঃস্বপল্লীর নীরব সাধক। কবি Pope যেমন বলিয়া গিয়াছেন—

"Thus let me live unseen unknown
Thus unlamented let me die
Steal from the world and not a stone
Tell where I lie."

তাঁহার জীবনের ধারাও অনেকটা যেন এইরূপই ছিল। তাঁহার কাব্যে পল্লীবাসীর সরল প্রাণের সরল ভাবের সমাবেশ। পল্লীর অফুরন্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ পল্লীকবি, পল্লীর সরল ভাষায়, পল্লীগাথাই গাহিয়া গিয়াছেন।

যে জন্য আমাদের পল্লী উপেক্ষিত ও আনাদৃত, এই পল্লী কবির অনাদরেরও তাহাই অন্যতম কারণ। দেশবাসীর অমার্জ্জনীয় উপেক্ষা ও অনাদরেই বাঙ্গলার একমাত্র জাতীয় পল্লীকবি গোবিন্দ দাসের অমূল্য কাব্য "কুঙ্কুম" "কস্তুরী" "প্রসূন" "চন্দন" ও "বৈজয়ন্তী" অনাদৃত।

এই অনাদর ও উপেক্ষা লক্ষ্য করিয়াই কোন কবি বলিয়াছিলেন—

"বিরহ বিধুর মধুর কবি
এনেছেন "চন্দন" "কস্তুরী"
কাঙ্গাল কবি তাই বুঝি গো
নাম পান নাই যুগান্তরী।"

কবির দারিদ্র্য বা কবির স্পষ্টবাদিতা, রূঢ়ভাষিতা কিম্বা তাঁহার যশো-লিপ্সায় বৈরাগ্য—তাঁহার অনাদরের কারণ হইলেও দেশবাসীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষাই যে তাঁহার মূলে একথা তাঁহার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুর পর আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির প্রতি এই অযথা অবজ্ঞা আমাদের জাতীয় চরিত্র চিরদিন কলঙ্কিত ও মসিলিপ্ত করিয়া রাখিবে।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ এই মর্ম্মবাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

"থাকলে মানুষ কবির মৃত্যু হয় কি অনাহারে।
দুমুঠা ভাত সবাই দিত শাস্ত্র অনুসারে॥
এদের চেয়ে হাজং-গারো হাজার গুণে ভালো।
তাদের হৃদয় এদের মত নয়ত ... ..." ইত্যাদি।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—০০০—

(৫) অতীত স্মৃতি।

শ্রাবণ মাসের শেষ—মনসা পূজার দুই একদিন বাকী: ময়মনসিংহ ষ্টেসনে ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম। একটু পরেই কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়, আমারই সৌভাগ্য ক্রমে সেই কুঠরীতে উঠিলেন। আমার একখানা সংবাদ পত্র ছিল, তাহা বিছাইয়া বসিয়াছিলাম—তাহারই অর্দ্ধেকখানা কবিকে ছিড়িয়া দিলাম; তিনি বসিলেন।

* * * *

আমি গোবিন্দ বাবুর অতীত জীবনের কথা তুলিলাম: ট্রেন তখন কোন একটা ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি যে একদিন জয়দেবপুর হইতে পদব্রজে ময়মনসিংহ আসিয়াছিলেন, সেই কথাটী কহিলেন। গোবিন্দ বাবু গুছাইয়া গল্পটী বলিতে পারিলেন না। ... ...

জয়দেবপুর ছাড়িয়া ময়মনসিংহের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, একটী ছাতা, একখানা মোটা চাদর ও একটী ছেঁড়া জামা সম্বল করিয়া চলিলেন। এক রাত্রি কাটাইলেন গোশিঙ্গা গ্রামের নিকট এক কর্ম্মকার বাড়ীতে, দ্বিতীয়

রাত্রিতে অবস্থিতি করিয়া টেঙ্গাব গ্রামের ভূঞা বাড়ীতে। এই ভৌমিক মহাশয়েরা ব্রাহ্মণ এবং একান্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন। গোবিন্দ বাবু সন্ধ্যার সময় আসিয়া ভৌমিক মহাশয় গণের বাড়ী আতিথ্য যাচ্ঞা করিলেন। তাঁহারা অতিথিকে যেরূপ সাদরে গ্রহণ করেন তাঁহাকেও তেমনি ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। উঠানের প্রকাণ্ড রচনা ঘরে ফরাসের উপর শুইয়া তিনি তখনই ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি ১১ টার সময় ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহার আহারাদি করান হইল। গৃহস্থ বুঝিলেন ভদ্র লোকটী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন; তাই আদর করিয়া পরদিন তাঁহাকে রাখিয়াদিলেন। গোবিন্দ বাবু পরদিন কাণিহারী গ্রামে ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে অবস্থান করিলেন। ইঁহার সহিত রাস্তায় তাঁহার দেখা হইয়াছিল।

* * *

ট্রেন কাওরাইদ পৌঁছিলে আমি নামিয়া গেলাম।

তারপর একদিন দেখিলাম—আমার ছোট দাদা—শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রোদন করিতেছেন— বড় দাদার বড় মেয়েটা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঢাকা হইতে বড়দাদা চিঠি দিয়াছেন—"দারিদ্র্যের বজ্রাঘাতে বাংলার কবি, বাঙ্গালীর কবি—গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় গত পরশু রাত্রিতে দেবলোকে চলিয়া গিয়াছেন।…

চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিল—হায়! কবি ভাতের দুঃখে মরিলে কিন্তু যে তোমার "যাগ যজ্ঞ যে তোমার ধ্যান" তার কোল পাইলে না— এই দুঃখ…।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রী।

—o—

(৬) স্মরণে।

হে কবি! শরতের এমনি এক উদাস ভরা দিনে তুমি পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া গাঢ় নীলাকাশের কোন্ অলক্ষ্য-লোকে চলিয়া গিয়াছ। মৃত্যু যেমন অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে চিরদিন আসে, তেমনি সে তোমার কাছেও আসিয়াছিল; চুপি চুপি তোমাকে জানি না কোন্ যাদু মন্ত্রে ভুলাইয়া মহাপ্রস্থানের পথে আহ্বান করিল। তুমি চলিয়া গেলে! মর্ত্ত্যলোকবাসিনী বীণাপাণির হাতের বীণাখানি খসিয়া পড়িল! বীণা বাজিতে বাজিতে খসিয়া গেল—সে বীণা চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া রহিল। শ্মশানের বুকের মৃত-দেহ ভস্ম তোমার বুড়ীগঙ্গার জলে কোথায় ভাসিয়া গেল! সেদিন স্বর্গে সারদাসুন্দরী—তোমাকে বরণ করিবার জন্য বরণ-ডালা লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শত কবি তোমার বান্দনা-গীতি গাহিয়া গোবিন্দের পাদ পদ্মে গোবিন্দকে চির-আশ্রয় দান করিয়াছিল।

হে কবি! সংসারের শোক দুঃখ নির্য্যাতনে চির-নিস্পৃহ তুমি—বুকে বজ্র-যাতনা লইয়া চলিয়াগিয়াছ। বনান্তরালে বিকশিত পুষ্পের ন্যায় বনভূমে সুরভি বিস্তার করিয়া চলিয়াগিয়াছ, কেহ জানিল না—কেহ বুঝিল না—সে বুকে কি স্নেহ মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইত। কেহ বুঝিল না—তোমার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ভিতর কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা—কি গভীর বেদনা—কি স্বদেশ হিতৈষণা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল! একদিন যাহা কেহ বোঝে নাই—একদিন তাহা বুঝিবে। সুরের ঝঙ্কার তোমার যুগে যুগে অমর-বীণার অমর-তানে জগদ্বাসীকে মুগ্ধ করিবে। মৃত্যু তোমাকে অমর করিয়াছে, সংসারের দুঃখ নির্য্যাতন তোমাকে নীল কণ্ঠের ন্যায় বিষহারী করিয়াছে। তুমি পূর্ব্ববাঙ্গালার দীপ্ত তপন—তোমার জ্যোতিঃ দিকে দিকে উজ্জ্বল আলোক মালায় উদ্ভাসিত করিবে। সেদিন দূরে নহে, নিকটে। সে শুভ প্রভাত আলোকোজ্জ্বল।

হে মরণজয়ী কবি! আজ অমর লোক হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর! আমাদিগকে মানুষ হইবার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছ, সে আদর্শ পথে চলিতে শিক্ষা দাও। মরণের পরে যে অক্ষয় আনন্দ পূর্ণ জীবন আছে, সে জীবন লাভের আদর্শ পথে চলিতে অনু-প্রাণিত কর।

বাঙ্গালী! অভিশপ্ত বাঙ্গালী! আজ কবির মৃত্যু দিন স্মরণে দুই ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিয়া পাপ দূর কর, অনুশোচনার লাঘব কর। কবির স্মৃতি-পূজায় ব্রতী হইয়া জাতীয় জীবনের নব উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার শক্তি লাভ কর।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

"কিশোরী" দর্শনে।

বিরহের কবি গোবিন্দ দাস মহাশয়কে "মিলনের" "গান" লিখিতে দেখিয়া স্বর্গীয় কবি মনোমোহন সেন এই কবিতাটী লিখিয়া দাস কবিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাস-কবি মনোমোহনের মৃত্যুর পর কবিতাটী আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সৌঃ সঃ

একি কবি! কোথা তব বিষাদের সুর?
প্রাণের উদাত্ত নাদ চিলাই-বেলায়?
এ যে মিলনের গান নেশা ভরপুর!
শ্রান্তি কি হয়েছে বড় শব-সাধনায়?
কোথা সে মোহন বীণ বাজিত যাহাতে
প্রেম-পুরবীর তান বিরহ-সন্ধ্যায়?
কে তার সেখেছে তার প্রভাতী ললিতে?
অবসানে আরম্ভের ধ্বনি শোনা যায়!
ধুয়েছ শ্মশান-ভস্ম কোন নদী জলে?
বৈরাগ্য-তিলক-রেখা ফেলেছ মুছিয়া?
কিশোরী-কুসুম লয়ে পুষ্প-শয্যা-কোলে,
এ কেমন রাস-লীলা যামিনী ব্যাপিয়া!
সেই যে করেতে লয়ে দিক-দরশন
একটী নক্ষত্র চাহি ছেড়েছিলে তরি
সহসা কি তীরে, বল, করি বিলোকন
ফিরিয়াছ হে নাবিক, বুঝিতে না পারি!
পুনরায় আচমন প্রণয়-পূজায়!
পুরাতন চণ্ডীপাঠ শয়ন-মণ্ডপে!
কচি-হাতে কাটা-আম দাও রসনায়
বিশুষ্ক আছিল যাহা বিরহের তাপে।
আজি পড়ে "অজ" "অগ", আমি জানি কালি—
সে লিখিবে "প্রিয় স্বামী" নাহিক সংশয়;
সোহাগে উঠিবে ফুটি গোলাবের কলি
ঘোমটা-পল্লবে যাহা আজো ঢাকা রয়।
প্রবীণে আবার কবি সেজেছ নবীন
মনির মুখানি কিন্তু এখনো মলিন।

শ্রীমনোমোহন সেন।

২০শে আষাঢ় ১৩০০ সাল।

কবি গোবিন্দ দাস ও তাঁহার কবি-প্রতিভার পারিপার্শ্বিক অন্তরায়।

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গদেশে যে কয়জন ক্ষমতাশালী কবির আবির্ভাব হইয়াছে, স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার কবিতার একটী বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাহা আধুনিক যুগের স্বভাব-সিদ্ধ-পাণ্ডিত্য ভাব হইতে সম্পূর্ণরূপ আত্মরক্ষা করিয়া, নিছক বাংলার ভাবৈশ্বর্য্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কবির বিরুদ্ধবাদিগণও একথা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

অনেকে বলেন যে তিনি ইংরাজী ভাষাতে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই এই পদ্ধতিটী তাঁহার সহজ লভ্য হইয়াছিল। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, এই হেতুবাদ সর্ব্বতোভাবে সমীচীন নহে। জাতীয় সাহিত্য ও সমাজ কারণ পরম্পরায় বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া পড়িলে, ঐ সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে স্বভাবতঃই সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়ে। ইহা যেমন সামাজিক আচার ব্যবহারের দিক দিয়া, তেমন সাহিত্যের দিক দিয়া সমভাবে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। আধুনিক যুগের ইংরাজী ভাষাতে অকৃতবিদ্য পুরুষ ও মহিলা কবিগণের রচনার প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই ভ্রম দূর হইতে পারে। ফলতঃ কবি গোবিন্দ দাস স্বভাব কবি ছিলেন এবং তাঁহার সহজাত ভাব ও রীতিকে তিনি পূর্ব্বাপর সমভাবে আঁকরিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। অপর কবির ভাব-ভাণ্ডারে সিঁদকাঠি বসাইয়া অনুকরণ বা অপহরণ তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল।

বাঙ্গালীর বৈদেশিক ভাবাপন্নতাকে তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াও তাহা মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচ্ছলে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

কবি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

সে পড়েনা ক্লিয়োপেট্রা,
মেরী-রাণী এট্সেট্রা,
ফিটিনে চড়িয়া সে না ইডেনে বেড়ায়।
যায়না বাগান পার্টি,
ভেরি আগ্‌লি, ভেরি ডার্টি,
ইয়ারের ডিয়ারের চিয়ারে ডরায়। ইত্যাদি।

সে দিন "প্রবাসী" পত্রের অন্যতম সমালোচক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ কবির জীবনী-গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"গোবিন্দ দাসের গ্রন্থগুলি আমি মরোক্কো বাইণ্ডিং করাইয়া আলমারীতে সাজাইয়া রাখিয়াছি।" কবি গোবিন্দ দাসের কবিতা সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণাও ঐরূপ উচ্চ। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই পাঠ করিয়াছি, বহু কবিতা অদ্যাপি স্মৃতির সহিত বিরাজিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কবিতা গুলির ছত্রে ছত্রে এমন একটা প্রাণারাম হিল্লোল-লীলা বহিয়া চলিয়াছে যে, আবৃত্তি মাত্র পাঠকের চিত্ত সেই লীলা-ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। আর আবৃত্তি মাত্রই উহার ভাব বা উদ্দেশ্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায় এই হিসাবে আধুনিক গীতি কাব্যকারদিগের মধ্যে কবি গোবিন্দ দাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যকার স্বদেশ বাসীর নিকট হইতে যথোপযুক্ত সম্মান ও সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই; কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অন্তরায় তাঁহার যশঃরশ্মিকে অল্লাধিক পরিমাণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কবি গোবিন্দ দাসের অধিকাংশ কবিতাই স্বীয় পারি-বারিক সুখ দুঃখের সহিত বিজড়িত। এই হিসাবে তাঁহার কবিতাতে সাহিত্যিক সার্ব্বজনীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কোন সমালোচক এই শ্রেণীর রচনার সাফল্য বিষয়ে সন্দিহান। আমাদের বিশ্বাস, কবির সুললিত শব্দ-মন্ত্র-কুহক তাঁহার রচণার সেই দৈন্য বহু পরিমাণে স্খালন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তথাপি বিষয়টী অনুধাবন যোগ্য।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া সুরুচির বিকাশ চিরকালই বাঞ্ছনীয় কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে এ নীতি সর্ব্বত্র সংরক্ষিত হয় নাই। সম্ভবতঃ তদানীন্তন সমাজ ইহা দোষাবহ বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে রুচি বিগর্হিত রচনা নিতান্তই নিন্দিত; এমন কি অপাঠ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি গোবিন্দ দাসের যৌবন বয়সের অনেকগুলি রচনাতে তিনি সুরুচির সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত তিনি সাহিত্য সমাজে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নিন্দার ভাজন হইয়াছেন। মনে পরে একবার সাহিত্য সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় কবির একটী কুরুচি-পূর্ণ কবিতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত বা সংযত না হইয়া নব্যভারত পত্রে একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতাতে উহার রীতিমত 'উত্তোর' গাহিয়াছিলেন। সেই কবিতাটীর শেষ অংশটী এইরূপ—

......"ওগো প্রিয়া ভয় কর দূর;
রুচি-ফোবিয়ার আমি ফরাসী পাস্তুর।"

সুধিগণের বচন মানিয়া চলিলে, অপ্রিয় সত্য গোপন করিয়া রাখিতে হয়; কিন্তু ঐ প্রাকার সত্য গুপ্তিটা সকলের ধাতে সহিয়া উঠে না। কবি গোবিন্দ দাস সেই ধাতের লোক ছিলেন। তিনি অপ্রিয় সত্যকে অধিকতর অপ্রিয় করিয়া শুনাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। ইহার ফলে দেশবাসী জনসাধারণ তাঁহার প্রতি তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একটী কবিতাতে সমগ্র দেশ-বাসীকে উল্লেখ করিয়া কিরূপ তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছিলেন তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নিম্নে ঐ কবিতার কতক অংশ উদ্ধৃত হইল।

"সব বেটা ঘুষ খোর,
সব বেটা জুয়াচোর,
ধ্বজাধারী আর্কফলা যার কাছে যাই!
তু করিতে মেলে হাত,
হেন পায়ে ধরা জাত,
এমন বিবেক-শূন্য দেশের বালাই!
কুকুরের চেয়ে নীচু—
যদি আর থাকে কিছু,
আমি যে এদেরে বলি ঘৃণা করি তাই। ইত্যাদি।

"বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়—" এই কবিতাটাতেও তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জীয়ন্তে সপিণ্ডি করণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন কবি পূর্ব্ববঙ্গে জন্ম গ্রহণ না করিয়া পশ্চিম বঙ্গে জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যক্ষেত্রে সমধিক প্রচারিত হইত। কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। পশ্চিম বঙ্গের সহিত পূর্ব্ব বঙ্গের একটা সাহিত্যিক দলাদলি বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য সমাজ

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সাহিত্যিকগণের প্রতিভা স্বীকার করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। কথাটি অপ্রিয় হইলেও অসত্য নহে। বাঙ্গাল যে মানুষ নয়—এ ধারণাটা তাঁহাদের মন হইতে কবে যে বিলুপ্ত হইবে, তাহা দেশমাতৃকার মন্দিরের সাম্য-মন্ত্রের পূজারীগণ পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে শুনাইয়া দিলে তাঁহারা আশ্বস্ত হইতে পারেন।

কবি আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণপাত করিয়াছেন। কবি জীবনে দারিদ্র্যটা বিধাতার এক নির্ম্মম অভিশাপ। অথচ দরিদ্রকে সম্মানের চক্ষে দেখাটাও মানব সমাজের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এমতাবস্থায় কবির দারিদ্র্য যে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান লাভের পরিপন্থী ছিল, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমাদের বিশ্বাস উল্লিখিত পারিপার্শ্বিক অন্তরায়গুলি বর্ত্তমান না থাকিলে, কবি গোবিন্দ দাস জীবিতকালেই দেশবাসীর নিকট হইতে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন। মৃত্যুর পরেও যে—কেহ তাঁহার চিতায় মঠ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন না, তাহাও তিনি জীবদ্দশায়ই জানিয়া গিয়াছিলেন। জীবিতাবস্থায় সম্মান লাভের সৌভাগ্য অনেক কবির ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। তবে কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিপুলা। সুদূর ভবিষ্যতের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে কবি গোবিন্দ দাস যে এক অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবেন তাহা নিঃসংশয়িতরূপে সত্য।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত।

গোবিন্দ-সম্ভাষণ।

বঙ্গ-কবি কাননের কল-কণ্ঠ-পিক
হে গোবিন্দ! নন্দনের মন্দার গহন
মুখরিছ আজি কিহে তেমনি নির্ভীক?
অমরী চামর ধরি করিছে হরণ
তোমারি কূজন-ক্লান্তি? ক্ষুধার দহন
সুধা পানে নির্ব্বাপিত? হে কাঙ্গাল কবি
তোমারি বাঞ্ছিত, তব স্বপনের ছবি
পাইয়াছ দেবপুর? যেথানে সদাই
চিদানন্দে মন্দাকিনী বহিছে চিলাই,
পারিজাতে পরিণত গজারি-গহন?
মিটিয়াছে সারদার সপত্নী কলহ,
প্রিয়া প্রেমদার সনে? অবজ্ঞা অসহ
এতদিনে ঘুচিয়াছে, মুছিয়াছে সবি?
হে বরেণ্য বাসবের প্রিয়-সভা কবি!

শ্রীগিরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

দাস কবির কয়েকখানা চিঠি।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে আমরা জানিয়াছিলাম—সর্ব্ব বিষয়ে। তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে যত জানিতে না পারিয়াছিলাম, তাঁহার এক একখানা চিঠি পড়িয়া তাঁহাকে তত অধিক করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম এবং এইরূপে তাঁহাকে আমরা চিনিয়াছিলাম এবং তিনিও আমাদিগকে আপনার ভাবিয়া আমাদিগের নিকট বুক চিড়িরা নিজ দুঃখ দৈন্য বিবৃত করিয়াছিলেন। এস্থলে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত আত্ম দৈন্য-জ্ঞাপক কয়েকখানা চিঠিই প্রকাশ করিলাম মাত্র।

"১৫ই ভাদ্র, ১৩২১ সন
পোঃ জয়দেবপুর।

সুহৃদ্বরেষু—আপনার পত্রখানা পাইলাম। আজ ১১ দিন যাবৎ আমি জ্বরে শয্যাগত কাতর। … … …

আমার শুশ্রুষার জন্য ঢাকা হইতে বড় ছেলেটীকে আনাইয়াছিলাম, যে দিন সে আসিয়াছে, তারপর দিন হইতে তাহারও জ্বর। সুধাসমুদ্র খাইয়া পরশু তাহার জ্বর ছাড়িয়াছে। আমার কুইনাইন সেবনে আরো বাড়িয়াছে। এই কয় দিনের চেষ্টায় একজন ডাক্তার আনাইয়া দেখাইতে পারিলাম না। ভিজিট পাইবেনা, ঔষধের মূল্য পাইবেনা, বোধ হয় সেই ভয়েই আসেনা। ২।৩ দিন চেষ্টা করিয়া শেষে লিখিয়া দিয়াছিলাম যে আসা মাত্র ভিজিটের টাকা দিব কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিল না। অথচ মৌখিক বন্ধুতা খুব দেখাইয়াছে। আজ ১১ দিন মধ্যে ভিজিট দিতে চাহিয়াও একজন ডাক্তার দেখাইতে পারিলাম না। ইহা বিশ্বাস করিবেন কি? আমার অদৃষ্ট এমনি। ওদিকে মেজো ছেলেটী হেমেন্দ্রের ওখানে আছে। বৎসরেক যাবৎ তাহার বিছানা নাই। অনেক পত্র লিখিয়াছে, টাকার সুবিধা করিতে না পারায় বিছানা তৈয়ার করিয়া দিতে পারি নাই। বাড়ী হইতে একখানা কাথা ও একটী বালিশ আনাইয়াছিলাম এবং ১৸৵০ আনা দিয়া ঢাকা হইতে একখানা মশারী কিনিয়া আনাইয়াছিলাম; শীঘ্রই গিয়া দিয়া আসিব ভাবিয়াছিলাম, জ্বর হওয়ায় তাহা পারি নাই। সে রাগ করিয়াছে, পত্র লেখে না; তাহাকে দেখিবেন। যে জ্বরের ঠেলায় পড়িয়াছি, এই পত্রই শেষ কিনা তার ঠিক নাই। নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব স্থানে

পড়িয়াছি। আজ আবার ডাক্তারকে খবর দিয়াছি। আর কষ্ট সহিতে পারি না। শ্রীযুক্ত রামনাথ বাবুকে আমার প্রণাম জানাইবেন! স্নেহলতার কবিতাটা বড় লম্বা হইয়াছে সৌরভে মানাইবে না।"

কবি তাঁহার আর একটী বিপদের কথা নিম্নলিখিত চিঠি খানাতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"২৯শে কার্ত্তিক, ১৩২৪
পোঃ ব্রাহ্মণগাঁ, ঢাকা।

আমি বরুণকে লইয়া যে বিপদে পড়িয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই আপনি জানেন। লক্ষ্মী পূজার পর দিন ভোলার (স্ত্রীর) দ্বিতীয় বিবাহের দিন ধার্য্য ছিল। সেই দিন বাজার হইতে আসিবার পরই (বিবাহের পূর্ব্বে) ময়মনসিংহের সি, আই, ডির সাব-ইন্‌সপেক্টর আসিয়া বরুণকে, আমাকে ও সত্যেন্দ্রকে ধরিয়া লৌহজঙ্গ থানায় লইয়া যায়। বাড়ীতে কাঁদা-কাটি সুরু হইল। বিবাহের আয়োজন—কে কি করিবে? অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন। যাহা হউক আমাদিগকে যখন থানায় লইয়া গেল, তখন উক্ত সব-ইন্‌সপেক্টরের নিকট তাঁহার ইন্‌সপেক্টরের টেলিগ্রাম আসিল যে ইন্‌সপেক্টরই আসিবেন। ইহাঁতে ঐ দিন আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার পর দিন সকালে আবার থানায় যাইতে বলিয়া দিল। তদানুসারে সকালে আবার থানায় যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় ইন্‌স্পেক্টর আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাকে ও বরুণকে ডাকইলেন ও বরুণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বরুণ সে সকল কথা জানেনা বলায়, তাহাকে নানারূপ তোষাইতে ও ফুসলাইতে লাগিলেন। বরুণ বলিল আমাকে কি মিথ্যা কথা বলিতে বলেন? ইহাতে ইন্‌সপেক্টর অত্যন্ত রাগিয়া নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিলেন ও ধমকাইতে লাগিলেন। আর আমাকে বলিলেন যে আমি ৭ দিনের সময় দিয়া যাইতেছি, ইহার মধ্যে ইহাকে ঠিক করিয়া দিন্। ৭ দিন পরে আমি আবার আসিব যদি সে সময় এ ঠিক না হয়, তবে ধরিয়া নিয়া যাহা করিতে হয় করিব ও ইণ্টার্ণ করিব।

সেই হইতে কি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় দিন কাটাইতেছি যে তাহা বলিবার নহে। কোন সময় আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে, সর্ব্বদা সেই কথা মনে করিয়া বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছে। জয়দেবপুরে যাওয়ার বিশেষ ঠেকা ছিল, মুক্তাগাছা যাওয়ার অতি আবশ্যক, তথাপি বাড়ী বসিয়া কেবল অমঙ্গলের দিন গণিতেছি। ভগবান আমার অদৃষ্টে কত অশান্তি লিখিয়াছেন, তাহা আর ফুরায় না। এ যেন রক্ত-বীজের মত নিত্য নূতন হইয়া একে শত সহস্র হইয়া উদ্ভব হইতেছে। মনে হয় মানুষের মত বিধাতারও আমার সঙ্গে আড়ি।"

কবি তাঁহার শ্যালিকা পুত্র সত্যেন্দ্রকে আমাদের বাসায় রাখিয়াছিলেন; তাহার নিজ পুত্র বরুণ থাকিত 'দেবনিবাসে' 'দেবনিবাসে পুলিসের খানাতোল্লাসী হওয়ায় সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং নিরাশ্রয় হয়। পুলিসের ভয়ে কেহ তাহাকে স্থান দিতে স্বীকার করেনা; সেও সুতরাং লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া দলে ঘুরিতে সুযোগ পায়। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া গোবিন্দ বাবু লিখিয়াছিলেন—

১৮ই মাঘ ১৩২৪
৪৭নং সা সাহেবের লেন, নারিন্দা, ঢাকা।

সুহৃদ্বরেষু—বরুণকে ঢাকা রাখিয়া পড়াইবার জন্য এত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই হইয়া উঠিল না। কোন স্থানে উহার খাওয়ার জোগাড় করিতে পারিলাম না। অগত্যা আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। বাবু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট শুনিলাম আপনি এণ্ট্রেন্স স্কুল খুলিয়াছেন; অনুগ্রহ করিয়া আপনার স্কুলে ক্লাস ৬তে বরুণের নাম ভর্ত্তি করিয়া রাখিবেন, এবং উহার থাকার ও খাওয়ার একটা যোগাড় করিয়া দিবেন। আপনি দয়া না করিলে আর উপায় নাই।…………"

ইহার কিছুদিন পরে ঢাকা গিয়াছিলাম। গিয়াই শুনিলাম গোবিন্দ বাবু আমাদের পার্শ্বের বাড়ীতেই আছেন; এবং এইমাত্র আমাদের খোজ লইয়া গিয়াছেন। বিশ্রাম না করিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম; তিনিও প্রথমেই বরুণের কথা তুলিলেন—"কি করিয়াছেন বরুণের জন্য?" আমি বলিলাম—"আমি ঢাকাতেই চেষ্টা করিয়া বরুণের স্থান করিয়া দিব। চলুন আমার সঙ্গে, দেখি………"

তিনি ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিলেন—"ঢাকায় অসম্ভব—আমার ছেলের স্থান ঢাকায় হইবে না। সে দুরাশা………"

আমি আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"ঢাকায়ও ময়মনসিংহের লোক আছে—সে ভার আমার উপর। আপনি চলুন—কেবল বসিয়া থাকিবেন—যাহা করিতে হয় আমি করিব।"

কবিকে লইয়া তখনই ময়মনসিংহের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর নারান্দিয়া ভবনে উপস্থিত হইলাম। অমরেন্দ্র বাবু ও মনোজেন্দ্র বাবু উভয় ভ্রাতাই তখন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সাদর আপ্যায়নে আমরা পরিগৃহীত হইলাম। প্রচুর জল-যোগের ব্যবস্থা হইল। ......বরুণেরও আশ্রয় স্থান হইয়া গেল। কবি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইয়া যেন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

* * * *

গোবিন্দ বাবুর সামান্য কিছু টাকা ছিল। ঐ টাকাগুলি তিনি তাঁহার এক সরিকের নিকট হইতে সম্পত্তি রেহেণাবদ্ধ রাখিয়া নিরাপদে রাখিয়াছিলেন। নিম্নের চিঠি খানাতে তাহার পরিচয় আছে।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৪

৪৭নং সা সাহেবের লেন, নারিন্দিয়া

পরম্পর শুনিতে পাইলাম কেদার বাবু বাড়ী গিয়াছেন। আমার পূর্ব্বের মোকদ্দমার (ঢাকা ৮র্থ সবজজ আদালত ১৯১৬ সনের ৪১নং) ডিক্রীজারীর নোটীশ সূর্য্যভূষণ গুহের নামে পিয়ারপুর বাজারের ঠিকানায় জারির জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ময়মনসিংহে গিয়াছে। গতবার আপনি দয়া করিয়া জারি করিয়া দিয়াছেন, এবারও আপনি দয়া না করিলে উপায় নাই।............

দুর্ভাগ্য কবির ভাগ্য সর্ব্ব ক্ষেত্রেই অনুরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। এই টাকা গুলিও আদায় হয় নাই। সেই বৎসর শ্রাবণের প্লাবনেই রেহেণাবদ্ধ জমিগুলি পদ্মার উদরে স্থান লইয়াছিল।..........

* * * *

নিম্নলিখিত চিঠিখানাই গোবিন্দ বাবুর শেষ চিঠি। এই চিঠিও তাঁহার স্বহস্তে লিখিত, তাহাতে তারিখ নাই। একটী কবিতার সহিত চিঠিখানা আসিয়াছিল। ১৩২৫ সালের ১২ই আশ্বিন চিঠি ও কবিতা আমরা পাই। ১৩ই আশ্বিন তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু সংবাদ ১৫ই আশ্বিন পাই।

আপনার নিকট পত্র লিখিয়াই আমার জ্বর হইয়াছে, আজিও ভাত খাই নাই। সুতরাং নুতন কবিতা লিখিয়া দেওয়া অসম্ভব। জ্বরের জন্য আমার বইও হইলনা। এই কবিতাটী পাঠাইলাম। ইহাই ছাপিবেন। পূজায় বাড়ী যাইবেন কি? সকলের কুশল লিখিয়া সুখী করিবেন।

আপনার--

গোবিন্দ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

উদ্দেশের অশ্রু।

সেই দেশ সেই রাজ্য পড়িয়া র'য়েছে ভাই,
শুধু তুমি কোকিলের সে কল-ধ্বনিটী নাই!
সারদার প্রেমধার নীরবে করিয়ে শোধ
জাগা'লে সবের প্রাণে গভীর দেশাত্ম বোধ।
আমাদের পরস্পর হয় যথা সম্মিলন
তোমার জীবন কথা হয় তথা আলাপন।
মনে হয় আজো যদি বাঁচিয়া থাকিতে প্রাণে
সাহিত্য সম্পদশালী হইত তোমার দানে।
মধুর নাচনী ছন্দে ধরিয়া অপূর্ব্ব তান
শুনাতে সোহাগ ভরে নূতন নূতন গান।
দুর্ভাগ্য দেশের আর দুর্ভাগ্য মোদের হায়,
মরণের পরে বিনে কেহ না চিনিতে পায়।
অহো, কত অনাদরে অনাহারে গেল প্রাণ
কেহ না করিল কবি, বিপদে তোমারে ত্রাণ!
আজ তুমি বিরাজিছ নন্দনে সারদা সনে
আমরা প্রায়শ্চিত্ত করি অনুতাপ হুতাশনে!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

গোবিন্দ স্মৃতি-সভা।

সৌরভ সাহিত্য-সঙ্ঘের আহ্বানে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে গত ১৩ই আশ্বিন কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণের জন্য এক সভা আহুত হইয়াছিল এবং দাস-কবি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত ও পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধাংশ লইয়াই এই "গোবিন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা" সৌরভ সম্পাদিত হইল। কার্ত্তিক সংখ্যা সৌরভকে "গোবিন্দ স্মৃতি সংখ্যায়" পরিণত করিতে যাওয়ায় কার্ত্তিকের জন্য মনোনীত প্রবন্ধগুলি এই সংখ্যায় দেওয়া গেল না।
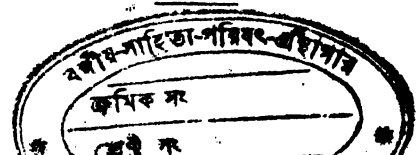
স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঘোষ

জন্ম—৩রা পৌষ, ১২৫৬ সাল।

স্বর্গারোহণ—১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল।
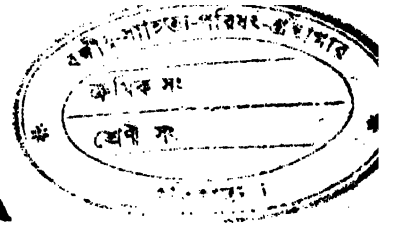
দ্বাদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। একাদশ সংখ্যা।

অভিভাষণ।

প্রবাসী দেশবাসীকে আজ দয়া করিয়া আপনারা স্মরণ করিয়াছেন; দেশের মাটীর টানে আজ আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। হে আমার নূতন এবং পুরাতন বন্ধুবৃন্দ, এই দয়াটুকুর জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দূরে যাদের কর্ম্মক্ষেত্র নিহিত হয়, দেশের কথা তারাও একেবারে কখনও ভুলিয়া যায় না; আমিও যাই নাই। কিন্তু কাজ যখন সহস্র জঞ্জালের বেড়া দিয়া তাহার সকল পথ আগুলিয়া থাকে, তখন সে, সে জঞ্জাল ভেদ করিয়া আপন দেশের মুক্ত হওয়ায় প্রাণ ভরিয়া শ্বাস টানিয়া কৃতার্থ হইবার অবকাশ সব সময় পায় না; সে জন্য সে নিশ্চয়ই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ থাকে। আজ যে আমার এই অবকাশটুকু জুটিয়াছে, সে জন্য আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যাঁদেরে চিনি, যাঁদেরে জানি, যাঁদের সহিত সহস্র বন্ধন রহিয়াছে, যারা হাজার রকমে আমার নিতান্তই আপন, যাঁদেরে দেখিবার ইচ্ছা কখনও না কখনও, নিশ্চয়ই মনে উদিত হয়—তাঁরাই যে আহ্বান করিয়া আমাকে আজ তাঁদের নিকটে আনিয়াছেন, ইহার চেয়ে পরম আনন্দের বিষয় আর আমার কি হইতে পারে?

দূরত্বের দীর্ঘরেখায় যাকে দেখি, তাহার অসামঞ্জস্য এবং আবিলতা চোখে পড়ে না; তাহার সবটাই প্রায় এক সঙ্গে চোখে পড়ে বলিয়া, এখানে সেখানে তার যে সকল ত্রুটী এবং অপূর্ণতা থাকে, সেগুলি আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। দূরের জিনিষ সেই জন্যেই কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখায়। তেমনি বুভুক্ষায় তাড়িত হইয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্যেই হউক, দেশ হইতে দূর দেশে যারা চলিয়া যায়, কালক্রমে দেশবাসী তাহাদিগকে নিজেদের চেয়ে কতকটা বড় মনে করিয়াই দেখে। দূরত্বের মোহজালে তাহাদের অনেক ক্ষুদ্রতা, অনেক অপূর্ণতা, অনেক দোষ ঢাকা পড়িয়া যায়; অনেক অপরাধ তখন আপনা হইতেই বিস্মৃত এবং মার্জ্জিত হইয়া যায়।

অনেক কাল আপনাদের নিকট হইতে দূরে আছি বলিয়া আমার ও সকল ক্ষুদ্রতা এবং অক্ষমতা যে আপনাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। তথাপি সে সব ত আর আমার নিজের অজ্ঞাত নয়। সুতরাং আপনাদের ভুল যে ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যাইবে, সে আশঙ্কা আমি না করিয়া পারি না; সেই জন্য, কৃত-অকৃত সকল অপরাধ এবং সকল ত্রুটীর জন্যে পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

কি অধিকারে আজ আমি আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি? কিসের বাণী আজ আমি আপনাদিগকে শুনাইতে পারিব? আপনাদের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয় আজ একইতানে স্পন্দিত হইতেছে বটে; কিন্তু কোন্ বীণার মুখর ঝঙ্কারে সে সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিবে? কোন্ বাদকের নিপুণ হস্তে সে বীণার তার নাচিয়া উঠিবে?

গায়ক বলিয়া যাহাকে আজ আপনারা আহ্বান করিয়াছেন সে যে গাইতেই জানে না; বাদক বলিয়া যাহার হাতে আজ আপনারা তন্ত্রীটী তুলিয়া দিয়াছেন, কম্পিত হস্তের আন্দোলিত অঙ্গুলী তাহার অক্ষমতা যে আগেই ঘোষণা

করিয়া দিতেছে! আহুত জনমণ্ডলী যে আশায় সমবেত হইয়াছেন, সে আশায় যখন তাঁরা নিরাশ হইবেন, তখন তাঁহারা না মনে করিয়া বসেন যে, তারিখ ভুল করিয়া সাহেবদের অনুকরণে পয়লা এপ্রিলের লীলাটা আপনারা আজই করিয়া বসিয়াছেন।

মফঃস্বলে আসিয়া যাঁরা বাণীর সেবা করেন, তাঁরাই সত্যসত্য তাঁর সেবক; কেন না, সেটা তাঁদের পেশা নয়; তাঁরা বাণীর আঁচল ধরিয়া লক্ষ্মীর কাছে পৌছিবার চেষ্টা করেন না; এ সাহিত্য চেষ্টা অর্থের লিপ্সায় কলুষিত নয়। পেশাদারী শিক্ষা এবং শিক্ষকতার ন্যায়, পেশাদারী সাহিত্য চর্চ্চাটাও সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে; শিক্ষার অন্ততঃ অন্য কোন আদর্শ আর আজকাল আমল পায় না; শিক্ষকও কেহই আজ আর দশ সহস্র ছাত্রকে অন্নবস্ত্র দ্বারা ভরণ পোষণ করিয়া এবং বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিয়া কুলপতি হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। সাহিত্য ও তেমনি আজ একটা পেশায় পরিণত হইতে চলিয়াছে; এবং অনেকে মনে করেন, তা না হইয়াও উপায় নাই; সাহিত্যের জীবন রক্ষা এবং পরিপুষ্টির জন্য ইহাই আধুনিক সমাজে এক মাত্র পন্থা। যে গায়ক এমন গান গাইবেন, যাহা কেহ শুনিতে চায় না, যে কবি এমন কাব্য লিখিবেন, যাহা কেহ পড়িতে চায় না, তাঁহাকে হয় জীবিকার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, নয়ত উপবাসকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে। যে শিল্পী এমন জিনিষ তৈয়ার করে যাহা কোন কাজে লাগে না—যাহা কেহই ব্যবহার করিতে চায় না—সমাজ গায়ে পড়িয়া তাহার জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে এবং মৃত্যুর পর তাহার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করিবে—এমনটী আশা করাই ভুল। সেই জন্যই ত আজ শিল্প রুচি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা না করিয়া উপস্থিত রুচির অনুযায়ী হইয়াই চলিয়াছে। সেই জন্যই গল্পপ্রিয় বাঙ্গালীর জন্য তাহার পসন্দ মত গল্পই রচিত হইতেছে; সমালোচকের কশাঘাত লেখকদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

কিন্তু যাঁরা গ্রামে বসিয়া সাহিত্যের আলোচনা করেন—তাহার চর্চ্চা কিম্বা সৃষ্টি করেন—তাঁরা এসব প্রবৃত্তির অনেক উপরে। তাঁরা চান, সাহিত্যের নির্দ্দোষ আনন্দ—উপভোগের আনন্দ এবং সৃষ্টির আনন্দ; বাজারের গড্ডলিকা প্রবাহ তাঁহাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না; তাঁরা যাচাই করিয়া জিনিসের সৃষ্টি করেন না, এবং কর্ম্মক্লান্ত সহর বাসীর নিকৃষ্ট এবং সস্তা আনন্দেরও ধার ধারেন না।

পয়সার গন্ধে ভরপুর নাগরিক সাহিত্যসেবা দ্বারাও দেশের উপকার হয় বটে, কিন্তু গ্রামের সাহিত্য চেষ্টাটা তাহার চেয়ে অনাবিল। এখানে কি লাভ হইবে, সে প্রশ্ন আদৌ উঠে না; এবং উঠে না বলিয়াই ইহার পবিত্রতাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভারতের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, অতি পুরাতন যুগ হইতেই এ দেশে দুই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে; নগরে, রাজার আশ্রয়ে, শাসন-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে সৃষ্ট হইয়াছে গৃহ্য সাহিত্য; আর, অরণ্যে, ঋষির কুটীরে, তপশ্চর্য্যার মাঝখানে সৃষ্ট হইয়াছে আরণ্যক সাহিত্য। উজ্জয়িনীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে কালিদাস লিখিয়াছিলেন কাব্য ও নাটক; শ্রীহর্ষের আশ্রয়ে রচিত হইয়াছিল উপন্যাস; এবং পাটলিপুত্রে বাৎসায়ন লিখিয়াছিলেন কামসূত্র, আর কৌটিল্য লিখিয়াছিলেন অর্থশাস্ত্র। কিন্তু নৈমিষারণ্যে ঋষিদের মাত্র রচিত হইয়াছিল মহাভারত এবং তমসার তীরে বাল্মীকির তপোবনে লিখিত হইয়াছিল রামায়ণ। অবশ্যই এই নিয়মের যে কোন ব্যতিক্রম নাই, এমন নয়; বিদেহরাজ জনকের আশ্রয়ে কোন বাৎসায়ন কামসূত্র রচনা করেন নাই; যাজ্ঞবল্ক ঋষি ব্রহ্মবিদ্যারই চর্চ্চা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাপি মোটের উপর গ্রাম্য এবং নাগরিক জীবনের যে একটা পার্থক্য, সেটা এ দেশের সাহিত্যের মধ্যেও যে না রহিয়াছে, এমন নয়।

বাংলা দেশের প্রাচীন সাহিত্যের ভিতরেও এই নিয়মের কতকটা প্রভাব দৃষ্ট হয়। নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র গাহিয়াছিলেন বিদ্যাসুন্দর; কিন্তু পল্লীবাসীর কৌলের জিনিস 'মনসার ভাসান' ঠিক সেই শ্রেণীর সাহিত্য নয়।

এই সব দেখিয়া এবং চিন্তিয়া অনেক সময় মনে হয় পল্লীর খোলা মাঠের মত খোলা প্রাণের সামগ্রী যে সাহিত্য, তার ভিতর সহরের আবর্জ্জনাময়, অন্ধকার

গলির পূতিগন্ধের অস্তিত্ব অনেকটা কমই থাকে।

অবশ্যই একথা আমি না মানিয়া পারিনা যে সাহিত্যই হউক, আর উপানৎই হউক, সৃষ্টি ক্রিয়ার সরঞ্জাম বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রামের চেয়ে সহরেই মিলে বেশী। কোন জিনিস উৎপাদন করিতে এবং অন্যত্র সরবরাহ করিতে যাহা লাগে, তাহা সহরেই সংগ্রহ করিতে হয়; সুতরাং আগে যত সহজে অরণ্যে কিম্বা গ্রামে সাহিত্য রচনা সম্ভব হইত, তেমনটী এখন হইবার জো নাই। সৃষ্টিটা কাজেই গ্রামের চেয়ে সহরেই হইবে বেশী এবং হইতেছেও তাই। এরূপস্থলেও যাঁরা গ্রামের নিবিড় ছায়ায় থাকিয়া সাহিত্য রস উপভোগ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁদিগকে সত্যসত্যই হিংসা করিতে ইচ্ছা হয়; —তাঁদের সেই আনন্দ সেই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং সেই একনিষ্ঠ সেবা, নিতান্তই লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সেই জন্যই আমার মনে, হয় আপনারা যে সহরের আন্দোলন উত্তেজনা এবং কলহ ও কলরব হইতে দূরে থাকিয়া সাহিত্যের নিবিড় আনন্দ উপভোগ করিবার সুবিধা এবং অধিকার পাইয়াছেন, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আর আজকার দিনের জন্য অন্ততঃ, আপনারা যে আমাকে সে আনন্দের অংশ দান করিয়াছেন, সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

ব্যক্তির জীবনে যেমন সুপ্তি ও জাগৃতি বলিয়া দুইটী অবস্থা স্বীকৃত হয়, জাতির জীবনেও আমরা অনেক সময় এইরূপ দুইটী অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকি। ঘুমন্ত মানুষ যেমন কোন কাজই করে না, শুধু বাঁচিয়া থাকে, জাতিও যখন তেমনি কেবল কোনও রকমে বাঁচিয়াই থাকে, উল্লেখ যোগ্য কোনও কাজ করে না, তখন তাহাকেও ঘুমন্ত জাতিই বলিয়া থাকি। সেই জন্যেই বর্ত্তমানে আমরা কর্ম্মের যে একটা নূতন স্পন্দন অনুভব করিতেছি, তাহাকে নব-জাগরণের লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছি; আর, তার পূর্ব্বে যে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইয়াছে, সেটাকে বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার মত জাতির একটা দীর্ঘ নিদ্রা মনে করিয়া নিয়াছি।

কিন্তু ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে এই যে তুলনা, সেটাকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে জাতি কখনও একেবারে ঘুমায় না; নিদ্রিত ব্যক্তিরও হৃদয় যেমন কখনও ঘুমায় না—সেটা ঘুমাইলে যেমন একেবারে জীবনের পরিসমাপ্তি হয়, জাতিরও তেমনি প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ নিদ্রা কখনও হয় না; যখন হয়, তখন তার লোপ হয়—কেননা, সে যে মহানিদ্রা!

সুতরাং আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের যে সকল কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কিংবা অনাদর করিয়া সে সময়টাকে নিদ্রার সামিল করিয়া রাখিয়াছি সেটাও বাস্তবিক পক্ষে জাগ্রত জীবনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। রঘুনাথ, রঘুনন্দন, জগদীশ, শ্রীচৈতন্য যে যুগে বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সে যুগে বাঙ্গালী জাতি একেবারেই অসাড় হইয়া ঘুমাইয়া ছিল না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলার রঘুনন্দনেরা যখন কয় দণ্ড একাদশী থাকিলে কোন্ দিন উপবাস করিতে হইবে, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে ছিলেন, তখন তাঁরা মস্তিষ্কের অপব্যবহার ভিন্ন আর কোন বড় কাজই করেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে কোন উপকারে আসে নাই বলিয়াই যদি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সমস্যার সমাধান গুলিকে মস্তিষ্কের অপব্যবহার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই কিছু না কিছু 'মস্তিষ্কের অপব্যবহার' খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। আজ যে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন লইয়া এত আলোচনা আন্দোলন হইতেছে, যদি উহা বর্জ্জিতই হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের পরবর্ত্তীরা কি এই বলিয়া আমাদিগকে টিট্‌কারী দিবে না যে, এমন একটা সোজা কাজ করিবার জন্য বাঙ্গালীরা কতটা মস্তিষ্কের অপব্যবহার না করিয়াছে!

যুগে যুগে মানুষের নূতন নূতন সমস্যা উপস্থিত হয়; এক যুগের সমস্যা অন্য যুগের কিছু না—বলিয়াই উহাকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা ঠিক নয়। যারা ন্যায়ের কূটতর্ক কিংবা স্মৃতির মীমাংসা নিয়া সময় কাটাইত, তারাও একটা কিছু করিতেই ছিল; আর যারা 'ভাসান' কিংবা 'পাঁচালী' কিংবা 'মঙ্গল' সাহিত্য রচনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল, তারাও একেবারে ঘুমাইয়াই ছিল না।

অবশ্যই একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বর্ত্তমানে আমাদের জীবনের ধারা অন্য দিকে চলিয়াছে। যাঁরা প্রাচীনের ভক্ত, তাঁরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইতেছেন;

আর যাঁরা প্রাচীনের উপাসক তাঁরা আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু ক্ষোভ কিংবা আনন্দের অবকাশ ইহাতে নাই; ইহা জাগতিক নিয়ম। প্রাচীনকে ছাড়িয়া চলিয়াছি বলিয়াই যাঁরা দুঃখ করেন, তাঁরা মনে করেন না যে, নবীনও একদিন প্রাচীন হইবে। একটা দিন অতিক্রম করিয়া আর একটীতে যিনি পা দিতে চান না, তাঁর জীবনে যে ঐ খানেই দাড়ি পড়িবে। নিশা অতিক্রম করিয়া উষার আলোক দেখিতে না চাইলে চলিবে কেন? আর, উষার আলোক পাইয়াছি বলিয়াই নিশার আগমন পরিহৃত হয় নাই।

আজ যে প্রাচীন নবীনের দ্বন্দ্ব বিশেষ ভাবে আমাদের চিন্তাকে অকর্ষণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটী বিষয় আলাদা করিয়া দেখিবার মত জিনিস। প্রথমতঃ আমরা চাই চারিদিকে বিক্ষিপ্ত উপাদান গুলিকে একত্র করিয়া একটা বিরাট সমষ্টি, একটা মহত্তর জাতী সংগঠন করিয়া তুলিতে। আমাদের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা এই যে, এইরূপে গঠিত বিরাট জাতিটী পৃথিবীতে তাহার উপযুক্ত স্থান করিয়া লইবে এবং নিজের দেশে আর সে পর-দেশী হইয়া থাকিবে না—নিজের দেশের শাসন সংরক্ষণ নিজেই করিবে।

প্রথম উদ্দেশ্যটী সাধন করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ অনুসারে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন এবং হিন্দু মুসলমানের সম্মেলন, এই দুইটিকেই মুখ্য উদ্দেশ্য উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এ দুইয়ের একটী আর একটীর সঙ্গে আবার এমনি ভাবে জড়িত যে, এই দুইটীকে পৃথক্ উপায় মনে না করিয়া এক মনে করাও চলে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিলে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর মিলনটা খুব দূরে থাকিবে না।

কিন্তু এই চেষ্টায় প্রাচীনের সঙ্গে গুরুতর বিরোধ রহিয়াছে; কবে বিরোধের মীমাংসা হইবে, ভগবান্ জানেন; কিন্তু বিরোধ একটা ঘটিয়াছে বলিয়াই যাঁরা আতঙ্কে অস্থির হইয়াছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ইতিহাসে এ ব্যাপার এই প্রথম ঘটিল না। প্রাচীনকে যাঁরা সনাতন বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁরা ভুলিয়া যান যে, সনাতন মানে স্থিতি নয়, গতি। উষাও সনাতন নয়, নিশাও নয়; নিশার পরে উষা এবং তার পর আবার নিশা—এই যে অপ্রতিহত গতি, এইটীই প্রকৃতির সনাতন নিয়ম। সমাজ যে আচার যখন গ্রহণ করে, সেটাকে ভাল মনে করিয়াই গ্রহণ করে; পরে আবার সময়ান্তরে যখন উহাকে বর্জ্জন করে, তখন বুঝিতে হইবে উহার আর প্রয়োজন নাই; আর, যে সময় যখন আসিবে, তখন সনাতন বলিয়া উহাকে বাঁচাইয়া রাখা ও সম্ভব হয় না।

মানুষের সমাজ প্রাচীনকে ছাড়িয়া নবীনকে বরণ চিরকাল করিয়া আসিতেছে।

> "জীর্ণানি বাসাংসি যথা বিহায়,
> নবানি গৃহ্ণন্তি নরোঽ পরাণি"

তেমনি মানব সমাজের আত্মা চিরকালই নূতন নূতন আচারের বসন পরিধান করিয়া আসিতেছে; ইহাই সনাতন সত্য।

এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রেপ্সু মানব সমাজ উন্নতির দিকে চলিয়াছে কি অবনতির কূপে নিপতিত হইতেছে—নিশার শেষে উষা আসিতেছে, কি উষার স্থান নিশার অন্ধকার দখল করিতেছে,—এ প্রশ্নের কোন সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তর নাই। নদী সাগরের জলে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া উন্নতি লাভ করিতেছে কি না, সে প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে? কিন্তু প্রশ্নের মীমাংসা আমরা করিতে পারি না বলিয়াই নদীর গতি ত থামিয়া যাইবে না! সমাজের দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, ততদিন তাহার গতিও তেমনি কেহ রোধ করিতে পরিবে না, "ক ঈপ্সিতার্থ স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ"? কাজেই কবির ভষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

> "আগে চল্, আগে চল্ ভাই,
> পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে।"

আজ এই প্রাচীন নবীনের কলহে আমার যদি কিছু বলিবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে প্রাচীনকে বলিতাম—শিশুর ক্রীড়া এবং যুবকের উৎসাহে প্রাণ ঢালিয়া দিবার সময় আপনাদের যদিও অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাদের এই আনন্দেও উৎসাহে ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত হইবার কিছুই নাই, আপনাদের পরে ইহারা আসিয়াছে, আর এর পরে, ইহারাই থাকিবে। প্রস্ফুটিত কুসুম তাহার সঞ্চিত সৌরভের বড়াই নিয়া যদি কোরককে ফুটিতে মানা করে, তাহা হইলে কি লজ্জারই না কথা হয়!

আর, নবীনকে আমার তেমনি বলিতে ইচ্ছা হয়, মাটীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃক্ষ যেমন বাঁচিতে পারে না, তেমনি প্রাচীন হইতে একেবারে সরিয়া গিয়া নবীন তাহার জীবন গঠন করিবার কোন মসলাই খুঁজিয়া পাইবে না। অনেক প্রাচীন দেশের ইতিহাসে দেখা যায়, কতকটা বার্দ্ধক্য লাভ না করিলে দেশের শাসন কার্য্যে লোককে যোগদান করিতে দেওয়া হইত না। অভিজ্ঞতার মূল্য চিরকালই আছে। যদিও বর্ত্তমানে শুধু বয়সের ন্যূনতার জন্যে কেহও কোনও কার্য্যের অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় না, তথাপি বয়সকে একেবারে উপেক্ষা করিবার কোনও হেতুও এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। শুভ্র শ্মশ্রু এবং পলিত কেশকে যে দেশ সম্মান করে না, বুঝিতে হইবে, সে দেশ জ্ঞানকে অবহেলা করে এবং অভিজ্ঞতাকে চরণে দলিত করে; এবং কোন না কোন দিন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে।

প্রাচীনকে আমি বড় সম্মান করি; সর্ব্বত্র না হইলেও সাধারণতঃ আমি বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য বলিয়াই মনে করি। তার অর্থই এই নয় যে, নূতন কিছু ঘটিতে দিতে আমার আপত্তি আছে। নূতন ত আসিবেই— এবং অনেক স্থলেই সে পুরাতনের স্থান কাড়িয়াও লইবেই। কিন্তু সে জন্য পুরাতনের প্রতি অনাবশ্যক অনাদর দেখাইতে হইবে, এমনও কোন যুক্তি নাই। যাহাকে পিছনে রাখিয়া পথ চলিতে হইবে তাহার প্রতিও সম্মান দেখান যায়।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য কখনও পুরাতন হয় না। মানুষের আচার সমাজের কায়দা-কানুন সময়োপযোগী না হইলেই তাহাকে পুরাতন মনে করা হয়; কিন্তু তাহাকে বাঁচিয়া থাকা রূপ যে বিরাট সত্য, তার কোন অপচয় হয় না। যাঁরা উন্নতির পরিপন্থী এবং যাঁরা উন্নতি চিকীর্ষু, তাঁদের উভয়কেই এই কথাটা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

কোনও একটা পদ্ধতি ধরিয়া চলিতে চলিতে যখন শরীরে ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তখন একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া নূতন প্রণালী কোনও একটা গ্রহণ করিতে হয়; নইলে ত আর ব্যাধি সারে না। এ দেশের প্রাচীন সমাজ দেহে ব্যাধির অন্ত নাই; দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, কোহাট, মুলতান, ভয়কম প্রভৃতি কত জায়গায়ই ত দেখা যাইতেছে কলহের অবধি নাই; এ যদি সমাজের ব্যাধি না হয়, তবে ব্যাধি কাহাকে বলে? যে পদ্ধতিকে সনাতন মনে করিয়া আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছি, তাহা হইতেই এক্ষণে ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে; তবুও কি ইহার পরিবর্ত্তন কিংবা পরিবর্জ্জন সম্ভবপর নয়?

সমাজের কোনও একটা অংশ যদি মনে করে, অপরকে বাদ দিয়াই সে পুষ্ট হইয়া উঠিবে, তবে ইহার চেয়ে গুরুতর ভুল আর কি হইতে পারে? হিন্দু যদি মনে করে, মুসলমানের অস্তিত্ব-লোপ এক সময়ে ঘটাবে, তবে এই অশুভ ইচ্ছার পাপের ফল এক সময়ে তাহাকে ভুগিতেই হইবে যেমন করিয়াই হউক, যাহারা আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই দেশকেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আর দেশ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এখানেই তাহারা থাকিবে; বিলোপ তাহাদের হইবে না; এবং তাহা ঘটুক, এ ইচ্ছাও যেন কেহ না করে। একের বিলোপ সাধন করিয়াই যদি অন্যের পরিপুষ্টি করিতে হয়, তবে এ ক্রীড়ায় একজনই শুধু হাত দিতে পারে এমন নয়; একাধিক সংখ্যার যোগদানও সম্ভব। হিন্দু যদি মুসলমানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চায়, তবে তাহার সে শুভ ইচ্ছার উপযুক্ত প্রতিদান মুসলমানও দিতে পারে। আজ যে চারি দিকে এই উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর এতটা মন কষাকষি দেখা যায়, তাহার মূলে কি এমনি একটা কোন অশুভ আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন নাই—যে একটা ক্রোধ বহ্নির তাণ্ডব-লীলা আজ চারি দিকে নানা বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত করিতেছে, তাহার মূলেও কি এমনি একটা জিগীষা এবং জিঘাংসার প্রবৃত্তি লুক্কায়িত রহে নাই?

সোজা কথাটা এই হয় অমন ভাবে ভিতরে ভিতরে অশুভকে, অসৎকে, অন্যায়কে পোষণ করিয়া কোন শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কোন্‌টা সনাতন কোন্‌টা তা নয়, সে বিচারে কোন লাভ নাই; এখন এইটিই সব চেয়ে সনাতন সত্য যে, এদেশে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই একত্রই বাস করিতে হইবে। কাহারও বিলোপ যেন কেহ আকাঙ্ক্ষা না করে; ভগবান্ করুন, সে দিন যেন না আসে। আর, একে অন্যের ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া

যে সমাধান, সেটাও এক্ষেত্রে হইবে না। এমন পাগল কে আছে, যে স্বপ্নেও কখনও ভাবে যে, সব মুসলমান হিন্দু হইয়া যাইবে, কিংবা সব হিন্দু মুসলমান হইয়া যাইবে? তবে কি এ কলহের মীমাংসা হইবে না। কিন্তু মীমাংসা ত চাই। তা না হইলে, এই হতভাগ্য অভিশপ্ত দেশের গতি কি হইবে? সাহিত্য সমাজ কিংবা রাষ্ট্র, কোনটাই ত ঠিক গড়িয়া উঠিবে না!

মানুষ যখন মনুষ্যত্বকে ধর্ম্মের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে জানিবে, তখনই এসকল ক্ষুদ্র অথচ গভীর কলহের তিরোভাব ঘটিবে। মানুষ সকলের আগে মানুষ, সকলের পরেও মানুষ, মাঝ খানে অবস্থার ফেরে সে যেমন চাকর কিংবা মনীব, শিক্ষক কিংবা ছাত্র, রাজা কিংবা প্রজা হয়,—তেমনিই ব্রাহ্মণ কিংবা শূদ্র, হিন্দু কিংবা মুসলমানও হইয়া থাকে। এসব তার বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু সাধারণ ধর্ম্ম ইহা নয়; আজ যে কিশোরগঞ্জে আছে কাল যেমন সেই ময়মনসিংহে থাকিতে পারে এবং তাহাতে যেমন তার ব্যক্তিত্ব লোপ পায় না,—তেমনই মনে হয়, জাতি কিংবা ধর্ম্ম যাহা নিয়া আমরা এত মারামারি করি সেটাও প্রকৃত মনুষ্যত্বের কাছে পরিহার্য্য এবং পরিবর্ত্তন যোগ্য একটা আগন্তুক গুণ। খাওয়া দাওয়ায় কিংবা কাপড় চোপড় কিংবা অন্যান্য সামাজিক আচার নিয়মে যেমন কতকটা পরিবর্ত্তন আমরা সর্ব্বদাই ঘটিতে দিতেছি, তেমনই যদি ধর্ম্মাদি বিষয়েও কতকটা পরিবর্ত্তন সহিষ্ণুতা আমাদের উৎপন্ন হইত, তাহা হইলেই, মনে হয়, অনেক অনীপ্সিত আপদ সরিয়া যাইত। মানুষ যে মানুষ, কোনও ধর্ম্মবিশেষ গ্রহণ বা বর্জ্জন করিলেই যে তার সে মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়া যায় না, এই মহৎ সত্যকে জানিতে পারিলেই আমাদের অনেক বালাই দূরে যাইবে। আমিষ বা নিরামিষ আহারে মানুষের আসল সত্তার লোপ বা বিকৃতি হয় না; শাক্ত বা বৈষ্ণব হইলেও হয় না; তেমনি হিন্দু বা মুসলমান হইলেও মনুষ্যত্বের দপ্তরে কোনও নূতন হিসাব করিতে হয় না; এই কথাটাই আজ আমাদিগকে বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে।

আমরা যে নিজের দেশ নিজের করিবার জন্য এমন আকুল চেষ্টা করিতেছি, এবং পদে পদে ব্যর্থকাম হইতেছি, তাহার সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। যারা মূল মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়াও মানুষের অবান্তরগুণের উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করেন,—তারা সর্ব্বদাই ভুল করেন। উৎকর্ষটা তথাকথিত ধর্ম্মেরই হউক, কিম্বা রাষ্ট্রীয় শক্তিরই হউক পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের তুলনায় সেটা একটা আংশিক লাভ মাত্র। সমস্তটাকে ভুলিয়া গিয়া অংশটাকে বড় করিয়া তোলার যা ভুল, সে ভুলই আমরা করিয়া আসিতেছি এবং সেই জন্যই আমাদের এত পদস্খলন হইতেছে।

"To thine own self be true;
And it will follow as the night the day,
That thou canst not be false to any man."

কিন্তু এ যে ধান ভানিতে শিবের গীত গাইতেছি; সাহিত্য সম্মিলনীর আসরে দাঁড়াইয়া এ কি কথা হইতেছে? সাহিত্যের রস-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া কর্কশ রাজনীতি এবং কলহ-বহুল সমাজ নীতির আলোচনা দ্বারা আসর জমাইবার একি ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে? কোথায় নিপুণ বাদকের বীণার নিক্কনে মদালস চিত্ত সাহিত্যের পারিজাত-সৌরভে মাতিয়া উঠিবে, আর কোথায় একি ঘোর সাংসারিকের বিবাদ মীমাংসার কথা! কিন্তু আমার কৈফিয়ত এই যে, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এসব কথা কিন্তু না বলিয়া পারি না; কেননা, যাঁদের অদম্য উৎসাহে এই সম্মেলন সংঘটিত হইয়াছে, তাঁদের যে প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্যই হইতেছে এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া। শুধু তাঁহাদেরই বা বলি কেন, মানুষ মাত্রেরই কি একমাত্র চরম লক্ষ্য মনুষ্যত্ব লাভ নয়? মানুষ যে হইয়াছে, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য—সবই তার আপনা হইতেই হইয়া আসিবে। অবশ্যই এ সবের ভিতর দিয়াই আবার মনুষ্যত্বকেও লাভ করিতে হয়; কিন্তু তাই বলিয়াই ইহার যেকোনও একটীকে একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে মস্ত ভুল হইবে। সাহিত্য আমরা চাই, ধর্ম্ম আমরা চাই, সমাজও চাই এবং রাষ্ট্রও চাই—এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কি চাই; এ সকলের ভিতরই আমরা নিজকে খুঁজিয়া

পাইব; ইহাদের দ্বারাই আমরা যা হইতে চাই, তাহা হইব। কিন্তু ইহার যে কোনও একটীকে যদি সর্ব্বস্ব মনে করিয়া বসি, তবে যে যথার্থ সর্ব্বস্ব লাভ আমাদের ঘটিবেই না। আর যে পর্য্যন্ত জাতির ভিতর বিদ্বেষ এবং কলহের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সাহিত্যই কি ঠিক গড়িয়া উঠিবে? এখনও এদেশে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানেরা বাংলাকে নিজের জিনিস বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। এ অবস্থায় আধখানা সমাজের আধখানা সাহিত্য কত বড় আসন পাইবার যোগ্য হইবে?

তাই ত বলিতে হইতেছে. যাঁরা সাহিত্যের জন্য এতটা ব্যাকুল চেষ্টা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁদের এ উৎসাহ যেন এখানেই পরিসমাপ্ত হয় না। সমুখে মহত্তর এবং বৃহত্তর কর্ত্তব্য তাঁদের রহিয়াছে। যাঁদের জীবন-সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তারা বেলা শেষের গান গাহিয়া খেলা সাঙ্গ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। কিন্তু যাদের জীবনে সবে মাত্র বালার্ক-কিরণের রঙীন ছটা ফুটিয়া উঠিতেছে, তাদের ত শেষ করিবার তাড়া-হুড়া নাই। তারা কেন অক্লান্ত মনে, অদম্য উৎসাহে, ব্যাকুল চেষ্টায় বিরাটকে পাওয়ার জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিবে না? তারা কেন কোনও একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে? তারা কেন সকল সীমা, সকল ক্ষুদ্রতা সকল বেষ্টন ভেদ করিয়া ভূমাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না? 'যদ্বৈ ভূমা তৎসুখং'।

শুধু সাহিত্য চেষ্টায় ইহাদের উৎসাহ আবদ্ধ থাকুক, এ আকাঙ্ক্ষা কেহ যেন না করেন। সাহিত্যের আনন্দের জন্য যে উৎসাহ আজ ইহারা দেখাইয়াছে, মনুষ্যত্বের বহুধা পরিণতি লাভের জন্য চারি দিকে তাহা দ্বিগুণিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ুক। প্রকৃত মনুষ্যত্ব কোনও একটা সীমা কিংবা সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না— ধর্ম্ম কিংবা সাহিত্য কিম্বা অন্য কোনও একটা সীমার ভিতর ইহাকে পাওয়া যাইবে না; এ সকলের মধ্যেই ইহা আছে অথচ কোনটায়ই উহা সীমাবদ্ধ নয়।

এই যে বহুমুখ, বিরাট মনুষ্যত্ব, সেইটাই যেন আমাদের চরম উদ্দেশ্য হয়। তাহা হইলে, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের যে বহুবিধ অভিব্যক্তি আছে, সে গুলি আমাদের আপনা হইতেই লাভ হইয়া যাইবে।

আর একটা কথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। হওয়ার চেয়ে করা, অস্তিত্বের চেয়ে বিকাশ কখনই বড় নয়; অথচ আমরা অনেক সময় মনে করিয়া বসি, নিজে যেমন প্রকারের লোকই হই না কেন, একটা বড় রকমের কাজ করিয়া লোকের চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিব। এ প্রকার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অনেক সময়ই হয়। কিন্তু আমদের মনে রাখা উচিত যে, বড় কাজ করার চেয়ে বড় হওয়া বেশী মূল্যবান। যে বড় হইয়াছে, বড় কাজ তার আপনা হইতেই হইবে; অথবা তার প্রত্যেক কাজ বড়ই হইবে; সেটা আর তার চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে না। কিন্তু যে নিজে প্রকৃত পক্ষে বড় না হইয়া কোনও একটা বড় কাজ করিয়া লোক ভুলাইতে চায়, তার পক্ষে আয়াস স্বীকার করিতে হয় বহু কিন্তু তথাপি তাহার জীবনের কৃত্রিমতা দূর হয় না।

যদি সকল দিকে পূর্ণতালাভ করিবার একটা সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্য্যে আমাদের মহত্ব সহজ এবং অকৃত্রিমভাবে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে। সুতরাং যাঁদের উৎসাহ পূর্ণ হাসিমাখা মুখ দেখিয়া আমি তৃপ্ত হইতেছি, তাঁদের কাছে এই আমার শেষ নিবেদন যে নিজেকে ছলিয়া নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া যেন তাঁরা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন; নিজের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, কার্য্যের মূল্য আপনিই বাড়িয়া যাইবে।

যাঁদের তরুণ প্রাণের প্রবীণ উৎসাহ এই কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হউক; আজ এই শরতের যুক্ত আকাশের সীমাহীন মূর্ত্তি দেবতার আশীর্ব্বাদ তাহাদের উপর বর্ষণ করুক। কাননের কুসুমপুঞ্জ বিশ্বের শুভ ইচ্ছা স্বরূপ ইহাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠুক। মলয়ের মৃদুল সমীরণ হিল্লোল তাদের গভীর হৃদয়ের নিবিড় আনন্দ নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ুক। ইতি ওঁ। *

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* কিশোরগঞ্জ ১ম কিশোর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

লক্ষ্মীছাড়া।

(ময়মনসিংহ—গৌরীপুরের পূর্ণিমা-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত)

১

আজি কোজাগর লক্ষ্মীপূজায় এস দুনিয়ার লক্ষ্মীছাড়া।
লক্ষ্মীরে ছেড়ে লক্ষ্মীছাড়ার তুষিতে হয়েছি আত্মহারা।
এস সয়তান, নরকের দূত, এস ভবঘুরে, গুণ্ডা পাজি!
এস মন্তপ, গঞ্জিকাসেবী, চোর, বদ্‌মাস, পতিতা আজি!
ঘৃণা করিতেছে করুক সমাজ, আমি তোমাদেরে করি না ঘৃণা।
জ্যোৎস্না যামিনী হতো কি মধুর অমা যামিনীর আঁধার বিনা!
কীটসঙ্কুল বদ্ধ তড়াগে ফুটিয়া থাকুক্ পদ্মফুল!
পঙ্কিল ঘোলা নদী বহমান, ভালো সে বরং, ভাঙিবে কুল!

২

তোমরা মানব সমাজেরে আজ করেছ যদিও পঙ্কময়,—
তবু তোমাদের টাট্‌কা হৃদয়; নাহি মনো লোক-লজ্জা ভয়!
আছে জীবনের দুইটি পন্থা, একটি কুটিল একটি সোজা;
তোমরা ছুটেছ নরকের পথে হাল্‌কা করিতে বুকের বোঝা।
দুষ্টা ভারতী ঘাড়ে সমাসীন, চলেছ আবেগে দুর্ব্বিষহ।
সমাজে তোমরা নির্ব্বাসিত যে, তথাপি তোমরা মরিয়া নহ!
সাজিয়া ভণ্ড 'সাধু' 'সজ্জন' তোমরা গোপনে কর না ক্ষতি!
এস নিন্দিত লক্ষ্মীছাড়ারা, মর্ম্মপীড়িত, তরলমতি!

৩

নাহি হেন কোনো পুণ্য যেথায় মেশেনি কখনো বিন্দু পাপ!
যদি কিছু থাকে সে নহে মানবে; নীতিবাগীশেরা করুণ মাপ!
কায়মনোবাক্যে নিষ্পাপ থাকে এ হেন দেবতা দেখিতে চাই!
স্বর্গ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিলে আমরা আবার বাঁচিয়া যাই!
দোষে গুণে গড়া মানব সমাজ, রক্তমাংসে গঠিত দেহ;
নরকের পথে যেতেছে যেমনি স্বর্গের পথে যাইবে কেহ।
অচেতন কভু নাহি করে পাপ, চেতনের পাপ-পুণ্য-ভয়;
ভালো ও মন্দে চলিছে দ্বন্দ্ব, পুণ্যের তবু হইবে জয়।

৪

লক্ষ্মীছাড়ারা, এস মোর কাছে! আমি তোদের দুখের সাথী!
দলবলে বলী হইয়া তোমরা প্রসাদে কুটীরে জ্বালালে বাতি!
তোমরা না হ'লে চলে না সমাজ, ধরা হতো পূতিগন্ধময়!
পান্থশালার শব-সৎকারে কে করে তুচ্ছ মৃত্যু-ভয়?
চির-বিচ্ছেদ ভুলিয়া রহিতে মন্তপ হ'লে ক্রমশ, ভাই!
ওরে গৃহ-হারা, ঘৃণিতা, পতিতা, 'আপনার' বলে' কেহ কি নাই?
পেটের ক্ষুধায় করিছ চৌর্য্য, জীবন আজিকে ভীষণ ধূ-ধূ!
সুখের লাগিয়া তোরা সয়তান বিশ্ব যাহারে খুঁজিছে শুধু!

৫

ভালো ও মন্দ দুই-ই কাজ বটে, শক্তিপ্রকাশ সমান ধারা;
পাপের পন্থা ছেড়ে চল এবে. কোথা ভাই বোন লক্ষ্মীছাড়া!
লক্ষ্মীমন্ত যন্তপি নহ, শক্তিমন্ত সত্য বটে;
লক্ষ্মীর ছেলে মেয়েরা তাইতো তোমাদেরে দেখে' পিছনে হটে!
মুক্ত তোমরা, নির্ভীক্ সবে, শক্তির যেন অগ্রদূত!
বেড়াও নিশীথে ঝড়-ঝঞ্ঝায়, পথ ছেড়ে দেয় প্রেতিণী ভূত!
সেবার ধর্ম্মে জাগিয়া উঠিয়া জাগালো সুপ্ত জাতির প্রাণ!
ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছে ইহারা, দল বেঁধে গেছে আন্দামান!

৬

জগতে কোথাও একা একা কেহ হয়নি কখনো লক্ষ্মীছাড়া;
সমাজে যাহারা সাধু সেজে আছে আজিকে তাহারা দিতেছে তাড়া
আমি তোমাদেরি, কেঁদন, কেঁদনা, তোমাদের চেয়ে নহিতো বড়!
কুল-কণ্টক চলে গেছে যাক্, অকূলের মাঝে ঝাঁপায়ে পড়!
গণিকা সেজেছ! গণপতি গলে দাওনা পরায়ে মনের মালা!
জীবের মাঝারে শিবেরে হেরিয়া সাজাও জীবন-অর্ঘ্যডালা!
ঘৃণা করিতেছে? করুক্ সমাজ, আমি তোমাদেরে করিনা ঘৃণা!
সকলেরে ভালোবাসিয়া যাইব; চলে না সমাজ তোমরা বিনা!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

স্নেহের দান।

(৬)

দৌলতপুরের চরে মেলা বসিয়াছে। মেলা লোকে লোকারণ্য। আরঙ্গের তামাসা দেখিতে যেন দেশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই দুর্দ্দিনেও লোকের সখ্ যেন দমিয়া যায় নাই।

নানা রঙ্গের নিশানে সজ্জিত নৌকাগুলি দেখিয়াই মাধবী আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।

মাধবীর উচ্চ চীৎকারে সকলেরই মন আকর্ষণ করিয়াছিল। মাখন ও মণি খেলা রাখিয়া বাহিরে গেল।

বাহিরে নৌকার ছৈর উপর পূর্ব্বেই ভাল বিছানা করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা যাইয়া তথায় বসিল।

মণি বলিল—"ওদেরে'ও এখানে ডাকিয়া লও না!"

মাখন আপত্তি করিল—"দিনের বেলায় এত বড় মেয়েদের বাহিরে আসা ভাল নয়, এ গ্রাম দেশ।"

মাখনের আপত্তি শুনিয়া মণি আর কোন উত্তর করিল না।"

নদীর তীরে মেলায় নানা প্রকারের খেলানার দোকান বসিয়াছিল; অখাদ্য কুখাদ্যের সমাবেশও এইরূপ জনতার স্থানে যেরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইয়াছিল।

মণি বলিল—"ওদের জন্য কিছু খাবার নেওয়া যাক্ না?"

মাখন বলিল—"আচ্ছা; চল তীরে যাই, মেলার ব্যাপারটার আনন্দও উপভোগ করা যাউক!…"

মাখন ও মণি উভয়ে তীরে উঠিয়া গেল এবং চারি দিক দেখিয়া শুনিয়া কয়েকটা ভেপু বাঁশী ও খেলানা এবং কিছু মিষ্ট সন্দেশ লইয়া বজরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শেষ বেলায় নৌকার দৌড় আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ বিষয়ক সারি গান গাহিয়া, তালে তালে বৈঠা মারিয়া, তীর বেগে সুসজ্জিত নৌকার লহর ছুটিয়া চলিল। তীরের ও নীরের দর্শক মণ্ডলী চক্ষে, মুখে ও হৃদয়ে বিপুল আনন্দ ও আবেগ লইয়া অপলক দৃষ্টিতে সেই প্রতিযোগীতার দৌড়ের দিকে চাহিয়া রহিল। ইহাতে যে আনন্দ কি, তাহা গ্রাম্য সৌখিন সমজদার ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যে বুঝিবে না।

দৌড় শেষ হইয়া গেলে নদীর নৌকাগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখনকার দৃশ্য আরো অপূর্ব্ব, সৌখিন গ্রাম্য লোকেরা "ভাসান" গাহিয়া নদীর বুকে আনন্দের তুফান চালাইয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া মণির বজরাও গৃহাভিমুখে চলিল।

নৌকার ছাদে বসিয়া মাখন বলিল—"গ্রাম্য আমোদ আহ্লাদগুলি আমাদের সহানুভূতির অভাবে ক্রমেই লয় পাইয়া গেল।"

মণি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"তাহার কারণ সহানুভূতির অভাব নয়; কারণ, যাহারা চিন্তা করে, তাহারা কাজ করে না, আর যাহারা কাজ করে, তাহারা চিন্তা করে না; যাহারা বক্তৃতা করে, তাহারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, আর যাহারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা বক্তৃতা দেয় না। এই সকল কারণে—কার্য্যের সহিত কার্য্যের উপদেষ্টার পরস্পর দূরত্ব বৃদ্ধি হেতু…"

মাখন বাধা দিয়া বলিল—"অভাব, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক ইত্যাদিও তাহার অন্য কারণ…"

মণি হাসিয়া বলিল—"যাক্ এ সকল বাজে কথা; এই সকল কথা লইয়া প্রকৃত আনন্দ তুমি মাটি করিয়া দিলে……"

মাখন বলিল—"সে কেমন?"

মণি—"খেলার আনন্দ যেমন কেবল একার উপভোগে স্ফুর্ত্তি পায় না, দর্শনের সুখও একা দেখিয়া পূর্ণতা লাভ করে না—তৃপ্তি হয় না—দেখাইয়াই সুখ"।

মাখন মণির মনের ভাবটা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। মাখনের বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব মণি অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার পর মুহূর্ত্ত হইতেই যে এই বজরার অভ্যন্তরের ক্ষুদ্র জগতে একটু ভাবের ব্যত্যয় অঙ্কুরিত হইয়াছিল—এবং সেই ভাব-অভাবের সৃষ্টি কর্ত্তা যে মাখন নিজে, তাহা মাখন নিজের মনের ভিতরেই বেশ্ স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল; এবং সেই জন্য সে ক্রমেই একটু একটু করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল, এই বার মণির এই কথায় মাখন তাহা ভাল করিয়া চিন্তা করিবার অবকাশ পাইল।—ছোট হিস্তার কনকের নিকট সে যতখানি পর হইয়াও আপন, মণিও আজ তাহার গৃহে সেইরূপ নহে কি? কথাগুলি চিন্তা করিয়া করিয়া মাখন মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল।

মাখন বলিল—"সময়টা কাটে কি করিয়া চল, ছক্‌টাই পাতা যাউক।"

অপাঙ্গে ঈষৎ হাসির রেখা টানিয়া মণি জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কি ইদিলপুরে যাইতেছি না পানার?"

মাখন মণির মনের ভার বুঝিতে পারিয়া কৈফিয়ৎ দিল—"ইহাদিগকে লইয়া আর ইদিলপুরে যাওয়া যায় কেমনে? সেখানে কাল কি পরশু যাইব!"

মণি হাসিয়া বলিল—"আমার কিন্তু বিশ্বাস আমরা

ইদিলপুরেই যাইতেছি; যাক্, এখন ওদের কিছু খাবার দাও; তার পর চল্ খেলিতেই বসা যাউক। কিন্তু নরক-বাস—অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক।"

মাখন বলিল—"সেইজন্য নরক-ত্রাণের উপাদান সংগ্রহ অত্যাবশ্যক।"

মণি—"কাল ইদিলপুরে গিয়া তাহারই চেষ্টা করিব। আর "নরককুণ্ডে" বাস সহ্য হয় না।"

এইবার মাখন প্রাণ খুলিয়া হাসিল। মণিও সঙ্গে সঙ্গে হাসিল।

জলযোগের পর খেলা আরম্ভ হইল। মণির ইঙ্গিত বুঝিয়া মাখন সকলকে লইয়াই খেলিতে বসিল; মণির তখন বেশ উৎসাহ দেখা যাইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীন চিন্তা।

মনের কার্য্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছা। পশুর ব্যবহারে তাহার মনের এই ত্রিবিধ কার্য্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহারা সুখদুঃখের অনুভূতি দ্বারা বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করে, তদনুসারেই ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত করে। মানবের দেহে অস্ত্রচিকিৎসা করিতেগেলে মানব যেমন ভবিষ্যত সুস্থতার আশায় বর্ত্তমান কষ্ট স্বীকার করে, পশু সেরূপ কার্য্যের ফলাফল বিচার করিয়া বর্ত্তমান দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে জানে না। যুগযুগান্তর ব্যাপী ক্রম-বিকাশের ধারায় পশুর দেহ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে যেমন মানব দেহে রূপান্তরিত হইয়াছে, সেইরূপ মনও অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রম পরিবর্ত্তনের ফলে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে। কার্য্য ও তাহার ফল পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতে করিতে মন বিষয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পরে নূতন ঘটনা উপস্থিত হইলে চিন্তাশক্তির সাহায্যে তদ্রূপ পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করিবার প্রয়াস করিয়াছে এবং অবশেষে কার্য্য কারণ ও ফলাফল বিচার করিয়া মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছে।

এইরূপে যে সমস্ত মীমাংসার সত্যতা বংশানুক্রমে অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসে তাহারা সংস্কারে পরিণত হয়। মানুষের মন হইতেই তখন ধারণা আসে যে ইহা সৎ ইহা অসৎ। এই সংস্কার বিবেক নামে আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালিত করিতেছে। সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে বিবেকের গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার বিবেকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের উন্নতির সুযোগ ঘটে। কারণ সাধারণ কার্য্যের ফলাফল আর তখন আমাদিগকে বিচার করিয়া স্থির করিতে হয় না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রেরণা স্বতঃই উপলব্ধি হয়। সুতরাং সে অবস্থায় মানব শ্রেষ্ঠতর চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারে এবং বিচারের যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পাওয়াতে বুদ্ধির অসাধারণ উন্নতি করিতে পারে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার সাক্ষ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে কোন দেশের অধিকাংশ লোকই যথেষ্ট বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চচিন্তা করিতে পারিতেন তাঁহারা বিচার করিয়া যাহা মীমাংসা করিতেন তাহাই মানিয়া নেওয়া ছাড়া সাধারণ লোকের আর গত্যন্তর ছিল না। বুদ্ধির এই পার্থক্য অনুভব করিয়া একদিকে উচ্চস্তরের লোক যেমন নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন তেমনি অন্যদিকে হীনতর ব্যক্তিগণ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইল। তাই আমরা দেখিতে পাই—জীবনের সুখ-দুঃখ বিলাস-ব্যসন সমস্ত শ্রীগুরুচরণে উৎসর্গ করিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য; পিতামাতা পুত্রের সাক্ষাৎ দেবতা, পুত্র পিতার দাসানুদাস; ভগবানের অংশে রাজার জন্ম, রাজদর্শন মহাপুণ্য—শাসন ত অবশ্যমাননীয়।

কিন্তু সেই একদিন, আর এই একদিন! ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ৩১.শে অক্টোবর জার্ম্মানীর অন্তর্গত উইটেনবার্গ নগরের রাস্তায় একজন লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছিল "রোমের পোপ দশম লিও স্বর্গের স্থান বিলি করিতেছেন, যাঁহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া সুখে থাকিতে চান, তাঁহারা উপযুক্ত মূল্য দিয়া অবিলম্বে স্থান ক্রয় করুন।" উক্ত নগরের গির্জ্জায় একজন ধর্ম্মযাজক কাজ

করিত, সে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি বলিতেছ? খৃষ্টজগতের ধর্ম্মগুরু পোপ মূল্য নিয়া স্বর্গের স্থান বিক্রয় করিবেন? মূর্খ! অসম্ভব! মানুষের কি কখন স্বর্গরাজ্য বিক্রয় করিবার অধিকার থাকিতে পারে?" প্রাণের আবেগে সেই ধর্ম্মযাজক ছুটিয়া চলিল—পৃথিবীর ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। এই মার্টিন লুথারের চেষ্টাতেই খৃষ্টধর্ম্মে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং বহু অনাচার অত্যাচারের পর তাঁহার প্রটেষ্টাণ্ট্ মত অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করিল। বুদ্ধির একশৃঙ্খল খসিয়া পড়িল।

আবার দেখুন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া নববলদৃপ্ত ইস্‌লাম ইয়োরোপ আক্রমণ করিয়াছে। এক-দিকে তুরস্ক অন্যদিকে স্পেন মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল—সমস্ত ইয়োরোপ শিহরিয়া উঠিল, শেষে কি ইয়োরোপ খণ্ড মুসলমানদের করতলগত হইবে! ছোটবড় সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—তাহারা ভাবিল 'এজন্য রাজারাই দায়ী, তাঁহারা নিজেদের সুখ সুবিধা লইয়াই ব্যস্ত, দেশের শুভাশুভের দিকে তাঁহারা দৃকপাতও করেন না। সুতরাং আর নয়, জনসাধারণ যে ভাবে সঙ্গত মনে করে সেইভাবে রাজ্য পরিচালনা করাই দেশের মঙ্গল—রাজার কোন প্রয়োজন নাই।' দেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল—ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস ও ফরাসী দেশের রাজা ষোড়শ লুইকে বলি দিয়া এ মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইল। বুদ্ধির আর এক শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল।

স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পাইয়া মানব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহারা আর বাধা মানে না। অসাধ্য সাধন করিতে চাহে। তাহাদের উদ্যমের ফলে যে সকল সার্থক ও অনর্থক ঘটনা ঘটিয়াছিল; তাহাই ইয়োরোপের পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাস। এই যুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার বিষয়ে যেরূপ উন্নতি দেখা গিয়াছিল ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ হয় নাই।

স্বাধীন চিন্তার এই বাণী দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে ইয়োরোপের অধিবাসিগণই দলে দলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা এই ভাবের ভাবুক বলিয়া অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিল। ইহাতে স্বাধীনতার গতি যেন পশ্চিমবাহিনী হইয়া গেল। কারণ তারপরই জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার উন্নতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরও পশ্চিমে চীন দেশ। তাহারা বহু শতাব্দীর সুদীর্ঘ শিখা কাটিয়া চা ও আফিংএর নেশা কাটাইয়া যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য রণদামামা বাজাইতেছে, সে নিনাদ আপনাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে কি? চাহিয়া দেখুন, আপনার দেশের বাতাসও বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে—পুত্র আর পিতাকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান করে না, প্রজার আর রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নাই শিষ্য আর গুরুকে ভক্তি দেখায় না, শূদ্র ব্রাহ্মণকে মানে না, ভৃত্য প্রভুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এ দেশেই শেষ নয়, এসিয়ার পশ্চিমতম দেশেও এ বাতাস বহিতেছে; তা না হইলে কি মুসলমানের মুকুটমণি খলিফাকে তাহারাই দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে পারে, না অসূর্য্যম্পশ্যা কুল ললনারা পর্দ্দা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিতে পারে!

ধনুকের গুণ ছিঁড়িয়া গেলে দণ্ড যেমন আড়ষ্টভাব ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; মহাবেগে বিপরীতদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, তেমনি উদ্বুদ্ধ জনগণ স্বাধীনতার বৈদ্যুতিক আলোকে বিভ্রান্ত হইয়া যে কোন পথকেই শ্রেয়োলাভের অবলম্বন মনে করিতেছে এবং বর্ত্তমানে নানা প্রকার বিভ্রাট ঘটাইতেছে। আজ যাঁহারা উচ্চপদ অধিকার করিয়া আছেন তাঁহারা চিরনিম্নের এই আস্ফালন দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবেন না। সত্যবটে যাহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া পথের ধূলির মত পদতলে স্থান পাইয়া আপনা-দিগকে ধন্য মনে করিত আজ আবার তাহারাই স্বাধীনতার বাতাসে উড়িতে উড়িতে গগনস্পর্শ করিয়া চারি-দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা বলিতেছে "কোন এক অতীত কালের এক প্রতিযোগিতায় আমরা পরাস্ত হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু সে পরাজয়কে চিরপরা-জয় বলিয়া আমরা বরণ করিয়া লইতে পারি না। আজ আমরা আর একবার প্রতিযোগিতা করিতে প্রস্তুত। হে বিগত বারের বিজয়ী বীরগণ! আপনাদের জয়মাল্য ক্ষণিকের জন্য খুলিয়া রাখিয়া আসুন সকলের মাঝে এই

উন্মুক্ত মাঠে! দেখি এবার আমরা পারি কি না। আমরা চাই সারাজীবন, জন্মজন্মান্তর এই চেষ্টায় জীবনপাত করিতে যে কিসে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিতে পারি! আমরা বুঝিতে চাই কিসে আমরা হীন, আর সে হীনতা দূর করা যাইতে পারে কি না!"

মানব রক্ষণশীল, পরিবর্ত্তনকে সে সহজে গ্রহণ করিতে চায় না; কারণ তাহাতে তাহার সংস্কার ও বিবেকে আঘাত লাগে। বিশেষতঃ যাঁহারা অনাদিকাল হইতে বুদ্ধিতে ও বলে অন্যের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সে ক্ষমতা লোপ হওয়াতে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাঁহারা পুরাতন বিধিব্যবস্থার দোহাই দিয়া ইহাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহা কিছু মাত্র ফলপ্রসূ হইবে না। কারণ তাহারা কৈফিয়ত চায়। আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে প্রশ্ন উঠিয়াছে 'কন?'—এটা কেন? সেটা কেন? প্রশ্নের বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, উত্তর দিয়া উঠা ভার! বস্তুতঃ ইহাই স্বাধীন চিন্তা স্ফুরণের লক্ষণ। উচ্চ যাঁহারা তাঁহারা যদি মদগর্ব্বী আওরংজীবের ভাষায় বলেন 'কৈফিয়ত যদি না দেই, তবে তাহার সদুত্তর ইহাই হইবে যে, 'তা হলে বুঝব যে দেওয়ার মত কৈফিয়ত কিছু নেই!'

ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু এ গতি রোধ করে কার সাধ্য! কেহ কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন 'রাজার তেমন কড়া শাসন নাই, পিতার তেমন আধিপত্য নাই, গুরুর তেমন তেজ বীর্য্য নাই—তারই ফলে এই ঔদ্ধত্য'। প্রকৃত পক্ষে ঐ গুলি কারণ নহে, এসব স্বাধীন চিন্তারই ফল। মানুষ যখন মুক্তির আস্বাদ পায়, যখন নিজের মূল্য বুঝিতে পারে তখন সে প্রাণান্তেও হীনতা ও দাসত্ব স্বীকার করে না। ঐ শুনুন তাহারা গাহিতেছে—'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে, ততই মোদের বাঁধন টুটবে।' এদৃশ্যে শাসকের দণ্ড হস্ত হইতে আপনি খসিয়া পড়ে, আর মন্দই বা বলি কি করিয়া? চিন্তার স্বাধীনতা ত সকলের ভিতরেই দেখা যায়—যে ভৃত্য তাহার প্রভুর নিকট ষোলআনা অধিকার দাবী করে তাহার নিকটই পুত্রের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয় মনে হয়; যে গুরু অন্যের নিকট হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার মুক্ত ভাবে পাইতে চাহিতেছে সেই তাহার শিষ্যের প্রতি জ্ঞান বিতরণে কার্পণ্য প্রকাশ করে; যে বর্ণ অন্য বর্ণকে অশুচি জ্ঞান করে, সেই আবার গৌরবর্ণের নিকট স্বায়ত্ত শাসনের প্রার্থনা জানায়। স্বার্থের বিরোধ ভিন্ন ইহাকে আর কি বলিবেন!

ছোট বড়—চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিবে; কিন্তু কে ছোট কে বড়—তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ, তাই আজ বোঝাপড়ার দিন আসিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের চিন্তাশক্তির বিকাশ হওয়াতে তাহারা বুভুক্ষুজনগণের ন্যায় জিজ্ঞাসুভাবে আপনাদের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান। আজ প্রভু ভৃত্যকে, গুরু শিষ্যকে, পিতা পুত্রকে, রাজা প্রজাকে তাঁহাদের আদেশনির্দ্দেশের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া দিউন, আর প্রচলিত হইলেও যাহা অযৌক্তিক তাহা পরিহার করুন। আর যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ধুরন্ধর তাঁহারা শাস্ত্রের 'বরং মাতৃবধং কুর্য্যাৎ নৈকাদিত্যে দ্বিভোজনং' প্রভৃতি অবোধ্য ভাব ও ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া দিউন, পরন্ত প্রচার করুন—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যঃ বিনির্ণয়ঃ
> যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী।

রাস পূর্ণিমায়।

(১)

কার পূজা ঘরে ঘরে রাস পূর্ণিমায়?
এমন মধুর নিশি, দশ দিশি হাসি হাসি
সুধাধারা ঢালি শশী ধরণী হাসায়
কোকিল পাপিয়া গায়, "পিয়ারে" পাইতে চায়
শেফালি, বকুল বায় নিশি নিদ্রা যায়॥
তটিনীর কুলুতানে রাখাল বাঁশরী গানে,
পুলকে শিহরি টানে আকুল হিয়ায়।
এমন জোছনা রাতে, গোপিগণ নিয়ে সাথে;
রাস লীলা এ ভারতে করি শ্যামরায়—
হরিয়াছ কুলমান, ব্রজ বধূগণ প্রাণ;
সরম ভরম জ্ঞান দিছে তব পায়।

মরি কি মাহেন্দ্রযোগ, ঘুচে গেছে কর্ম্ম ভোগ;
পুলকে দিয়াছে পাড়ি ভরা দরিয়ায়॥
আজি যুগ যুগ ধরি, সে দিনের কথা স্মরি;
ভারতের নরনারী করে আবাহন।
মোহন মুরলী ধরি, এসো পুনঃ এসো হরি;
সার্থক করহ রাসে স্মৃতির তর্পণ॥

(২)

কার পূজা ঘরে ঘরে রাস-পূর্ণিমায়?
সাজায়ে কানন কুঞ্জ, ফুটায়ে কুসুম-পুঞ্জ;
ষোড়শ নাগরী মাঝে কারে দেখা যায়?
গলে বনমালা ছড়া, পীতবাস পীতধরা;
শিখি পুচ্ছ শিরে চূড়া কিবা শোভা তার!
মোহন মুরলী করে চরণ চরণো'পরে
মন্দাকিনী মন্দগতি লহরে খেলায়।
কারপূজা ঘরে ঘরে রাস-পূর্ণিমায়?

(৩)

কার পূজা ঘরে ঘরে রাস-পূর্ণিমায়
কত যুগ বয়ে যায়, তবু ত না ভোলা যায়;
আজিও তোমারে চায় সকল হিয়ায়!
এসো নটবর হরি, অধরে বাঁশরী ধরি;
বাজাও সে সুর—যাহে আপনা হারায়!
ভুলি নর পাপ পুণ্য, হৃদয় করিয়া শূন্য
ছুটুক যমুনা পানে কদম্ব তলায়।
তোমারি চরণ তলে, মিলে সবে দলে দলে
এক মন্ত্রে নিয়ে দীক্ষা প্রেম মহিমায়,
একধর্ম্ম একনীতি, প্রতি জীবে শিব-প্রীতি;
একই বন্দনা গানে মুখরি ধরায়;
পুজিবে তোমায় সবে, রাস-পূর্ণিমায়!

(৪)

রাস পূর্ণিমায় পূজি সেই দেবতায়,
যাঁহার বাঁশরী স্বরে জগৎ একত্র করে,
পাপ তাপ শোক হরে' আনন্দ বহায়।
জাগে মৃতপ্রায় জাতি, জড়তারে মারি লাথি;
বিলাস-ব্যসন-গ্লানি অন্তরে পলায়॥
জাগে প্রাণে ভূমানন্দ, ঘুচে যায় স্বার্থদ্বন্দ্ব
মহাশক্তি, স্বাস্থ্য শান্তি বিরাজে হিয়ায়।
তা হ'তে উপজে ভক্তি, দেশ ধর্ম্মে অনুরক্তি;
অধীনতা-পাশ লুটে চরণ তলায়॥
কেহ নহে কারো ভৃত্য, সকলি স্বাধীন চিত্ত,
জাগে মড়া—যতদূর বাণী শোনা যায়।
মরুভূমে ফুটে ফুল, ভাঙে জন্ম জন্ম ভুল,
বীর্য্যবন্ত উষ্ণরক্ত হৃদয়ে খেলায়।
রাসপূর্ণিমায় পূজি সেই দেবতায়॥

(৫)

তারে পূজে দেশবাসী রাস-পূর্ণিমায়,
বৃন্দাবনে বংশীধারী, কভু বা দুষ্কৃতহারী;
শঙ্খ-চক্রগদা-ধারী মহাকাল প্রায়!
পূতনা কালীয় কংস, শিশুপাল করি ধ্বংস
রাজসূয়ে ব্রাহ্মণের চরণ ধোয়ায়!
ধরিয়া সারথি বেশ, 'অধর্ম্ম করিলা শেষ;
কুরুক্ষেত্রে সিন্ধুতীর প্রভাসে হেলায়!
এসো পুনঃ সেই হরি রাস-পূর্ণিমায়!

(৬)

রাস-পূর্ণিমায় আজি এসো ভগবান!
তোমার এ মাতৃভূমি, চাহিয়া দেখনা তুমি;
দেখ না ভারত জুড়ি' কি মহাশ্মশান,
হিমাদ্রির চূড়াপরে, অরুণ-কিরণ পড়ে;
ভারতের চিতানল—চির-অনির্ব্বাণ?
যমুনা মলিনা আজ, নাহি সে রাখাল রাজ;
নাহি তমালের তলে বাঁশরীর গান॥
তোমার জনমভূমি, ভুলিয়া রয়েছ তুমি,
ভূভার-হরণ কৃষ্ণ-পূর্ণ ভগবান!
জননী কংসের ঘরে, শৃঙ্খলিতা আছে পড়ে,
তার বুকে দুর্ভাগ্যের বিরাট পাষাণ!
অন্নজল নাহি মুখে, ছিন্নবস্ত্র নাহি বুকে
রক্তধারা উঠে মুখে, অন্ধ দু'নয়ান!
কঙ্কণ কেয়ুর হার, মেঘমালা কেশভার;
সীমন্তে সিন্দুর ধার—সবি অন্তর্ধান!
মায়ের ললাট'পরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
বিহরে দানব দস্যু শঙ্কাহীন প্রাণ!
ত্যজ যোগনিদ্রা, হরি, সকলি লইল হরি
মদমত্ত ষড়রিপু পাপের সন্তান!
লাঞ্ছিতা জননী যার, এত নিদ্রা সাজে তার?
আছে কেহ কাপুরুষ এমন ধরায়?
কিবা গেছ দূরদেশে, কোন্ বণিকের বেশে;
আনিতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরি পুনরায়!
এসো শীঘ্র এসে হরি, পাঞ্চজন্য ধ্বনি করি;
নিয়ে গদা সুদর্শন সৃষ্টি ডুবে যায়।
উদ্ধার পতিত দেশ, এসো ত্বরা হৃষীকেশ;
পাপের তাপের জ্বালা কত সহা যায়।
তাই পূজে নরনারী রাস-পূর্ণিমায়॥

আবার বাজাও বাঁশী রাস-পূর্ণিমায়
হিমালয় কুমারিকা, ছুটাও তাড়িত শিখা;
জাগাও নিদ্রিত ব্রজ, বেলা বয়ে যায়।
মল্লারে ধরিয়া তান; জাগাও ভারত প্রাণ;
ঢালি মৃত-সঞ্জীবনী জাতীয় হিয়ায়!
আবার দীপক রাগে, যেমন আছিল আগে;
তেমনি আগুন জ্বাল হৃদি কলিজায়!
ভাঙ্গিয়া পাষাণ কারা, এসে কালিন্দীর ধারা;
আনন্দে ভারত যেন ভাসাইয়া যায়।
আবার কদম্ব ফুলে, গুঞ্জিত ভ্রমর কুলে;
কোকিল পাপিয়া দলে সুধা ঢালি গায়॥
পুনঃ তমালের তলে, নাচুক রাখাল দলে;
কলাপী নাচুক প্রেমে বিটপী শাখায়!
ধেনুবৃন্দ বৃন্দাবনে, আনন্দে বাঁশরী স্বনে;
বৎস ছাড়ি স্নেহ ভরে চাটুক তোমায়!
আবার গোপিকা গণে, নিয়ে প্রেম বৃন্দাবনে;
কর হরি রাস লীলা এমনি জ্যোছনায়!
জগৎ উদ্ধার হরি রাস-পূর্ণিমায়॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলন।

উচ্ছে ও করলা।

তরিতরকারি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া উচ্ছেকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ইহার আস্বাদ তিক্ত হইলেও ইহা হইতে উপাদেয় ও হিতকর ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৈদেশিকগণও এ দেশে আসিয়া উচ্ছের 'কারির' কদর বুঝিয়াছেন।

উচ্ছেকে সংস্কৃতে কারবেল্লী, ল্যাটিনে Momordica Charantia (মোমরডিকা চ্যারেনটিয়া), ইংরাজীতে Bitter Gourd (বিটার গোর্ড), হিন্দিতে ছোটী করেলী ও মারাঠাদেশে লঘু কারেলী বলিয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে উচ্ছের গুণ বহুবিধ; যথা—তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, অরুচিনাশক: এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শ্বাস, কাশ, জ্বর, ক্রিমি, ক্ষত, রক্তদোষ, মেহ, কামলা, পাণ্ডু, বাত ইত্যাদি রোগাপহারক। হাকিমি মতে ইহার গুণ বলকর ও পাকস্থলী হিতকর। ইহা গ্রন্থিবাত প্লীহা ও যকৃৎরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে নিয়মিতরূপে উচ্ছে ও করলা পাতার রস অথবা সুকৃত খাইলে বসন্তরোগের আক্রমণাশঙ্কা হ্রাস হয়। কুষ্ঠরোগে উচ্ছে ভোজন ও উচ্ছে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। উচ্ছে সিদ্ধ খাইতে তিক্ত হইলেও ইহা কুচি কুচি করিয়া ভাজিলে অথবা প্রণালী বিশেষে ইহার সুকৃত করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পতিক্ত ও অধিকতর মুখরোচক হয়।

একেবারে বেলেমাটি ভিন্ন আর সকলপ্রকার মাটিতেই উচ্ছে জন্মিয়া থাকে। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী দো-আঁশ জমীই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। পলিমিশ্রিত এবং ধোয়াট মাটিই ইহার পক্ষে উচ্চশ্রেণীর সারের কাজ করে।

বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে উচ্চ ভূমিতে অথবা শরতের শেষে জমিতে যখন হিম পড়িতে থাকে কিংবা পলি বসিয়া যায় তখন ইহার চাষ আরম্ভ করিতে হয়। অগ্রহায়ণের মধ্যেই জমী তৈয়ার করিয়া ২।৪ হাত অন্তর মাদা করিতে হয়। প্রত্যেক মাদাতে ৩।৪টী বীজ বপন করিয়া তদুপরি খড় বিছাইয়া মাটি ঠাণ্ডা রাখিয়া বীজ সজীব রাখিতে হয়। বীজ বপনান্তে ২।১ দিন অন্তর বৈকালে অল্প পরিমাণে জলসেচন করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ সপ্তাহখানেকের মধ্যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। চারাগুলির গোড়ায় সময় সময় কিছু কিছু মাটি দিয়া দিলে গাছ সতেজ হয়। অধিকাংশস্থলেই চারাগুলি আধ হাত উচ্চ হইলে মাদা হইতে উঠাইয়া মাঘ মাসে ক্ষেত্রে রোপণ করা হইয়া থাকে। অবশ্য মাদাতে রাখিলেও বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই, ফলনও যে খুব কম হয় তাহা নহে। মাদায় রাখিতে হইলে অপেক্ষাকৃত রুগ্ন গাছগুলি উঠাইয়া ফেলাই সঙ্গত। কারণ কতকগুলি গাছ একত্র থাকিয়া জড়াইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা অথচ সংকীর্ণস্থানে যথেষ্ট খাদ্যও পায় না; সুতরাং ফলন আশাপ্রদ হইতে পারে না। অন্যত্র রোপণের ব্যবস্থা করিলে ক্ষেত্রটী উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া বিশেষ পাট করা দরকার। এক একটী কেয়ারী দীর্ঘে চারি হাত ও প্রস্থে হাত তিনেকের অধিক না হওয়াই ভাল। কেয়ারি-গুলির মধ্যে কিছু স্থান ব্যবধান থাকিলে সুবিধা হয়। উচ্ছে গাছে জলসেচনে কৃপণতা প্রদর্শনই সমীচীন। বেশী জল সেচনে গাছের অনিষ্ট হয়, পক্ষান্তরে জলসেচন বিনাও

ইহারা দীর্ঘদিন জীবিত থাকে। গাছগুলি যখন লতাপাতা বিস্তার করিয়া উঠে তখন ডগার নীচে বিচালি বিছাইয়া দিলে রৌদ্রে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। স্থলবিশেষে অনুচ্চ মাচা করিয়া দেওয়াই সুবিধা। কেহ কেহ বাঁশের কঞ্চি বা তদ্রূপ কোন অবলম্বন দিয়া থাকেন। ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতেই গাছে উচ্ছে ধরিতে থাকে এবং বর্ষার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত ফলন হয়। বৃষ্টির সংস্পর্শেই গাছ পচিতে আরম্ভ করে।

করলা উচ্ছেরই উন্নত সংস্করণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বহু প্রাচীনকাল হইতেই ইহা নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। উভয়ই প্রায় সমগুণসম্পন্ন। করলার পাতা উচ্ছের পাতা অপেক্ষা অধিক বিরেচক, কিন্তু করলার ফুল আবার মলরোধক এবং রক্তপিত্ত রোগে উপকারী।

করলা সংস্কৃতে কারবেল্ল, ল্যাটিনে Momordica Muricata মোমরডিকা মিউরিকেটা ইংরাজীতে Balsam apple (ব্যালসাম্ এপল্) হিন্দিতে করেলী, মারাঠা ভাষায় কারলী. উৎকল ভাষায় শলরা এবং তেলেগু ভাষায় কাকর চেট্টু নামে অভিহিত হয়।

করলার চাষ উচ্ছেরই মত। সাধারণ জমিতে করলা ভাল হয় না। পলিপড়া জমিই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট। চৈত্র মাসের প্রথমভাগ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বীজ ফেলিতে হয় এবং প্রতিদিন জল দিতে হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

পাগ্‌লা।

(গদ্য কবিতা)

ছোট্ট বুচ্‌কি বগলে হাতে লাঠী একটা লোক ভোর
থেকে সন্ধ্যে অবধি কেবল চলে, কেবল চলে!
রাত্তিরে কি করে জানিনে, তখন তো আর দেখ্‌তে পাইনে।
তার চলার সীমা হোলো, ডাল্‌কোর্ পোল্ থেকে
বালুয়া নদীর কিনারা অবধি।
ঝড়্ বৃষ্টি, রোদ্ ঠেলে বার মাস সে সমান চলে,
গ্রীষ্মের চাঁদি-ফাটা রোদ, বর্ষার পিছল পথ,
শীতের কন-কনে হাওয়া,
কেউ তাকে রুখ্‌তে পারে না।
চলতে চলতে নেতিয়ে পড়ে, মুখ চোখ লাল হয়ে
যায়, হাঁপাতে থাকে, তবু সে বসে না।
বড় কষ্ট হলে লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটু
দম্ 'নিয়ে ন্যায়্।
ও কাকে পেতে চায়?
লোকে বলে সে পাগল। নাম "কেষ্ট চক্রবর্ত্তী"।
সে বলে "পাগল আমি না তোরা?"
সংসারে বসাটা ঠিক, না চলাটা?
সবাইতো চল্‌ছে বসে কেউ নেই!
রবি সারা দিন চলে, শশী চলে সারা রাত।
তারা গুলোও বসে নেই।
বীজ চলে, অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর চল্‌তে গিয়ে গাছ হয়ে পড়ে।
গাছ চোলে' চোলে' ফুল হয়; ফল, ফুলেরই চলার ফল,
ফল বীজে এসে আবার নতুন কোরে চলতে সুরু করে।
এরাত থামছে না!
ছেলে চলে' যোয়ান হয়, যোয়ান চলে' হয় বুড়ো;
শিশু, বুড়োরই চল্‌তে চলতে হঠাৎ একটু থেমে
আবার চলা।
এরা যে কোন এক অজানা দিন থেকে চোল্‌তে সুরু
করেছে, আজো তো থাম্‌লো না!
এরা যেন কাকে না পেয়ে চল্‌ছে।
আমিও এদের পিছু পিছু চল্‌ছি!
এরা যে দিন অপাওয়াকে পেয়ে থাম্‌বে,
আমিও থাম্‌বো সে দিন।
তার আগে থাম্‌ছিনে, বাবা!
ওরে, তোরা থেমে আছিস্ কেন!
চল্‌না এগিয়ে চল্!
ভালরাই চলে, বসে থাকে পাগ্‌লারা।
এই বলে আবার চল্‌তে লাগ্‌লো।
তাইতো; পাগল কে? ও, না আম্‌রা?

শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত।

প্রহেলিকা।

কবি কালিদাস ঠিকই বলিয়াছেন যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি; নতুবা আমার মত স্বল্প বেতনের বাঙ্গালী কেরাণীরও বক্ষে বক্ষে ঘূর্ণীবায়ু উপস্থিত হয় কেন? এবার যখন পূজার ছুটী প্রায় সমুপস্থিত এবং আফিসের বড় বড় বাবুরা কেহ বা "রাচি", "গিরিডি" ইত্যাদি বড় বড় কথা কহিতেছিলেন ঘূর্ণীবায়ুগ্রস্ত আমিও ঠিক করিয়া ফেলিলাম অগত্যায় কম খরচায় চন্দ্রনাথ, আদিনাথ হইয়া কিছুদিন সাগরতীরে কুতুবদিয়া গিয়া হাওয়া বদলাইয়া আসিব।

আত্মসম্মানের রাশ খাটো করিতে না পারিলে দুনিয়াতে লোকের সহিত মেশামিশিই কঠিন, তাহাতে আবার যাহারা দেশ বিদেশ ভ্রমণ ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে মানের রাশ বাড়ানো বিড়ম্বনা মাত্র।

আমার পূর্ব্বপুরুষেরা মগের দেশে আসিয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে সাত পুরুষে কেহ যে আসেন নাই, তাহা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি। যাহা হউক, আমার বাঙ্গাল দেশের জনৈক বন্ধু তাঁহার বিশেষ কোন পরিচিত বন্ধুর নাম করিয়া চিঠি দিলেন ও বলিয়া দিলেন, তাহার বন্ধু রাম বাবু সাগর তীরে কুঠী নির্ম্মান করিয়া বসবাস করিতেছেন। রাম বাবু অতিশয় সাদাসিদেগোছের অমায়িক ভদ্রলোক, দূরদেশে আমাকে পাইলে পরম আত্মীয়ের মত রাখিবেন।

চন্দ্রনাথ ও আদিনাথের নৈসর্গিক শোভা দেখা শেষ করিয়া একদিন আদিনাথ উদ্দেশে কুতুবদিয়ার জাহাজে কুতুবদিয়া আসিয়া পৌছিলাম—তখন সন্ধ্যা।

সহরে আমি, ভাবিয়াছিলাম জাহাজ হইতে নামিয়াই প্রস্তুত যানবাহন পাইব। একটা কুলি ঠিক করিয়া অতি কষ্টে আমার ভাষা তাহাকে বুঝাইয়া এবং আমি তাহার ভাষা বুঝিয়া রাম বাবুর গৃহের দিকে চলিলাম। কুলিকে রাম বাবুর বাসায় যাইতে বলিলে—সে রাম বাবুর বাসা কোথায়—জানে না বলিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সাগরের ধার দিয়া দ্বিতীয়ার ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে কতকগুলি জেলে মাছ ধরা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, রাম বাবুর বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল "ভূতের বাড়ী? জেলের কথায় বুঝিলাম—রাম বাবুর বাড়ী ভূতের উপদ্রবগ্রস্ত। তাহারা পথটা বলিয়া দিলেও বেশী সাবধান করিয়া দিল—"এই রাতের বেলায় ভূতের বাড়ী না যাওয়াই ছিল ভাল।"

রাম বাবু স্বয়ং মানুষ না ভূত, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। রাম বাবুর গৃহের প্রাঙ্গনে আসিয়াই দেখিলাম—একটী পশ্চিমা আধ বয়সী চাকর; তাহাকে বলিলাম "একটী ভদ্রলোক আসিয়াছে, রাম বাবুকে খবর দাও।" রাম বাবু একটী হারিকেন হাতে, চটিপায়ে আমাকে নানা ভদ্রতা সূচক সংবর্দ্ধনা করিতে করিতে ঘরে লইয়া গেলেন। রামবাবুর বয়স পঞ্চাশের উপর, গোলগাল চেহারা, বেশ সদালাপী এবং সদানন্দ। জানিলাম তিনি স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির আশায় হাওয়া পরিবর্ত্তন জন্য বর্ত্তমান কুঠীটী ভাড়া লইয়াছিলেন। পরে স্ত্রীর মৃত্যুর পর লোকালয় বর্জ্জিত সাগরতীরে অবশিষ্ট দিন কয়টা কাটাইবার জন্য রীতিমত বসবাস করিতেছেন। ভূতে পাওয়া বাড়ীর কথাটা কিন্তু আমার মনে তখনও বেশ উঁকিঝুঁকি মারিতে-ছিল। লোকবহুল ও দিবালোকের মত আলোকিত সহরে ভূত নাও আসিতে পারে কিন্তু জনমানবহীন সাগরতীরে নির্জ্জন গৃহে ভূতকে তাড়ানো বড় সহজ সাধ্য নহে।

একদিন অবসর বুঝিয়া রাম বাবুকে বলিয়া ফেলিলাম যে "তাঁহার বাড়ী ভূতে পাওয়ার জনশ্রুতিটী কি?" তিনি খানিক্ষণ অস্বাভাবিক গম্ভীর থাকিয়া নানাপ্রকার প্রেততত্ত্ব, ইহকালের সহিত পরকালের জীবসম্বন্ধ—নানা ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার কতক বা বুঝিলাম, কতক বুঝিলাম না। সেই আধবুঝা বা না বুঝা কথার উত্থাপন এ স্থলে না করাই ভাল। যাহা হউক, খানিক্ষণ বক্তৃতার পর যখন তিনি বুঝিলেন যে আমি ভূত মানি, তখন বলিলেন, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর দিন হইতে প্রতি দিনই মৃত স্ত্রীর আত্মার সহিত তাঁহার দেখা শুনা—এমন কি গল্প গুজব পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। "আমাকে দেখাইতে পারেন কি না" জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন যে "অদ্য রাত্রেই উহা দেখাইবেন।" সন্ধ্যা আটটা বাজিতে মিনিট পনর বাকি

থাকিতে সন্তর্পণে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামী বলিলেন "সময় হইয়াছে"; আমি তাঁহার সহিত যে গৃহে রামবাবু ও তাঁহার স্ত্রী থাকিতেন সেই গৃহে উপস্থিত হইলাম। রামবাবু নিজে একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া আমাকে তাঁহার পাশে বসাইয়া বলিলেন, তাঁহার স্ত্রী প্রতি রাত্রের মত ঠিক নিয়মিত আটটার সময়ই আসিবেন। রামবাবুর গৃহের দেয়ালে তাঁহার মৃত স্ত্রীর খুব বড় একখানা রঙ্গীন ব্রোমাইড্ এন্লার্জমেণ্ট। আটটা বাজিতে যখন মাত্র সামান্য কয়েক সেকেণ্ড বাকী তিনি তখন আমাকে ইঙ্গিত দ্বারা সতর্ক করিয়া ছবিখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। প্রকোষ্ঠটী পূর্ব্ব হইতেই প্রায় অন্ধকার ছিল;—আটটার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অপার্থিব আলো: অর্থাৎ না লাল না সাদা খানিকটা ব্লু রং মিশ্রিত সাদা আলো ছবির মুখে দেখা যাইতে লাগিল। আমি ভয়ে একবার চক্ষু বুজি একবার চক্ষু মেলি, আবার একবার ভাবি চীৎকার করি! শরীর রোমাঞ্চিত, দেহটা যেন ফুলিয়া ত্রিগুণ হইয়াছে।

রামবাবু শোক গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ভয় নাই, এইবার আরও কিছু প্রত্যক্ষ করুন।" আমি দেখিলাম ছবিটী যেন ঠোট কাঁপাইয়া কি বলিতে চাহিতেছে এবং ধীরে ধীরে যেন গ্রীবা বাঁকাইতেছে। আর না, আমি রামবাবুকে বলিলাম, "মহাশয় আমাকে নিজ প্রকোষ্ঠে রাখিয়া আসুন।" রামবাবুও বেগতিক দেখিয়া বিরক্তিসহকারে আমাকে নিজ প্রকোষ্ঠে রাখিয়া আসিলেন। আত্মিক দেহ চলিয়া গেলে খানিকক্ষণ পরে রামবাবু আমার প্রকোষ্ঠে আসিলেন! রামবাবু বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর দিন হইতেই প্রতিদিন ঠিক আটটায় নিয়মিত ভাবে তাঁহার স্ত্রীর আত্মিক দেহের সহিত রামবাবুর দেখা শুনা হয়। এ কথাটাই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াতে রামবাবুর গৃহ "ভূতের বাড়ী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামবাবু আরও বলিলেন "প্রতিদিন তাঁহার স্ত্রীর আত্মিক দেহের সহিত দেখা শুনাই তাঁহারি সাধনা এবং রামবাবুর দেহান্তে রামবাবুর আত্মার সহিত তাঁহার স্ত্রীর আত্মার মিলনই সিদ্ধি। তাই তিনি ঐহিক সমস্ত সুখ বিস্মৃত হইয়া সমাজকে উপেক্ষা করিয়া সাগর তীরে নিরিবিলি এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে, এই কুঠিতে বাস করিতেছেন।

পর দিবস প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বিগত রজনীর ভৌতিক বিষয় মনে মনে আধঅবিশ্বাস এবংআধবিশ্বাস সহ আলোচনা করিতেছি এমন সময় রামবাবু আসিয়া বলিলেন, কার্য্য ব্যপদেশে তিনি দুই তিন দিন অনুপস্থিত থাকিবেন, অনুনয় সহকারে আরও বলিলেন, "আমি যেন তাঁহার গৃহ নিজ গৃহ মনে করিয়া নিঃসঙ্কোচে বাস করি।" রামবাবু চলিয়া গেলে সমস্ত দিন আমায় ভূতের চিন্তা পাইয়া বসিল। একে একে গত রাত্রির সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম, মন ভূতের অস্তিত্ব ঠিক স্বীকার করিতে না চাহিলেও চাক্ষুষ ঘটনাকে অবিশ্বাস করি কি করিয়া? বিষয়টী নানা ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম, কূল কিন্তু পাইলাম না। রামবাবুর ভৃত্য আধ-বাঙ্গালী আধ-পশ্চিমা রামদীনকে ডাকিলাম। সে বলিতে লাগিল "বাবুর 'বহু' মরার পর হইতেই ভূতের উপদ্রব সুরু হইয়াছে," সে আরও বলিল, "বাবুর শয়ন কক্ষ নানা প্রকার বিলাতি ছবি, সোফা, আয়না, কারপেট্ও অন্যান্য আস্বাবে সজ্জিত ছিল। যে দিন বাবুর স্ত্রী মারা যায় সে দিনই সন্ধ্যাকালে রামবাবু মনোদুঃখে গৃহের আস্বাবাদি স্থানান্তর করিতেছিলেন, তখনই ভূতের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। ভূতটা আজ পর্য্যন্তও যাতায়াত করিতেছে।" সমস্ত দিনটা একপ্রকার কাটিল, কিন্তু সন্ধ্যা না হইতেই আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। নির্জ্জন নিঃসঙ্গ অবস্থায় মস্তিষ্কে স্বভাবতই কারণে অকারণে শত চিন্তা সাড়া দেয়। এদিকে বাড়ীতে রামবাবু অনুপস্থিত, সন্ধ্যাও প্রায় আগত, ভূতটা আমার সমস্ত মাথা জুড়িয়া বিরাজ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আটটা প্রায় বাজে বাজে হইয়া উঠিল, আমার মনে ভয় এবং ঔৎসুক্যের সমতাড়না আরম্ভ হইল। আমি রামবাবুর শয়ন প্রকোষ্ঠের দিকে চাহিয়া আছি, সেই আটটা বাজিল, বাধা বিপত্তির কথা মনে স্থান পাইল না। উত্তেজনা বশে রামবাবুর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ছবিরমুখে সেই ভৌতিক আলো! অমি চক্ষু বুজিয়া রাম নাম করিতে করিতে দ্রুতবেগে নিজ শয়ন গৃহে হাজির হইলাম।

রাত্রি প্রভাতেই আমি 'মরিয়া' হইয়া রামবাবুর শয়ন গৃহ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। এদিক্ সেদিক্, চারিধারের দেয়াল, তক্তপোষের নীচ, এমন কি রামবাবুর মৃত স্ত্রীর ছবিখানি পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে কসুর করিলাম না।

আমার সমস্ত ডিটেক্‌টিবগিরি ব্যর্থ হইয়া কেবল ভূতের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইতে লাগিল। আমার চক্ষু হঠাৎ রামবাবুর ঘরের মেজেতে পড়িল, টিনের বাংলোর দোতালা মেজ কাঠের তৈয়ারী, এবং সেই কাঠের মেজের মাঝখানটাতে ইঞ্চি পরিমাণ একটি ছিদ্র। অনুসন্ধানে ছিদ্রের চতুষ্পার্শ্বে সন্দেহের কিছু না পাইলেও কেন যেন খেয়ালের বশে একটী ন্যাক্‌ড়ার চিবি দিয়া ছিদ্রমুখ বন্ধ করিয়া আসিলাম।

আবার সেই কালসন্ধ্যা সমাগত! আটটাও বাজে বাজে! এবার মনে একটু সাহস করিয়া রামবাবুর ঘরে আটটার পুর্ব্বেই প্রবেশ করিয়া এদিক্, সেদিক্, দেখিতে লাগিলাম। ঘড়ির কাটা আটটায় পৌছিল, কিন্তু ভৌতিক আলো কোথায়? আটটা ছাড়িয়া সাড়ে আটটা, তবুও ভুত নাই, ব্যাপার কি? মেজের ছিদ্রের সহিত ভূতের কুটুম্বিতা নাই তো? আমি ন্যাক্‌ড়ার চিবি সরাইতেই আবার ছবির মুখে সেই আলো, আর বন্ধ করিতেই, ভূতের প্রয়াণ! কি আশ্চার্য্য, অদূরে কুতুবদিয়ার লাইট্ হাউজের ব্লু রংএর বৈদ্যুতিক আলোই রামবাবুর কাঠের মেজের রন্ধ্রপথে ভূত হইয়া প্রবেশ করে না তো? রন্ধ্রপথটী ন্যাক্‌ড়ার চিবি দিয়া আবার বন্ধ করিয়া আমি রামবাবুর প্রত্যাশায় আমার শয়ন কক্ষে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

দীর্ঘ প্রবাসের পর মিলনোৎসুক প্রণয়ীর ন্যায় রামবাবু ব্যস্তভাবে গৃহে ফিরিয়াই কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া নিজ শয়ন প্রকোষ্ঠে হাজির হইলেন। আমিও অলক্ষ্যে নীরবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলাম। রামবাবু তাঁহার মৃত স্ত্রীর ছায়া অদর্শনে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ হইতে আমি হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম "রামবাবু আপনার স্ত্রী আর আসিবেন না।" রামবাবু কিয়ৎকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তেজিত ভাবে উন্মাদের ন্যায় আমাকে আক্রমণ করিয়া বলিলেন "পাষণ্ড! তুইই রোজা ডাকিয়া আমার প্রিয়তমার ছায়া মূর্ত্তি চিরতরে আমার গৃহ হইতে অপসারিত করিয়াছিস, আমার একমাত্র সাধনার সম্বল ছায়া প্রতিমা চিরতরে বিলুপ্ত করিয়াছিস; যে খানে ছায়া মূর্ত্তি, আজ তোকেও সেখানে পাঠাই।" এই বলিয়া রামবাবু হস্তীবলে আমাকে কোণ ঠেসা করিয়া দোতালার জানালার কাছে আনিতেই বাহিরে কতকগুলি সামুদ্রিক পাখীর কলরব শুনা-গেল। রামবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "না, না, তোকে মুক্তি দিলাম; ঐ শুন্ প্রিয়তমা আমাকে ডাকিতেছে, আমিই যাই।" মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রাণের মায়া জলাঞ্জলি দিয়া রামবাবু দোতালা হইতে সেই অনির্দ্দিষ্টের পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই ঘটনার পর কত কাল চলিয়া গিয়াছে। রামবাবুর মত আমরাও কত অজানা আলেয়ার পিছনে ঘুরিয়া ধীরে ধীরে আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হইতেছি কি না কে জানে!

শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী বি এ

গোপালের মা।

কথা ও: কি উচুদরের—
"গোপাল গেছে জেলে"
ডান হাতে নাকের ডগাটী
উপর দিকে ঠেলে,
বর্ষিয়সী জননী তার
বলছেন জনে জনে
"তা দিয়ে উড়িয়ে দিছি
আমি তারে বনে।
চখ ফুটেছে মুখ ফুটেছে
খুটে খেতে পারে
তার কারণ কেন্ ভাবনা চিন্তা
কত্তে কও আমারে?
বেশ, শুনে খুব তুষ্ট হলেম
আহা, মরি-মরি—
গোপাল আমার জেলে গেছে
দেশের কার্য্য করি!"

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।
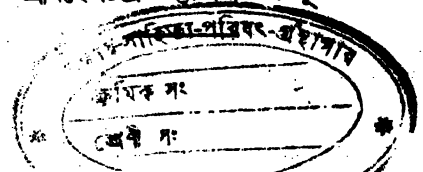
চিঠি ও উত্তর।

উপনীত ও উপবীত।

পরম কল্যাণবর

শ্রীমান কেদারনাথ মজুমদার ... ...

সৌরভ সম্পাদক

পরম আশীর্ব্বাভাজনেষুঃ—

আমার বিজয়ার শুভ কামনা ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। আমি সম্প্রতি পাটিতা দাসদিগের সংস্কার সম্বন্ধীয় ব্যাপারে লিপ্ত লইয়া সাখুয়াই যাইতেছি। কবিভূষণের আহ্বান। তাঁহারা সঙ্কীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া উদারতা দেখাইতে আশ্বাস দিয়াছেন, এ সুযোগ ছাড়িতে পারি নাঁ। গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে তোমাকে পাইব ও কথা গুলি উঠাইব আশা করিয়াছিলাম, তুমি আইস নাই সুতরাং কোন কার্য্যই হইল না।

আমি নীচজাতির জল চলের পক্ষপাতী হইলেও তাহাদের যজ্ঞসূত্রের পক্ষপাতী নহি। যজ্ঞসূত্র থাকিবে তাহার, যাহার বেদ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ধারণ করিয়া রাখিবার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জলচলের ব্যাপার কিন্তু এইরূপ নহে। এই অধিকারে কোন বিশিষ্ট গুণের বা ক্ষমতার দরকার করে না। সুতরাং আমার মতে হিন্দু মাত্রেরই একীকরণ বাঞ্ছনীয় কিন্তু হিন্দু মাত্রেরই পৈতা গ্রহণের স্পৃহা বাঞ্ছনীয় নহে।

আমি অন্যান্য জাতির কথা রাখিয়া তোমার নিকট কেবল তোমাদের কায়স্থ জাতির কথাই বলিব। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় টাঙ্গাইল অঞ্চলে কায়স্থদিগকে উপনয়ন দিয়া উপবীত ধারণ করাইতেছেন। কিশোরগঞ্জের মোক্তার তোমাদের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও নাকি উপনীত হইয়া উপবীতী হইয়াছেন। তোমাদের জ্ঞাতির ভিতরই আরও কে শুনিয়াছি—নিজেই মন্ত্র পাঠ ও চণ্ডীপাঠ করিয়া দুর্গাপূজা করিয়াছেন। ঢাকার কর্ম্মকার শ্রেণীও বর্ম্মা হইয়া "বর্ম্মের" পরিবর্ত্তে উপবীত লইতেছে। এগুলি কি সামাজিক উশৃঙ্খলতার পরিচায়ক নহে? কোন এক শ্রেণীর লোক মনীষা বলে যে গুণ অর্জ্জন করিয়া যাহার অধিকারী হইয়াছে, নির্গুণ—বিশেষ অনধিকারীর পক্ষে তাহার ভান করিতে যাওয়া কি উশৃঙ্খলা উৎপাদন করা নহে? জল চলের ব্যাপার এই শ্রেণীর নহে, তাহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পার।

তুমি ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ কায়স্থ কুলের বংশধর। পণ্ডিত হিসাবেও তোমার ন্যায় বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজেও খুব বিরল, তোমার রামায়ণ আলোচনা তাহার প্রমাণ। ইহা কেবল আমার মত নহে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে তোমার মত জানাই আমার তোমার সহিত সাক্ষাতের প্রধান কারণ। তুমি সন্ধ্যা আহ্নিক দ্বারা দ্বিজাতির অনুরূপ কার্য্য করিলেও পৈতা গ্রহণরূপ স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষপাতী নও। তোমার নিকট আমি প্রথমতঃ কায়স্থ বৈদ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নই উত্থাপন করিতেছি—আশা করি তুমি আমার এই প্রশ্নের সরল ভাবে উত্তর দিবা। উত্তরে যেন পক্ষপাতিত্ব না থাকে। পরন্তু তাহা পাণ্ডিত্য পূর্ণ হয়। আমার দ্বিতীয় কার্য্য হইবে কোন শ্রেণীর অধিকারে নিম্ন শ্রেণীর বেআইনী প্রবেশ নিবারণ করা। আমার প্রশ্ন—বৈদিক সাহিত্যে কায়স্থ ও বৈদ্যের উপনীত ও উপবীতী হইবার কোন উল্লেখ আছে কি না? থাকিলে তাহা কিরূপ? আমার মনে হয়—নাই।

বিদ্যালঙ্কার বেদের দোহাই দিয়াই কায়স্থকে পৈতা লওয়াইতেছেন—এ সম্বন্ধে তোমার মত সত্বর পাইতে চাই। ইহার পর আমি বিদ্যালঙ্কারের সহিত বুঝাপাড়া করিব।

আর একটী হাস্যোদ্দীপক বিষয় কায়স্থ ও বৈদ্যের উপাধির শব্দ দুটী—বর্ম্মা ও গুপ্ত। কায়স্থের আদি পুরুষ চন্দ্রগুপ্তের 'গুপ্ত' উপাধি লইলেন বৈদ্যেরা, আর বর্ম্ম ধারী ক্ষত্রিয়ের উপাধি লইলেন—মসীজীবী কেরাণীরা! এ রহস্য মন্দ নয়!

বর্ম্মের ব কারের সহিতও যাহার পরিচয় সম্বন্ধ নাই তাহারা বর্ম্ম হইতে চান, ইহা হাস্যজনক নয় কি? আজ এই পর্য্যন্ত অত্র মঙ্গল; কুশল চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শর্ম্মা শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

উত্তর।

প্রিয় শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ মহাশয়,

বিজয়ার প্রণাম পর নিবেদন—আমি আদার ব্যাপারী; আমার নিকট জাহাজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বিপন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্র-ব্যবস্থা দিবার অধিকার আমার নাই—তেমন অধিকারের স্পৃহারূপ ধৃষ্টতাও আমার যেন কখন না হয়। সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে

আমি "সতংবদ মা লিখ" নীতি অবলম্বন করাই সঙ্গত মনে করিলাম। সাক্ষাতে আলোচনা করিবারই অবসর লইয়েছি।

"উপনয়ন ও উপবীত" সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমার "রামায়ণের সমাজ" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইবে। ঐ প্রবন্ধের প্রতি বরাত দিয়াই ব্যবস্থা দানের দায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাই। প্রবন্ধটী কিছু বড়; পত্রে আলোচনা বা উদ্ধৃত করিবার মত নহে; Extract দিবারও সময় আমার নাই। বরং অগ্রহায়ণ সংখ্যা সৌরভে প্রকাশ করিব; আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার পত্র সহ-ই তাহা মুদ্রিত করিতে পারি; ইহাতে সুবিধা হইবে এই যে সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যেই বিষয়টীর আলোচনার সুবিধা হইতে পারিবে এবং আলোচনার ফলে আমার লেখার ভিতর ভুল, পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শীতার প্রভাব থাকিলে তাহা সহজেই সংশোধিত হইতে পারিবে। অবশ্য অনুগ্রহ করিয়া যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি ত্রুটী দেখাইয়া আলোচনা করেন তবেই।

জাতির অধিকার অনধিকার বা জল আচরণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমার মোটেই কোন অভিজ্ঞতা নাই। বৈদিক সাহিত্য—যে সামান্য কয়েকখানা দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এ সম্বন্ধে আমি যে ঐতিহাসিক ধারণায় ('সত্যে' বলিতে পারি না) উপনীত হইতে পারিয়াছি—তাহা আমি আমার রামায়ণী যুগের 'জাতিতত্ত্ব' প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি। সৌরভে তাহা বাহির হইয়াছিল, দেখিয়া থাকিবেন। আমি বিস্তৃত ভাবেই জাতি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি—জাতি বিশেষের অধিকার অনধিকার বিষয়ক আলোচনা—সৌরভে করা সঙ্গত মনে করি না। তবে আপনি "বর্ম্মণ" উপাধি ব্যবহার সম্বন্ধে যে, শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত করিয়াছেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার সম্বন্ধে ২।১টী কথা না বলিয়া পারিলাম না।

চর্ম্ম বা কৃষ্ণাজিন ব্যবহার না করিয়াও যদি আপনি "চর্ম্মণ" বা "শর্ম্মণ" শব্দ নামের পশ্চাতে ব্যবহার করিয়া নিজকে যজ্ঞপুরুষের স্থানীয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা না বোধ করেন, তবে ক্ষত্রিয় কায়েস্থের পক্ষে (আমি কেবল আপনার এবং আমার কথাই বলিব, তৃতীয় পক্ষের কথা বলিব না) বর্ম্মের সহিত পরিচয় না থাকিলেও "বর্ম্মণ" বলিতে এমন কি অধিক ধৃষ্টতা প্রকাশ হইল বুঝি না।

"শর্ম্মা" শব্দের আভিধানিক অর্থ "সুখী" হইলেও বৈদিক প্রয়োগ সেই অর্থে নহে। কোন বেদে 'শর্ম্মণ' শব্দ আছে কি না আমি জানি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থে 'শর্ম্মা' ও 'বর্ম্মা' এ দুটী শব্দেরই উৎপত্তির ইতিহাস আছে। আমার মনে হয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং শতপথ ব্রাহ্মণে আমি 'শর্ম্মা' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস পাঠ করিয়াছি। তাহাতে যেন আছে যজ্ঞ (পুরুষ) দেবগণর নিকট হইতে মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলে দেবগণ মৃগকে ধরিয়া তাহার চর্ম্ম উৎপাটন করিয়া আনিয়া সেই কৃষ্ণাজিন বেষ্টন করিয়া যজ্ঞ রক্ষা করেন। যিনি যজ্ঞ পুরুষের স্থলবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণাজিন ধারী হইয়াছিলেন তিনিই 'চর্ম্মা' হইয়াছিলেন। "এই চর্ম্মা" শব্দই ক্রমে 'শর্ম্মা' শব্দে পরিণত হইয়াছিল। 'শর্ম্মা' শব্দের অর্থ খুব স্পষ্ট, সেজন্য তাহার উল্লেখে ও আলোচনায় বিরত রহিলাম। আমার হাতের কাছে এখন "ব্রাহ্মণ" গুলি নাই; আপনি সাক্ষাতে আসিলে পুঁথি খুলিয়া আলোচনা করিব; আপাততঃ নিজ ভাষাতেই ব্যক্ত করিলাম। এখন আপনার কথাই বলিতেছি, আপনি কি এখন যজ্ঞ করেন, না চর্ম্ম ধারণ করেন? তবে যে 'শর্ম্মা'? না সুখের সহিত সম্পর্ক হেতু? বলিতে গেলে অপরাধ উভয়েরই তুল্য নয় কি? আজ এই পর্য্যন্ত। মঙ্গল সংবাদ চাই।

আপনার স্নেহের—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

রামায়ণে উপনয়ন ও উপবীত-কথা

উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ রামায়ণে নাই। রামাদির জাত কর্ম্ম সমূহের স্থলে

তেষাং জন্ম ক্রিয়াদীনি সর্ব্বকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ।

এইরূপ উল্লেখ দ্বারা বর্ত্তমান 'উপনয়ন' প্রথার ন্যায় কোন কার্য্যের আভাস পাওয়া যায় না। রামায়ণের টীকাকার রামানুজ খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। তিনি আধুনিক সংস্কার অনুসারে অনেক স্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রাম বনে গমন কালে কৌশল্যা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।

অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখ পরিক্ষয়ম। ৪৫।২।২০

এই শ্লোকের জাতস্য শব্দে রামানুজ উপনয়ন সংস্কার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ অনুসারে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত রামায়ণে এই শ্লোকের অনুবাদ করা হইয়াছে—"তোমার দশম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া সপ্তদশ বৎসর কাটাইয়াছি।" পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"উপনয়নের পর আজ তোমার এই সতর বৎসর বয়স হইয়াছে।"

ইঁহারা উভয়েই মহাপণ্ডিত লোক। অথচ তাঁহাদের এই উভয় ব্যাখ্যাই পরস্পর বিরোধী, এমন কি প্রকৃত তত্ত্বেরও বিরোধী।

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ রামের বয়স নির্দ্দেশ স্থলে যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি উপস্থিত বোধ সৌকর্য্যার্থে পুনরায় প্রদান করা গেল। এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ অতি স্পষ্ট। মাতা কৌশল্যা রামের বনবাস বার্ত্তা শুনিয়া সকল আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া রামকে বলিতেছেন—"তোমার জন্মের পর এই সপ্তদশ বর্ষ কাল আমি আমার দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া আছি।"...

ইহাতে উপনয়নের কোন কথাই নাই। আধুনিক সংস্কার দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থের ভাব গ্রহণ ঐতিহাসিকের চক্ষে এই জন্য নিরাপদ নহে।

বেদে উপনয়ন রীতির উল্লেখ নাই। বেদ রচনা কালের পরে বেদ খুব আদরের ও সম্মানের জিনিস হইয়াছিল। তখন সকল গৃহস্থই (গৃহমেধিন্) বেদ কণ্ঠস্থ রাখিয়া তাহা নিত্য পাঠ করিতেন। রামায়ণের যুগেও এই রীতিরই প্রভাব লক্ষিত হয়। রাম বনে গমনের দিন অতি দুঃখে কোন গৃহস্থই বেদ পাঠ করিতে পারেন নাই। (রাঃ সঃ ৮৮ পৃষ্ঠা পদটীকা সহ দ্রষ্টব্য) ক্রমে এই রীতি শিথিল হইয়া আসিতে থাকিলে বেদ-পাঠ-শিক্ষার জন্য মানবককে গুরুর নিকট যাইয়া দীক্ষা লইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাই উপনয়ন দীক্ষা।

রামায়ণে বেদ পাঠের জন্য গুরু গৃহবাসের ব্যবস্থার কোন বিশিষ্ট উল্লেখ নাই।[১] ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও সূত্র গ্রন্থ গুলিতে উপনয়নের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থেই উপনয়ন বা শিক্ষার জন্য দীক্ষা গ্রহণের প্রথম আভাস আমরা পাই। উপনিষদে ইহার বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ পাঠ অভ্যাস করিতে যে প্রাথমিক বিশেষ-জ্ঞান-দৃষ্টি বা নয়ন (preliminary insight) মানবকের প্রয়োজন, সেই প্রাথমিক চক্ষুদান বা নয়ন দানের প্রতিশ্রুতিকেই যেন উপনিষদে 'উপ+নয়ন' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উপনয়নের ব্যাকরণ সঙ্গত অর্থও আছে। তাহা উপ+নী+ অনট করিয়া; অর্থ—উপ--সামীপ্য, নী—নেওয়া; যে ক্রিয়া দ্বারা গুরু মানবককে নিজের একান্ত সমীপবর্ত্তী করেন। অর্থাৎ আত্ম সদৃশ করেন। স্মৃতির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

গৃহোক্ত কর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।

বালো বেদায় তদ্যোগাদ্বালস্যোপনয়নং বিদুঃ॥

অর্থাৎ গৃহোক্ত কর্ম্ম অনুসারে গুরুর সমীপে নীত হওয়া রূপ সংস্কারকে উপনয়ন সংস্কার বলে।[২]

১। রামায়ণের টীকাকার—রাবণ গুরুগৃহে পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া লঙ্কাকাণ্ডের একটী প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্লোকটী এই (রাবণকে সুপার্শ্ব বলিতেছেন)—

হন্তুমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ধর্ম্মমপাস্যচ॥ ৫৯

বেদবিদ্যা ব্রত স্নাতঃ স্বকর্ম্ম নিরতস্তথা।

স্ত্রিয়ং কথাদ্বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর॥ ৬০। ৬। ৯০

ব্রতস্নাত বা স্নাতক শব্দের ভাব খুব প্রাচীন নহে। উপনিষদের পূর্ব্বের কোন বৈদিক সাহিত্যে এই শব্দগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামায়ণের আদি রচনায়ও তাহা নাই। থাকিলে আর্য্যসমাজের দশরথ এবং রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিষয়েও তেমন উল্লেখ দেখিতে পাওয়ার আশা করা যাইতে পারিত। আমাদের মনে হয়, সূত্রগ্রন্থ গুলিতে "সমাবর্ত্তন" ব্যবস্থা বিহিত হইলে সেই সঙ্গেই "স্নাতক" ব্রতস্নাত, প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হইয়াছে—

২। শতপথ ব্রাহ্মণের 'উপনয়ন' শব্দের আলোচনায় অধ্যাপক মোক্ষ-মূলারের গৃহ্যসূত্রের মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে।

"Upanayana i e solemn reception of the pupil by the teacher who is to teach him the Veda.

Sacred Book of the East V. XXX page XVIII

উপনিষদে যেন কেবল বেদ শিক্ষারজন্যই উপনয়ন ব্যবস্থা ছিল দেখা যায়।

রামায়ণে এ সকল বিষয়ের কোন আভাসই নাই। মহর্ষি বাল্মীকি অনার্য্যরাজ বালীর স্ত্রী তারার মুখে পর্য্যন্ত বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-যুগে যিনিই গুরুর সমীপে পাঠার্থী হইয়া উপনীত হইতেন, তিনিই গুরুর জ্ঞান স্পর্শে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেন। এই কথাটী শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"আচার্য্যোগর্ভী ভবতি হস্তমাদায় দক্ষিণম্।
তৃতীয়স্যাম সজায়তে সাবিত্র্যা সহ ব্রাহ্মণঃ॥ ১১ | ১২

অর্থ—আচার্য্য (শিক্ষার্থীর) দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া গর্ভবান হন। অতঃপর তৃতীয় দিবসে সে সাবিত্রীর সহিত ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

শথপথ ব্রাহ্মণের এই নির্দ্দেশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ যুগে সকলেই উপনীত হইতে পারিতেন এবং উপনীত হইলেই "ব্রাহ্মাণ" বলিয়া অভিহিত হইতেন। উপনিষদে যেন কেবল ব্রাহ্মণকেই উপনয়ন দিবার আভাস দেওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের গৌতম সত্যকামকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে এইরূপই বুঝা যায়। ৩ অতঃপর ক্রমে উপনয়নে ত্রিবর্ণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন "ব্রাহ্মণ" শব্দের স্থলে "দ্বিজ" শব্দে—উপনীত ব্যক্তিকে বুঝাইত।

"দ্বিজ" শব্দটী "স্নাতক" শব্দের মতই অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী। রামায়ণের প্রাচীন স্তরের রচনায় এই শব্দগুলি নাই, সন্দেহ জনক রচনায় আছে।

উপনয়ন প্রথা এইরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। অতঃপর সূত্র ও স্মৃতির যুগে তাহা ত্রিবর্ণের অবশ্য করণীয় হইয়াছিল।

রামায়ণ উপনয়ন প্রভাব কালে রচিত হইলে তাহার উল্লেখ রাম লক্ষ্মণাদির জন্ম-কর্ম্মও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারের বর্ণনায়—যে স্থলে—

"তেষাং জন্ম কর্ম্মণী"... ইত্যাদি ও

"সর্ব্বে বেদ-বিদঃ সুরাঃসর্ব্বে লোক হিতেরতাঃ॥ ২৫
সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ।"

ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, বালকাণ্ডের সেই ১৮শ সর্গেই তাহার কোন না কোন আভাস আমরা পাইতাম। এইরূপ স্থলে কবি কালিদাস তাহা করিয়াছেন। রামানুজের টীকারও সেই যুগ প্রভাবই বিদ্যমান।

উপনয়ন প্রসঙ্গে যজ্ঞসূত্র বা উপবীত গ্রহণ প্রথাও আলোচ্য। রামায়ণে সর্ব্বদা যজ্ঞসূত্র ধারণ প্রথার কোন উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামায়ণের দুই এক স্থলে যজ্ঞসূত্রের উল্লেখ আছে; স্থানগুলি সন্দেহ জনক। একটী বালকাণ্ডের ৪র্থ সর্গের একাদশ শ্লোক। এই সর্গটী যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ' (রাঃ সঃ ৫১ পৃষ্ঠা)

রামায়ণের যে সকল স্থানে যজ্ঞোপবীতের উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থান সন্দেহ জনক হইলেও যজ্ঞোপবীত বা ব্রহ্ম-সূত্র জিনিসটী প্রাচীন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতায় উপবীতের উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থে তিন জাতির তিন প্রকার সূত্র ছিল এবং বিভিন্ন অবস্থায় তাহা বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। শুক্ল যজুর বাজসনেয়ী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে উপবীত ব্যবহারের স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে তাহা পরে উদ্ধৃত হইল।

তৈত্তিরীয় সংহিতার শ্রুতিটী এইরূপ—

"নিবীতং মনুষ্যাণাং, প্রাচীনাবীতং পিতৃনাম, উপবীতং দেবাণাম।" তৈঃ সং ২ | ৫ | ১১ | ১

শতপথের ব্যাখ্যা—নিবীত মনুষ্যের, প্রাচীনাবীত পিতৃ-লোকের এবং উপবীত দেবতাদিগের ধারণীয়।

এই তিন জাতির তিনটী অধিকারের কথা শতপথে একটী আখ্যায়িকা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গল্পটী এই—একদা সমস্ত ভূত জগৎ (দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ) প্রজাপতির নিকট স্ব স্ব জীবন যাত্রার বিধান্ ব্যবস্থার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবগণ উপবীতী হইয়া, পিতৃগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া এবং মনুষ্যগণ (বসন) প্রাবৃত (সায়ন ব্যাখ্যা নিবীত) হইয়া প্রজা-

৩। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৪। ৪। ৫ (গৌতম সত্যকাম সংবাদ)। ছান্দোগ্য উপনিষদ বিনা উপনয়নেও উপদেশ প্রার্থীকে শিক্ষাদানের উল্লেখ আছে। ৫। ১১। ৭

পতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। [৪] প্রজাপতির বিচার ফল প্রদান এস্থলে অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই আখ্যান ভাগ দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃ লোকগণ ও মানুষগণের কাহাকে কোনরূপ সূত্র ধারণের অধিকারী করা হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়।

ইহার পর শতপথ ব্রাহ্মণেই পূর্ব্বোক্ত রীতির অনুসরণ করিয়া দেব কার্য্যে, পিতৃ কার্য্যে ও মানুষ-কার্য্যে যথা ক্রমে উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীতের ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে।[৫] কাত্যায়ন শ্রৌত-সূত্রে ইহার বিশেষ নির্দ্দেশই প্রদত্ত হইয়াছে।[৬] শতপথের এই ব্যবস্থা হইতে উপবীত যে সর্ব্বদা গলদেশে ধারণ করিয়া থাকিতে হইত, তাহা প্রকাশ পায় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন—প্রাচীন আর্য্যেরা আকাশস্থ কালপুরুষের বা যজ্ঞ-পুরুষের কোমরবন্ধের অনুকরণে উত্তরীয়, উপবীত বা মেখলা কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং যজ্ঞকালে তাহা ব্যবহার করিতেন; পার্শিরা নাকি সেই নিয়মেই আজও তাহা ব্যবহার করে। উপবীত ধারণ রীতি প্রবর্ত্তনের আদি ইতিহাস এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু আমরা কোথাও এইরূপ উল্লেখ পাই নাই।

যজ্ঞকালে যাজ্ঞিকদের সূত্র ধারণের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ গুলিতে আছে এবং সূত্র গুলিতে তাহা বিশ্লেষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থের এই মত আধুনিক 'আহ্নিকতত্ত্ব' গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। আহ্নিকতত্ত্বের উক্তি অতি স্পষ্ট। তাহা এইরূপ—

যজ্ঞোপবীতে দ্বে ধার্য্যে শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ কর্ম্মণি।
তৃতীয় মুত্তরীয়ার্থং বস্ত্রাভাবেঽতি দিশ্যতে॥

অর্থ—যজ্ঞোপবীত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত এই দুই কার্য্যের জন্য দুটী প্রয়োজন … উত্তরীয়ের অভাবেও একটী ব্যবহার্য্য।

দুটী যজ্ঞ সূত্রের এইরূপ ব্যবস্থা বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইহাদ্বারা ক্রিয়ার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে, সর্ব্বদা ব্যবহারের ব্যবস্থা নহে।

৪। শত পথ ব্রাহ্মণ ২।৩।৪।১

৫। শত পথ ব্রাহ্মণ ২।৫।২। ১২, ১৮, ২৪, ৩৭, ৪০, ৪৩…

৬। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৫।৮।২৬

৭। হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র ১।২।৮।১০—১২

সূত্রযুগে কোন কোন সমাজে নিত্য উপবীত ধারণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখনও উপনয়ন কালে উপবীত গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে কোন সমাজে কিরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল, সূত্রকার গণের সূত্র হইতে তাহা অবগত হওয়া যাইতে পারে।

গৃহ্য সূত্রকার হিরণ্যকেশিন্ উপনীত ব্যক্তি উপনয়ন কালে কি কি ধারণ করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সূত্র করিয়াছেন "মানবক দণ্ড, মেখলা ও উত্তরীয় ধারণ করিবে।"[৭] বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ও এই ব্যবস্থাই করিয়াছেন;।[১০]

সাংখ্যায়ন মেখলা স্থলে উত্তরীয়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন[৮] এবং সমাবর্ত্তন কালে (অর্থাৎ বেদ পাঠ জন্য গুরু-গৃহে-বাস কাল সমপ্ত করিয়া চলিয়া আসিবার কালে) ঐ দণ্ড-মেখলা-অজিন ইত্যাদি বরুণ মন্ত্রে জলে বিসর্জ্জন করিয়া আসিতে বলিয়াছেন।[৯]

গোভিল ব্যবস্থা করিয়াছেন—যজ্ঞ করিতে বসিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বসিবে;[১১] যদি তাহা না থাকে, যজ্ঞোপবীত স্বরূপ দড়ি, বস্ত্র অথবা কুশ-সূত্র গলদেশে লইতে হইবে।[১২] গোভিল বিবাহ বাসরে কন্যাকেও উপবিতী হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।[১৩]

আপস্তম্ব সূত্র করিয়াছেন—বাম স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া যজ্ঞে বসিতে হইবে।[১৪] ধর্ম্মসূত্রে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—প্রত্যেকে দুইটী করিয়া বস্ত্র রাখিবে; যজ্ঞকালে যজ্ঞসূত্র যেরূপে রাখিতে হয়, সেই নিয়মে উত্তরীয়বস্ত্র হাতের নীচ দিয়া স্কন্ধে রাখিতে হইবে।[১৫] এক-বস্ত্র হইলে ঐ

৮। সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র ২।১৩।১

৯। ঐ ২।১৩।৮

১০। বসিষ্ঠ ধর্ম্ম সূত্র ১১।৫২—৬৬

১১। গোভিল গৃহ্য সূত্র ১।১।২

১২। গোভিল গৃঃ সূঃ ১।২।১

১৩। গোভিল গৃহ্য সূত্র ২।১।১৯ গোভিলের টীকাকার আধুনিক সংস্কার বশতঃ টীকায় লিখিয়াছেন—যেহেতু স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীতে অধিকার নাই, সেই হেতু তিনি নিজ উত্তরীয়ই উপবীতের ন্যায় ধারণ করিবেন।

১৪। আপস্তম্ব গৃহ্য সূত্র ১।১।৩

১৫ আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্র ১।২।৬।১৮

বস্ত্র কোমরেই বাঁধিয়া রাখিবে। আপস্তম্ব অন্যত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সর্ব্বদা উত্তরীয় বাম স্কন্ধের উপর দিয়া রাখিবে; উত্তরীয় না থাকিলে সূত্র ধারণ করিবে।[১৬]

সাংখ্যায়ন শ্রৌত-সূত্রে বলেন—

যজ্ঞোপবীতি দেব কর্ম্মানী করোতি।
প্রাচীনাবিতী পিত্রাণী ... ... ইত্যাদি

পারস্কর[১৭] এবং আশ্বলায়নও[১৮] অহ্নিক করিবার সময় উপবীতী হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ইহার পর সংহিতার যুগে উপবীত সর্ব্বদা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্মৃতির এই দৃঢ় ব্যবস্থার কারণ হইয়াছিল, বৌদ্ধ বিপ্লব। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় বেদ পাঠেরজন্য নহে, বেদের সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য—উপনয়ন নূতন ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছিল এবং উপবীত ধারণ বাধ্যতা মূলক হইয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনে সমগ্র বেদ পাঠ বাধ্যতামূলক শিক্ষার মধ্যে গণ্য করিলে তাহা আচরিত হওয়া সুকঠিন হইবে বিবেচনায়ই বোধ হয় সমস্ত বেদ পাঠের নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং চারি বেদের চারিটী মাত্র শ্রুতি ("বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয়") সন্ধ্যা মন্ত্র রূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই সময়—শূদ্রক কবির মৃচ্ছকটিক রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী। কেন না, মৃচ্ছকটিকে এই যুগ ধর্ম্মের প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান; উহাতে উপবীত নিয়ত ব্যবহারের আভাস আছে। ইহাও দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন কথা।

সাহিত্য সংবাদ।

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলন—গত ২৪শে কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের ৮ম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনে কিশোরগঞ্জ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ হইতে সাহিত্য সেবীগণ আগমন করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধ ও কবিতাদি পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিশোরগঞ্জ কিশোর সাহিত্য সম্মিলন—পূজার ছুটির পূর্ব্বে কিশোরগঞ্জের কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে এক সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সুলেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শোক সংবাদ।

ময়মনসিংহের প্রাচীন সাহিত্যসেবী, ময়মনসিংহের সে কালের ও এ কালের প্রায় সকল সৎকার্য্যের অগ্রণী, সারস্বত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের সকলের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, "সে কালের চিত্র" প্রণেতা কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদে আমরা একান্ত ব্যথিত হইয়াছি। তিনি পিতৃ ভক্ত পুত্র কন্যা, পৌত্র দৌহিত্রে পরিবৃত হইয়া ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। উপযুক্ত সময়েই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা তাঁহার অভাব বেদনা বিস্মৃত হইতে পারিব না। এমন কর্ম্মী, এমন উৎসাহী, এমন যুবজন সুলভ আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তি আমরা আর পাইব না। আমরা আজ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবার-বর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান এই পবিত্র চেতা পুরুষের আত্মার কল্যাণ করুন।

কলিকাতা চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক বাবু গৌরহরি সেন মহাশয়ও একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবক ছিলেন। গত ১৫ই কার্ত্তিক তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

সৌরভের অন্যতম লেখক বিমলানাথ চাকলাদারের মৃত্যু ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোকাবহ ঘটনা। বিগত ১৩ই কার্ত্তিক বিমলা বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও বালিকা পত্নীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছে। আমরা যখন "শিক্ষা সমাচারে" মেগাস্থানিসের ভ্রমণ কাহিনীর অনুবাদ প্রকাশ করিতেছিলাম, বিমলানাথ সেই সময় বি, এ, পাশ করিয়া আসিয়া আমাদের সেই অনুবাদের কার্য্য ভার গ্রহণ করে। অতঃপর সে মেগাস্থানিস, এরিয়ান ষ্ট্রাবো প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া ইলিয়টের ইতিহাসেরও অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়। ইলিয়ট সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধটী সৌরভে বাহির হইয়াছিল। আজ তাহার সেই সমস্ত প্রারদ্ধ কার্য্য তাহার মৃত্যুর সহিত নীরবে সমাধি প্রাপ্ত হইল।

---

১৬ আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্র ২।২।৪।২১—২২

১৭ পারস্কর গৃহ্য সূত্র ২।৪ ১৮ আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র ৩।৭।৩
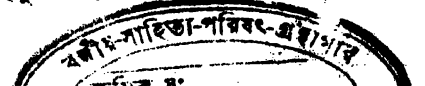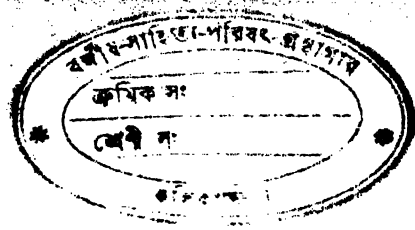
দ্বাদশ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩৩১। } দ্বাদশ সংখ্যা।

আর্ট বনাম চিত্র।

আর্ট-আর চিত্রের মধ্যে ভয়ানক বিরোধ লাগিয়া গিয়াছে। এক পক্ষ চিত্র লইয়া আপন শক্তি-প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ; আর এক পক্ষ আর্টের দোহাই দিয়া চিত্রের গঙ্গাযাত্রা করিতে ব্যতিব্যস্ত। এক পক্ষ চিত্রকর, অপর পক্ষ আর্টিষ্ট। একদল চাহেন, ছবির গায় গহনা পরাইতে, আর এক দল তাহার নগ্ন সৌন্দর্য্যের কল্পনায় আত্মহারা। সুতরাং দুই যুধ্যমান শক্তি আপন আপন ব্রহ্মাস্ত্র ও পাশুপতাস্ত্র সংগ্রহে ক্রটী করিতেছেন না। আমরা ছবি দেখিয়া যেটা চক্ষে ভাল ঠেকে, তার প্রশংসা করি; আর যাহা সাদা চোখে ভাল ঠেকে না, তার মধ্যে আর্টের সন্ধান করিতে ব্যগ্র হই না। ইহা আমাদের বুদ্ধির দৌর্ব্বল্য হইলেও সহজে যে এ দুর্ব্বলতার হাত এড়াইতে পারিব এমন সম্ভাবনা নাই। পুরাতন পঞ্জিকার মধ্যে পঞ্চানন কর্ম্মকারের যে খোদিত ছবি দেখিয়া আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করি সে কালের লোকেরা নাকি আধুনিক রুচিবিগর্হিত সেই ছবির সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ হইতেন। এমন কি চারি কোণায় আঁটা ক্রুগুলির হুবহু ছবিকে তাহারা পরস্পর দুইটি অর্দ্ধ চন্দ্র মিলিত হইতেছে মনে করিয়া কত আনন্দে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের এই সকল সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি যে আমাদের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ সেই চল্লিশ বৎসর আগেকার কাঠে খোদাই ছবি আর আজিকার হাফ্‌টোনব্লকে যে স্বর্গ নরক তফাৎ, আধুনিক রুচি-সম্পন্ন আমাদের একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিশুবোধকের সান্দীপনী মুনির পাঠশালার ছবি বা বিদ্যা-সুন্দরের অশ্বারোহী সুন্দরের ছবি আজকাল শিশু মহলেও আদর পাইবে না। সাহিত্যের উন্নতি, সভ্যতার উন্নতি, চিত্রের উন্নতি খুব হইতেছে, কিন্তু শ্লীলতার দিক দিয়া বিচার করিবার, যে প্রয়োজন আছে, তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। বহুদিন পূর্ব্বে প্রদীপ মাসক পত্রে কণ্ঠলগ্ন প্রণয়িনীকে তাহার দয়িত সোহাগ করিতে গিয়া সমালোচকের কশাঘাত সহ্য করিয়া ছিলেন। আমরা এসকলের সাফল্যের প্রশংসা করিলেও তাহা আঁকিয়া দেখানর সমর্থন করি না। পাঁচকড়ি দের ডিটেক্‌টিব উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে যে সকল কুৎসিত নারী-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আর্ট বুঝিতে আমরা অক্ষম। উন্মুক্তবক্ষা একটি রমণী পুরুষের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহা চিত্রে ফুটাইয়া তোলা কত টুকু হিতকর—ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। কবিরাজী দোকান হইতে প্রচারিত কেশ-তৈলের বিজ্ঞাপনে নারী চিত্র থাকা একটা গদবাঁধা নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেশের বৃদ্ধি সাধন দেখান উপলক্ষে ব্যবসায়ী কবিরাজ ও ফরমায়েস তামিলকারী চিত্রকর অত্যন্ত কুশলতার সহিত সেই চিত্রখানি পরিপূর্ণযৌবনা অপূর্ব্ব সুন্দরীর বলিয়া রচনা করেন, আবার অর্দ্ধ অনাবৃতবক্ষা বিলোল-কটাক্ষ-শালিনী নারীচিত্র অঙ্কনই ইহাদের উদ্দেশ্য। অধুনা বাজারে প্রচলিত উপন্যাসেও ছবির ব্যবহার গুলজার হইয়া উঠিতেছে। এই সকল পুস্তকেও আর্টের দোহাই দিয়া তথাকথিত অনেক উৎকৃষ্ট ছবি দেওয়া হয়। বিস্মিত হইয়া যাই যে, আমাদের দেশে

ঐ সকল পুস্তকের কাট্‌তি কম নহে। এক দিকে আর্টের চরম চিত্র, অপর দিকে আর্টের পরম রচনা কৌশল ঐ সকল পুস্তক বিক্রয়ের ভীষণ সাহায্য করিতেছে। ঐ সকল পুস্তকে "পাপের ছাপ" একান্ত-স্পষ্ট। 'ঘরে বাইরে' উহার যথেষ্ট প্রচার এবং সমাজকে 'চরিত্রহীন' করিবার জন্য ইহাদের বিপুল আয়োজন। লেখকগণ আবার এই সকল ঘৃণিত গ্রন্থে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন! হিন্দুজননীর সন্তান হইয়া, মাতৃ-জাতির মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করা সনাতন ধর্ম্মোচিত কার্য্য নহে। সুশিক্ষিত সুসাহিত্যিক প্রতিভাবান্ লেখকগণ পুণ্যবতী সীতা সাবিত্রীর মহদাদর্শ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। যদি তাহারা সেই সকল প্রাচীন পুণ্যতম আদর্শে শ্রদ্ধাশীল হইয়া সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে যত্নশীল হইতেন, তবে কখনও মনোরমা, কুন্তলা; রাজলক্ষী, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্র আঁকিয়া এমন ভাবে নারী-গণের নারীত্বের ও সতীত্বের মাথায় পদাঘাত করিতেন না। ইহা আর্টের আকর্ষণ, না জাতীয় জীবনেরও পারি-বারিক জীবনের চরম অধঃপতন? সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার যেমন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই চিত্র শিল্পীর উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বেচ্ছাচার রুচির জন্য চিকিৎসাও বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই জাতীয় চিত্রের উপর অস্ত্রোপচার না করিলে চলিবে না।

এই সকল চিত্র ও সাহিত্য মধ্যে নির্ম্মলতাও পবিত্রতার বিনিময়ে মনে হয় যেন পঙ্কিলতা এবং আবিলতাই নিহিত রহিয়াছে। ইহা গলিতে গলিতে গো-রস বিকায় না, বৈঠকে বৈঠকে সুরার মত মাদকতা, আফিঙ্গের মত আমেজ আনয়ন করে। ঐ চিত্র, সাহিত্য এবং আর্টের চরম উন্নত আদর্শ হইলেও গৃহ শত্রুর মত জাতির পরম শত্রু।

কিছু দিন হইল ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির পুনরুদ্ধার মানসে বাঙ্গালার আর্ট বিদ্যা-বিশারদগণ, পদ্মপলাশ-নয়না, চম্পকাঙ্গুলীবিশিষ্টা, বিম্বোষ্ঠা, তিলফুল জিনি-নাসা, গোলাপ রঞ্জিত-গণ্ড প্রভৃতি নারী চিত্র অঙ্কনে আত্ম-নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। তখন অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন হয়ত বা এই পথ দিয়াই বাঙ্গালার প্রকৃত চিত্র শিল্প লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং গৃহলক্ষ্মীগণের ফটো তুলিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। আশার কথা ঐ চিত্র কলা-পদ্ধতির পরিসমাপ্তি ঘটি-য়াছে। যাহারা আপন পরিবারের মহিলার বিভিন্নাবস্থার ছবি গ্রহণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন তাহাদের আর্টের প্রশংসা করা যাইতে পারে; কিন্তু সুরুচির মাথায় বারী মারিয়া যে তাহারা একাজ করিয়া থাকেন ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্ফুট যৌবনাবস্থার নগ্ন চিত্র অঙ্কনই যে ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাতে আর বিরুদ্ধ তর্ক চলেনা।

মড্‌এলেনের নগ্ন নৃত্যের ছবিগুলি যদি লাখে লাখে বিক্রয় হয়, তবে স্ফুরিতাধরা অনাবৃত রক্ষা রমনীর চিত্রে চিত্তাকর্ষণ না করিবে কেন? ভিজা মিহি ঢাকাই শাড়ীর আবরণে দেহের সর্ব্বস্থান প্রদর্শনের প্রয়াস চিত্রকরের থাকিতে পারে, কিন্তু চিত্রিতার থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আর একটা কথা— আর্ট কেবল ষোড়শী যুবতীর চোখে মুখে বুকে ফুটে উঠে কেন? বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া, ছেলে বা পুরুষ কি দেশ জুড়িয়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? শুধু কি ষোড়শীরাই দেশ উজল করিয়া রাখিয়াছে? না যুবতীর নগ্ন চিত্র বিনা আর্টের বিকাশ সাধিত হয় না? সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে আজকালকার সভ্যতার যুগে যে প্রকার অশ্লীল চিত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে বস্তুতই ঘৃণা হয়।

আবার এক দফা চিত্র উঠিতেছে—ইহা আর্টের জন্য নহে; জিনিষের কাট্‌তির জন্য। এই ট্রেড্ মার্কে চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী উঠিয়াছেন, সশিষ্য পরমহংসদেব উঠিয়াছেন। শকুন্তলার লিপি, শকুন্তলার জন্ম, মায়ামৃগ এগুলি গা-সহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশলাইয়ের বক্সে কাপড়ের ছাপে যে হিন্দুদেব দেবীর প্রতিকৃতি বিনা প্রতিবাদে চলিতেছে ইহাতে প্রাণে আঘাত লাগে। কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ কেন যে দেশলাইয়ের বাক্সের সঙ্গে সঙ্গে পথে ঘাটে অশুচি স্থানে পড়িয়া থাকে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইনা। হিন্দুর জাতীয়তার এই অধঃ পতনে কেন যে আমাদের গায়ে আঁচড় টুকু পর্য্যন্ত লাগেনা ইহা বুঝিতে পারিনা। ইহা কি ব্যবসাচ্ছলে ধর্ম্মের উপর অযথা আক্রমণ বা বিদ্বেষ নয়? এইত আমাদের বর্ত্তমান চিত্র বিদ্যার অসাধারণ প্রভাব। হায়রে দুর্ভাগ্য! যে দেশ চিত্র কলার অনির্ব্বচনীয় লীলা ভূমি ছিল, যে দেশের রমণীগণও চিত্র বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন; সেই দেশের মানবগণই

আর্টের এই নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া আত্ম হারা! প্রাচীন পৌরাণিক ঊষা-অনিরুদ্ধ সংবাদে দেখেতে পাই' ঊষা স্বপ্নযোগে অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া তাহার জন্য অস্থির হইলে তদীয় সখীগণ (স্বপ্ন দর্শিত প্রিয়তমকে বাছিয়া চিনিয়া লইবার জন্য) ত্রিলোকের যুবক বৃন্দের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আবার রত্নাবলী স্বপ্নে দেব-নির্দ্দেশিত তাঁহার দয়িতকে দেখিয়া সখীগণ কে বলিতেছেন —"তোমরা কি সামর্থহীন হইলে? তোমাদের চতুঃষষ্টিকলা বিষয়ে অভিজ্ঞতা কোথায়? তোমরা আমার হিতৈষিণী, হিতসাধন কর।" সখীগণ. কেহ স্বর্গবাসী, কেহ মর্ত্ত্যবাসী, কেহ পাতালবাসীকে চিত্রিত করিল। এইরূপ আরও কতশত পৌরাণিক আখ্যায়িকায় প্রাচীন ভারতের চিত্রকলার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এসকল রূপক কথা নয়, হিন্দুর নিকট সত্য, চিরসত্য। হিন্দুগণের প্রাচীন আদর্শে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহা অলৌকিক বলিয়াই মনে হয়। আর বর্ত্তমান চিত্র বা আর্ট তাহার পদরেণু স্পর্শেও অক্ষম। অথচ ইহা লইয়া আমাদের কত আস্ফালন! আমি বলি, এ আর্ট নৈতিক উন্নতি করিতেছে, না অবনতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এআর্টের জন্য "হাফেজ" কৈ? যে দিন ঘরে ঘরে রায় রামানন্দ বা হাফেজের আবির্ভাব হইবে সেই দিন যেরূপ ইচ্ছা অবস্থান দেখাইয়া তন্বঙ্গী ষোড়শী যুবতীর চিত্র আঁকিও। তখন আর্ট এ দেশের 'হার্ট' ফেল্ করিতে পারিবে না। তাই কালী নগ্নিকা। এই দেবনিকেতনে নগ্না স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া তথাকথিত রুচিবাগীশগণ শিহরিয়া উঠেন।

আমরা চিত্রের পক্ষপাতী; কিন্তু মন যাহাতে, অপবিত্র হয়, তেমন আর্ট চাই না। বাংলার চিত্র শিল্পের উপর অস্ত্রোপচার অতি প্রয়োজন। আশা করি দেশের মাতৃ ভক্ত পুরুষ সমাজ জঘন্য কুৎসিত চিত্র দলনে বিলম্ব করিবেন না।

শ্রীপূর্ণিমা রায়।

গৌরিপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত।

লজ্জা।

লজ্জা যেমন নারীর ভূষণ নাইত তেমন ভূষণ আর;
শরৎ রাতের শুভ্র মেঘে লুকায় শশী চমৎকার!
ঝোপের আড়ে কোকিল ডাকে,
কুসুম ফোটে পাতার ফাঁকে,
গোপন-রূপে আপন করে' বিলায় যখন সুবাস তার,
লজ্জানতা নারীর মতন দেখ্‌তে তখন কি বাহার!

২

লজ্জা যেমন নারীর ভূষণ নহিত তেমন ভূষণ আর,
কমল-কলির শোভা যেমন ফোটার চেয়েও চমৎকার।
উষার কোলে তপন জাগে,
হাসায় জগৎ অরুণ রাগে,
দুপুর দিনের প্রখর তাপে রয়কি তেমন শোভা তার?
লজ্জা হীনা নারী, যেমন খরস্রোতা নদীর ধার।

৩

লজ্জা যেমন নারীর ভূষণ নাইত তেমন ভূষণ আর;
বাসর রাতের নীরব কথায় ঘুচায় কেমন মনের ভার।
নব বধুর ঘোম্‌টা তলে,
কি চাহনির চেরাগ জ্বলে!
লজ্জানতা নারীর নয়ন মুছায় মনের অন্ধকার।
লজ্জাহীনা কোথায় তেমন পাবে দীপ্তি চোখে তার?

৪

লজ্জা যেমন নারীর ভূষণ নাইত তেমন ভূষণ আর;
সুপ্তি-মগন-শিশুর মুখে হাসির মত চমৎকার!
মায়ের গোপন হৃদয় তলে
স্নেহের মহান্ উৎস চলে,
কপট স্নেহের কোলাহলে তেমন ভাল লাগে কার?
লজ্জাহীনা নারীর হৃদয় তরঙ্গিত পারাবার।

৫

লজ্জা যেমন নারীর ভূষণ নাইক তেমন ভূষণ আর;
কুসুম-ভারে নত লতা শোভে কিবা চমৎকার!
লজ্জা নয়ত সংকীর্ণতা,
কিম্বা মনের নয় দীনতা,
সে যে কোমল-মুক্ত-প্রাণের গোপন বীণার কনক তার।
লজ্জাবতী নারীর মতন কোথায় এমন পাবে আর?

শ্রীসুরজিৎ দাসগুপ্ত।

স্নেহের দান।

(৭)

বাড়ী পঁহুছিতে মাখনদের রাত্রি অনেক হইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া মাখন মাসীমার চিঠি পাইল। মাসীমা লিখিয়াছেন :—

তোমার বাড়ী পঁহুছার সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। কনককে লইয়া একবারে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আজ এক মাস আট দিন তাহার জ্বর। তাহাকে যে আর জীবিত রাখিতে পারিব, সে আশা দিন দিনই ত্যাগ করিতে হইতেছে। কনক তোমাকে দেখিতে চায়, যত সত্বর পার আসিতে চেষ্টা করিবা; তোমার জন্য চিন্তা করিয়াই তার অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে—এইটী মনে করিয়া তুমি আর অপেক্ষা করিও না। আমার এই স্নেহের দান তোমার জন্যই লইয়া বসিয়াছিলাম; ভগবান বুঝি আমার সে বাসনা পূর্ণ হইতে দিলেন না। তোমার পত্রে তোমার জেঠা মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থার কথা অবগত হইলাম। এখন তাঁহাকে রক্ষা করাই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত। অদ্য তোমার জেঠা মহাশয়ের নামে পাঁচশত টাকার নোট ইনসিওর করিয়া প্রেরণ করিলাম। ইহা তোমার টাকা বলিয়াই তিনি যেন গ্রহণ করেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও—তিনি যেন আমার শেষ সম্বলটীকে কাড়িয়া না নেন। ... ...

মাখন চিঠি পড়িয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে জেঠী মাকে বলিল—"জেঠীমা কালই বোধ হয় আমাকে ডহর চলিয়া যাইতে হইবে!"

রামকানাই ঘরে ছিলেন। তিনি বলিলেন—"দুই দিন ঘরে-বাড়ীতে রহিলে না, কালই চলিয়া যাইবে?"

মাখন বলিল—"হাঁ নিতান্তই যাইতে হইবে।"

চিঠি খানার এক স্থানে এমনই একটী ছত্র লেখা ছিল, যাহাতে চিঠি খানা পড়িয়া শুনাইতে বা দেখাইতে মাখনের সাহস হইতেছিল না।

যাবনের কথা শুনিয়া পুঁঠির প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বলিল "কেন যাইবে, এমনই কি জরুরি—হ্যাঁ দাদা!"

মাখন বলিল—"খুব জরুরী।"

পুঁঠি কৌতুহলবশতঃ মাখনের হাতের চিঠি খানা ধরিল, সুযোগ পাইয়া মাখনও চিঠি খানা পুঁঠির হাতে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

জেঠীমা বলিলেন—"মণি বাবুকে ডাকিয়া লইয়া খাইতে আইস, রাত হইয়াছে।"

মাখন নৌকায় চলিয়া গেলে জেঠীমা কুসুমকে বলিলেন—"চিঠি খানা পড়, দেখি কুসু।"

কুসুম অনর্গল পড়িতে লাগিল। পাঠ শেষ হইলে রামকানাই বলিলেন—"নিতান্তই যাওয়া উচিত; এবং এই সহৃদয়া ভদ্র-কন্যার মন রক্ষা করিয়া চলা কর্ত্তব্য।"

জেঠীমা বলিলেন—"কুসুমের জন্যও তো পাত্র চাই; পুঁঠিকে না হয় আরও ২।৪ বৎসর রাখা গেল—কিন্তু কুসুর ..."

বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিতেই পুঁঠি ও কুসুম উঠিয়া গেল।

রামকানাই বলিলেন—"সেও মাখনই দেখিবে, এখন ওখানেই যাহাতে তাহার বিবাহ হইয়া যায়, তুমি তাহার অনুমতি দাও; সে সম্মতির জন্যই চিঠি খানা নিজে না পড়িয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

খাইতে বসিয়া রামকানাই-ই বলিলেন—"তোমাদের কালই যাওয়া প্রয়োজন, এবং তোমার মাসীমার পত্রের ও কথার সম্মান রক্ষা করা তোমার সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আমাদের সম্মতি না থাকিবার কোন কারণ নাই। বরং সম্পূর্ণই আছে।"

মাখন মণিকে কনকের পীড়ার কথা এবং কাল তাহাদের রওয়ানা হইবার কথা মাত্র বলিয়াছে; পত্রের সম্পূর্ণ মর্ম্ম প্রকাশ করে নাই।

মাখন ও মণি সুতরাং রামকানাইর কোন কথার উত্তর না দিয়া নীরবে আহার করিতেছিল।

রামকানাই বলিতে লাগিলেন—"পুঁঠির বিবাহ আরো দু বৎসর পরে হইলেও হইবে, কিন্তু কুসুর বিবাহ না হইলেই নয়; এ আমার গলার কাঁটা হইয়া আছে;—এর তুমি একটা সত্বর কিছু না করিলেই হইবে না। আর আমাদের জন্য চিন্তা কি বাবা, দশটী টাকা মাসে পাইলেই আমাদের কোন রকমে হইয়া যাইবে।"

মাখন বলিল—"কুসুর বিবাহ ঠিক না করিয়া কোন

কার্য্যই হইবে না—যাই আমি, ডহর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহা স্থির করিব। সে জন্ম আপনারা বিশেষ চিন্তা করিবেন না।"

জেঠা মহাশয় বলিলেন—"যাই কর মাখন, তোমার মাসীমার কথা কখনও অন্যথা করিও না।"

মণি চিঠির মর্ম্ম মনেমনে অনুমানে অনুভব করিয়া আহারের পর মাখনকে বলিল—"সে চিঠিটা লইয়া আইস মাখন, নির্ব্বাসনের অর্ডার দেখাইয়া তামিল করিতে হয়।"

বজরায় গিয়া মণি চিঠি পড়িল—তার পর বলিল "এইবার পথে আইস! তাই ভাবিতেছিলাম এ কিসেরই বা সম্মতি, আর কিসেরই বা অনুমতি!"

মাখন বলিল—"এও কিন্তু ভাই অসম্ভব!"

মণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কেন?"

মাখন বলিল—"জেঠা মহাশয়ের উপর এত বড় বোঝা রাখিয়া আমি আমার পথ দেখিব, ইহা কি সঙ্গত বলিয়া তুমি মনে কর?"

"দুটাই একেবারে হইবে, সেজন্য চিন্তা কি?"

"সে হইলে তো কোন আপত্তিরই কথা নাই!"

শয্যায় শুইয়া মণি বলিল—"ছকটা ছাড়িও না কিন্তু ভাই, নতুবা বড়ই চিন্তায় চিন্তায় পথ যাইবে, ছকটাতো হইবেই, ছকের মালীক কেও……"

মণির মুখে আর কথা বাহির হইল না।

মাখন উৎসাহের সহিত উঠিয়া বসিয়া বলিল "সত্য?"

মণি বলিল—"আর সত্য না করিয়া কি করি? খাতিরে ঢেকিও গিলিতে হয়!"

মাখন বলিল—"না; ও ঢেকি গিলাইবার মত করিয়া কোনপ্রকারে গিলানের ভাবে আমি এ মেয়েটাকে ফেলিয়া দিতে পারি না।"

মণি হাসিয়া বলিল—"তবে কি ভাবে সম্মতি দিতে হইবে বল, বরং সে ভাবেই সত্যতা পাঠ করিয়া প্রতিশ্রুতি দেই।"

মণির সম্মতি পাইয়া মাখন রাত্রিতেই যাইয়া জেঠা মহাশয়কে ও জেঠী মাকে তুলিয়া কুসুমের সম্বন্ধ পাকা করিয়া লইল।

পর দিন মণি, মাখন ও কুসুমকে লইয়া গ্রিনবোট পানার পরিত্যাগ করিল।

৮

আজ ছয় সপ্তাহ পর কনকের জ্বর ছাড়িয়াছে। পথ্য করিবার পর সামান্য একটু তন্দ্রার ভাব হইয়াছিল।

তন্দ্রা ভাঙ্গিলে কনক বলিল—"মা দাদা আসিল না!"

মা সাগ্রহে বলিলেন—"আজই আসিবে মা, এই মাত্র তাহার নিকট হইতে তার আসিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ পঁহুছিয়া সে টেলিগ্রাম করিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিয়া পঁহুছিবে!"

মা এই বলিয়া কনকের শয্যার পার্শ্বে রক্ষিত লেপাফা হইতে খুলিয়া টেলিগ্রামের কাগজখানা তাহার হাতে দিলেন। কনক তাহা দেখিয়া মনে যেন কত উৎসাহ অনুভব করিল। সে প্রফুল্ল চিত্তে বলিল—"আমাকে ধরিয়া উঠাও মা, আর কত শুইয়া থাকিব?"

মা বলিলেন—"না মা এখন উঠিও না, একটু পথ্য কর; এখন উঠিলে মাথা ঘুরিবে, আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। আজ ৪৩ দিনে জ্বর ছাড়িয়াছে; একটু সাবধানে থাক—"

কনক কাগজখানা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মা পথ্য করাইলেন।

পথ্য করিয়া কনক মাকে তাড়া করিতে লাগিল—"দাদার জন্য ষ্টেসনে গাড়ী পাঠাইয়াছ কি? পাঠাও নাই কেন? এখনই পাঠাও, গাড়ী আসিবার সময় হইয়াছে।…"

৩ টায় রেলগাড়ী ষ্টেসনে পঁহুছিবে। কনকের তাগাদায় বড় হিস্যার জুড়ী গাড়ী বারটায় ষ্টেসনে চলিয়া গেল।

গাড়ী ষ্টেসনে গিয়াছে শুনিয়া কনক আরামের শ্বাস ফেলিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। মাতার নিষেধ গ্রাহ্য করিবার মত দুর্ব্বলতা আর তাহার মধ্যে যেন একেবারেই ছিল না। সে আজ যেন কত বলবান, কত সুস্থ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জুড়ী গাড়ী আসিয়া মাখনকে লইয়া পঁহুছিল। কনক দরজারদিকে চাহিয়া দাদার অপেক্ষা করিতেছিল।

মাখন ডাকিল—"দিদি—"

কনক বলিল—"দাদা—"

লজ্জা সরম ভুলিয়া গিয়া কনকের দুই বাহু মাখনের

গলদেশ বেষ্টন করিয়া লইল; মাখন ও পরম আগ্রহের সহিত মন-প্রাণ-দেহ কনকের বাহু বেষ্টনে ধরা দিয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে তাহার স্নেহ-কোমল হস্তের অমৃত-পরশ কনকের ক্ষীণগণ্ডের উপর সন্তর্পণে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

* * *

মণি ও কুসুমকে নৌকায় রাখিয়া মাখন গোয়ালন্দে ষ্টিমার ধরিয়াছিল। মণি নিজ পছন্দ মত বউ লইয়া আসিতেছে, এ সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল। মণির মা সংবাদ শুনিয়া ছেলের বিবাহের উত্তোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বড় হিস্যায় মহা ঘটা লাগিয়া গেল।

* * *

মাখন কুসুমের বিবাহ না হইলে বিবাহ করিবে না। সুতরাং মণির বিবাহ অগ্রেই হইল। দীনানন্দ স্বামী কন্যাকর্ত্তা হইয়া ভগিনী কুসুমকে শিষ্য মণিমোহনের হস্তে দান করিলেন। জীবানন্দাশ্রমে মণির বিবাহ হইয়া গেল।

তারপর বন্ধু মণিমোহন কন্যাকর্ত্তা হইয়া মাখনের হস্তে তাহার মাসীমার স্নেহের দান সমর্পণ করিল।

সমাপ্ত।

মার্কিন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটী মার্কিন রাজ্যে বড়ই শিথিল ভাবে প্রযুক্ত হয়। যুক্তরাজ্যের যে সকল বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীন ভাবে মৌলিক গবেষণা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আছে তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। যুক্তরাজ্যে এইরূপ ১৩টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে, হারবার্ড, জেল ও কলম্বিয়ার বিশ্ববিদ্যালই বিখ্যাত। চিকাগোতেও একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি কলা (art) বিষয়ে এবং গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান (Science) বিষয়ে যে সকল বিদ্যালয়ে ৪ বৎসর পাঠ করিবার পর বি, এ উপাধি লাভ করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাদিগকেই মার্কিন রাজ্যে কলেজ বলা হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ বিভাগে বি, এ ডিগ্রীর পরবর্ত্তী পাঠ্য বিষয় সমূহ ব্যতীত কোন কোন স্থলে বি,এর পাঠ্য পড়াইবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু কলেজে বি,এর অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয় শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা নাই। ১৮ কি ১৯ বৎসর বয়সের সময়ই কলেজে প্রবেশ করিতে হয়। যুক্ত রাজ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৪৮০টী হইবে।

বেতন——শিক্ষার্থীকে অতি সামান্য বেতন দিতে হয়। আবার কোন কোনটাতে ছাত্র বেতনের বন্দোবস্ত একেবারই নাই।

আয়——ষ্টেট-বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ষ্টেটের দান এবং ষ্টেটের ব্যয়েই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ষ্টেটই টেক্সের বন্দোবস্ত করিয়া খরচ পত্র নির্ব্বাহ করেন। প্রাইভেট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে ছাত্র বেতন ও সাধারণের বদান্যতার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ কোটী পাউণ্ড মূলধন আছে এবং বৎসরে মোট ১০ মিলিয়ান বা ১ কোটী পাউণ্ড আয় হয়।

পাঠ্যতালিকা——কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও ইলেকটিক প্রণালীর প্রচলন আছে। শিক্ষার্থী তাহার পছন্দ মত বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে।

ভর্ত্তি——মার্কিন দেশে এম, এ, ডিগ্রী লাভ না করিলে কেহ গ্রাজুয়েট বলিয়া গণ্য হয় না। গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্ত্তী হইতে হইলে পূর্ব্বে বি, এ ডিগ্রী লাভ করা চাই। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই এম, এ, ও পি, এইচ, ডি উপাধি দিবার ক্ষমতা আছে। ডক্টার উপাধি দুই ভাবে দিতে পারা যায়। ডক্টার পি এইচ (Dr. Ph.) ও ডক্টার সায়েন্স (Dr. Sc.)। এম, এ ডিগ্রী লাভ করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। পরীক্ষার্থীকে মৌলিক গবেষণায় এক খানা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে বলা হয়। এতদ্ব্যতীত মৌখিক অথবা লিখিত একটী পরীক্ষাও দিতে হয়। ডক্টার উপাধি লাভ করিতে হইলে তিন হইতে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিবার নিয়ম। তাহাতেও একটী অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর মৌলিক গবেষণার ফল উপস্থিত করিতে হয়। এখানকার কার্য্যের দ্বারা জর্ম্মনীর সেমিনার পদ্ধতির অনুরূপ।

এক্রেডাইটিং সিসটেম——কোন কোন্ হাইস্কুলকে কলেজের কার্য্য করিবার অধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ

যে সব ছাত্র এখান হইতে পাশ করিয়াছে হেড্‌মাষ্টার সুপারিশ করিলে তাহারা কলেজে পাঠ না করিয়াই সরাসর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলটী পরিদর্শন করিয়া যদি যোগ্য বিবেচনা করেন তবেই ঐ স্কুলটীকে ঐ অধিকার দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ছাত্র যে যে কার্য্য করিল তাহার রিপোর্ট বৎসরান্তে ঐ স্কুলে পাঠান হয়। যদি কোন স্কুল হইতে প্রেরিত কোন ছাত্রকে সন্তোষজনক কাজ করিতে দেখা না যায় তবে ঐ স্কুলকে ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিতও করা হয়।

টেকনিক্যাল কলেজ——ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুক্ত রাজ্যে ১৪৫টী উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়সমূহ কলেজ নামেও আখ্যাত হয়। বোষ্টন টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ১৩ টী বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেকটী বিষয়ের জন্য চারি বৎসরের পাঠ্য তালিকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

শিক্ষকগণের শিক্ষালাভ পদ্ধতি——শিক্ষকগণকে শিক্ষা-দান পদ্ধতি শিক্ষাদিবার জন্য প্রত্যেক ষ্টেটে একটী করিয়া নর্ম্মেল স্কুল আছে। কোন স্থলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকেও ঐ প্রকার নর্ম্মেল স্কুল স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। কোন কোন নগরের নর্ম্মেল স্কুল ষ্টেটের স্থাপিত নর্ম্মেল স্কুল হইতে কোন অংশেই হীন নহে। নাগরীয় নর্ম্মেল স্কুলসমূহ কেবল নিজদের নগরে শিক্ষা দিবার অধিকার সূচক একটী সার্টিফিকেট দিয়া থাকে।

হাই স্কুল হইতে পাশ করিয়া পরে নাগরীয় নর্ম্মেল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হয়।

পাঠ্য তালিকা——হাই স্কুল হইতে পাশ করিয়া নর্ম্মেল স্কুলে ভর্ত্তি হইলে ২ বৎসর তথায় অধ্যয়ন করিতে হয়। অধ্যয়নের বিষয় অনেকগুলি। তবে শিক্ষকতা করিতে যে যে বিষয়ের দরকার তাহার উপরই বেশী জোর দিতে হয়। প্রথম বৎসরে মনোবিজ্ঞান ও ছেলে পরীক্ষাতে (Child study) বেশী সময় ক্ষেপণ করিতে হয়। দ্বিতীয় বৎসরে ছেলে পরীক্ষা করিয়া ও মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়া শিক্ষার্থী যে যে সত্য আবিষ্কার করিল বা যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, তাহা বিধিবদ্ধ (formulate) করিয়া, কিরূপে ঐ সত্যসমূহ শিক্ষাদান কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারা যায় তাহার প্রতি যত্নবান্ হয়। এতদ্ব্যতীত বৎসরের ⅙ অংশ সময় তাহাকে কোন একটী ক্লাসের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে হয়। আর কোন কোন ছেলে সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিয়া তাহার ছেলে পরীক্ষায় জ্ঞান কত দূর হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিতে হয়।

ট্রেনিং কলেজ—ট্রেনিংগুলিকে হাই স্কুলের শিক্ষক প্রস্তুত করিবার যন্ত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে এম, টি, ও কোন স্থলে ডি, টি উপাধি পর্য্যন্ত দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। আবার কোন কোন স্থলে মাত্র বি, টি উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে। কলম্বিয়া ষ্টেটের টিচারস্ কলেজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রণালী শিখাইবার জন্য পৃথিবীতে ইহাই যোগ্যতম কলেজ বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে ১০০ জন অধ্যাপক আছেন। নর্ম্মেল স্কুলে যাহারা দুই বৎসর পাঠ করিয়াছে অথবা যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছে তাহাদিগকেই ভর্ত্তি করা হয়। জাগতিক শিক্ষা সংস্কারের ইতিহাস, দর্শন শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালী প্রভৃতি এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষক সমাজ--যুক্ত রাজ্যের শিক্ষক সম্প্রদায়ের গড়ে শতকরা ৭৮·৩ জন স্ত্রীলোক এবং ২১·৭ জন পুরুষ। বড় সহরে শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জন শিক্ষক শিক্ষাদান প্রণালী শিক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রামে ট্রেইন্‌ড শিক্ষক শতকরা ২০ জনের বেশী হইবে না।

শিক্ষকের বেতন——যুক্ত রাজ্যে শিক্ষকের জন্য পেনসনের ব্যবস্থা নাই। অনেক স্থলে স্কুলের আয়েরও স্থিরতা নাই। এবং শিক্ষকের বেতনও অতি সামান্য। এই জন্য তথায় ভাল শিক্ষক সচরাচর মিলে না। এবং এই জন্যই বোধ হয় তথায় শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা এত বেশী। অনেক শিক্ষককে আবার শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া শিল্পবিজ্ঞানের দিকেও হেলিতে দেখা যায়। তথায় প্রত্যেক পুরুষ শিক্ষক গড়ে বার্ষিক ১৩৯·৩ পাউণ্ড ও প্রত্যেক স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী গড়ে বার্ষিক ১০৫·৭ পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রবাদের আবাদ।

রসময়ের রাসলীলার বাসি বাসরের আসরে রসকরা, রসগোল্লার সরস বৈঠকে এপ্রবন্ধ "ব্রাহ্মণ দোকানস্থ পাঁওরুটী"-বৎ বেজায় বেখাপ্পা হইলেও হাজির করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কবন্ধাকার অবন্ধ প্রবন্ধই হাজির করিয়া দিলাম। কবি বলেন "নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" আমার স্পর্দ্ধার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ধাতু প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের অর্থে খুব জোর না থাকিলেও "বদাদন্যত্র" লইয়া যাইবার মত শক্তি বিশিষ্ট উপসর্গের ক্ষমতায় প্রবাদ খুব পরিপুষ্ট হইয়া আছে। কতকগুলি প্রবাদ দেশ ব্যাপী, যেমন "জোর যার মুলুক তার।" আর কতকগুলি স্থানীয়। দেশ ব্যাপী যে সকল প্রবাদ আছে, সে গুলি নানা উপায়ে সংগৃহীত হইতেছে ; আর স্থানীয়গুলি বড় অসহায়, বড় বিপন্ন। তোরীরা থাকে সমাজের গণ্ডিতে আবদ্ধ, একটু এদিকে সেদিকে গেলেই হুঁকাবন্ধ, নাপিত-ধোপা, পুরোহিত বন্ধ। কাজেই পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের মত

"—কুসুম দাম সজ্জিত
দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত"

প্রবাদ গুলি আজ গভীর জঙ্গলে কণ্টক-লতায়-আবদ্ধ। সেই জঙ্গল আবাদ করিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। কাজ অগ্রসর হউক বা না হউক্, আরম্ভ ত করি। বহুকালের অনাবাদী ভূমি আবাদ করাও কয়েক পুরুষের দরকার। তারপর—

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার
অমূল্য রতন।"

এসকল প্রবাদেও ভাগকথায় একটা পাওয়া যাইতে পারে। ছোট, খাট মানুষ আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে বড় বড় গবেষণার ধারে কাছে আর যাইতে চাহি না "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ"

আদার বেপারী হইয়া জাহাজের খবর লইব না ; গাঁয়ের ভূত গাঁজের প্রবাদ আবাদ করিয়া যাইব, আশা করি আমারও দোসর মিলিবে। না মিলিলে—

"একা কব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।"

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি ; অনেক প্রবাদ এমন আছে, যাহা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের মূলে উৎপন্ন, আবার কতকগুলি সামাজিক কটাক্ষে জর্জ্জরিত ; আর কোন কোনটা বা অনাবিল হাস্যরসের উৎস। প্রয়োজন অনুসারে কোন কোন প্রবাদের উল্লেখ মাত্র করিব, কাঁটা ঘাঁটাইবনা, সুরুচি সম্পন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর ভার রহিবে তাহার ব্যাখ্যার।

১। "সাজনে এগারসিন্দুর, বাজনে টোক,
গোদে বাদিয়া, ঢেঙ্গে থামা
ন্যায় করিস্ ত হাজরাদী সামা।"

ব্রহ্মপুত্র তীরে এগারসিন্দুর একসময় দেওয়ান ইশাখাঁর এক প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তখন হইতেই এখানকার মানুষ সাজসজ্জায় পারিপাট্যের প্রতি একান্ত আগ্রহান্বিত। টোকের লোকসকল গান বাজনায় খুব সৌখীন। টোক ব্রহ্মপুত্র ও বানারের সম্মিলন স্থানে, ঢাকা জিলায়-অবস্থিত এগার সিন্দুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে। বাহাদিয়া বা বাদিয়া এগারসিন্দুরের নিকটবর্ত্তি গ্রাম এখানে "গোদ" ওয়ালা লোকের সংখ্যা অনেক। "ঢেং" অর্থে অত্যধিক মাত্রায় চতুর ও বঞ্চক। থামা'র লোক বেজায় ধূর্ত্ত—ভারি টেট্না। আর কূট তর্কে হাজরাদির লোক পটু। আমার বাড়ী হাজরাদি হইলেও, আমার বিশ্বাস আমাদের উপর এই 'ন্যায়' বা টেঁটামি' করার সার্টিফিকেটটা বড় জুলুম হইয়াছে। কথিত আছে এক ব্যক্তি সভায় বলিয়াছিল আমি একটা গল্প বলিব, ভারী মজাদার, কিন্তু যদি সভায় হাজরাদির লোক না থাকে

সকলেই বলিল, হাঁ হাঁ বলুন, এখানে কেউ হাজরাদির নাই। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, 'এক দেশে এক রকম গাছ আছে, তার পাতা জলে পড়িলে হয় কুমীর, আর তটে পড়িলে হয় বাঘ। সকলই গল্পটার তারিপ করিল। কেবল একজন বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, পাতাটা জলে স্থলে পড়িলে কি হয়?" বক্তার মুখ চুণ হইয়া গেল।

তিনি কহিলেন—"আপনার বাড়ী?"

"আজ্ঞে "হাজরাদী।"

"এঃ—গল্পটা মাটী করলেন"

২। "আঙ্গিয়াদি 'সেন' ভূতানাং বরাটীয়া "রায়'সে তথা—
পাকুন্দিয়া তালগাছশ্চ, কুমারপুর নমোহস্তুতে।"

আঙ্গিয়াদি গ্রামের প্রায় সকলই সেন' উপাধিকারী, তাহাদের

অতীত কার্য্যাবলী 'ভূত' প্রায় ছিল। বরাটীয়া গ্রামের রায় মহাশয়েরাও প্রায় ঐরূপ, পাকুন্দিয়া গ্রামে এক সময় বহু তালগাছ ছিল, আর সে অঞ্চলের কুমারপুর গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি।

৩। "বেতালে বহব গাবা
মন্থুয়াং শাল্মলীস্তথা
বহু পর্ণনাচ মিতায়াং
বানীয়াগ্রামে বরাঙ্গনা।"

বেতাল গ্রামে বহু গাবগাছ আছে, আগে আরও বেশী ছিল। মহুয়া গ্রামে বিস্তর শিমুলগাছ। ফুলের সময়

"আল্‌তা নিয়ে পাড়া বেড়ায়
শিমুলমণি নাপ্তানী,।"

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৩। শিরোমণিরে খাইল বাঘে,
আর মানুষ কিসে লাগে।"

নওয়ার কমলাকান্ত শিরোমণি, খুব জোয়ান জবরদস্ত মানুষ ছিলেন। তিনি বলিতেন "বাঘ—ছাগ, "অর্থাৎ যেমন তেমন বাঘ্‌কে তিনি গণ্য করিতেন না। অনেক বাঘকে তিনি তাঁহার নিত্য সহচর যষ্ঠীর সাহায্যে লোক চিনাইয়াছিলেন। এ হেন ব্যক্তিকে একবার "বাঘে খাইয়াছে" এরূপ গুজব উঠে। এই কথা হইতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি।

৫। "জগাই, ভগাই, কুশি, গাই,
এর পাছে আর বামুন নাই।
যদি থাকে দুই এক ঘর
সপ্তশতী পরাশর।"

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৬। ব্রাহ্মণেভ্য দধিদীয়তাং
তক্রং কৌণ্ডিণ্যায়।"

ইহার ব্যাখ্যাও তথৈবচ।

৭। রাজ্যি জুড়ে বামন নাই
কাশীঠাকুর চিড়া খায়।"

দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের দই চিড়া খাওয়ার নিমন্ত্রণ। দৈবাৎ কেহই সেখানে যান নাই, এক মাত্র কাশী ভট্টাচার্য্য হাজির। এত গুলি দই চিড়া, চিনি, কি হইবে ভাবিয়া ও গৃহ কর্ত্তা ম্রিয়মাণ। কাশীঠাকুর একাই সমস্ত উদরস্থ করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

৮। বাড়ী নষ্ট বাঁশে
গাঁও নষ্ট দাসে,
ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৯। বসো—বসো
বণং নণং

...গ্রাম নিবাসী রামশঙ্কর বিদ্যামণি মহাশয় ভ্রাতার শ্বশুর বাড়ীতে একটী গাছ চাহিয়াছিলেন, কর্ত্তা বাড়ী ছিলেন না; কর্ত্তার ভাই এ—ও—তা—তা—করিতে করিতে মাথা চুলকাইয়া পুত্রাকে বিদায় দিলেন। বিদ্যামণি মহাশয় বাড়ী আসিয়া উক্ত ৮টী অক্ষর লিখিয়া পাঠাইলেন; কর্ত্তা বাড়ী আসিয়া দেখেন ভাই ঐ ৮টী অক্ষরে মাথায় তাল পাকাইতেছেন। কর্ত্তা ৮টী অক্ষর পড়িয়াই কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, পর দিনই প্রাতে গাছ কাটাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত ৮টী অক্ষর নিম্নলিখিত বিখ্যাত শ্লোকের অগ্র ও পশ্চাৎ অক্ষর।

"বরমসি ধার তরুতলে বাসো
বরমে ভিক্ষা বরম্ উপবাসো
বরমে ঘোরে নরকে মরণং
ন চ ধন গর্ব্বিত বান্ধব শরণং।"

১০। কম আগুনে তামাক খাওয়া আর ছোট লোককে খোসামুদী করা।

১১। "কুঁরপুর, মুরপুর, পাটুয়াভাঙ্গা নিচিন্‌পুর তার মধ্যে বাস করেন অনেকগুলি ......।"

১২। "রক্ত বর্ণ চক্ষু আর, পিঙ্গল বর্ণ দাড়ি
দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে যে তাঁর...বাড়ী।"

১৩। (ক) "ছিটের কাপড় পিঙ্গল দাঁড়ী
তোমার কি ভাই...বাড়ী?"

(খ) "রেতে মশা দিনে পুকী
আর না যাইও...মুখী।"

(গ) "দিনে 'উনি' রেতে মশা
আর যাইও না...পাশা।"

এগুলি তাৎকালীয় মশা মাছি ও উনি পোকার মাহাত্ম্য ও গ্রাম বিশেষের মাহাত্ম্য প্রকাশক। আজ-কাল কিন্তু পাট ও রেলের কৃপায় দেশের সর্ব্বত্রই মশার বিশেষ আধিক্য দেখা যায়।

১৪। "বান্তার টুক্ টাক্ কামারের এক ঘা।"

১৫। "শ কোণে লাঙ্গল এক কোণে চেলা।"

১৬। "যেমন গাবর তেমন থাবর"

১৭। "কামাইরা আগুণ চামাইরা "টান।"

দুই-ই অব্যর্থ এবং অতিশয় কড়া।

অতঃপর আমরা অদ্য আহাম্মক দ্বাদশীর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। যদি এই জঙ্গলা আবাদ করিয়া ব্রহ্মত্রের সনন্দ উপস্থিত সভাপতি মহাশয় দেন, তবে আরও আবাদের ইচ্ছা রহিল, নহিলে আজই শেষ।

অথ আহাম্মক দ্বাদশী—

১। "আহাম্মক এক,
যে বড় লোকের সাথে দেয় ঠেক।"

টীকা—ঠেক্—তাল দেওয়া, ঝুঝিতে যাওয়া।

২। আহাম্মক দুই
যে ঘর ছেরে না ধরে টুই।

টীকা—কাজ শেষ না করায় কোন ফলই হয় না।

৩। "আহাম্মক তিন
যে ছোট লোকের রাখে ঋণ।"

টীকা—ছোট লোকে পথে ঘাটে তাগাদা করে, পাঁচ জনের সাম্‌নে অপমান করে। সময় অসময় বোঝে না।

৪। আহাম্মক চাইর—
যে ঘরের কথা করে বাইর,।" টীকা অনাবশ্যক,

৫। "আহাম্মক পাঁচ
যে সীমানায় রোয় গাছ।"
টীকা—কলহ লাগাই থাকে, ফল নিয়া টানাটানি।

৬। আহাম্মক ছয়—
যে 'কথায় কথায় করে হয়' হয়'।"
টীকা—অনর্থক তোষামোদ কারিতা।

৭। আহাম্মক সাত
যে পেট ভরে খায় ভাত।"

টীকা—হজমও হয় না, কার্য্য ক্ষমতাও থাকেনা।

তাই কথায় বলে—

আঁতে তিত দাঁতে নুন,
পেটের ভরে তিন কোণ।
আমে কভু নাইরে [illegible]
তার বাড়ীতে বৈদ্ না গেল।"

বইদ্ = বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসক।

৮। আহাম্মক আট—
যে অন্নের জন্য করে নষ্ট—।"

৯। আহাম্মক নয়
যে আজ করে হয়, কাল করে নয়।"
অর্থাৎ যাহার কথার ঠিক মোটেই নাই।

১০। আহাম্মকে দশ—
যে জন ঝি চাকরের বশ"

১১। আহাম্মক এগার
যে পরের ঝুঁকি লয় ঘাড়।"

টীকা—এই কথাতেই লোকে বলে।
"গাছে উঠে পড়্‌তে
জামিন হয় ভর্‌তে।

১২। দ্বাদশ আহাম্মকের কথা বল্‌ব আর কি,
যে অভাগা গাঁর মধ্যে বিয়া দেয় ঝি।
সর্ব্বদা ঝগড়া লাগা থাকে। এ উহার জাতি বিটলায়, সে তাহার জাত্ বিটলায়।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দেবাসুর সংগ্রাম।

ঊর্দ্ধে বহু ঊর্দ্ধে যেথা মানবের দৃষ্টি হয় হারা.
এখনও আলোর লোকে আছেন অনন্ত দেবতারা।
নাহিক তাঁদের কোন সুখ দুঃখ জরা মৃত্যু ভয় ;
সুধাঘন সোম পানে সদানন্দ শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়।
নিম্নে বহু নিম্নে এক রন্ধ্রহারা অন্ধকারে
অসুরেরা করে বাস'—জন্ম জনমের পরপারে.
অজ্ঞান-তমিস্রা-ঘেরা আছে যেই মহামরণের
অনন্ত নরক ঘোর, পরিণাম সকল পাপের !
সম্মুখ বাহিনী তারা তার।
মাঝ খানে ত্রিভুবন,
বিরাট আহবক্ষেত্র ; বক্ষ তার দলে অগণন
দানবের সৈন্যগণ। ঊর্দ্ধ হতে কভু বা আবার
উজ্জ্বল দৈবাস্ত্র আসি' বজ্ররবে করে ছারখার
দৈত্যদলে; টুটাইয়া অন্ধকার, দীপ্ত সমুজ্জ্বল

সূর্য্যালোকে ভরি' দেয় স্বর্গ মর্ত্ত্য গগণ মণ্ডল।
দেবাসুর যুদ্ধ ঘোর মানব-অন্তর-ত্রিভুবনে
রাত্রি দিন চলিছে এমনি. বেগে দেহে প্রাণে মনে!
অন্তিমে দেবতা জয়ী-। রে মানব, রাখিও স্মরণ।
উর্দ্ধ করে কোরো সদা দেবতারি বিজয় বরণ!

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

প্রত্যাবর্ত্তন।

"অরুণ! অরুণ"! দেখেছ সুরেন্! ছেলেটা একেবারে ব'য়ে গেল, বাবা ব'লেছিলেন, ওটাকে মানুষ কর্‌তে, তা আর পেরে উঠলুম্ না। বিদ্যে ত সেকেণ্ড ক্লাস, এরই মধ্যে তিনি একজন মস্ত নন্‌কোপারেটার হ'য়ে উঠেছেন, রাত ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমান মিটিং ক'রেন, আর আমি বড়, ভাই তার উপরে যে আছি, সেটা সে আমলেই আন্‌তে চায় না। আচ্ছা, আজ তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব যে, দেশ দেশ ক'রে মাথা ঘামালেই পেট চল্‌বে না।"

এই কথাগুলি তালুকদার তরুণ রায়, তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্র ঘোষ কে ব'লছিলেন। আজ তাঁর মনটা বেজায় গরম। বাজার থেকে বিলেতী কাপড় নিয়ে আস্‌ছিলেন রাস্তায় ভলান্টিয়ারেরা কাপড় কেড়ে নিয়ে, তাঁরই সাম্‌নে তাহা পুড়িয়ে দিয়েছে। আর তাঁর ভাই, সেও কিনা তাদের মধ্যে একজন।

এই সময় চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়ে অরুণ এসে বল্‌তে আরম্ভ ক'রলো "দাদা, দাদা, আজ যে নিতীশ বাবু বক্তৃতা,"... তরুণ বাবু আর নিজকে সাম্‌লাতে পারলেন না, ভ্রাতৃস্নেহ চ'লে গেল, বন্ধুর অনুরোধ ভেসে গেল, বলে উঠলেন,, থাম্ নন্‌সেন্স, তোকে আর বক্তৃতার কথা আমাকে শোনাতে হবে- না।"

তরুণ বাবু, তিনি যে বড় ভাই, এবং সে যে আদপেই তাঁকে গ্রাহ্য করেনা, এটা খুব ভাল করে কড়া কথায় বুঝিয়ে দিলেন। অবশেষে যে কথা বললেন, তাতে আর অরুণ চুপ্ করে থাকতে পারলেনা, রেগে ব'লে উঠ্‌লো, "আমি আর আপনার টীকা টিপ্পনী শুনতে চাইনে, কাল থেকে আর আমি বক্তৃতার কথা ব'লে জ্বালাতেও আসবো না।

বাস্তবিকপক্ষেও অরুণকে পরের দিন হইতে আর গ্রামে দেখা গেল না"।

(দুই)

অরুণ দেশের কাজে খুব নাম কিনেছে, দুকথায় তার পরিচয় দিলে ব'লতে হয়—সে একজন মস্ত নন্‌কোওপারেটার, দেশেরকাজে, মায়ের ডাকে সাড়া দিতে সে সব সময়ই প্রস্তুত। এখন, এমন আরো কয়েকজন রহিমপুরে এসেছে, গ্রামের লোকদের বোঝাতে যে, "তারা সবই এক মায়েরই সন্তান, ভায়ে ভায়ে মোকদ্দমা করে ঝগড়া করো না, বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করো না, এতে তোমাদের মায়ের কষ্ট হয়।"

আজ গ্রামে হাটের দিন, অরুণ দলবল নিয়ে তার কাজে বে'র হয়েছে,। বিষয় হ'চ্ছে, হাটের লোককে বোঝান যে তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাই। সভাস্থল হাটের একপাশে। সভা বেশ জমে উঠেছে, হাটের প্রায় সব লোক ছুটে এসে বক্তৃতার বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে, আর প্রতিজ্ঞা কর্‌ছে, তারা ভায়ে ভায়ে "ঝগড়া বিবাদ" করবে না।

সভা ভেঙ্গেছে, তারা সবাই তাদের আড্ডার দিকে আস্‌ছে; মন কৃতকার্য্যতার ফুর্ত্তিতে কাণায় কাণায় ভরপুর। এমন সময় তারা শুনতে পেলো কে এক জন পেছন থেকে ডাকছে। সকলে ফিরে লোকটার জন্যে দাঁড়াল। এর মধ্যে লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একটা কথা জানবার জন্যে তাদের অনুমতি চাইল। তার মুখে চোখে জানবার একটা বিরাট আগ্রহ।

তাঁরা রাজি হলে, সে বলতে লাগলো, "আচ্ছা বাবু আপনারা যে সব কথা কইলেন, তাকি আপনারাও মানেন, আপনারা কি ভাই ভাইয়ে ঝগড়া করেন না?"

সকলেই তখন এক সঙ্গে বল্‌লেন—"আমরা যা মুখে বলি, কাজেও তাই করি, তুমি এতটা না ভাবলেও পারতে।" বেচারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

প্রত্যেকের মুখে তখনও বেশ ফুর্ত্তি লেগে আছে, কিন্তু কেন জানি অরুণের মুখখানা ভার হয়ে রয়েছে। লোক্‌টার কথাগুলো তার মধ্যে খালি তোলাপড়া করতে লাগ্‌লো। বাসায় গিয়ে সে কারো সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা কইলো না, চুপ করে একদিকে সরে রইলো। পরের দিন যা কিছু তার ছিল, গুছিয়ে নিয়ে যে বাড়ী মুখে রওনা হলো।

(তিন)

গাড়ী থেকে নেমে, অরুণ কেমন জানি ছন্ন ছাড়া হ'য়ে বাড়ী মুখে ছুটেছে, মনটা যেন তার থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছে। আর সে ভাবছে,—কোন দাবিতে সে বাড়ীর দোয়ে ঘা দেবে, সে যে একদিন নিজেই সামান্য কথায় চটে গিয়ে, বেজায় তেজ দেখিয়ে বাড়ী হ'তে বে'র হ'য়ে এসেছে। তবু খারাপের ভাল যে, লোকটা তার চোখ খুলে দিয়েছে।

নিরাশ-নিস্ফল-তীব্র-অনুশোচনায় অরুণের দেহ মন যেন অসার হিম হ'য়ে আসছিলো; নিজের দোষ সে বুঝতে পেরেছে, যে রকমই হউক সে আজ দাদার কাছে "দাদা" ব'লে দাঁড়াবেই, লোকে যাই মনে করুক না কেন। এই ভেবে সে বাড়ীর দোরে এসে ঘা দিলে। কিছু পর একটা চাকর এসে দোর খুলে দিলো, এবং তাকে দেখেই ব'লে উঠ্‌লো "ছোট বাবু?" "চুপ ক'র, ব'ল দাদা কোন্ ঘরে?" চাকরটা সে ঘর দেখিয়ে দিলে। সে ঘরে গিয়ে সে যা দেখলে, তাতে তার মন আরও দ'মে গেল। দাদা বিছানায় শুয়ে আছেন, মাথার কাছে ক'য়েক শিশি ঔষধ, আর বন্ধু সুরেন্ চোখ ভরা জল নিয়ে, বসে বাতাস দিচ্ছে। তাকে দেখেই সুরেন্ ব'লে উঠ্‌লো, "তরুণ, তরুণ, চেয়ে দেখ, তুমি যার কথা মনে ক'রে এই শেষ সময়ে কষ্ট পাচ্ছ, সে এসেছে। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে, বল, পরে বোধ হয়" আর সে ব'লতে পারলোনা, কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে এ'লো।

কে? অরুণ এলি?—আজ বুঝি তোর ভাইকে মনে পড়েছে,—আমি যে এই তিন বছর প্রতিপলে তোকে মনে করছি। আজ আমার শেষ দিন,—আমার দোষ হ'য়ে থাকলে ভুলে যাস্,—বিনু আর ওর মাকে দেখিস্!"...

অরুণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ব'লতে লাগলো,—"দাদা আমারই দোষ,—তুমি শেষ সময়ে আমাকে ক্ষমা ক'রে যাও,—আমি যে...," আর কিছু সে ব'লতে পারলো না,—শুধু অজ্ঞান হয়ে অরুণের পায়ের দিকে প'ড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান হ'লো,—তখন বাড়ীতে কান্নার রোল পরে গেছে।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য চৌধুরী।

হোটেল।

বয়স তাহার তিন কুড়ি প্রায় কথায় ভারি রস,
হোটেল খানার পাণ্ডাগুলার মুখেই তাহার যশ।
বড় বাজারে খালের ধারে হোটেলখানা তার,
হাসির সাথে কথা বিকায় এমনি চমৎকার।
মেথর মুচি সমান শুচি সে যে তাদের মা—
ফেন টুকু দেয় দুই আনাতে এমনি মহিমা।
বাসন মাজে সখ্‌রা কাচে. জংবাহাদুর নাম—
কেউ যানে না গাঁই গোত্র তার কোন্ দেশে বা ধাম।
মিষ্টি মুখে কথা বল্লে দুষ্টি উঠে কাঁপি
মাসির সাথে ফষ্টি নষ্টি হাসির চাপা চাপি।
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ যিনি তিনি বিলান পান,
খাতা লিখেন গাঁজা টিপেন গাহেন ভাবের গান।
লাট বেলাটের ঘরের কথা গাঁধীর ঠাকুরালী—
সুইডেনের সব গুজব খবর ইংলিশ ম্যানের গালি,
বার্কেনহেডের বক্তৃতা আর আমেরিকার ট্রাম,
সবই জানেন ঠাকুর কর্ত্তা কত বল্‌ব নাম।
বাসায় যখন মনে পড়ে একলা ব'সে হাসি—,
এহস্পর্শ-বেশ জুটেছে—ঠাকুর, চাকর, মাসি।
রাম বাবু আর নদেরচাঁদ—মাসিক যাঁরা খান—
এবং যাঁদের ভাগ্যে পান মাসির হাতের পান—
তাদের ভাগ্যে ঝোলের মাছের বিবেচনা আছে,
কাউকে মাসি তলায় রাখে কাউকে রাখে গাছে।
পঁচাবাসি পান্তা তাহার সবাই সহ্য হয়—
চৌদ্দপুরুষ নরকে যায়—যে জন মন্দ কয়।
ভোজন শালার বিকট গন্ধ লাখে লাখে মাছি,
গো গ্রাসে খাই তিন মিনিটে—উঠ্‌তে পার্‌লে বাঁচি।
পাচক যিনি ময়লা ভরা গামছা কাপড় তার—
দোক্তা পানে গাল্‌টা ভরা কথা কওয়া ভার।
গলায় তাহার পৈতা নামে সুতার দড়ি বাঁধা—
সতর বছর ধরে তাঁহার এক প্যাটার্ণের রাঁধা।
লঙ্কা দিতে শঙ্কা নাহি তঙ্কা লাগে দশ—
গালি খেলেও "নান্যঃ পন্থা" থাকি তাদের বশ।
হায় বিধি কোন্ পাপের ফলে—বাঙ্গলা দেশের ছেলে—
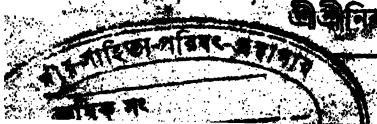
হোটেলে খায় নরক গুলা হবিষ্যান্ন ফেলে।
যায় না জাতি, যায় না ধর্ম্ম —স্বাস্থ্য থাকে ভাল,
হে দয়াময় একবার দেখায়ে দাও আলো।
চক্ষু ফেটে রক্ত উঠে বক্ষ কাঁপে ত্রাসে
গালির ছালা পিঠে ফেলে চল্লাম হোটেল বাসে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম।

মানব সমাজবদ্ধ হইয়া যে নৈতিক বিধির উপর সেই সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে, তাহাই তাহার সমাজ-ধর্ম্ম। ঐ নৈতিক বিধিই ব্যষ্টি ভাবে ব্যক্তিকে এবং সমষ্টি ভাবে সমাজকে রক্ষা করিয়া থাকে; সুতরাং সমাজ পরিচালনের যে ব্যবস্থা তাহাই সমাজ-ধর্ম্ম। এই সামাজিক ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সমাজ আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়;—সেই সমাজ নীতির হিসাবে কত উন্নত বা কত অবনত, তাহা অপর বাহিরের সমাজ বুঝিতে পারে; অনাগত ভবিষ্যতের সমাজও বর্ত্তমান ও অতীতের তুলনায় আলোচনায় অবগত হইতে পারে।

সমাজ-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বৈবাহিক সম্বন্ধ। বৈবাহিক পদ্ধতি বা যৌন-সম্বন্ধ-রীতি যে জাতির যত উন্নত, জগতে সে জাতির সমাজ-ধর্ম্মের ভিত্তি তত সুদৃঢ় এবং ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ তত উচ্চ।

সমাজ স্থাপনের সঙ্গেসঙ্গেই সমাজ-ধর্ম্ম উন্নত পর্য্যায়ে আরব্ধ হয় নাই। উন্নতি ক্রমবিকাশেরই ফল। ক্রম বিকাশের ফলে মানব সমাজ যে চির দিন উন্নতির পথেই ধাবিত হইতে থাকে, তাহাও আবার অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উন্নতির পর অবনতি, আবার অবনতির পর উন্নতি; এই রীতিই সমাজ-গতির পদ্ধতি। জাতির উন্নতি ও অবনতির সহিত সমাজ-গতি অলঙ্ঘ্য ভাবে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আর্য্য সমাজ কিরূপ নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল, বেদে তাহার সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত না থাকিলেও, তাহাতে তাহার আভাস আছে।

বৈদিক যুগের পরেই ব্রাহ্মণ যুগ। ব্রাহ্মণ যুগের "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ গুলির নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, তখন বেদের ইঙ্গিত সমূহই সমাজ-ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এই যুগে মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। এই যুগে যে সমস্ত গীত ও বিধান রচিত হইয়াছিল, তাহা বেদমন্ত্র সমূহের ন্যায় মুখে মুখেই রচিত হইয়াছিল। গীত গুলি যুগের পর যুগ জন-গণের স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তাহার সামান্য অংশ সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে, ব্রাহ্মণ গুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।[১] রামায়ণ সেই গীত রচনারই রক্ষিত অংশ মাত্র। ব্রাহ্মণ যুগের ভারতীয় সমাজ-ধর্ম্মের চিত্র রামায়ণে অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

রামায়ণের বর্ণনার ভিতর আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টা থাকিলেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে তাহা হইতে তৎকালের প্রকৃত সমাজ ধর্ম্মের অবস্থা অবগত হওয়া যাইতে পারে।

রামায়ণ-সমাজের পর আর্য্য সমাজের সমাজ ধর্ম্মে কোন্ কোন্ বিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, মহাভারতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণের আভাসও তাহাতে রহিয়াছে।

রামায়ণের যুগে আর্য্য ভারতে যে সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, সে সমাজে স্পষ্ট বিশেষ কোন আবিলতা দৃষ্ট হয় না। বৈদিক সমাজের ভিতর যে আদিম বিশৃঙ্খল ভাবের আভাস পাওয়া যায়, এই সমাজের দেহ হইতে তাহা তখনও যেন একেবারে মুছিয়া যায় নাই; সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিলে যেমন বাহিরে বেশ উজ্জ্বল দেখায়, অথচ তাহার অভ্যন্তরে প্রাচীন শিকরবদ্ধ কুপ্রথা গুলি লুপ্ত ভাবে গুপ্ত থাকে, ঠিক এইরূপ ভাবে এই সমাজের চিত্রটী পাঠকের নিকট রামায়ণে উদ্ভাষিত হইবে।

কি সামাজিক শৃঙ্খলা, কি আচার ব্যবহার, কি বিবাহ পদ্ধতি, কি রীতি-নীতি—সমস্ত বিষয়েই যেন রামায়ণের সমাজ-সদ্য প্রবর্ত্তিত সরল সমাজ বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত একটী আদর্শ অথচ অসম্পূর্ণ সমাজ। ইহার উপর যে কবির লেখনী প্রভাব নাই—ইহা অস্বীকার করা যায় না।

কাব্যের অতিশয় উক্তি ও আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টার ভিতর হইতে প্রকৃত সমাজ-তত্ত্ব সংগ্রহের যে উপায় আমরা পূর্ব্ব

---

১ ব্রাহ্মণ যুগে তিন বেদের মাত্র তিন খানা ব্রাহ্মণ ছিল। বৌধায়ণ ধর্ম্ম সূত্র ১।১।১।৪ দ্রষ্টব্য। আপস্তম্ব বলেন "সেই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি নাই"। ...আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্র ১।৪।১২।১০ দ্রষ্টব্য।

অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, রামায়ণের সমাজ আলোচনায় আমরা সেই উপায়, যতদূর সম্ভব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

রামায়ণের প্রধান সামাজিক ক্রিয়া—সীতার বিবাহ। এই বিবাহের অনাবিল চিত্রটী রামায়ণের সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বিবাহের চিত্রটী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে, বর্ত্তমান অধ্যায়ে সমসাময়িক সমাজ-ধর্ম্মের অনুমোদিত সাধারণ অনুষ্ঠান গুলির কথায়ই আলোচনা করা যাইতেছে।

শুল্ক বা পণ প্রথা।

বিবাহে শুল্কের উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। সীতাকে পাত্রস্থ করার সম্বন্ধে রাজা জনক নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—

"বীর্য্য শুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা" ১৫।১।৬।

অর্থ—আমি আমার এই অযোনিজা কন্যাকে বীর্য্য-শুল্ক করিয়া রাখিয়াছি; অর্থাৎ যিনি নিজ বীর্য্য দেখাইয়া এই ধনুতে জ্যারোপণাদি করিতে পারিবেন, তিনিই কন্যা লাভ করিবেন।

ইহাও একটী পণ। এই পণের নাম ধনুর্ভঙ্গ-পণ। রাজা দশরথকে কৈকেয়ীর পাণি গ্রহণ করিতে অন্য প্রকারের আর একটী পণে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। সে পণ ছিল—রাজ্য শুল্ক। (অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭।৩) সুতরাং পণ প্রথাটি সামাজিক হিসাবে খুব প্রাচীন। কালে কালে পণের যে প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন, ঘটিয়াছিল তাহা সূত্র-গ্রন্থ গুলি হইতে অবগত হওয়া যায়।

কোন কোন সূত্রগ্রন্থে অবগত হওয়া যায়—পণ প্রথাটী বৈদিক কালেও প্রচলিত ছিল। কোন কোন সূত্রকার আবার ইহা বেদ-বিরুদ্ধ-প্রথা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] বসিষ্ঠ-ধর্ম্ম-সূত্রকার[১] প্রথমোক্ত মতের সমর্থক; বৌধায়ণ-ধর্ম্ম-সূত্রকার দ্বিতীয় মত প্রচার করিয়াছেন।[২] বসিষ্ঠ ছয় প্রকার বিবাহ প্রথার মধ্যে পণ দ্বারা কন্যা গ্রহণকে মনুষ্য-রীতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৌধায়ন বলিয়াছেন—"অর্থ দ্বারা ক্রীত স্ত্রী ধর্ম্ম পত্নীই নহে। সে দাসী; যজ্ঞে তাহার অধিকার নাই। অন্যান্য সূত্রকারগণ মধ্যপন্থী। আপস্তম্ব ধর্ম্ম-সূত্রকার বরকে কন্যা কর্ত্তার সন্তোষ বিধান করিয়া উপঢৌকন প্রদান করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন।[৩] আপস্তম্বও বেদের দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু কোন সূত্রকারই কোন বেদ-মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহা সমর্থন করেন নাই। ঋকবেদে সূর্য্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে ঋক-মন্ত্রগুলি আছে, তাহাতে উভয় পক্ষেরই উপঢৌকনের উল্লেখ আছে।[৪] গৃহ্য-সূত্রকারগণ শুল্কের উল্লেখ করেন নাই; উপঢৌকন বা যৌতুকের উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] বর কন্যা কর্ত্তাকে একশত গাভী ও এক খানা রথ যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিবে। যৌতুকের এই প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে বৌধায়ন ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সূত্রকারও গৃহ্যসূত্রকারগণের মধ্যে সাংখ্যায়ন ও পারস্কর এক মতাবলম্বী।

মহাভারতেও কন্যাপণ প্রথার দৃষ্টান্ত আছে। মাদ্রীর ভ্রাতা শৈল্যের আচরণে তাহা অবগত হওয়া যায়। অবশ্য মহাভারতে শৈল্যের মুখে এই প্রথাকে নিন্দিত প্রথা বলিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে।[৬] এসম্বন্ধে স্মৃতিকারগণের মতও ঐক্যসম্পন্ন নহে। মনু কন্যাপণে আপত্তি করেন নাই বটে[৭] কিন্তু আপস্তম্ব স্মৃতি[৮] ও অত্রি-স্মৃতি[৯] ঐ প্রথাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অত্রি বৌধায়নের ন্যায় শুল্ক-ক্রীতা স্ত্রীকে ধর্ম্ম পত্নী বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

বিভিন্ন সমাজে বেদ-মন্ত্রের অর্থ গ্রহণে মত-বৈসম্যতাই যে এইরূপ মত ভেদের কারণ ইহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে, হয় কন্যার পিতা স্বীয় কন্যাকে কিরূপ স্থলে সম্প্রদান করিবেন—এসম্বন্ধে তাঁহার নিজের মনে একটা সঙ্কল্প থাকা খুব স্বাভাবিক। কন্যাপণের এই সঙ্কল্পই কালে কন্যা-শুল্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন বীর্য্য প্রদর্শনের যুগে শক্তির পরিচয় ছিল পণের একটা প্রকার;

১। বসিষ্ঠ ধর্ম্ম সূত্র ১।৩৫, ৩৬

২। বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্র ১।১১।২১।২

৩। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২।৬।১৩।১২

৪। ঋক্‌বেদ ১০।৮৫।৩১ (বরপক্ষের উপঢৌকনের উল্লেখ)
ঋকবেদ ১০।৮৫।১৩ (কন্যার পিতামাতা প্রদত্ত উপঢৌকনের উল্লেখ।)

৫। সাংখ্যায়নগৃহ্যসূত্র ১।১০।১৬; পারস্কর গৃহ্যসূত্র ১।৮।১৮

৬। মহাভারতআদি পর্ব্ব ১১৩ অধ্যায়।

৭। মনুসংহিতা ৯।৯৩, ৯৭
মনু শূদ্রকে কন্যা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৮। আপস্তম্ব স্মৃতি ৯।২৫

৯। অত্রি সংহিতা ৩৮০ শ্লোক।
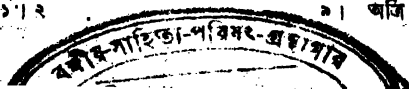
সূত্রগ্রন্থসমূহে যে যুগের রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে পণ শত সংখ্যক ধেনুও একটি রথ ধার্য্য হইয়াছিল। মহাভারতে মদ্র-রাজের মুখে স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের কথা শুনা যায়। মহাভারতে বীর্য্য শুল্কের পরিচয়ও দ্রৌপদীর বিবাহের ঘটনায় প্রদত্ত হইয়াছে—উহা প্রাচীন রীতিরই অনুসরণের দৃষ্টান্ত। মহাভারতে যে মুদ্রা-পণ বা কন্যা বিক্রয় প্রথার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, রামায়ণে তাহা নাই। স্মৃতিতে এইরূপ ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধেই মতামত প্রদত্ত হইয়াছে। ধেনুর পরিবর্ত্তে সমাজে যখন অর্থই বিনিময়ের উপাদান হইয়াছিল, স্মৃতিতে সেই যুগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণের যুগ-লক্ষণে তেমন উপাদান নাই।

রাম নিজ শক্তির পরীক্ষা দ্বারা জনকের সঙ্কল্প বা পণ পূর্ণ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এই যোগ্যতারই নাম ছিল সে কালে শুল্ক।

সফলতা।

বরিষার মেঘে আকাশ ছাইল
দাদুরী তুলিল তান,
নীরস ধরণী সরস হইল
বাঁচিল চাতক-প্রাণ।
কণ্ঠ তাহার গিয়াছে ভরিয়া
সুশীতল ধারা করিয়া পান;
"চোখ গেল" রব গিয়াছে ভুলিয়া
বরষা রাণীর পাইয়া দান।
সাক্ষী ছিল তার আকাশ বাতাস
সাক্ষী ছিল তার কবির প্রাণ,
পরাণ ভরিয়া ডেকেছিল কত
তুলেছিল কত করুণ তান!
ব্যর্থ নহে তার আকুল কামনা,
ব্যর্থ নহে তার সাধন কভু,
ব্যর্থ নহে তার পরাণের ডাক,
মন্ত্রে যদিও ডাকেনি "প্রভু।"

শ্রীতারকনাথ ঘোষ।

গুতোর খাতির।

(গদ্য কবিতা)

গোয়ালে গাই বাঁধা আছে।
কচি বাছুর আছে তারই কাছে খোঁয়াড়ে বন্ধ।
গাই ডাক্‌ছে।
সে পেতে চায় তার ছেলেকে কাছে,
আরো কাছে, কোলের কাছে।
তাই দেখতে পাচ্ছে, তবু ডাক্‌ছে।
ছেলে আগড় ঠেলে যেতে চাইছে, পারছে না,
তাই পা দাপাচ্ছে, ন্যাজ্ নাড়ছে,
আর কাতর চোখে মায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে,
"হামা" হামা" কোর্‌ছে।
তার মানে—কি কোরব—
আমাকে যে আট্‌কে রেখেছে।
মা চাট্‌তে চাচ্ছে, বাছুর গা এগিয়ে দিচ্ছে।
মা চাট্‌তে গিয়ে চাট্‌তে পার্‌ছে না।
বেড়ার বাখারি চাট্‌ছে।
বসে বসে দেখ্‌ছি,
পাশে বসে' চার বছরের ছেলে।
সে বল্লে "বাবা, ওকে আট্‌কে রেখেছে কেন?"
"দুধ খেয়ে ফেল্‌বে যে।"
"ওর মার দুধ ও খাবে না?
আমি তো আমার মা'র দুধ খাই!
আমাকেত কেউ আট্‌কে রাখে না?"
"তুমি যে মানুষ, ওযে গরু!"
"ষাঁড়তো গরু, সে যে রোজ রোজ ধান খেয়ে যায়,
তাকেতো আট্‌কে রাখে না!"
"তার যে শিং আছে, গুঁতোয়!"
"ও বড় হোলে ওর যখন শিং হবে, গুঁতোতে পারবে,
তখন ওকে কেউ আট্‌কাতে পারবে না, কেমন না?"
আমি বল্‌লেম, "হুঁ—ঠিক কথা।"
খোকা খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে কি জানি কি ভেবে
মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে—
"বাবা আমার কবে শিং হবে?"

শ্রীসুরজিৎ দাশ গুপ্ত।

সাহিত্যে পঞ্চম পুরুষার্থ।

সাহিত্য-চর্চ্চাটা অধিকাংশ লোকের পক্ষে রুচিকর নয়, অন্ততঃ তাহা কেহ পুণ্যজনক মনে করে না, একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। সাধারণতঃ সাহিত্য-সেবায় "বাতিক গ্রস্ত" জনকয়েক মিলিয়া একটা পুর্ণিমা সম্মিলনের মত "জটলা" করিলে যে সর্ব্ব সাধারণকে সে স্থানে খুব কমই পাওয়া যায়, তাহা অনেক স্থানে অনেক বার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। যদি বেশী শ্রোতার আশা করিতে হয় তবে নানাপ্রকার হাস্য-রসাত্মক বা অপূর্ব্ব রসাত্মক কিছুর অবতারণা করিলে জনকয়েক লোককে ধরিয়া রাখিলেও রাখা যায়।

যদি বলা যায় সৎ-সাহিত্য-চর্চ্চায় ধর্ম্মের সাধন হয়, তবে অনেকেই হয়ত চম্‌কিয়া উঠিবেন। "হরির লুটের" আসরে বাতাসা বা সন্দেশের লোভে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাণ্ডবনৃত্যে ও কীর্ত্তনে কাটাই—ভরসা ও বিশ্বাস আছে স্বর্গের অর্গল কথঞ্চিৎ মুক্ত হইবে—অন্ততঃ মিষ্টিমুখ করিয়া বাড়ী যাইতে পারিব; সুতরাং শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কথঞ্চিৎ সাধিত হয়। কিন্তু সৎ-সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য অত ধৈর্য্য নাই। যদি বলি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি পাঠে যে ফল হয়, গঙ্গাস্নান অষ্টমীস্নান, করিলে যে পুণ্য হয়, জপ, ধ্যান, ধারণা, যোগ করিলে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, একমাত্র সাহিত্য-চর্চ্চা করিলে সেই ফল হয়, তবে আপনারা তাহা বিশ্বাস করিবেন কি? যদি প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উপস্থিত করা যায় তবে অষ্টমীস্নানে যত লোক পুণ্য-লোভে ব্রহ্মপুত্র স্নানে আসে তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ ততোধিক পুণ্যলোভে এই গৌরীপুর পুর্ণিমা সম্মিলনে উপস্থিত হইবে কি? গৌরীপুরের কর্তৃপক্ষের মহা সৌভাগ্য যে মানুষ এত পুণ্য-লোভী নয়, নচেৎ বিভ্রাট ঘটিত!!

কিন্তু এই পুর্ণিমা-সম্মিলনের সভ্যগণকে আমি খুব জোরের সহিত বলিতেছি যে আপনারা প্রকৃতই পুণ্যাত্মা। আপনারা বেদ-বেদান্ত পড়ুন আর নাই পড়ুন, আপনারা বেদজ্ঞ; আপনারা তীর্থে গমন করুন আর নাই করুন, আপনারা সাহিত্যপূত; আপনারা ধ্যান ধারণা যোগ তপস্যা করুন আর নাই করুন, স্বর্গের দ্বার আপনাদের জন্য উন্মুক্ত!!

শুধু কি তাই? যদি সাহিত্য-চর্চ্চার ফল কেবল ধর্ম্ম সাধনই হইত তবে অনেকেরই আপত্তির কারণ ছিল।

আপনারা বলিবেন, রাম! রাম!! এ আবার কি কথা, বিনা ক্লেশে ধর্ম্ম করিয়া স্বর্গে যাইব তাহাতে আবার আপত্তি কি? কিন্তু সভ্যগণ, প্রেম-তোষের মত অনেকেরই আপত্তি থাকা বিচিত্র নয়। প্রেমতোষের গুরু প্রেমতোষকে উপদেশ দিলেন, "বাপুহে মদ খেয়োনা, নরকে যাইবে।" প্রেমতোষ বলিল "গুরুদেব, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আর মদ স্পর্শ করিব না। কিন্তু একটা কথা প্রভু" গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কথা বাপু?" প্রেমতোষ বলিল, "আজ্ঞে, আমাদের জমিদার রামধন বাবু ত মদ খান তিনি কোথায় যাইবেন? আমাকে তিনি খুব ভালবাসেন, তার থিয়েটারে আমি একজন বড় "একটর্।" গুরু বলিলেন "তিনি নরকে যাইবেন"। "আজ্ঞে থিয়েটারের ম্যানেজার জয় বাবুও খান?" "তিনিও নরকস্থ হইবেন।" "আজ্ঞে Dancing mastarও ত খান?" "তিনিও নরকে যা'বেন।" "আজ্ঞে আমাদের দলের ত সকলেই খায়?" "তাহারা সকলেই নরকে যা'বে।" "তবে গুরুদেব, আমাকে মাপ কর্‌বেন, আমি নরকই গুলজার কর্‌ব প্রভু; স্বর্গে না আছে রস, না আছে আমোদ, কেবল শুক্‌নো মুনি ঋষি, আর অনুস্বার বিসর্গ—কাজ নাই আমার এমন স্বর্গে!!!"

সভ্যগণ, এরূপ আপত্তি আমাদের মধ্যে থাকাটা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। তাই আপনাদিগকে অভয় দিয়া বলিতেছি সৎ-সাহিত্য-চর্চ্চায় শুধু ধর্ম্ম নয়,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সব কয়টী হয়। এ আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা।

"ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসুচ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধু-কাব্য নিষেবণং॥"

আপনারা সকলেই ভাবিতেছেন সাহিত্য হইতে কিপ্রকারে এই চতুর্ব্বর্গ সাধন হয়। সাহিত্যদর্পণকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্প ধিয়ামপি। কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে।" আপনারা জানেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইহার এক একটী এক পুরুষার্থ, এবং এই চারিটীকে চতুর্ব্বর্গ বলা

বায়। আমরা কেহ ধর্ম্মের আচরণ করি, কেউ বা শুধু অর্থের উপাসনা করি, কেউ বা কাম অর্থাৎ ভোগ বিলাস চরিতার্থ করায় জড় প্রাণ পাত করি, কেহ বা মোক্ষের সাধনে নিযুক্ত হই। দর্পণপ্রণেতা বলেন, সৎকাব্য হইতে মানুষ ধর্ম্ম সাধন করিবে দুই উপায়ে। এক উপায় প্রত্যেক সৎকাব্য হইতে আমরা মূলতঃ এই একটী প্রধান উপদেশ পাইব যে আমাদিগকে রামাদিবৎ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, রাবণাদিবৎ নহে। সৎসাহিত্যে পুণ্যের চিত্রের সঙ্গে ২ পাপের চিত্র অঙ্কিত হইলেও লেখকের বর্ণনা কৌশলে পাঠকের মনে পাপের বিভীষিকা ও পুণ্যের বিমল-জ্যোতিই প্রতিফলিত হইবে। মানুষ যদি কাব্য-বর্ণিত আদর্শ-নায়ক হইতে পুণ্যপথ নির্ব্বাচন করিয়া লয় তবে তাহার ধর্ম্মের সাধন সম্পূর্ণ হইয়া গেল ও বস্তুতঃ সৎ-কাব্যের প্রভাব চরিত্রে অতুলনীয়।

দর্পণ-প্রণেতা বলেন সাহিত্য হইতে ধর্ম্ম প্রাপ্তির অপর উপায় সাহিত্যসেবীর ভগবৎ-স্তোত্রাদি রচনা দ্বারা। এই উপায় বর্ত্তমান সময়ে সকলের মনঃপূত নয়।

অতঃপর অর্থ প্রাপ্তির কথা। দর্পণ-প্রণেতা বলেন সাহিত্য হইতে অর্থ প্রাপ্তি সে ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ধনাঢ্যগণ সর্ব্বদাই সাহিত্য-সেবীদিগকে পোষণ করেন যদিও গোবিন্দ দাস, প্রভৃতি কয়েক জন এ নিয়মের ব্যাতিক্রম, কিন্তু তাঁহাদের দোষ এই তাঁহারা খোসামুদি জানিতেন না। খোসামুদির ঘানিতে সাহিত্য সরিষা পিষিলে বেশ তৈল বাহির হয়। আচ্ছা ধনাঢ্যের বদান্যতা ছাড়িয়া দিলাম। স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া গ্রন্থকার বড় লোক হইয়াছেন এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আর যদি উপন্যাস ও গল্প চালাইতে পারেন তবে ইট কিনিতে দেরী হইবে না। সুতরাং সাহিত্য হইতে অর্থ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

তারপর কাম বা ভোগ বিলাস। অর্থলাভ হইলে ভোগ বিলাস অনায়াসে চরিতার্থ হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এখন মোক্ষের কথা। রামাদিবৎ জীবন যাত্রার সঙ্গে ২ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের কলাকাঙ্ক্ষা সাহিত্যেও আসিবে সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে মোক্ষ প্রাপ্তি কাব্য হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

যদি বলেন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির সাহিত্য হইতে ধর্ম্ম লাভ হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিবে না। দর্পণপ্রণেতা বলেন "যে রোগ তিক্ত ঔষধে আরোগ্য হয়, সেই রোগ যদি মধুর ঔষধেও আরোগ্য হয় তবে কোন্ নির্ব্বোধ মধুর ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া তিক্ত ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হয়? সুতরাং সাহিত্য সকলেরই হৃদয় রঞ্জন করিবে।

এখন এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অর্থ নীতিবিদ্‌গণ বলেন— 'ধর্ম্মাদর্থস্ততঃ কামঃ কামাৎ সুখ সমুন্নতিঃ" এরূপ উক্তিটী খুব সমীচীন? ধর্ম্ম হইতে অর্থ, শুনিতে বেশ কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ত তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ সংগ্রহ অধর্ম্মের পথেই হইয়া থাকে। এই যে সেদিন আমরা লক্ষ্মীপূজা করিলাম, ইহা হইতে কি আমরা অন্যায় পথে ধনাগমের একটা গুপ্ত ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই না?

ধরুন এই লক্ষ্মীর বাহক পেচক। পেচক অতি কুদৃশ্য। কাহারও মুখখানা দেখিতে খারাপ হইলে আমরা বলি পেচার মত মুখ। তবেই বুঝুন এই কুৎসিৎ বাহনে লক্ষ্মীর আগমন। অন্যায় উপায়ে অর্থাৎ কুৎসিৎ বাহন ভিন্ন বেশী রকম লক্ষ্মী খুব কম আসেন।

তারপর লক্ষ্মীপূজায় রাত্রিতে অক্ষক্রীড়ার জন্য রাত্রি জাগরণ! অক্ষক্রীড়া একপ্রকার জুয়া খেলা। লক্ষ্মীর আগমনের সহিত জুয়াখেলার সংযোগ! পূর্ব্ব ইঙ্গিতটা যেন বেশী রকম ব্যক্ত হইয়া পড়িল। চানক্য বলিয়াছেন "ধনাদ্ধর্ম্মঃ ততঃ সুখম।" অর্থ হইতে ধর্ম্ম, তারপর ধর্ম্মানুমোদিত পথে ভোগ বিলাস। তারপর ভোগ হইতে ত্যাগের আরম্ভ। যার ভোগ নাই তার ত্যাগও নাই। মাথা নাই তার আবার মাথা ব্যথা!! ত্যাগ হইতে মোক্ষ। প্রকৃত পক্ষে ধার্ম্মিক গৃহস্থ ধর্ম্মানুমোদিত পথেই অর্থোপার্জ্জন করিয়া অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম কার্য্য করিবেন। পূর্ব্বোক্ত কথা বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। যাহাই হউক সাহিত্য চর্চ্চা হইতে চতুর্ব্বর্গ সাধনের কথা বুঝান গেল। এখন বলুন দেখি এই অতি সহজ পথ ছাড়িয়া কঠোর পথে যাইতে কয়জন রাজী আছেন? কঠোর পথের একটু নমুনা দেই।

আমাদের এই পূর্ণিমা সম্মিলনে উপস্থিত হইতে ক্লেশ অতি সামান্য, এই স্থানে বসিয়া থাকিতেও কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না, কোন্ আসনে, কি ভাবে বসিয়া শ্রবণাদি করিতে হইবে তাহার কিছুই বাঁধাবাধি নিয়ম নাই। কেহ পদ্মাসনেই বসুন আর স্বস্তিকাসনেই বসুন বা কুক্কুটাসনেই বসুন, কিছু যায় আসে না। পূর্ব্বাস্যই বসুন আর উত্তরাস্যই বসুন বা পশ্চিমাস্যই বসুন কোন আপত্তি নাই। তবে বক্তাস্য না থাকাটা ভদ্রতা বিরুদ্ধ মাত্র।

এখানে বসিয়া আপনি মোকদ্দমার কথাই ভাবুন, আর গৃহিণীরই ধ্যান করুন, বা প্রতিবেশীকে ৵০ ক্রান্তি ঠকাইবারই মতলব করুন তাহাতে কেহ বাধা দিবে না, তবে বক্তা আসন গ্রহণ করার উপক্রম করিলে একটু "অস্ত্রায় ফট্" করিবেন এই টুকু ভদ্রতার খাতির মাত্র।

আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় কি করিতে হইবে জানেন? যদি এই স্থলে সাহিত্য চর্চ্চা না করিয়া ধর্ম্মালোচনা করা যায় তবে আপনারা যারা শ্রোতা আছেন তাহাদিগকে কি করিতে হইবে জানেন? শাস্ত্র মতে নৈমিষারণ্য বাস করিতে হইবে। এই সভাভূমিকে নৈমিষারণ্যে পরিণত করিতে হইবে।

তবে কি আপনারা এস্থানে সেই তুষার শুভ্র—অভ্রবসন হিমালয়ের পাদতলে মৃদুবাহিনী কলনাদিনী স্রোতস্বতী তীরে গগনচুম্বী তাল তমাল পিয়াল শাল তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায়—শত পুণ্য কাহিনী বিজড়িত সাম ঝঙ্কার ধ্বনিত মধুর হোম আহুতি গন্ধ পূরিত—বিশ্বপ্রসার উদার চিত্ত—কামনা বাসনামুক্ত শত ২ মহর্ষির পবিত্র চরণ পূত নৈমিষারণ্য ইন্দ্রজালে সৃষ্টি করিবেন? সঙ্গে ২ মহর্ষিগণ উদাত্ত স্বরে বেদ ধ্বনি করিতে ২ এস্থল অলঙ্কৃত করিবেন?

যদি তা না হয় তবে শাস্ত্র একথা বলে কেন? নৈমিষারণ্য সম্বন্ধে বায়ু পুরাণের একটী বচন এই—

"এত মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ সদেশ স্তপসঃ শুভঃ॥"

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত মনোময় চক্রের নেমি যথায় প্রতিহত হয় সেই স্থানের নাম "নৈমিষ" "উবাচ নিমিষেনেদং নিহতং দানবং বলং" নিমেষ অর্থাৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে দানব বল নিহত হওয়ার নৈমিষারণ্য নাম। আবার: "অনিমিষস্ত অলুপ্ত দৃষ্টেঃ বিষ্ণোঃক্ষেত্রং" ভগবতের টীকার মতে নিমেষ রহিত বিষ্ণুর ক্ষেত্র। সুতরাং নৈমিষারণ্য মানে
(১) যথায় বিষ্ণু সাক্ষীরূপে অবস্থিত (মনোময় কোষের ঊর্দ্ধে)
(২) যথায় মনোময় চক্র ফিরে আসে। (মনোময় কোষের ঊর্দ্ধে)

(৩) যেখানে দানবীয় শক্তি অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি থাকে না। (ইহাও মনোময় কোষের ঊর্দ্ধে) ধর্ম্ম শ্রোতাকে শাস্ত্র বল্‌ছেন নৈমিষারণ্য সৃষ্টি করিতে অর্থাৎ চৈতন্যকে মনো কোষের ঊর্দ্ধে স্থাপিত কর্ত্তে অর্থাৎ বুদ্ধির ভূমিতে রাখিতে। ভগবান্ গীতায় বল্‌ছেন "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ" শুধু ধর্ম্ম শুনতেই এতখানি, এরপর জপ, ধ্যান, ফোঁটা তিলক আসন মুদ্রা বাকী।

আপনারা কয়জন এই পথে শাস্ত্র মানিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে রাজি আছেন? আর সাহিত্য চর্চ্চার পথ অতি সহজ! অতি সরস!! অতি অতি আনন্দ প্রদ!!! অথচ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সব ইহার নিকট মলিন।

সভ্যগণ ঐ যে চারিটী পুরুষার্থের বিষয় এত বিস্তারিত বলা হইল এখানেই তাহার শেষ নহে। আরও আছে। পঞ্চম পুরুষার্থ সাধনই সাহিত্যের মুখ্য সাধন। এই পঞ্চম পুরুষার্থ পদার্থটী কি, বুঝিয়াছেন কি? ইহার নাম প্রেম। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সব ইহার নিকট মলিন।

"কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়
ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়, হৃদয়!!"

বৈষ্ণব ধর্ম্মাচার্য্যগণ এই প্রেমের সাধনকে মোক্ষ সাধনের উপরে স্থান দিয়াছেন। ভক্তিপথের পথিকগণ প্রেমের সাধনকে চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপরে ভিন্ন আর একটী সাধন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই প্রেম কি পদার্থ? কাম ও প্রেমে সর্ব্বদাই গোলযোগ। বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার অতি সুন্দর পার্থক্য দেখান হইয়াছে।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার নাম কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার নাম প্রেম॥"

ইহাকে সোজা ভাবে আনিলে—নিজের ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনার নাম কাম, আর প্রিয়ের প্রীতি সাধনে আত্ম-বিসর্জ্জনের বাসনার নাম প্রেম।

শাস্ত্র বলে "আনন্দং ব্রহ্মনোরূপং" "রসো বৈ সঃ।"

যেখানে আনন্দ ও রস সেইখানেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। তবে আনন্দটী অনাবিল ও সাত্ত্বিক হওয়া চাই। গীতায় আছে "অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি" ইহাই সাত্ত্বিক আনন্দ; রাজস আনন্দ প্রথমে আনন্দের আভাস মাত্র পরে অবসাদ ও দুঃখ তামস আনন্দে কেবল মোহ মাত্র।

সচ্চিদানন্দ পদার্থকে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের দিক দিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির পথে মানুষ পাইতে চায়। এই তিনটী স্তরের সংক্ষেপ বর্ণনা একটী ইংরেজী বই হইতে তুলিলাম—প্রথম স্তরে— God is looked upon as the moral Governor of the universe. দ্বিতীয় স্তরে God is regarded as law eternal ! আর তৃতীয় স্তরে God is regarded a Love Enternal, Love which is not against His moral Governorship, but its justification, Love which is not against the Law but its fulfilment. সুতরাং প্রেম হইল Self realization of the Infinite Love" অর্থাৎ "অসীম আনন্দময় পুরুষের আত্মানন্দাস্বাদ"

রস স্বরূপ আনন্দময় পুরুষ জীবের হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়া বলিতেছেন—"তুমি আমায় ডাকনা কেন গো?" মানুষ বলিল তুমি অরূপ আর আমি রূপের কাঙ্গাল, তোমায় ডাকিব কি? আনন্দময় পুরুষ বলিল—"তুমি এই জন্ম জন্মান্তরে কতস্থানে কতরূপে এই রূপের অন্বেষণ করিয়াছ রূপ পাইয়াছ কি?" মানুষ হঠাৎ অন্তর্ম্মুখী হইল, হৃদয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া কাতরস্বরে বলিল—"না কিছুই পাই নাই, এই দেখ কেবল কাঁদিতেছি—জগতের রূপ যেন পাহাড়ের শোভা—দূর হ'তে দেখি পত্রময় পুষ্পময়—চিত্রিত অতি সুন্দর—কাছে গিয়া দেখি নীরস কর্কশ, নিষ্ঠুর প্রস্তরের স্তূপ!! ভক্তের এ ক্রন্দনে ফল হইল। হৃদয় দুয়ার খুলিয়া গেল, অসীম আনন্দময় পুরুষের রূপের প্রস্রবন উৎসারিত হইল—সাগর বহিয়া গেল—ভক্ত তাহাতে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া বলিল—

আমি চাহিনে স্বর্গ চাহিনে অর্থ—
আমি চাহিনে মোক্ষ চাহিনে ভোগ—

এর নাম প্রেমের লীলা।

আমাদের সাহিত্যে এই প্রেমের রাজত্ব। কেবল মিলনে নয় বিরহে—কেবল আলাপে নয় প্রলাপে—বসন্তের কোকিল কাকলীতে নয় মর্ম্মন্তুদ বিলাপে।

বিলাপেই ত প্রেমের বিকাশ!! শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের পর দুষ্মন্তের করুণ বিলাপে, সীতা বিসর্জ্জনের পর রামের করুণ বিলাপে, ইন্দুমতীর অভাবে অজ-বিলাপে—আর শত ২ প্রেমিকের বিলাপে এই হৃদয় স্পর্শী প্রেমের সুর শুনিতেপাই। এই সুর শুনিয়া ত্রিতাপদগ্ধ—মানব মুহূর্ত্তের জন্য যেন কোন অজানা আনন্দ রাজ্যে উপনীত হয়, দুঃখ ভুলিয়া যায়, নিজের অবস্থা বিস্মরণ হয়, প্রাণে অপূর্ব্ব ভাব জাগিয়া উঠে।

আমরা অশ্রুপ্লাবিত হইয়া নির্ব্বাসিতা সীতার কাহিনী পাঠ করি, ক্ষান্ত হইনা। এ কোন্ অশ্রু? ইহা প্রেমাশ্রু। এই প্রেম ইন্দ্রিয় বিলাসহীন নির্ম্মলানন্দ। এই অশ্রুর অন্তরালে, আমাদের আত্মা অসীম আনন্দময় পুরুষের আত্মানন্দাস্বাদ দেখিয়া তৃপ্ত হয়, তাই অশ্রুর অন্তরালে আনন্দ লুক্কায়িত থাকে। তাই দর্পণ প্রণেতা লিখিয়াছেন রসের স্বরূপ— "ব্রহ্মাস্বাদঃ সহোদরঃ" ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ আর সাহিত্যের রস একপ্রকার।

প্রেমের বিকাশ অতৃপ্ত মিলনাকাঙ্ক্ষায় অসীম আনন্দময় পুরুষে নিয়ত জগতকে আকর্ষণ করিতেছে! এই মিলনের সুর সর্ব্বত্র তাই—

কাব্য নয় চিত্র নয় প্রতিমূর্ত্তি নয়—
ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়, হৃদয়, !!

কমলা কান্তের ভাষায়, —এক হৃদয় অন্য হৃদয়কে বলিতেছে এস এস বধূ! গ্রহ উপগ্রহকে বলিতেছে এস এস বধূ!! সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে এস এস বঁধূ এস!!! জগৎ অন্য জগৎকে আহ্বান করিতেছে এস এস বঁধূ এসগো এস। অনু পরমানুকে ডাকে এস এস বঁধূ এস। আধ আচরে বসো!!! সাগর নদীকে ডাকে এস এস বঁধু, বৃক্ষশাখা হস্ত হিল্লোলিত করিয়া ডাকে এস এস বঁধূ এস!! প্রকৃতি পুরুষকে ডাকে এস এস বঁধু এস গো এস!!!

এই প্রেম—সৎসাহিত্যে পাওয়া যায়; সাহিত্যসেবী তাহা পাঠ করিয়া ধন্য হয়—আর কি হয়?

"সেই প্রেম সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগত ডুবায়!!"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

স্বরাজ-সাধন।

১

মুক্তিকামী আত্মা সদাই ইন্দ্রিয়তে বন্দী রে!
অসহযোগ তাই চলেছে পঞ্চভূতের মন্দিরে!
ইচ্ছা-মহাশক্তিমতী,
মনকে পাগল কর্‌লো অতি,
সাধন-ভজন-ছন্দগতির তাই তো আঁটি ফন্দি রে!

২

পঞ্চ রিপুর পঞ্চমকার উঠ্‌লো ভীষণ পঞ্চমে!
পঞ্চপ্রাণের কান্না শুনে' মন দিয়েছি সংযমে!
পঞ্চাননের চরণ স্মরি,'
পঞ্চমহাযজ্ঞ করি,
স্বরাজ আমার পেতেই হবে পঞ্চকোষের সঙ্গমে!

৩

রাত্রি দিনের সংক্রমণে ফুরায় আয়ু সঞ্চিত!
তরল সুখের গরল পিয়ে আসল সুখে বঞ্চিত!
ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ-সুধা,
মিটাক্ আমার প্রেমের ক্ষুধা,
সঙ্গোপনে কর্‌বো রমণ, আর কি রবো কুঞ্চিত!

৪

উপভোগের যন্ত্রণাতে জীবনটা কি কম ভোগে!
ভোগ্-আয়তন দেহের মাঝে মাত্‌বো এবার সম্ভোগে!
আমার প্রাণের সরল পথে,
বন্ধু, এসো পুষ্প-রথে,
আবেশ্-রসে রইবো মজে' আলিঙ্গনের সংযোগে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য সংবাদ।

গত ২৫ অগ্রহায়ণ বুধবার গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনের ৯ম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মুক্তাগাছার জমিদার কবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনে বহু প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল। পঠিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি সৌরভে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

বর্ষ শেষ।

বর্ত্তমান সংখ্যায় সৌরভের দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। আগামী সংখ্যায় সৌরভ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। এপর্য্যন্ত আমরা সৌরভকে নিয়মিত ভাবেই চালাইয়া আসিয়াছি—মাসের প্রথম ভাগেই হউক, আর শেষ ভাগেই হউক, মাসের সৌরভ মাসেই বাহির হইয়াছে।

সৌরভ পরিচালনে এই রীতির যে একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশেই প্রতি বৎসর হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে প্রেসগুলি স্কুল সমূহের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র মুদ্রণে ব্যাপৃত থাকে, এই জন্য অন্য কোন কাজই ঐ মাসে প্রেস হইতে নিয়মিত মত পাইবার উপায় নাই। নিজেদের প্রেস করিয়াও এই বাধা অতিক্রমের সাধ্য হইল না। সে জন্য এবারও অগ্রহায়ণ সংখ্যা অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহে বাহির করিবার রীতি রক্ষা করিতে পারি নাই। অগ্রহায়ণের শেষ দিনে পত্রিকা বাহির করিতে হইয়াছে; এবং পৌষের সংখ্যা পৌষের ১৫ই বাহির হইল।

মাঘে বর্ষারম্ভ হইবে। মাঘের সংখ্যা ১লা মাঘ বাহির হইবে এবং ৭ই মাঘের ভিতর সকল গ্রাহকই তাহা পাইবেন। অতঃপরও যাহাতে প্রতিসংখ্যা প্রতি মাসের ১লা তারিখ বাহির হইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এবার রীতিমত চিত্র দিবার বন্দোবস্ত করা গেল। এ ব্যবস্থার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে সময় মত ব্লক আসিয়া না পৌঁছিলে এই ব্যবস্থা ঠিক থাকিতে পারিবে না। নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ছবি ব্যতীতই সৌরভ বাহির হইবে। আশা করি সৌরভের অনুগ্রাহক গ্রাহকগণ অবস্থা বুঝিয়া এইরূপ ত্রুটী ক্ষমা করিয়া লইবেন।

সৌরভের প্রাচীন গ্রাহকগণ—যিনি যে সময়ে মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন তিনি সেই সময়ই মূল্য প্রদান করিবেন। ইতি

কার্য্যাধ্যক্ষ।